একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা
ও অন্যান্য প্রবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

কেতকী কুশারী ডাইসন

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

রবীন্দ্রচর্চায় সহপথিক

চিত্রশিল্পী সুশোভন অধিকারীকে

লেখিকার এ-যাবৎ গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য তাঁর ওয়েবসাইট :

http://www.virgiliolibro.com.kkd

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণের পর দেড়শো বছর পূর্ণ হতে চলেছে। দেশে-বিদেশে স্মারক সভার বা উৎসবের প্রস্তুতি চলছে, কিছু কিছু কার্যক্রম আরম্ভও হয়ে গেছে। তাঁকে নিয়ে যেটুকু কাজ করেছি তার সূত্র ধ'রে আমার দুয়ারেও নানা অনুরোধ আর আমন্ত্রণ পৌঁছচ্ছে—কেউ দাবি করছেন প্রবন্ধ, কেউ চাইছেন আমি তাঁদের সভায় গিয়ে কিছু বলি। ভয় করছে আমার—আমার নিজের যে-সব কাজ শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলা দরকার সেগুলিকে অসমাপ্ত অবস্থায় চতুর্দিকে ফেলে-ছড়িয়ে রেখে, সীমাবদ্ধ সময় আর ক্ষীয়মাণ শক্তি নিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সেই বিশেষ মানুষটি সম্পর্কে নতুন কী কথা শোনাতে পারি, এতজনের দাবি কী ক'রে মেটাই ?

সেই বিশেষ মানুষটি আমার জীবনেও বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁর জীবনের শেষ বছর আর আমার জীবনের প্রথম বছর এক : তাঁর সময়ের ভূলুণ্ঠিত চাদরের শেষপ্রান্তটিকে আমি ছুঁতে পেরেছিলাম। সাক্ষরতার প্রথম পর্যায় থেকেই তাঁর কবিতা আমার চেতনায় তার স্বাক্ষর রেখেছে, বড় হয়ে তাঁকে জেনেছি আমাদের গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক গগনের মধ্যাহ্নসূর্য-রূপে। অত বড় একটি জ্যোতিষ্ক কালের বিচারে এখনও আমাদের বেশ কাছাকাছি ব'লেই আমাদের জন্যে তা কিছু সমস্যা, কিছু টেনশনও সৃষ্টি করে। এমন একটি মূর্তি তিনি, যাঁকে ঘিরে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে সহজেই তৈরি হয়ে ওঠে 'ব্যাণ্ডওয়াগন' বা শকটবাহিত বাজনদারদের পরিমণ্ডল। সেই কলরোলে হারিয়ে যায় একটি প্রশ্ন : ঐ ঢাকবাদ্যি ছাড়া আর কী তিনি উত্তরসূরি আমাদের কাছ থেকে পেতে পারেন, দাবি করতে পারেন ?

সেই প্রশ্নটার কিছু উত্তর, আমার দিক থেকে যেমন দেখায়, আমার এই নব্বইয়ের দশক থেকে নেওয়া প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে। ঐ কালপর্বের একটা বড় অংশ জুড়ে আমি রবীন্দ্রগবেষণায় নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু শুধু তা-ই করছিলাম না, চর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিচরণ করছিলাম। কেবল একটি বিষয়ে নিমগ্ন থাকেন যে-ধরণের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, আমি তা নই, চেষ্টা করলেও হতে পারতাম না, কেননা আমার মন নানা রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। রবীন্দ্রচর্চা প্রকৃতপক্ষে বহুবাচনিক। বিভিন্নজন বিভিন্ন অবস্থান-জীবনচর্যা-পরিবেশের ভিতর থেকে, বিভিন্ন চারণক্ষেত্রের সংলগ্নতায় ও প্রভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে সে-কাজ করবেন এটাই প্রত্যাশিত। অভিজ্ঞতা ও মননের একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি থেকে আমাদের ভাবনারা যেভাবে বাষ্পায়িত হয়ে উপরে ওঠে,

সেই প্রক্রিয়াটা বুঝে নিতে বরাবর আগ্রহ আমার। কোনো-একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি, কিন্তু তারই সংলগ্নতায় আরও কয়েকটা বিষয় নিয়েও ভেবে চলেছি, এবং সেই বহুগোত্র ভাবনাদের মিথস্ক্রিয়া থেকেই আমার পুরো ভাবনাজগৎটা গ'ড়ে উঠছে। আমি চাই যে আমার পাঠকরা এই পশ্চাদ্ভূমিটা বুঝুন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝে নিন। এই বইয়ে প্রথম সাতটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এখানে এমন কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি প'ড়ে তখনকার তরুণ প্রজন্ম কবিতা-অনুবাদের 'কী এবং কেন' সম্পর্কে দিশা পেয়েছিলেন—তাঁরা বলেছেন আমাকে। বাকিগুলিতে ধরানো আছে নব্বইয়ের দশক জুড়ে আমার অন্যান্য কিছু চিন্তাক্ষেত্র, যাদের ভিতরে আনাগোনা করতে করতেই রবীন্দ্রচর্চাও ক'রে গেছি। ঐ চারণভূমিগুলিকে প্রেক্ষিতের মধ্যে নিলে পাঠকদের চোখে আমার রবীন্দ্রচিন্তার 'কী এবং কেন' আরও পরিষ্কারভাবে ধরা দেবে। আমি যে একজন আন্তঃসাংস্কৃতিক জীবনচর্যার মানুষ, একজন 'ডায়াস্পোরিক' বাঙালী, জন্মভূমির বাইরে অন্য একটি সমাজের ভিতরমহলে অবস্থান ক'রে বাংলাভাষার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত থাকি, আমি যে একজন মেয়ে, নারীবিষয়ক গবেষণা যে আমার ঔৎসুক্যের একটি ক্ষেত্র, আমি যে ফ্রীলান্সার, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি করি না, আমি যে কেবল গবেষক-প্রাবন্ধিক-অনুবাদক নই, নিজেও সৃষ্টিশীলভাবে লিখি, দুটি ভাষায় কবিতা লিখি, সাহিত্যিক হিসেবে কেবল রবীন্দ্রনাথের নয়, রবীন্দ্রোত্তরদেরও অধমর্ণ—আমার রবীন্দ্রচিন্তাকে বুঝতে হলে আমার এই 'ব্যাকগ্রাউণ্ড'টা মাথায় রাখা দরকার। ভাবনাদের একটা বিস্তৃততর জালবন্ধনের মধ্যে আমার রবীন্দ্রভাবনাকে বসিয়ে দেখলে পাঠকরা বুঝবেন কেন আমি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গীয় মিডিয়ার কোনো কোনো মহলে আক্রমণের শিকার হয়েছি, বিতর্কে জড়িয়ে প'ড়ে জবাব দিতে বাধ্য হয়েছি। তাঁরা দেখবেন, যে-প্রবন্ধগুলি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়, সেখানেও প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া কোনো সূত্র, তাঁর কোনো টেক্সটের টুকরো ঘুরে-ফিরে চ'লে আসছে, আমার জগৎ নির্মাণে আমাকে সাহায্য করছে।

বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে আবশ্যিকভাবেই কিছু সাধারণ এলাকা আছে, কয়েকটি সূত্র বিভিন্ন অনুষঙ্গে বারবার বোঝাতে হয়েছে, প্রত্যেকটি লিখনেই চিন্তার একটি সামগ্রিক চালচিত্রকে ধরিয়ে দিতে হয়েছে। পাঠকরা পুনরুক্তিগুলো মার্জনা ক'রে নেবেন, বেশী কাটছাঁট করতে গেলে লিখনগুলির প্রাবন্ধিক অঙ্গসৌষ্ঠব ব্যাহত হতো। অন্যান্য গোত্রের কিছু সম্পাদনা-পারিমার্জনা অবশ্যই করতে হয়েছে। প্রায় সমস্ত টীকা এখনকার সংযোজন। যে-বানানপদ্ধতিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি তা-ই ব্যবহার করেছি, অন্যদের থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময়ে তাঁদের বানান অক্ষত রেখেছি।

কিডলিংটন, অক্সফোর্ডশায়ার, ২০১০

সূচীপত্র

আমার রবীন্দ্রচর্চা : কিছু প্রারম্ভিক কথা

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার প্রথম প্রবন্ধ ছাপা অক্ষরে বেরিয়েছিলো ১৯৬৪ সালের রবীন্দ্রজন্মদিবসে *দৈনিক বসুমতী* কাগজে। লিখিয়ে নিয়েছিলেন ঐ কাগজের সম্পাদক, সেকালের নাম-করা সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে চিনতাম, কারণ তাঁর প্রথমা কন্যা প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠিনী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে আমি যখন অক্সফোর্ড থেকে বি. এ. পাশ ক'রে কলকাতায় ফিরলাম তখন *দেশ* পত্রিকার কল্যাণে একজন উদীয়মান কবি হিসেবে আমার নামটা অনেকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু আমার গদ্য লেখার সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত হন নি। সেই সময়ে একাধিক সম্পাদক আমাকে দিয়ে গদ্য লিখিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠলেন। 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প' নামে লেখাটি সেইরকমই একটি সম্পাদকীয় চেষ্টার ফলশ্রুতি। পরবর্তী কালে আমার প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধসংগ্রহ *শিকড়বাকড়*-এ স্থান দিয়েছি তাকে।

একজন মানুষের চিন্তার মধ্যে যে কিরকম ছেদহীন ধারাবাহিকতা থাকে তা মর্মে মর্মে বোঝা যায় নিজের পুরোনো লেখায় ফিরে গেলে। আমার মন যে বরাবরই কংক্রীটধর্মী, মূর্তের প্রেমিক, তার পরিচয় পাই এই ছোট্ট লেখাটিতে। চব্বিশ পূর্ণ হওয়ার আগে লেখা ঐ ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম :

> রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'জীবনদর্শন' নিয়ে ভাসা-ভাসা কতগুলি ধরতাই বুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা ছাড়া তাঁর বিষয়ে আর কোনো সক্রিয় কাব্যগুণগ্রাহিতা আমাদের মধ্যে সত্যিই বিরল। তাঁর মধ্যে যেহেতু কতগুলি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনস্বীকার্য প্রভাব আছে, সেহেতু তাঁর কবিতাগুলিকে কবিতা হিসেবে না দেখে কয়েকটি পরিচিত নির্বস্তুক ভাবের লীলাক্ষেত্র হিসেবে দেখাটাই অধিকাংশ পাঠক-সমালোচকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর কল্পনা, শব্দপ্রয়োগ, চিত্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সম্পর্কে বাঙালীরা সাধারণতঃ উদাসীন; ফলে তারা তাঁর কবিতার যথার্থ সচেতন পাঠক হয়ে উঠতে পারে না।
>
> রবীন্দ্রনাথের কবিতা একান্তভাবে বাংলাদেশের জলমাটির সন্তান, তার রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের দ্বারা নিবিড়ভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট। সারা পৃথিবীতে ভ্রমণ

করা সত্ত্বেও বিদেশের প্রাকৃতিক রূপ তাঁর কবিতায় বেশী প্রভাব বিস্তার করে নি; মোটের উপর বাংলাদেশের স্নিগ্ধতাই তাঁর রচনায় নির্ভুল স্বাক্ষর রেখেছে।

এখানে এমন কিছু গুঞ্জরণ আছে যেগুলি পরিণততর রূপ পায় আমার পরবর্তী কালের রবীন্দ্রবিষয়ক ভাবনা ও গবেষণার মধ্যে। বাঙালীরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে কবিতা হিসেবে দেখতে নিরুৎসুক, ও ব্যাপারে তাঁরা সাধারণতঃ উদাসীন, রবীন্দ্রকাব্যকে তাঁরা দেখেন নির্বস্তুক অর্থাৎ বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভাবের লীলাক্ষেত্র হিসেবে, এ-সব কথা আমার সে-যুগেই মনে হয়েছে। তখনও বুদ্ধদেব বসুর বই *কবি রবীন্দ্রনাথ* বেরোয় নি। সে-বই বেরোলো আরও দু' বছর পরে, ১৯৬৬ সালে। আমি তো বাংলা অনার্সের ছাত্রী ছিলাম না, ছিলাম ইংরেজী অনার্সের ছাত্রী। ইংরেজীতে সেকালে আমরা যে-যে ধরণের সাহিত্যিক বিচারবিশ্লেষণে অভ্যস্ত ছিলাম, যেমন বায়গ্রাফিকাল অনুসন্ধান, লেখকের দেশকাল, সামাজিক শ্রেণী, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে বসিয়ে তাঁর লেখাকে দেখবার চেষ্টা, তাঁর শব্দপ্রয়োগ ও চিত্রকল্পরচনার সযত্ন বিশ্লেষণ—এ-সমস্তর বদলে রবীন্দ্রচর্চার মধ্যে দেখতে পেতাম ভক্তিময় আরাধনার উপচার, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবার প্রবণতা। এই-সব কথা ভেবেছি বাংলা সাহিত্যের বিশেষিত চর্চার বাইরে থেকে, ভিতরের ঘরগুলিকে বাড়ির বারান্দা থেকে দেখে যেভাবে বোঝা যায় সেইভাবে। জানি না বাংলা অনার্সের ছাত্রী হলে কী ভাবতাম, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রচর্চার কিছু বিকল্প মডেল সম্পর্কে আরও অবহিত হতাম। কিন্তু তখনই এটুকু বুঝতাম যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলেরই উত্তরাধিকার, তাঁর উপরে আমাদের সকলেরই দাবি আছে। তাই আরোই অস্বস্তি হতো। পরবর্তী কালে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে বাঙালীদের দিক থেকে কিছু যুক্তিবর্জিত তর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তখন মনে প'ড়ে গেছে আমার ১৯৬৪ সালের সেই অনুভব, মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে কবিতা হিসেবে দেখবার অক্ষমতা অনেকের মধ্যে এখনও অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ যে কেন পৃথিবীপর্যটক হয়েও তাঁর লেখায় বিদেশী নিসর্গের বেশী বর্ণনা রেখে যান নি, তা বুঝতে পারলাম যখন তাঁর আংশিক বর্ণান্ধতার কথা জানলাম এবং তা নিয়ে গবেষণা করলাম। তাঁর শব্দপ্রয়োগ ও চিত্রকল্পনির্মাণকে তখন বিশেষভাবেই স্টাডি করতে হলো।

এর পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি ছোট্ট অনুসন্ধান করেছিলাম আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় দেবীপদ ভট্টাচার্যের অনুরোধে। সেটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়। তখন আমি বিয়ের পরে ব্রাইটনে থাকতে এসেছি। ব্রাইটনে কিশোর রবীন্দ্রনাথ কোন্ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, মেদিনা ভিলাস্ নামে যে-

গৃহশ্রেণীর মধ্যে একটিতে তিনি কিছু দিন কাটিয়েছিলেন সেটিই বা ঠিক কোথায়, এ দুটি বিষয়ে তিনি আমাকে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। ব্রাইটনে থাকি—উক্ত অনুসন্ধানকার্যে ঐটুকুই আমার কোয়ালিফিকেশন। আমি আর আমার স্বামী খুশী মনে অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। খোঁজখবর ক'রে যা-কিছু জানা গেছিলো তা তাঁকে জানিয়েছিলাম। খবরের টুকরোগুলো তিনি *রবীন্দ্র-চর্যা* নামে তাঁর একটি বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর সেই বইখানায় মেদিনা ভিলাস্-এর যে-ছবিটা রয়েছে সেটা আমাদেরই ক্যামেরায় তোলা। আসলে মেদিনা ভিলাস্ ঠিক ব্রাইটনে নয়, তারই সংলগ্ন হোভ্-নামক শহরটিতে অবস্থিত। ব্রাইটন আর হোভ্ সমুদ্রতীরবর্তী দুটি পাশাপাশি শহর, যমজ শহর। ওখানে থাকার সময়েই বুদ্ধদেবের *কবি রবীন্দ্রনাথ* পড়লাম।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম, কত বড় বড় পণ্ডিত ভারত আর বিলেতের মধ্যে যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা কেউ আমাদের আগে কবির ব্রাইটনবাস-সংক্রান্ত খবরগুলো খুঁজে বার করেন নি কেন? তাঁরা কি এ ধরণের অনুসন্ধানে আগ্রহী নন? দেবীপদবাবু একটা মোক্ষম কথা বলেছিলেন, যা আমি কখনো ভুলতে পারি নি। তিনি বলেছিলেন, 'জানো তো, আমাদের মধ্যে তথ্যের চাইতে তত্ত্বের প্রতিই আসক্তি বেশী।' তথ্যের প্রতি অন্যদের এই অনীহা বারে বারে আমাকে বিপর্যস্ত করেছে, নানান এঁড়ে তর্কের মুখোমুখি করেছে। রবীন্দ্রচর্চায় তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে-ফাঁক ছিলো তা পরবর্তী কালে পূর্ণ করেছেন অধ্যবসায়ী গবেষক প্রশান্তকুমার পাল। তিনি আমারই প্রজন্মের মানুষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি আর আমি একই বছরে স্নাতক হয়ে বেরোই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমি যদিও বাংলা বিভাগের তিনজন ছাত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, এবং আরেকজন ছাত্রকেও অল্পস্বল্প চিনতাম,—যিনি পরে ঐ তিন বান্ধবীর একজনের স্বামী হন,—প্রশান্তকে কিন্তু ছাত্রাবস্থায় চিনতাম না। তিনি বরাবরই লাজুক প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় আরোই মুখচোরা ছিলেন।

§

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রচর্চার প্রাঙ্গণে আমি এসে পড়েছি ঘটনাচক্রে, পর-পর করা কয়েকটি কাজের ধারাবাহিকতার চক্রান্তে। রবীন্দ্রচর্চা আমার কাজের একমাত্র ক্ষেত্র নয়, এবং বিভিন্ন প্রোজেক্টের প্রয়োজনে যে-কাজ করেছি তার বাইরে কোনো বিশেষজ্ঞতাও দাবি করি না। ইংরেজীর ছাত্রী আমি কী ক'রে এই চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম?

বললে ভুল হবে না, প্রাপ্তবয়স্ক রবীন্দ্রচর্চায় আমি দৈবাৎ এসে পড়েছি ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের রাস্তা ধ'রে। তখন সত্তরের দশকের শেষ, আমার প্রথম উপন্যাস লেখা শেষ করেছি। একই সময়ে স্প্যানিশ ভাষাটা নিয়ে

একটু নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করেছিলাম, কেননা স্প্যানিশ গান আমার খুব প্রিয়। সেই সূত্রে অক্সফোর্ডের টেইলরিয়ান লাইব্রেরিতে গেছি, বইপত্র উল্টেছি। একদিন ভাবলাম, দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যের তাকগুলো একটু দেখলে কেমন হয়, হয়তো রবীন্দ্রনাথের বিজয়া সম্বন্ধে কোনো বই পাওয়া যাবে। পেয়েও গেলাম—তখন সবে বেরিয়েছে মার্কিন অধ্যাপিকা ডরিস মায়ারের লেখা একটি বই, যা কিনা ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রামাণিক ওকাম্পো-জীবনী। তখন শিবনারায়ণ রায়ের সম্পাদনায় *জিজ্ঞাসা* ত্রৈমাসিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তিনিও সম্পাদকীয় কানুন মেনে যথারীতি আমাকে দিয়ে গদ্য লেখানোর তালে আছেন। মায়ারের বইখানা সেখানে রিভিউ করলাম। তার পর আমাদের ঐ লাইব্রেরিতে আবিষ্কার করলাম ভিক্তোরিয়ার প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা *সুর*-এর সমস্ত ব্যাক ইশ্যু, এবং অনেক খণ্ডে তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ *তেস্তিমোনিয়োস্*। দেখলাম তাঁর পত্রিকার একটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে, শ্রদ্ধাঞ্জলি-সহ অবিচুয়ারি প্রবন্ধ। প্রথমে পত্রিকায় বেরিয়েছে, তার পর তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহে সংকলিত হয়েছে। কলকাতায় খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই প্রবন্ধটির কথা সেখানে কেউ জানেন না। শিবনারায়ণ রায়কে প্রস্তাব দিলাম, এইটি যদি তর্জমা করি, কেমন হয়? তিনি তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবকে স্বাগত করলেন। তখন স্প্যানিশ পড়ার ব্যাপারে একেবারে উঠে প'ড়ে লাগলাম, এবং বুয়েনোস আইরেস থেকে অনুবাদের অনুমতি আনিয়ে নিয়ে তর্জমার কাজটা করলাম। সেটা *জিজ্ঞাসা*-য় ছাপা হলো, এবং অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

১৯৮১ সালে কলকাতায় গেছি, কলকাতার প্রকাশনা-জগতের অন্যতম বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেক দিন বাদে দেখা হলো। তাঁকে অল্প বয়সে চিনতাম, কবিতাভবনে দেখেছি। আমি যখন ১৯৫৮-৫৯-এর *প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা*-র সম্পাদনা করি তখন তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে প্রুফ দেখতে হয়। নাভানা-য় ছিলেন, মাঝখানে নাভানা ছেড়ে দিয়ে ভারবি-র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার পর আবাব নাভানা-য় ফিরে এসেছেন তখন। *জিজ্ঞাসা*-য় প্রকাশিত ওকাম্পো-সম্পৃক্ত লেখা-দুটি তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি আমাকে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে একটা ছোট বই লেখো।' আমি খুব গাঁইগুঁই করলাম। তাঁকে বললাম, এ বিষয়ে যা-কিছু জানার আছে তা সাহিত্য আকাদেমির রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক গ্রন্থের অন্তর্গত ওকাম্পোর স্মৃতিচারণা বা শঙ্খ ঘোষের *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ* থেকেই জানা যায়। আর ঐ তো দুটো কাজ ক'রে দিয়েছি—মায়ারের বইটা রিভিউ ক'রে দিয়েছি আর ১৯৪১-এর অবিচুয়ারিটা তর্জমা ক'রে দিয়েছি। ও দুটোই এ বিষয়ে আমার অবদান, আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? আসলে আমি তখন আমার দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার জন্য পাঁয়তারা কষছি, বিরামবাবু আমাকে রিসার্চের দিকে

ঠেলতে চাইছেন এইটে আমার একটুও মনঃপূত হয় নি। 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো,' ব'লে বিলেতে ফিরে এলাম। স্থির করলাম, যদি আলোচ্য বিষয়ে কিছু নতুন মেটিরিয়ল পাওয়া যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথ আর ওকাম্পোর বিষয়ে নতুন বই লিখবো। লাইব্রেরি ঘেঁটে আবিষ্কার করলাম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর গান্ধী সম্পর্কে ভিক্তোরিয়ার আরও কিছু ছোট ছোট রচনা। এক ইংরেজ কবি-বান্ধবী মারফৎ খবর পেলাম, ডার্টিংটন হলের এল্‌ম্‌হার্স্ট আর্কাইভ্‌সে এমন কিছু প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র আছে, যাদের নিয়ে কেউ কখনো গবেষণা করে নি। সেখানে পেয়ে গেলাম কিছু অমূল্য দলিল। মালমশলা যোগাড় করেছি, কিন্তু বইটাকে কিভাবে বাঁধবো তার হদিস পাচ্ছিলাম না। ওদিকে ভিতরের উপন্যাসটা ক্রমাগত দাবিদার হয়ে উঠছে। তার পর এক দুর্লভ অনুপ্রেরণার মুহূর্তে মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম উপন্যাস আর রিসার্চ এই দুটো ধারাকে কিভাবে একই বইয়ের শরীরে বেণীর মতো বেঁধে দেওয়া যায়। সৃষ্টির তাগিদ আর গবেষণার প্রতি উন্মুখতাকে আমরা কৃত্রিমভাবে পৃথক ক'রে রাখি। কিন্তু একই মানুষের স্বভাবে এবং জীবনচর্যায় দুয়ের সহাবস্থান ঘটতে পারে, এবং সেই সহাবস্থানকে রূপ দিতে পারা স্বস্তিজনক তথা আনন্দদায়ক। আমার সামনে এমন কোনো বই মডেল হিসেবে ছিলো না, যেখানে ঠিক আমার বইটির মতো আঙ্গিক দেখতে পাওয়া যায়। আমার বই বেরিয়ে যাওয়ার পর অন্যদের কাছ থেকে জেনেছি, ফিক্‌শনের সঙ্গে ফিক্‌শনাল রিসার্চের গ্রন্থন করেছেন কেউ কেউ, অর্থাৎ তাঁদের গল্পের মধ্যে যে তথাকথিত রিসার্চ আছে সেটাও বানানো। কিন্তু *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* লেখার সময়ে আমার নিজের সেরকম কোনো বইও পড়া ছিলো না। আসলে আমার বইটা আমি কিভাবে সাজাবো সে-সম্পর্কে আইডিয়াটা পেয়েছিলাম সাহিত্য নয়, পাশ্চাত্য সংগীতের এক 'মুভমেন্ট' থেকে আরেক মুভমেন্টে চ'লে যাওয়ার আর সিনেমার দৃশ্যবদলের টেকনিক থেকে। অনেকেই স্বীকার করেছেন, এই মিশ্র আঙ্গিকের মাধ্যমে আমি জীবন সম্পর্কে এমন কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পেরেছি, যা অন্য কোনোভাবে দেওয়া যেতো না। বইটি আমাকে এনে দিয়েছিলো আমার জীবনের প্রথম আনন্দ পুরস্কার।

আমার বিশ্বাস, মূল স্প্যানিশ থেকে ওকাম্পোর বিভিন্ন রবীন্দ্রবিষয়ক টুকরো রচনার অনুবাদ ছাড়াও রবীন্দ্র-ওকাম্পো গবেষণার দিক থেকে বিচার করলে বইটি কিছু সম্পূর্ণ নতুন অবদান রাখতে পেরেছিলো। প্রথমতঃ, ঐ দুজনের মিথস্ক্রিয়ার কাহিনীতে এল্‌ম্‌হার্স্টের ভূমিকার চিত্রণ। আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার আদানপ্রদানকে তৃতীয় যে-ব্যক্তি একেবারে কাছ থেকে দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিলেন, এবং ঐ দুজনের সঙ্গে রীতিমতো একটা ত্রিভুজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রসুহৃদ লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট। হৃদয়াবেগের অনেক ঝড়ঝাপ্টা, অনেক মান-অভিমানের জোয়ারভাঁটা পেরিয়ে তিনজনের মধ্যে এমন একটা

ত্রিকোণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা তাঁদের সকলের পক্ষেই আজীবন স্থায়ী হয়। আর্জেন্টিনায় তাঁদের ঐ ঝটিকাক্ষুব্ধ উত্তাল দিনগুলির একটা দলিলভিত্তিক চিত্র আমিই প্রথম আঁকলাম। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের আঁকা কোনো কোনো নারীমুখের উপরে যে ভিক্তোরিয়ার মুখের ছায়া প'ড়ে থাকতে পারে সেই সম্ভাবনার দিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তথা নারীবিষয়ক তাত্ত্বিক চিন্তায় ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং ঐ মহিলার নারীবিষয়ক চিন্তাভাবনার যে একটা সূক্ষ্ম প্রভাব প'ড়ে থাকতে পারে তার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলাম, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ বিনিময়ের আগে এবং পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক কিছু রচনার বিশ্লেষণ করেছিলাম। যতদূর জানি, সর্বপ্রথম এই বইয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগত নারীভাবনার টানাপড়েনকে আধুনিক নারীবাদী বিশ্লেষণের অধীন করা হয়, তাঁর চিন্তাধারার অন্তর্বিরোধগুলিকে উদ্ঘাটন করা হয়, তাঁর মধ্যে যে একটা ফেমিনিস্ট-বনাম-অ্যান্টিফেমিনিস্ট দ্বন্দ্ব ছিলো তা তুলে ধরা হয়। চতুর্থতঃ, রবীন্দ্রনাথের জীবনে যত নারী এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভিক্তোরিয়াই যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা কৃতী ও ব্যক্তিত্বশালিনী, কৃতিত্বের উচ্চতায় কবির সব থেকে কাছাকাছি, এবং কেবল কবির প্রেরণাদাত্রী বিজয়া হিসেবেই স্মরণীয়া নন, নিজের জোরেই বিংশ শতাব্দীর একজন কৃতী মহিলা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সংস্কৃতিজগতের একটি অবিস্মরণীয় নাম—এই তথ্যটি এই বইয়েই প্রথম প্রতিষ্ঠা পায়। তার আগে বাংলায় এবং বৃহত্তর ভারতে এ বিষয়ে ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিলো। আমার বইটির আরও একটি অবদান কাদম্বরী দেবীকে ঘিরে। তাঁর আত্মহত্যার আগে তাঁর মানসিক অবস্থা কিরকম হয়ে থাকবে, আধুনিক মনস্তত্ত্বের নিরিখে এবং অনামিকার জবানিতে তার একটা বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করি। তার আগে ঠিক ওভাবে, বিশ-শতকী মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে আর কেউ বিশ্লেষণ করেন নি। জগদীশ ভট্টাচার্যের *কবিমানসী* পড়তে বলেছিলেন একজন ; তখন সে-বই বাজারে পাওয়া যায় নি, সম্ভবতঃ আউট-অফ-প্রিন্ট ছিলো ; কিন্তু তা থেকে প্রাসঙ্গিক পাতাগুলির ফোটোকপি আনিয়ে নিয়ে পড়েছিলাম, প'ড়ে উপকৃতও হয়েছিলাম। তবু আমার সচেতন চেষ্টা ছিলো আমার বিশ্লেষণটিকে আরেকটু যুগোপযোগী করার দিকে। মানুষ যে শুধু মনে দুঃখ পেয়ে অভিমানভরে আত্মহত্যা করে না, তেমন ক্রিয়ার যে আরও কিছু শারীরিক-মানসিক ভিত্তি থাকে, মানুষের যে ঘোর অমানিশার মতো ডিপ্রেশন অথবা মানসিক ভাঙন হয়, তার যে একটা ক্লিনিকাল মাত্রা থাকে, কেউ কেউ যে মেধা, সৃজনশীলতা আর ডিপ্রেসিভ প্রকৃতির গাঁটছড়া নিয়ে জন্মায়, একাধিকবার আত্মক্ষতি করার চেষ্টা করে—বাংলা সাহিত্যের আলোচনাপ্রাঙ্গণে এই তথ্যগুলির কোনো স্পষ্ট স্বীকৃতি আগে ছিলো না, এখনও অনেকে এদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন। পাশ্চাত্য

শিল্পসাহিত্যের আলোচনাপ্রাঙ্গণে এ-সব ব্যাপারে ইনহিবিশন নেই, সিলভিয়া প্ল্যাথ বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ডিপ্রেসিভ প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে কেউ সংকোচ বোধ করেন না। আমার সে-ট্রেনিং ছিলো ব'লেই আমি ঐ পরিপ্রেক্ষিতটা টেনে আনতে পেরেছিলাম।

অনেকে হয়তো জানেন না, কেবল সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ নন, যে-মহিলাটির জন্য টেড হিউজ় তাঁর স্ত্রী সিল্‌ভিয়াকে ছেড়ে যান, তাঁরও একটা ডিপ্রেসিভ দিক ছিলো, এবং তিনিও সিল্‌ভিয়ার মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পরে সিল্‌ভিয়ার আত্মহত্যারই অনুকরণে গ্যাসের বিষক্রিয়ার সহায়তায় আত্মহত্যা করেন। তফাৎ এই যে সিল্‌ভিয়া তাঁর বাচ্চা-দুটির যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা ক'রেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর এই মহিলা তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে আত্মঘাতিনী হন। এ থেকে অনুমান করা যায়, ঐরকম আত্মবিধ্বংসী ব্যক্তিত্বের মেয়েদের প্রতি টেড হিউজ় হয়তো তাঁর জীবনের একটা পর্বে একটা অবসেসিভ গোত্রের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। আরেকটা খবরও সম্ভবতঃ অনেকে জানেন না—দুই কবি টেড আর সিল্‌ভিয়ার পুত্র, যার এক বছর পূর্ণ হবার মাত্র কয়েক দিন পরে ১৯৬৩-র ফেব্রুয়ারিতে সিল্‌ভিয়া আত্মহত্যা করেছিলেন, সেই নিকোলাস হিউজ় সম্প্রতি—২০০৯-এর মার্চে—আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর এই শিশুপুত্র সম্পর্কে সিল্‌ভিয়া একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

> You are the one
> Solid the spaces lean on, envious.
> You are the baby in the barn.
> ('Nick and the Candlestick', *Ariel*)

ঐ মর্মস্পর্শী প্রত্যয় সত্ত্বেও আত্মনাশের দিকে নিজের যাত্রাপথ রুদ্ধ করতে পারেন নি সিল্‌ভিয়া। ডিপ্রেশনের সঙ্গে লড়েছেন, কিন্তু জিততে পারেন নি। জেনেটিক-উত্তরাধিকার-বাহিত ডিপ্রেশনের সঙ্গে লড়েছেন নিকোলাসও। মাছ ধরা টেড হিউজ়ের নেশা ছিলো ; অল্প বয়সে বাবার কাছ থেকে মৎস্যজীবন সম্পর্কে কৌতূহল অর্জন ক'রে বড় হয়ে মেরিন বায়লজি বা সামুদ্রিক জীববিদ্যায় কৃতী বিজ্ঞানী হয়েছিলেন নিকোলাস। মায়ের বাপের বাড়ির দেশে সেট্‌ল্ করেছিলেন, আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করতেন। শুভার্থীরা আশা করেছিলেন যে ভিন্ন সেই পরিবেশে প্রকৃতির সাহচর্যে এবং কর্মময় সফল জীবনের সহায়তায় তাঁর বিষাদবোধকে তিনি অতিক্রম করতে পারবেন, কিন্তু দেখা গেলো যে শেষ পর্যন্ত তা পারলেন না, সাতচল্লিশ বছর বয়সে মনের সেই 'অদ্ভুত আঁধার'-এর কাছে তিনিও হার মানলেন। তত দিনে টেড

হিউজ় গত হয়েছেন। নিকোলাসের দিদি ফ্রীডা বেঁচে আছেন। শোনা যায় তাঁরও একটা ডিপ্রেসিভ প্রবণতা আছে।

না, বিষয়ান্তরে চ'লে যাচ্ছি না। বোঝাতে চাইছি যে বিষাদপ্রবণতা, মানসিক ভাঙন, আত্মক্ষতির চেষ্টা—মানবজীবনে এই জিনিসগুলি বাস্তব, তীব্র, পরস্পরসংলগ্ন। আধুনিক কালের সাহিত্যালোচনায় এরা যথাযোগ্য স্বীকৃতি দাবি করে। কাদম্বরী দেবী, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ, মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা ইত্যাদি আত্মঘাতিনীদের সম্বন্ধে মনে মনে অনেক তোলপাড় করেছি আমি, বিশেষতঃ এইজন্যে যে আমার নিজের মন হাতড়ে ওরকম কোনো প্রবণতা খুঁজে পাই না, তাই যাঁরা আমার মতো নন, অন্যরকমের, তাঁদের মানসতাটা আরোই বুঝে নিতে ইচ্ছে করে।

রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটা পড়লে আমাদের অনেকেরই মনে হয় যে ওখানে কাদম্বরী দেবীর কথা বলা হচ্ছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে কাদম্বরী দেবী তাঁর সফল মৃত্যুচেষ্টার আগে একবার আত্মনাশ করার চেষ্টা করেছিলেন, সে-চেষ্টা সফল হয় নি ; তার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে পশ্চিম ভারতে বেড়াতে নিয়ে যান ; রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি সেই সময়ে এবং সেই ঘটনার অভিঘাতে লেখা। কিন্তু ঐ আত্মনাশের প্রাথমিক চেষ্টার ব্যাপারটা যেহেতু শোনা কথা, তার কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই, তাই প্রশান্ত পাল এই অনুমান সমর্থন করেন না। 'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে/ ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা' ইত্যাদির মধ্যে জ্যোতিদাদা আর বৌঠানের বক্র উল্লেখ দেখতে তিনি অনিচ্ছুক। ঐ কবিতাটি আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদসংকলনের প্রথম কবিতা। যখন প্রথম অনুবাদ করেছিলাম তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশান্তর অভিমতটা মেনে নিয়ে সচেতনভাবে তারকাটিকে he-রূপে অনুবাদ করেছিলাম, যাতে কেউ তাকে কোনো মানবীর প্রতিনিধি না ভাবেন, যাতে কাদম্বরীর সঙ্গে আত্মঘাতী তারকাটির কোনো আইডেন্টিফিকেশন না ঘটে। তখন কবির কৈশোরের রচনা *বন-ফুল* পড়া ছিলো না। পরে *রঙের রবীন্দ্রনাথ*-এর কাজের সূত্রে সেটি যখন পড়লাম, দেখলাম যে পাহাড় থেকে গিরিনদীর স্রোতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নায়িকা কমলার মৃত্যুবরণ সম্পর্কে কিশোর কবি অনায়াসে বলেন, 'খসিল আকাশ হোতে তারকা উজ্জ্বল।' একই কাব্যে 'জ্যোতি' আর 'রবি' শব্দ-দুটিকে নিয়ে খেলাও আছে। আমার মনে হলো যে দু' জায়গাতেই একই জাতের চিত্রকল্প দ্বারা কবি আবিষ্ট, এবং 'তারকার আত্মহত্যা'য় জ্যোতিদাদা আর বৌদির বক্র উল্লেখ থাকা অসম্ভব নয়। আমার মত যে বদলাচ্ছে তার জানান দিয়েছিলাম *রঙের রবীন্দ্রনাথ*-এর ১৫-সংখ্যক পৃষ্ঠায়। আমার অনুবাদেব বইটির নতুন যে-সংস্করণটি চলতি বছরে (২০১০) বেরোবে সেখানে তারকাটিকে she ক'রে দিয়েছি।

বিষাদ আর আত্মহত্যার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা আমার

সাম্প্রতিক বই *তিসিডোর*-এ (২০০৮) আমাকে চালিত করে জীবনানন্দর মনস্তত্ত্ব আর তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আট বছর আগের একদিন'কে আরেকটু ভালো ক'রে বুঝে নিতে। আমার নায়িকা তিসি প্রশ্ন করে, ঐ কবিতায় একজন মানুষের আত্মহত্যার যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা মনস্তত্ত্ব হিসেবে কতটা গ্রাহ্য? বাঙালী সমালোচকরা জীবনানন্দর বিষাদপ্রবণতা সম্বন্ধে তেমন কোনো আলোচনা ক'রে থাকেন কিনা জানি না। তাঁর ক্ষেত্রেও কি ওটা টাবু বিষয়? জীবনানন্দর মধ্যে যে একজন ডিপ্রেসিভ প্রকৃতির মানুষ বাস করতেন সে-ব্যাপারে ক্লিন্টন সীলি আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন—এক মৌখিক আলোচনায়।

আমার ঐ নতুন বইটাতে যেমন অনেক জিনিস একটা উপন্যাসের ফ্রেমের ভিতরে তিসির চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে, তেমনি আশির দশকের গোড়ায় লেখা *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*-তে রবীন্দ্রনাথ, ওকাম্পো, এল্‌ম্‌হার্স্ট, কাদম্বরী এঁদের প্রত্যেককে নিয়েই যা-কিছু বিচারবিশ্লেষণ—সব-কিছুকে ধ'রে রাখে একটি ঔপন্যাসিক কাহিনীর ফ্রেমওয়ার্ক এবং নায়িকা অনামিকার চোখ। ঐরকম একটা কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করতে পারা আমাকে এক বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য দেয়।

§

ইতোমধ্যে, *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* বইটা ছেপে বেরিয়ে যাবার আগেই, আমি ওঁদের দুজনের উপরে অনেকটা কাজ ক'রে ফেলেছি এই খবরের ভিত্তিতে ওঁদের সমগ্র পত্রাবলী ভূমিকা-টীকা-সহ সম্পাদনা করার জন্য বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন শিবনারায়ণ রায়, আর বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন অম্লান দত্ত। সেই সম্পাদনার সূত্রে ইংরেজীতে একটি নতুন অ্যাকাডেমিক বই রচনা করি। এই বইয়ের রিসার্চের জন্য আরও অনেক প্রাসঙ্গিক পড়াশোনা করি; লাতিন-মার্কিন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিবলিওগ্রাফি নিই; দু' মাসের ভিজিটিং ফেলোশিপ নিয়ে শান্তিনিকেতনে কাজ করতে যাই, সেখানে অনেক নতুন কাগজপত্র দেখি, অনেক বই পড়ি, অনেকের সঙ্গে কথা বলি, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখি। তার পর প্যারিসে যাই, ওকাম্পোকে চিনতেন এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎকার নিই সেখানে। ততদিনে ভিক্তোরিয়ার আত্মজীবনীর সব ক'টি খণ্ডও বেরিয়ে গেছে, সেগুলি মন দিয়ে মূল স্প্যানিশে প'ড়ে নিই। এর পর অতিকষ্টে পাথেয় যোগাড় ক'রে আর্জেন্টিনা যাই, সেখানে রীতিমতো সংগ্রাম ক'রে নতুন কাগজপত্র দেখি, দেখি ভিক্তোরিয়ার পৈতৃক বাড়িটা। রবীন্দ্রনাথ আর এল্‌ম্‌হার্স্ট যে-বাড়িটায় ছিলেন সেই বাড়িটাও খুঁজে বার করি এবং দেখি। ভিক্তোরিয়ার

আত্মীয়বন্ধু ও বুয়েনোস আইরেসের বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে বার ক'রে তাঁদের সঙ্গে কথা বলি, মার্ দেল প্লাতাতেও একদিন যাই। এইভাবে অনেক নতুন মেটিরিয়ল সংগ্রহ ক'রে ফিরে আসি। সংকলিত চিঠিপত্রের জন্য ভূমিকা লিখতে গিয়ে দেখি যত মালমশলা জড়ো হয়েছে তাদের গুছিয়ে ধরিয়ে দিতে গেলে অনেকগুলি অধ্যায় লিখতে হয়। পুরো জিনিসটা তখন একটা বড় অ্যাকাডেমিক স্টাডির আকার ধারণ করে। প্রেক্ষাপটসহ গোটা কাহিনীটার একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করি—যেন দেয়ালজোড়া একটা তৈলচিত্র আঁকছি। ওকাম্পোর প্রকৃত সামাজিক পটভূমিকা ও সাংস্কৃতিক কৃতি অধিকাংশ ভারতীয়র কাছেই ছিলো ভাসা-ভাসা। সেটার আলেখ্য এবার ডিটেলে আঁকি। পাশ্চাত্য পাঠকদের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথেরও একটা তুলনীয় পটভূমিকা এঁকে দিই। আর্জেন্টিনায় তাঁদের আর এল্‌মহার্স্টের দেওয়ানেওয়ার ছবিটা আরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং আনুপুঙ্খিক ক'রে তুলতে চেষ্টা করি। অনুরূপ চেষ্টা করি ১৯৩০ সালে ফ্রান্সের কাপ্ মার্ত্যাঁয় ও প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার যে-পুনর্মিলন হয় সেই দিনগুলিরও একটা ছবি আঁকতে। সেই অনুষঙ্গে ওকাম্পোর চেষ্টায় প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের ছবির যে-প্রদর্শনী হয়েছিলো—তাঁর প্রথম প্রকৃত চিত্রপ্রদর্শনী—তার দিনগুলিকেও যথাসাধ্য ডিটেলে জীবন্ত ক'রে তুলি। তাঁদের জীবনে ও কাজে পরস্পরের কী-কী প্রভাব পড়েছিলো সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি—রবীন্দ্রনাথের উপর ওকাম্পোর প্রভাব, ওকাম্পোর উপরেও রবীন্দ্রনাথের গভীর ও জীবনব্যাপী প্রভাব। ওকাম্পোর *সুর* উদ্যোগের উপর বিশ্বভারতীর আদর্শের যে-প্রভাব পড়েছিলো সে-সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অনবহিত। শান্তিনিকেতনে তিনি কখনো যান নি, কিন্তু না গিয়েও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পিছনে গঠনমূলক আন্তর্জাতিকতার যে-আদর্শটি নিহিত ছিলো সেটিকে তিনি বুঝেছিলেন এবং তাঁর *সুর*-পত্রিকা-ও-প্রকাশভবনকেন্দ্রিক সকল কর্মকাণ্ডের পিছনে ঐরকম একটি আদর্শকেই স্থাপিত করেছিলেন। আত্মজীবনীমূলক লেখার দিকে তাঁর যে-ঝোঁক, সেই প্রবণতাও রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* থেকে কিছু পুষ্টি আহরণ ক'রে থাকতে পারে। তাঁরা পরস্পরকে কী অর্থে ভালোবেসেছিলেন সেটাও বোঝার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথের লেখার উপরে তো বটেই, তাঁর আঁকা ছবির উপরেও এই নারীর কী প্রভাব প'ড়ে থাকতে পারে তার একটা জরিপ নেওয়ার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রচিত্রে চেয়ারের থীম, ডিম্বাকৃতি নারীমুখের প্রাধান্য, নারীপুরুষের বাধাপ্রাপ্ত আহত সংলাপ—এই বিষয়গুলি ভেবে দেখি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়েও আমার একটা আগ্রহ তৈরি হয়ে যায়। আমার ধারণা, এবং আর্জেন্টাইন বিদ্বজ্জন-সহ অনেকেই এ কথা স্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়ার এনকাউন্টার এবং তাঁদের সম্পর্ক, এই বিষয়ে আমার ইংরেজী বইটিই প্রামাণিক বই। কোথাও আর কোনো বইয়ে এত তথ্য দেওয়া নেই। বিশ্বভারতীর অনুরোধে এই বই বার করেন দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমি।

মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কত তফাৎ থাকে তার একটি মজাদার দৃষ্টান্ত দিই এখানে। আমার বইয়ে সাধারণতঃ যে-তথ্যপ্রাচুর্য এবং খুঁটিনাটির অন্তর্বয়নের প্রতি অনুরাগ ফুটে ওঠে, তা কি সকলের মনোমত হয়? হয় না! কখনও কখনও তাঁদের কোনো-কোনো মন্তব্যে চকিতে সে-বিষয়ে অবহিত হই। সম্প্রতি আমার নজরে এসেছে যে প্রশান্তকুমার পাল তাঁর *রবিজীবনী*-র নবম খণ্ডে পৃঃ ১৬৬-তে মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছনোর সূত্রে এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার 'আকর্ষণ-বিকর্ষণের বয়ঃসন্ধিসুলভ এক জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার বিস্তৃত বিবরণ রচনা করতে কেতকী কুশারী ডাইসন বহু পরিশ্রম ও *In Your Blossoming Flower-Garden* গ্রন্থের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, যে-কারণে বইটির উপনামটি স্বচ্ছন্দে Leonard K. Elmhirst and Victoria Ocampo হতে পারত—রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে আমরা যে-আলোচনাটি অনায়াসে অবান্তর বলে বাদ দিতে পারি।' তাঁর মন্তব্যটি সরস এবং সকৌতুক, তবু কোথায় যেন খচ্‌ ক'রে লাগে, বুঝতে পারি যে আমার বীক্ষণপদ্ধতিটা প্রশান্ত ঠিক বোঝেন নি। এই মন্তব্যটা আগে দেখলে না-হয় তাঁর সঙ্গে একটু ('প্রাপ্তবয়স্কসুলভ'?) রগড় ক'রে নেওয়া যেতো, কিন্তু যখন ঐ খণ্ডটি কিনলাম তখন তিনি আর নেই, তাই তর্কটা এখানেই করতে হচ্ছে।

প্রথমতঃ, ভিক্তোরিয়া আর এল্‌ম্‌হার্স্টের মধ্যে মান-অভিমানের নাটকীয়-জটিলতা-মেশানো যে-সম্পর্কটা গ'ড়ে ওঠে সেটা 'বয়ঃসন্ধিসুলভ'-রূপে প্রতিভাত হলেও তাঁরা দুজনে তখন অবশ্যই রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক; ভিক্তোরিয়ার বয়স তখন চৌত্রিশ, আর এল্‌ম্‌হার্স্ট ছিলেন তাঁর চাইতে বছর-তিনেকের ছোট। অর্থাৎ বয়স যেমনই হোক, মানুষের নিহিত স্বভাবের গুণে আর স্ত্রীপুরুষের মিথস্ক্রিয়ার রসায়নে যে-কোনো বয়সেই সুযোগ পেলে এই ধরণের 'বয়ঃসন্ধিসুলভ' (বা অন্যান্য গোত্রের) সম্পর্ক বর্ষার লতার মতো বেড়ে উঠতে পারে। সেটা জীবনসত্য, সাহিত্যিক এবং জীবনীকার উভয়কেই সেটা স্বীকার করতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে এই, রবীন্দ্রজীবনীটি লিখছেন প্রশান্ত। তিনি, প্রশান্ত, অবশ্যই তাঁর আপন স্বভাবের চালনা অনুসারে, তাঁর মাথার মধ্যে জীবনীরচনার যে-মডেলটি আছে তদনুসারে কাজ করবেন। ডিটেল জড়ো করার ব্যাপারে তিনি নিজেই এক উল্লেখ্য নজির স্থাপন করেছেন। কৌতুক করতে হলে তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও তা করা যায়, এবং তেমন রঙ্গময় মন্তব্য আমার কানেও এসেছে। তাঁর সামনে দৃশ্যটা বিরাট—সমগ্র রবীন্দ্রজীবন নক্ষত্রখচিত মহাকাশের মতো খুঁটিনাটিতে ঠাসা। প্রশান্ত নিজে থেকে থেকে যে-সব 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' চয়ন ক'রে দেন, তাদের সবই কি সব পাঠকের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক *ঠেকে*? *ঠেকে* না, তবে তিনি যে ওগুলো জড়ো ক'রে দিয়েছেন তার জন্য গবেষক হিসেবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকি। এক জায়গায় অনেক খবর

পেয়ে যাবার মতো আরাম আর নেই, নয়তো আরও বইয়ের দোকান, আরও লাইব্রেরির তাক, আরও আর্কাইভের ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। দুই মলাটের মধ্যে অনেক খবর পেয়ে যাওয়াকে রিসার্চার হিসেবে আমি নিজে স্বাগত করি। কখনো বলি না, উনি এটা নিয়ে দুটো আলাদা বই লিখতে পারতেন। তা হলে তো আমাকেই উঠে গিয়ে লাইব্রেরি থেকে একটার বদলে দুটো বই ধার নিতে হবে। প্রকাশক যদি মনে ক'রে থাকেন এই মালমশলা দুই মলাটের মধ্যে ছেপে দেওয়া বিজ্‌নেস সেন্স হবে, তা হলে তার উপরে আর কথা নেই, তাতে ক্রেতা হিসেবে আমারই লাভ। হয়তো কতগুলো তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা এক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু প্রান্তিক, আবার অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ততটা প্রান্তিক নয়। আর রিসার্চের কাজে কখন যে কোন্ প্রান্তিক ডিটেলটা কেন্দ্রিক হয়ে উঠবে, তা কি সব সময় আগে থেকে বলা যায়?—বিশেষতঃ যেখানে তিন দেশের তিনজন মানুষের দেওয়ানেওয়ার একটা গল্প বলা হচ্ছে! একটা আন্তঃসাংস্কৃতিক কাহিনীতে এমন অনেক আলোছায়া থাকে যেগুলির তাৎপর্য ধরতে তুলনীয় আন্তঃসাংস্কৃতিক চোখ লাগে। আমার সেরকম একজোড়া চোখ আছে ব'লেই যা-যা আমার কাছে অর্থবহ বা কৌতূহল-জাগানিয়া মনে হয়েছে সেগুলো আমি চয়ন ক'রে দিয়েছি, বাদ দিই নি। লুকানো ইন্টারকানেক্‌শন খুঁজে বার করাই তো গবেষকদের একটা কাজ। আমি মনে করি, যে-ডিটেলগুলোর পুরো তাৎপর্য আমি এখনই এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না, কিন্তু যাদের সম্বন্ধে আমার মন বলছে যে এগুলো অর্থবহ, সেগুলো বৃহত্তর প্যাটার্নের অন্তর্গত ডকুমেন্টেশন হিসেবে বইয়ে রেখে দেওয়াই ভালো—ওগুলো ভাবী কালের বা অন্য কোনো দেশের গবেষকের ঔৎসুক্য জাগাতে পারে, তাঁর কাজে লাগতে পারে। যেখানে আমি গবেষক সেখানে আমার মনে হয়েছে যে রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার গল্পটা তুলে ধরতে হলে ভিক্তোরিয়া আর এল্‌ম্‌হার্স্টের গল্পটাকেও আখ্যানের মধ্যে রাখতে হবে, ওটা সামগ্রিক নকশার অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথবিষয়ক বইয়ের মুখোমুখি বাঙালীদের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের উপর একাগ্রভাবে ফোকস্-করা থাকে, কিন্তু ঐ বইটা আমি একটা আন্তর্জাতিক পাঠকসমাজের জন্য লিখেছি। ইংরেজ, কন্টিনেন্টাল-ইয়োরোপীয় আর আর্জেন্টাইন পাঠকরা যে ভিক্তোরিয়া আর লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্টের বিনিময়ের কাহিনীটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছেন তেমন কোনো খবর কখনো পাই নি। বরং তাঁরা এর উল্টোটাই ভেবেছেন। কারণ তাঁরা পাশ্চাত্য মানুষ, ঐ দুই পাশ্চাত্য মূর্তির সঙ্গে তাঁরা সহজেই relate করতে পারেন, সম্পৃক্ত বোধ করতে পারেন। সে-তুলনায় 'টাগোর' তাঁদের কাছে একটু দূরের জিনিস, তাঁকে বুঝতে একটু সময় লাগে, এবং সে-ব্যাপারে এল্‌ম্‌হার্স্টের মধ্যস্থতা তাঁদেরও কাজে লাগে। একজন আর্জেন্টাইন বুদ্ধিজীবী আমাকে বলেছেন, ঐ বইয়ে এল্‌ম্‌হার্স্টের যে-পোর্ট্রেটটা এঁকেছি সেটা পাঠকের জন্য একটা

বিশেষ প্রাপ্তি। তরুণ প্রজন্মের নতুন দু'-একজন আর্জেন্টাইন পাঠক, যাঁদের প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি ই-মেইলে পাচ্ছি, ওকাম্পো সম্পর্কে তথ্যপ্রাচুর্যে উচ্ছ্বসিত এবং কৃতজ্ঞ।

প্রশান্ত যখন তাঁর উপাদানগুলি জড়ো করেছেন, তখন নিশ্চয় তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এবং তাঁর পাঠকসমাজের কথা ভেবে ঝাড়াইবাছাই করেছেন, নিজের মতো ক'রে গ্রহণবর্জন করেছেন। আমার বইয়ের যে-যে অংশ তাঁর নিজস্ব কাজের নিরিখে অবান্তর মনে হয়েছে, সেগুলি তিনি বাদ দিয়ে যেতেই পারেন, সেটা তাঁর নির্বাচন। কেউ তাঁকে দিব্যি দিয়ে বলে নি যে প্রত্যেকটা প্যারাই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। আমি কিন্তু আমার ঐ বইয়ে তাঁর মতো রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ জীবনী রচনা করছি না! আমি ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একটা ছবি আঁকার মতলব নিয়ে আমার কাজ আরম্ভ করেছি, এবং সেটাকে ঠিক ক'রে আঁকতে গিয়ে দেখছি যে বারবারই ক্যানভাসের মধ্যে এসে যাচ্ছেন লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট নামে যুবকটি। আর্জেন্টিনার ঐ মান-অভিমানে উত্তাল দিনগুলিতে গল্পটা কেবল দুজনকে নিয়ে নয়, তার মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি নাছোড় রঙিন সুতোর মতো অনুপ্রবিষ্ট, যাঁর সহায়তা ছাড়া অন্য দুজনের আদানপ্রদান এগোয় না। আমার উপাত্তগুলি আমাকে বলেছে যে দিনে দিনে ওখানে একটা ত্রিভুজ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে, যা আজীবন স্থায়ী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভিক্তোরিয়াকে দেখাবার জন্য নিজের কবিতা অনুবাদ ক'রে লেনার্ডকে দেখিয়েছেন। লেনার্ড ভিক্তোরিয়াকে *রেড অলিয়াণ্ডার্স* পড়িয়েছেন, আর ভিক্তোরিয়া তাঁকে পড়তে দিয়েছেন তাঁর *La laguna de los nenúfares* নাটিকাটির ইংরেজী সারাংশ, যেটির মধ্যে *ডাকঘর*-এর ছায়া দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যে যে-সব চিঠি চালাচালি হয়েছে, তাদের মধ্যে ভিক্তোরিয়া আর লেনার্ডের পরস্পরকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি আছে, এবং জুলিও চেজ়ারে জাহাজে ফেরত যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ আর এল্‌ম্‌হার্স্ট দুজনেই ভিক্তোরিয়াকে চিঠি লিখেছেন। ভিক্তোরিয়া আর তরুণ লেনার্ড যে তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাচ্ছেন, দুজনে মিলে গাড়ি নিয়ে শহরে চ'লে যাচ্ছেন—হয়তো তাঁরই জন্য হাডসনের বই কিনতে, কিন্তু সেই ফাঁকে একসঙ্গে চা-ও খেয়ে নিচ্ছেন—এই বর্ধমান ঘনিষ্ঠতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন একটু ঈর্ষান্বিত হয়েছেন ('বয়ঃসন্ধিসুলভ' ?), তেমন একজন কূটনীতিজ্ঞের মতো ঐ অন্তরঙ্গতাকে উস্‌কেও দিয়েছেন। ভিক্তোরিয়াকে বলেছেন, 'লেনার্ড তোমার প্রেমে পড়েছে,' লেনার্ডকে মন্ত্রণা দিয়েছেন, সে কেন ভিক্তোরিয়াকে বিয়ে ক'রে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসে সেখানেই সেট্‌ল্ করে না। (তা হলে তো তিনি, আজকের ভাষায়, শান্তিনিকেতনে দুজন resident fan-এর সান্নিধ্য, সহযোগিতা এবং সেবা পেয়ে যেতে পারেন!) আমাদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একজন মানুষ ছিলেন, মানুষের সবরকম দুষ্টুমি, পাগলামি, অবসেশন আর খুনসুটি-প্রবণতা নিয়ে। বস্তুতঃ গল্প-কবিতা-নাটক তৈরি করতে গেলে

এইগুলি তো লাগেই। একজন সাহিত্যিককে তো চার দিকে তাকিয়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে আড়চোখে দেখে নিয়ে সৃষ্টি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথও তা-ই করতেন। তাঁর চোখ-কান-নাক সংকেতের অপেক্ষায় অনুক্ষণ টানটান হয়ে থাকতো—রঞ্জনের অপেক্ষায় নন্দিনীর মতো! ঘরেতে ভ্রমর এলে তিনি কি তার গুঞ্জরণকে উপেক্ষা করতে পারতেন? বাতাসে যে-কথা ভেসে চ'লে আসে, আকাশে যে-মুখ জাগে, বনমর্মরে নদীনির্ঝরে যে-মধুর সুরটি লাগে, তাকে সনাক্ত করবার জন্য তিনি তো সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সাঁওতাল রমণীরা ভাবতে পারে যে বাবু সারা দিন বারান্দায় ব'সে কাগজে হিজিবিজি আঁক কাটেন, তাঁকে একটা কাজ দেওয়া উচিত, কিন্তু তিনি তো আসলে সব সময়েই শিল্পীর হোমওয়ার্ক ক'রে যাচ্ছেন। আর শুধুই প্রকৃতির সংকেতের অর্থোদ্ধার করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন না, তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটাই চালু ছিলো যে তিনি কানপাতলা ছিলেন, অমুকের সম্পর্কে তমুক যা বলতো তা-ই বিশ্বাস ক'রে বসতেন।

গবেষণার দিকটা ছাড়াও একটা স্কলারলি বইয়ের আরেকটা দিকও থাকে: তার লিখনশৈলীর দিক, তা চিত্তাকর্ষক এবং সুখপাঠ্য হচ্ছে কিনা, প্রবাহিত হচ্ছে কিনা, পাঠকের মনোযোগকে ধ'রে রাখতে পারছে কিনা। অর্থাৎ তার একটা সাহিত্যিক মাত্রাও অবশ্যই থাকে। সেটাও একটা কারণ যেজন্যে একটা বইয়ের উপাদানগুলি সাজানোর সময়ে তুলনামূলক উপস্থাপন, সমান্তরালতা অথবা বৈপরীত্য সৃজন ইত্যাদি টেকনিক কাজে লাগে। সেই নিরিখে ভিক্তোরিয়া আর লেনার্ডের দেওয়ানেওয়ার কাহিনীটা ভিক্তোরিয়া আর রবীন্দ্রনাথের দেওয়ানেওয়ার কাহিনীকে আড়াল না ক'রে বরং তার উপর অতিরিক্ত আলোকসম্পাত করে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

একটা বড় তৈলচিত্রে আমরা হামেশা দেখতে পাই যে ক্যানভাসের মধ্যস্থলে প্রধান কাহিনীটা রূপায়িত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাব আশেপাশে আরও অনেক কিছু ঘ'টে যাচ্ছে: শিল্পী তাদের উপেক্ষা করছেন না, জায়গা দিচ্ছেন। আমার নিজের ঐরকম ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে। আমার ধারণা সেই juxtaposition থেকে আমরা কিছু শিখি। প্রশান্ত যদি লেনার্ড আর ভিক্তোরিয়ার 'বয়ঃসন্ধিসুলভ' খুনসুটির বিবরণ সম্বন্ধে আরেকটু সহিষ্ণু হতেন, তা হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ আর কাদম্বরীর সম্পর্কটাও আরেকটু কাছ থেকে বুঝতে পারতেন, মেনে নিতে পারতেন যে কবিতার মধ্যে জ্যোতিদাদার নাম আর নিজের নাম নিয়ে বিপজ্জনক শ্লেষ করা তরুণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিলো না—বস্তুতঃ, সে-কাজ তিনি করেছেন। হয়তো তা হলে তিনি কাদম্বরী দেবীর প্রথম আত্মহত্যার ব্যাপারটাও মেনে নিতে পারতেন, এবং 'তারকার আত্মহত্যা'য় কাদম্বরীর ছায়াটাও স্বীকার করতে পারতেন।

§

পূর্বোল্লিখিত কাজটির সূত্রে জন্ম নেয় আমার পরবর্তী রবীন্দ্রসংক্রান্ত উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করার জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হয়। সেই আহ্বান প্রথম জানানো হয় আমেরিকার মাটিতে। ১৯৮৭ সালে সান ফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু ও আমি দুজনেই আগত প্রতিনিধি ছিলাম। *ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন* বইটি তখনও সাহিত্য আকাদেমি থেকে ছেপে বেরোয় নি। আমার বক্তৃতাটি দিয়ে আমি যখন প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এসে ফের তাঁর পাশে বসলাম, নিমাইসাধন তখনই আমাকে ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করতে রাজি হবো কিনা। আমি ঈষৎ শঙ্কিতচিত্তে বললাম, 'ভেবে দেখবো।' কিন্তু তিনি আমাকে ভাববার জন্য বিশেষ সময় দেন নি। সেই দিনই এক রেস্তোরাঁয় সব ডেলিগেটদের জন্য সান্ধ্য ভোজনের আয়োজন ছিলো। সেই ভোজনসভায় নিমাইসাধন ঘোষণা ক'রে দিলেন, 'আমি কেতকীকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করতে আহ্বান জানাচ্ছি, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার এমন একটি সিলেক্টেড পোয়েম্‌স্‌ এডিশন তৈরি করুন যেটি প'ড়ে ইংরেজীভাষীরা তাঁর কবিতার রসগ্রহণ করতে পারবে, তাঁকে একজন বড় কবি ব'লে চিনতে পারবে। এই কাজ আরম্ভ করার জন্য কেতকীকে আমি তিন মাসের ভিজিটিং প্রোফেসরশিপ দিয়ে শান্তিনিকেতনে আনাবার ব্যবস্থা করবো। তিনি কী বলেন?' সবাই তো প্রস্তাবটিকে সমস্বরে স্বাগত করলেন। ভোজনসভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রবিশঙ্কর, নিমাইসাধনের পাশেই আসীন ছিলেন তিনি। মুখ তুলতেই দেখি তিনি মিটিমিটি হাসছেন। সকলেই আমার মুখের দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছেন, আমি কী জবাব দিই দেখবার জন্যে। ঘাবড়ে গেলেও এমন সাদর আহ্বান তো প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। অমন আহ্বান পাওয়াও তো একটা প্রিভিলেজ। অগত্যা ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেললাম, 'ঠিক আছে, আমি এই কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করছি।' এইভাবেই আমার তৃতীয় রবীন্দ্রপ্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। বিলেতে কাজ আরম্ভ ক'রে তার পর তিন মাসের জন্য শান্তিনিকেতনে গেলাম। আনন্দময় কাজ—কবিতা থেকে কবিতা সৃষ্টির বিশুদ্ধ আনন্দ। কয়েকটি গানও অনুবাদ করলাম। তবে নোটগুলো তৈরি করার জন্য,—বিশেষতঃ ফুলফল-গাছপালার বোটানিকাল পরিচয় দেবার জন্য—খেটেছিলাম খুব, জ্বালিয়েছিলামও অনেককে। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির শিরোনাম অবলম্বনে সংকলনটির নাম দিলাম *আই ওন্ট লেট ইউ গো*। সেই নামকরণ প্রকাশকের খুব পছন্দ হয়েছিলো। সংকলনটি ব্লাডঅ্যাক্স বুক্‌স্‌কে দিয়ে বার করাতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কেননা তাঁরা বর্তমান কালে বৃটেনের সর্বাগ্রগণ্য কবিতাপ্রকাশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তা ছাড়া বইটি লণ্ডনের পোয়েট্রি বুক সোসাইটির রেকমেণ্ডেশন পায়, যা কিনা বিশেষ সম্মানের

ব্যাপার। দিল্লী থেকে একটি ভারতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। দেশে বিদেশে বইটির কয়েকটি ভালো রিভিউ বেরোয়, যা থেকে বোঝা যায় যে অনুবাদগুলি অবাঙালী মহলে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির পুনর্বাসনে সহায়তা করতে সমর্থ।

§

যখন রবীন্দ্রভবনে ঐ অনুবাদের কাজটা করছি তখন দৈবাৎ একদিন চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাক্তার জ্যোতির্ময় বসু এসে রবীন্দ্রনাথের বর্ণান্ধতা সম্পর্কে পিক্‌ফোর্ডের সঙ্গে লেখা তাঁর পেপারটি আমাকে পড়তে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে আংশিক বর্ণান্ধতা ছিলো এ বিষয়ে এই প্রথম অবহিত হলাম। এ প্রসঙ্গে এদিক ওদিক কিছু ছোট ছোট উল্লেখ থাকলেও, কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় বিষয়টিকে ছুঁয়ে গেলেও, কোনো বড় মাপের পর্যালোচনা তখনও হয় নি। রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক চেতনার বা স্বীকৃতির অভাব ছিলো। তাই আমিও শুনি নি। শান্তিনিকেতনে কোনো আলোচনা কানে আসে নি। আমার কলেজজীবনের বান্ধবীদের মধ্যে যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা অনার্সের বা এম. এ.-র ছাত্রী ছিলেন, তাঁদের মুখেও এ বিষয়ে কোনোদিন কোনো কথা শুনি নি।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার মাথায় রূপ নিলো আমার চতুর্থ রবীন্দ্রপ্রোজেক্টের আদল। যদি এ কথা সত্য হয় যে রবীন্দ্রনাথ লাল রঙটা ঠিকমতন দেখতে পেতেন না, লাল-সবুজে গুলিয়ে যেতো তাঁর, তা হলে তার ছাপ কি তাঁর লেখায় আর ছবিতে পড়বে না? ঠিক করলাম, একটা বড় মাপের আন্তর্বিদ্য স্টাডি করতে হবে। সাহিত্যের দিকটা আমি নিজেই দেখবো। ছবির ব্যাপারে সহযোগী হতে অনুরোধ করলাম চিত্রশিল্পী এবং সে-সময়ে রবীন্দ্রভবনের সংরক্ষণবিভাগের দায়িত্বে বহাল সুশোভন অধিকারীকে। তিনি এর আগে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ভিক্তোরিয়ার মুখের আদল, আসবাবের থীম ইত্যাদি খুঁজে বার করতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তাঁর দৃশ্যগত বুদ্ধিটা প্রখর; এবং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বের ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান আনুপুঙ্খিক। প্রস্তাবটা তাঁর কাছে পেশ করতেই তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি। মনে মনে ঠিক করলাম, আমার স্বামীর বন্ধু অক্সফোর্ডের দৃষ্টিবিজ্ঞানী এড্রিয়ান হিল-কে এর সঙ্গে জড়াতে হবে। পরে আমার স্বামী নিজেও পুরো কাজটার সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে গেছিলেন। জ্যোতির্ময়বাবুর কাছ থেকে প্রাথমিক রেফারেন্সগুলো জেনে নিয়ে খোঁজখবর আরম্ভ করলাম। তখনই দুই রানী (চন্দ ও মহলানবিশ), রোম্যাঁ রলাঁ, স্টেলা ক্রামরিশ, শোভন সোম ইত্যাদিদের লেখায় বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলো পেলাম। *ছিন্নপত্রাবলী*-তে নিজের বর্ণান্ধতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সকৌতুক মন্তব্যটাও আমরা আবিষ্কার করলাম সে-সময়ে। পরিকল্পিত গবেষণা সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শাম্ভ লাহিড়ী, শঙ্খ ঘোষ এঁদের

সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাঁদের কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন পেলাম। তার পর অনুবাদের প্রোজেক্টটা শেষ করার জন্য বিলেতে ফিরে গেলাম; *আই ওন্ট লেট ইউ গো* বইটির টীকা-অংশে রবীন্দ্রনাথের বর্ণান্ধতা সম্পর্কে নোট জুড়ে দিতে পেরেছিলাম।

কবিতা-অনুবাদের কাজটা শেষ হবার পর ১৯৯০ সালে আমার প্রথম নাটকটা লিখলাম। তার পর নতুন প্রোজেক্টের জন্য পুরোদমে কাজ আরম্ভ করলাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপরে তাঁর বর্ণদৃষ্টির প্রভাব বোঝার জন্য সমগ্র *রবীন্দ্ররচনাবলী*-র আনুপূর্বিক পাঠ শুরু করলাম। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্য ভারতে যাওয়া একটু পিছিয়ে গেলো। ১৯৯১-এর শরতে অনুবাদ-কবিতার বইটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে এড্রিয়ান হিল আর আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় গেলাম, সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে। বিজ্ঞানী-দুজন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখলেন, কালারিমিটার যন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির রঙ মাপলেন। কলকাতায় শান্তু লাহিড়ীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হলো, অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথের ছবি দেখা হলো। এড্রিয়ান হিল শান্তিনিকেতন আর যাদবপুর দুই ক্যাম্পাসে একটি সেমিনার দিলেন— ফরাসী চিত্রশিল্পী মোনে-র ছবিতে তাঁর অগ্রসর-হতে-থাকা ছানির প্রভাব সম্পর্কে। এঁরা দুজন চ'লে যাবার পর আমি আরও কিছু দিন শান্তিনিকেতনে থেকে রিসার্চ চালিয়ে গেলাম। সাহিত্যের দিকটা দেখা ছাড়াও চিত্রকলার ইতিহাসের ব্যাপারে আমার অনেক কিছু শেখার ছিলো। ওকাম্পোকে নিয়ে কাজ করার জন্য যেমন দ্রুতগতিতে স্প্যানিশটা আয়ত্ত ক'রে নিতে হয়েছিলো, এই প্রোজেক্টের জন্য তেমনি চিত্রকলার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক 'ইজ্‌ম্‌' বা ধারার ইতিহাস গুলে খেতে হলো। সুশোভন আমাকে বোঝালেন, আমাদের অনুসন্ধান ঠিক ক'রে করতে হলে রবীন্দ্রনাথের ছবির উপরে প্রিমিটিভ কারুসামগ্রী আর জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট আর্টের প্রভাবটা খতিয়ে দেখতে হবে। বিলেতে ফিরে এসে অনেক বইপত্র কিনে আমিও আর্টের উপর পুরোদমে পড়াশোনা আরম্ভ ক'রে দিলাম। ১৯৯২ সালে আমরা দুজন এক বিরাট আর্ট সফরে বেরোলাম। ১৮টি জার্মান শহরে গ্যালারি ও সংগ্রহশালা ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমরা। ৯৩-এর গোড়ায় নিউ ইয়র্কের মাতিস রেট্রস্পেক্টিভ আর প্যারিসে অন্যান্য দ্রষ্টব্যসহ জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের উপর যে-বিশেষ প্রদর্শনীটি হচ্ছিলো সেটাও দেখা হলো। মাতিস রেট্রস্পেক্টিভটা দেখতেই হলো, কারণ মাতিস বিশ শতকের একজন অগ্রগণ্য কালারিস্ট ছিলেন। তাঁর রঙের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের থেকে কোথায় আলাদা সেটা দেখার দরকার ছিলো। তা ছাড়া লণ্ডনে দেখা হলো বৃটিশ মিউজ়িয়ম, ন্যাশনাল গ্যালারি, একটি বিশেষ মুংখ-প্রদর্শনী। আমাদের আর্ট সফর এত ব্যাপক হয়েছিলো, গ্যালারিতে গ্যালারিতে আমরা এত মাইল হেঁটেছিলাম, যে তার সর্বশেষ পর্যায়ে প্যারিসে সুশোভনের জুতো গেলো ছিঁড়ে—যে-সে জুতো নয়, বিয়েতে পাওয়া শ্বশুরবাড়ির দেওয়া জুতোজোড়া! কোনোমতে প্লেন

চাপলেন তিনি। বিলেতে ফিরে এসে প্রথমেই তাঁকে একজোড়া জুতো কিনে দিতে হলো। আর আমার তো কয়েক মাস পরে এক পায়ে অস্ত্রোপচারই লাগলো।

সাহিত্য, চিত্রকলা আর বিজ্ঞান তিন মাত্রা মিলিয়ে আমাদের এই অনুসন্ধান এক বিশাল আয়তন ধারণ করেছিলো। কাজের চালচিত্রটা বিরাট হওয়ায় কাজটা পরিকল্পনামতো শেষ করতে অর্ধদশক লাগলো। মাঝখানে আমাকে কিছু সময় দিতে হয়েছিলো অন্য এক কার্যক্রমে—৯৪-এ কলকাতা থেকে নাটকের দল এসেছিলো আমার নাটকটা করতে। অনেক হিমালয় ডিঙিয়ে অবশেষে বেরোলো আমাদের বই *রঙের রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় রঙের ব্যবহার*। বেরোলো ৯৭-এর বইমেলার ঠিক আগে কলকাতার সিমা গ্যালারিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে। এই আটশো পাতার বইয়ে আমরা তিনটি জিনিস করতে চেয়েছি। প্রথমতঃ, তাঁর সাহিত্যের উপরে তাঁর বর্ণদৃষ্টির প্রভাব এবং তাঁর ভাষায় রঙের ব্যবহার কিরকম তা বোঝার জন্য সমগ্র স্ট্যাণ্ডার্ড *রবীন্দ্ররচনাবলী* ও আরও কিছু রবীন্দ্ররচনার ভাষা সার্ভে করা হয়েছে—কেবল উপরে উপরে নয়, একেবারে গভীরে গিয়ে। বুঝতে চেয়েছি তাঁর বর্ণদৃষ্টি তাঁর ভাষাকে—বর্ণনার ভাষাকে, স্মৃতিচারণার ভাষাকে, বিমূর্ত আলোচনার ভাষাকে—কিভাবে প্রভাবিত করেছে; তাঁর উপমারূপক নির্মাণের উপর, বিশেষ্যবিশেষণ ব্যবহারের উপর কিভাবে ছাপ ফেলেছে; এমন কি তাঁর জীবনদর্শনে আধ্যাত্মিক বাচনে কী স্বাক্ষর রেখেছে; তাঁর ভাষায় ধ্বনির সঙ্গে দৃশ্যতার সম্পর্ক কী; বর্ণদৃষ্টিজনিত অসুবিধাকে তিনি ভাষায় কিভাবে বাইপাস্ করেন; সেই অসুবিধা কি কোনো থীমগত অবসেশনের জন্ম দেয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণদৃষ্টিতে কিছু প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে একজন চিত্রশিল্পী হয়ে উঠলেন সেই প্রক্রিয়ার একটা ইতিহাস মেলে ধরা হয়েছে; তাঁর ছবিতে রঙের ব্যবহার কিরকম, ফর্মের সঙ্গে কালারের সম্পর্ক কিরকম, প্রিমিটিভ কারুসামগ্রী এবং এক্সপ্রেশনিস্ট আর্টের প্রভাব কিরকম, এ-সমস্ত বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দৃষ্টান্তসহকারে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছবির উপরে এক্সপ্রেশনিজ্‌মের প্রভাবের কথা এর আগে ভাসা-ভাসাভাবে বলেছেন কেউ কেউ, কেউ কেউ আবার তা অস্বীকারও করেছেন, কিন্তু আমরা সেই প্রভাবের অস্তিত্ব ডিটেলে দেখিয়েছি। তৃতীয়তঃ, আমাদের বৈজ্ঞানিক সহযোগীরা বর্ণদৃষ্টির উপরে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, এ কাজে তাঁদের জড়িয়ে পড়ার কাহিনীটা একটু বলেছেন, তাঁদের কালারিমেট্রির ফলাফল পেশ করেছেন, সেই ফলাফল যে প্রোটানোপিয়ার হাইপথেসিসকে সমর্থন করে এ কথা জানিয়েছেন। তাঁদের অংশটি, ৫০ পাতা মতন, ইংরেজীতে লেখা। বইয়ের বাদবাকি অংশ বাংলায় লেখা। এটি তাড়াহুড়ো ক'রে পড়বার বই নয়, এনসাইক্লোপীডিক জাতের বই, রেফারেন্স বই। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রগবেষণার জন্য কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন আমরা এই বইয়ে

দিতে পেরেছি, ভাবী কালের রবীন্দ্রপণ্ডিতরা এই বইকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। এই কাজের জন্য সুশোভন আর আমি ১৯৯৭ সালে যৌথভাবে আনন্দ পুরস্কার পাই। আমাদের কাছে এটা এখনও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে রবীন্দ্রনাথের বর্ণদৃষ্টির অপূর্ণতার কথাটা ছাপার অক্ষরে একাধিক জায়গায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও আর্টে তার পরিণাম নিয়ে বড় মাপের গবেষণা করার কথা ভাবেন নি।

§

এই গেলো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার বিভিন্ন বড় মাপের কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট লেখাও লিখতে হয়েছে, ইংরেজীতে বা বাংলায়, সাধারণতঃ সভাসেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য। জানি আমি, আজকের দিনে পেশাদার অধ্যাপকদের পক্ষে সভাসেমিনার উপলক্ষ্যে দুনিয়াময় টহল দেওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। তবে আমি তো তা নই, আমি ফ্রীলান্স লেখক, তাই আমার কাছে এই ধরণের আমন্ত্রণ যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দ বয়ে এনেছে। নানান জায়গায় বক্তব্য পেশ করতে হয়েছে—শান্তিনিকেতনে, কলকাতায়, আমেদাবাদে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অক্সফোর্ডে, লণ্ডনে, গ্লাসগোতে, সান ফ্রান্সিস্কোতে, নিউ জার্সিতে, টরন্টোতে। একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায়, বিশ্বের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন নিয়ে, শিবনারায়ণ রায়ের একটি বহুবিতর্কিত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে—তাঁর সঙ্গে তর্ক ক'রেই লিখেছিলাম, কিন্তু তিনি সেটাকে পত্রিকার সেই সংখ্যার একেবারে প্রথমেই ছেপে দিলেন—ঐরকমই ছিলেন উনি। মিডিয়া নানারকম বিতর্ক সৃষ্টি ক'রে লিখিয়ে নিয়েছে। কখনও বা রবীন্দ্রসংক্রান্ত বই রিভিউ করতে হয়েছে। এইভাবে রবীন্দ্রসম্পৃক্ত কিছু বাংলা-ইংরেজী প্রবন্ধের সংগ্রহও গ'ড়ে উঠেছে। বাংলা লেখাগুলির মধ্যে কিছু সংকলিত হয়েছে আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধসংগ্রহ *চলন্ত নির্মাণ*-এ (দে'জ, ২০০৫), অন্যগুলি জড়ো করছি বর্তমান বইয়ে। ইংরেজী লেখাগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করা হয় নি, তার কারণ আমার ইতস্ততঃ প্রকাশিত বিবিধ ইংরেজী প্রবন্ধগুলিকে জড়ো ক'রে একটা বই যে তৈরি করবো, তার জন্য আমার জীবনে আজ পর্যন্ত সময়ের অবকাশই পাই নি!

সহজ নয় ফ্রীলান্সার হিসেবে গবেষণা করা। ফ্রীলান্স গবেষণার অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক জগতের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। সে-কাজ কিভাবে করা হয়, কারা করেন? কারা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, কারা অসহযোগিতা করেন? কেমন সেই দুনিয়ার পলিটিক্স, জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'realpolitik'? ভাবী কালের রবীন্দ্রচর্চার অনুষঙ্গে প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কখনও কখনও রীতিমতো অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*-র জন্য যে-রিসার্চ, তা পুরোপুরি নিজের খরচে করা। মূলতঃ একটা সৃজনশীল পরীক্ষাভিত্তিক কাজের সম্প্রসারণ হিসেবে সেই ব্যয় মেনে নিয়েছি। *ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন*-এর জন্য রবীন্দ্রভবনে দু' মাসের ভিজ়িটিং ফেলোশিপ ছিলো, আর আর্জেন্টিনা যাবার টিকিটটা নানা নিষ্ফল চেষ্টার পর ভারতীয় হাই কমিশনের সংস্কৃতি-দপ্তরের একজন সহানুভূতিশীল বাঙালী অফিসারের মধ্যস্থতায় দিল্লীর আই-সি-সি-আর-এর থেকে পাওয়া গেছিলো। আর্জেন্টাইনরা যে-আতিথ্য দেবেন বলেছিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, তার বদলে বুয়েনোস আইরেসের ভারতীয় দূতাবাসে যিনি তখন 'শার্জে দাফেয়ার' ছিলেন তাঁর বাড়িতে প্রাইভেট অতিথি হিসেবে দু' মাস থেকে ওখানকার সব অনুসন্ধান করেছি। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া, বাংলা-বলিয়ে সেই তামিল আতিথ্যদাতার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য, তিনি আশ্রয় না দিলে কী করতাম তা-ই ভাবি ! ১৯৮৫ সালে বৃটেন আর আর্জেন্টিনার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিলো না, ওখানে যাবার জন্যে ভিসা যে পেয়েছিলাম তা-ই ঢের ! কিন্তু এটা বললেও আবার সবটা বলা হলো না। লণ্ডনে যে-আর্জেন্টাইন অফিসাররা আমাকে আর্জেন্টিনা যাবার ভিসা দিলেন, তাঁরা সেই সন্ধ্যাতেই আমাকে অশেষ-সৌজন্য-সহকারে ডিনার খাওয়ালেন এবং বুয়েনোস আইরেসে যাঁদের কাছ থেকে ওকাম্পো সম্বন্ধে তথ্য পেতে পারি তাঁদের নামধাম দিলেন, *লা নাসিয়ন* কাগজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ওকাম্পো এস্টেটের আর্কাইভ্‌সে ঝামেলা পেয়েছিলাম বিস্তর—রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে। অর্থাভাবের কারণে ওঁরা আর্কাইভ্‌স্‌ খোলা রাখতেন খুব কম সময়, আর সব নোট হাতে নিতে হতো, কোনো কাগজ ফোটোকপি করা যেতো না, কারণ তার কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। যুদ্ধের রিপোর্টারের মতো কাজ ক'রে মালমশলা সংগ্রহ ক'রে এনেছি, কিন্তু পুরো কাজটা শেষ করতে বছর চারেক লেগেছে। লেখার কাজ তো নিজের বাড়িতে ব'সেই করতে হয়। জড়ো-ক'রে-আনা উপাদান সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা বড় বই লিখতে দীর্ঘ সময় লাগে। এটা একটা তথ্য যে ঐ প্রোজেক্টের জন্য বেশ কয়েকটি লিখিত আবেদন ক'রেও কোনো অনুদান পাই নি। ইংরেজীতে লেখা হচ্ছে এমন একটা বড় মাপের গবেষণাভিত্তিক স্কলারলি বইয়ের জন্য কিছু অনুদান পাওয়া নিশ্চয় উচিত ছিলো। আমার বায়োডেটা ও কাজকর্মের তালিকা সেই পর্বেও তেমন নিকৃষ্ট ছিলো না। তখন আমাদের প্রচণ্ড আর্থিক সংকট যাচ্ছে। সেই সংগ্রামের স্মৃতি এখনও আমার মন থেকে মুছে যায় নি। তখন আমরা ঋণগ্রস্ত, আমার আর্জেন্টিনা যাত্রার প্রাক্কালে আমরা আমাদের বাড়ির মর্টগেজের ঋণশোধে বেশ কয়েক মাস পিছিয়ে পড়েছি, একটা নতুন স্যুটকেস কেনার পয়সা নেই আমার। আর সে-দেশ থেকে যখন ফিরে আসছি, তখন

ফোনের বিল যথাসময়ে দিতে না পারার দরুন আমাদের ফোন লাইন কেটে দিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিদ্যার্চর্চার সংস্থা আর লাতিন-মার্কিন বিদ্যার্চর্চার সংস্থা দুয়ে মিলে অল্প একটু অর্থসাহায্য করলে কত উপকার হতো। লাতিন-মার্কিন সংস্থার এক কর্ণধার বললেন, ভারতীয় সংস্থা আমাকে সাহায্য করলে তাঁরাও করবেন। কিন্তু ভারতবিদ্যার সংস্থা আমাকে কিছু দিলেন না ব'লে তাঁরাও কিছু দিলেন না। আমি ওঁদের টেরিটোরিয়াল পলিটিক্সের মধ্যে প'ড়ে গেলাম। ভারতীয় সংস্থাটির কর্ণধার জানালেন, তাঁদের সব টাকা লাইব্রেরিতে বই কেনার জন্য আর কনফারেন্স ডাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে, রিসার্চে মদত দেবার জন্য টাকা নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো—দুটি বড় বড় নাম প্রোজেক্টের গায়ে লেখা থাকা সত্ত্বেও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ আমাকে সাহায্য করলেন না! সে-সময়ে কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, 'তুমি আপাততঃ একটা পার্টটাইম চাকরি যোগাড় করো, টাগোর-ওকাম্পো পরে হবেখন।' কিন্তু যে-কাজে আমি দায়বদ্ধ তাকে অসমাপ্ত রেখে অন্য কাজে মন দেওয়া আমার আসে না। আমার স্বামী বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি চালিয়ে যাও, কাজটা শেষ করো, আমি যেভাবে হোক বৃষ্টির নীচে ছাতা ধ'রে আছি।' সেই বইয়ের এখন তৃতীয় মুদ্রণ চলছে, এবং আর্জেন্টিনার নতুন প্রজন্মের কোনো কোনো তরুণ গবেষক যে সেই গবেষণাকে নতুন ক'রে স্বীকৃতি দিচ্ছেন তার খবর পাচ্ছি।

রবীন্দ্র-প্রোজেক্টগুলির মধ্যে একমাত্র তাঁর কবিতা অনুবাদ করার বেলায় ঠিকমতো ফাণ্ডিং পেয়েছিলাম, কোনো আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় নি। শান্তিনিকেতনের দিকটা দেখেছিলেন কর্মিষ্ঠ প্রশাসক নিমাইসাধন বসু, আর বাড়িতে ব'সে কাজ করার জন্য এখানকার আর্ট্‌স্ কাউন্সিলের আঞ্চলিক দপ্তর থেকে একটা ছোট অনুদান পাওয়া গেছিলো।

রবীন্দ্রনাথের রঙ নিয়ে কাজটা করতে গিয়ে কিন্তু পকেট থেকে গঙ্গাযমুনার স্রোতের মতো টাকা বওয়াতে হয়েছে। এই প্রোজেক্টের জন্য ধাপে ধাপে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রার রিটার্ন টিকিট কাটতে হয়েছিলো আমাদের—সব মিলিয়ে গোটা আষ্টেক। বিশ্বভারতী আমাদের রবীন্দ্রভবনে কাজ করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের প্রোজেক্টটিকে কোনো 'অফিশ্যাল স্টেটাস' দেন নি। দেবেন এইরকম একটা ভরসা প্রথম দিকে পাওয়া গেছিলো, কিন্তু তাঁরা পরে পিছিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের বর্ণদৃষ্টির উপর ফোকস্‌-ফেলা কোনো প্রোজেক্টের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের যুক্ত করতে চান নি। আমাকে অন্য একটা টপিক বেছে নিতে বলেছিলেন! বা রে, আমি কেন আমার নির্বাচিত বিষয় বদলে নেবো? আমি কি একজন কাঁচা বয়সের ছাত্রী, রিসার্চের উপযুক্ত বিষয় বাছতে পারি নি, তাই এবার মাস্টারমশাইদের কথা শুনে টপিকটা বদলে নিতে হবে! ওঁরা প্রোজেক্টটিকে 'অফিশ্যাল স্টেটাস' দিলেন না ব'লে বৃটিশ কাউন্সিল

আমাদের সাহায্য করা থেকে পিছিয়ে গেলেন, আমাদের মধ্যে কাউকেই ভারতে যাবার জন্য প্লেনভাড়া দিলেন না। তার পর ছিলো সুশোভনের আর আমার আর্ট ট্যুরে বেরোনো। সেই সময়ে আমি অক্সফোর্ডের একটি নারীসংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্রের সাম্মানিক সদস্য ছিলাম। সেটা কোনো বেতনভোগী পদ নয়, তবে বিদ্যাজগতের সঙ্গে আমার যে একটা বৈধ যোগ আছে তার স্বীকৃতিসংকেত। সেই সংকেতটুকু আর আমার নিজের বায়োডেটার জোরে জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জের স্টাডি ট্যুর গ্রান্ট একটা পেয়ে গেলাম। জার্মানরা স্বাধীন স্কলারদের অসম্মান করেন না সে-কথা শান্তিনিকেতনের বন্ধু মার্টিন ক্যেম্প্‌শেনেব কাছে আগেই শুনেছিলাম। একজনের টাকায় দুজনকে সফর করতে হয়েছিলো, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছিলো মার্টিন ক্যেম্প্‌শেনের সহায়তায়—জার্মানির কয়েকটি শহরে তাঁর বন্ধুরা সুশোভনকে আর আমাকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। এই প্রোজেক্টের জন্য আমাকে অর্ধদশক বিনা অনুদানে কাজ ক'রে যেতে হয়। যে-বই বাংলায় লেখা হবে তার জন্য বৃটেনে অনুদান পাওয়া অসম্ভব। *রঙের রবীন্দ্রনাথ*-কে সম্ভব করার জন্য আমার স্বামী জলের মতো টাকা খরচ করেছেন। পুরো সেট *রবীন্দ্ররচনাবলী* আনানো থেকে আরম্ভ ক'রে কত দামী দামী আর্টের বই যে পারিবারিক খরচে কেনা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। *রঙের রবীন্দ্রনাথ*-এর ক্যামেরা-রেডি কপি যাতে বাড়িতে তৈরি করতে পারি সেজন্যে কেনা হলো বাংলা লিখনের পক্ষে উপযুক্ত কম্পিউটারী সরঞ্জাম। নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে সে-সব সরঞ্জাম সস্তা ছিলো না। ঐ বইয়ের পুরো টেক্স্‌ট্ তৈরি করাও কোনো ছেলেখেলা ছিলো না। সে এক এলাহী ব্যাপার—দিনে রাত্রে বাড়ির ভিতরে ছাপাখানা চলছে। ছবিগুলির ফিল্ম তৈরি করার জন্য আবারও জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জের অমূল্য সাহায্য পাওয়া গেলো। রিপ্রোডাক্‌শনের কোয়ালিটি তাই ভালো হতে পারলো, নয়তো বিপদে পড়তে হতো। আরও একটি তথ্য উল্লেখ দাবি করে। ভারতীয় ভাষায় লেখা বইয়ের বাজার আর বইয়ের আনুমানিক দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপীয় কন্টিনেন্টের বিভিন্ন আর্টিস্টের এস্টেট রিপ্রোডাক্‌শন ফীতে ছাড় দিলেন বা নামমাত্র ক'রে দিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির মুদ্রণ-অনুমতির জন্য বিশ্বভারতী আমাদের প্রকাশকের কাছ্ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিলেন, এবং অনুমতিটা দিতেও দুই খেপে পুরো এক বছর নিয়ে নিলেন। এতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিলো। কোন্ ছবিগুলি বইয়ে দেওয়া যাবে তা নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছিলো। বিশ্বভারতীরই কর্মী সুশোভন প্রোজেক্টের ভিতরে ছিলেন, তবু সুরাহা হয় নি, বরং মনে হয় তাতে পরিস্থিতি জটিলতর হয়েছিলো। অনেক আবেদন-নিবেদন, আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের মাধ্যমে মর্মবিদারক ধ্বস্তাধ্বস্তি, এবং অবশেষে লণ্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনের মদত লেগেছিলো। তবে হাই কমিশনে এবং বিশ্বভারতীর ভিতরে যাঁরা আন্তরিকভাবে সাহায্য

করেছিলেন তাঁদের মোটেই ভুলে যাচ্ছি না। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ফীর প্রথম দশ হাজার আমি নিজে অগ্রিম মূল্যরূপে জমা দিয়ে পথ একটু সুগম ক'রে নিয়েছিলাম। সাতানব্বইয়ের জানুয়ারিতে ছবিগুলোর ফাইনাল প্রুফে রঙগুলো ঠিকঠাক আসছে কিনা তা দেখবার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে সুশোভন আর বিলেত থেকে আমি, দু' দিক থেকে দুজন, কলকাতার এক বিশেষ স্পেশ্যালিস্ট মুদ্রণালয়ে হাজির হলাম। সারা দিন ছবি ছাপা হচ্ছে আর আমরা তাদের 'ভেটিং' করছি। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু সমস্ত কাজটার উপর নজর রাখছেন। আমাদের জন্যে সে এক অবিস্মরণীয় উত্তেজনাময় দিন। দিনশেষে সুশোভন বাদলবাবুর কাছ থেকে বাকি চল্লিশ হাজার টাকার চেকটা নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেটা বিশ্বভাবতীর হাতে তুলে দেবার পরেই অফিশ্যাল মুদ্রণ-অনুমতিটা পাওয়া গেলো। ততক্ষণে ছবিগুলি ছাপা হয়ে গেছে।

রঙের রবীন্দ্রনাথ-এর কাজের জন্য সুশোভনও নিজের সম্বল থেকে টাকা ব্যয় করেছেন, কিন্তু আমার মতো একজন অভিবাসীর পক্ষে শান্তিনিকেতনের একজন সহগবেষকের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ রেখে কাজ করা নব্বইয়েব দশকে মোটেই সহজ ছিলো না। সেকালে ব্যাপক ই-মেইল চালু হয় নি, ফোন করতে হতো অনবরত, কিন্তু সে-যুগে আবার সুশোভনের বাসায় ফোন ছিলো না, তাঁর এক অধ্যাপক-বন্ধুর বাড়িতে ফোন ক'রে খবর দিয়ে তাঁকে আনাতে হতো! সে এক কাণ্ড, কিন্তু বলা বাহুল্য সুশোভনকে বারবার ওভাবে ডেকে দিয়ে, আমাদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে সেই মধ্যবর্তী মানুষটি আমাদের অমূল্য সাহায্য দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর কর্মীরা তাঁদের নিজস্ব অফিস-টাইমের বাইরে ফ্যাক্স-মেশিন ডিসকানেক্ট ক'রে রাখতেন—এদিকে আমি আছি ভিন্ন টাইম-এলাকায়!—অর্থাৎ আধুনিক আন্তর্জাতিক বিনিময়ের জন্য তাঁদের কোনো প্রস্তুতি ছিলো না। সব মিলিয়ে বইখানা তৈরি করা একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে যায়। প্রচণ্ড জেদ না থাকলে শেষ করতে পারতাম না। কিন্তু শেষ করতে পারাটা আমাদের বিশেষ আনন্দ এনে দিয়েছিলো।

চলতি বছর (২০১০) আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদের যে-পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বেরোবে সেখানে বেশ কয়েকটি নতুন অনুবাদ সংযোজিত হচ্ছে। আপাততঃ সেই সংস্করণের প্রস্তুতিই আমার সর্বশেষ রবীন্দ্র-উদ্যোগ!

[১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাতে 'আমার রবীন্দ্রচর্চা' শিরোনামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেটি কোথাও ছাপা হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধের আদি খসড়া হিসেবে কাজ করেছে সেটি। বলা বাহুল্য অনেক পুনর্লিখন এবং সময়োপযোগী সংযোজন করতে হয়েছে।]

একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা

১৩০২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন '১৪০০ সাল' নামে তাঁর জনপ্রিয় কবিতাটি। বঙ্গাব্দের সেই ১৪০০ সাল আমরা পেরিয়ে এসেছি, প্রবেশ করেছি বাংলা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। খৃষ্টাব্দের নতুন শতকও আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে বেশ দ্রুতগতিতেই। শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে, এ কথা বলতে পারলে খুশী হতাম হয়তো, কিন্তু সে-কথা এখন আর বলা যায় না! এককালে ২০০০ খৃষ্টাব্দটাকে কত সুদূর, আকাশের চাঁদের মতো অপ্রাপণীয় মনে হতো! তার পর মানুষ চাঁদেও পা ফেলেছে, এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দটাকে কেবল যে নিকট ব'লে মনে হয় তা-ই নয়, মনে হয় যেন একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে! ভাবনা জাগে, তার আগে হাতের কাজ শেষ করতে পারবো কি, মনের মতো ক'রে একটু বেঁচে নিতে পারবো কি, এই বিশ শতকটাকেই আরেকটু উপভোগ ক'রে নেওয়ার সুযোগ পাবো কি? এই ভাবনাগুলো যে কেবল বর্তমান বয়সটার জাতক তা-ও নয়, আমাদের সময়ের জাতকও বটে। সময়ের গতিবেগ আমাদের সময়ে যেন বেড়ে গিয়েছে। কনফারেন্স-সেমিনারের বা চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন থেকে শুরু ক'রে গায়কবাদকদের বা নাট্যদলের সফর-কর্মসূচী নির্ধারণ এবং প্রেক্ষাগৃহের বুকিং পর্যন্ত নানা কর্মকাণ্ডের পিছনেই আজকাল দু'-তিন বছরের অগ্রিম পরিকল্পনা থাকে, না থাকলে চলে না। একবিংশ শতাব্দী যে এগিয়ে আসছে সে-কথা ভুলবার জো নেই। আপনি ভুলতে চাইলেও গণমাধ্যমগুলি আপনাকে ভুলতে দেবে না। সেই অতিথিকে স্বাগত করার জন্য পরিকল্পনারও শেষ নেই। ইংরেজী প্রবাদে বলে, 'যদি তাদের পরাজিত করতে না পারো, তা হলে নিদেনপক্ষে তাদের দলে যোগ দাও!' সেই উপদেশ মেনে বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন করলাম!

সত্যি বলতে কি, ১৪০০ সালের কোনো প্রকৃত মানচিত্র রবীন্দ্রনাথের ঐ বিখ্যাত কবিতাটির মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া নেই। ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবতে পারতেন যে বাঙালীদের দেশটা দু' টুকরো হয়ে যাবে, যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে দেশান্তরিত বাঙালীদের বড় বড় দল? তবে দুটি বিষয়ে কবিকে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হয়। প্রথমতঃ, তিনি জানেন যে তাঁর কবিতা ১৪০০ সালে বেঁচে থাকবে, অজানা পাঠকরা তাঁর লেখা পড়বেন। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তিনি জানেন যে বাংলা কবিতাও বেঁচে থাকবে, তিনি বেঁচে না থাকলেও অন্যান্য

কবিরা বাংলা কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। 'আজি হতে শতবর্ষ পরে/ এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি/ তোমাদের ঘরে?/ আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন/ পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।' এই লাইনগুলির উপরে আমাদের ভাবনাকে একটু ফোকস্ ক'রে নেওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন। তাঁর কবিতা আমরা আজও আনন্দের সঙ্গে পড়ছি। তাঁর অবর্তমানে অন্যান্য কবিরা আসর জমিয়ে রেখেছেন। অবশ্য আজকাল তাঁরা আর ঠিক গান করেন না।[১] কেউ হয়তো চেঁচান, কেউ আর্তনাদ করেন, কেউ বা করেন মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জন। সে যা-ই হোক, বাংলা কবিতাকে তাঁরা যেমনভাবেই হোক বাঁচিয়ে যে রেখেছেন তা অস্বীকার করা যায় না।

দুই জমির বাঙালীদের মধ্যে, দেশান্তরিত বিপুলসংখ্যক বাঙালীদের মধ্যে, এমন কি যাঁরা ইংরেজী অনুবাদে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতাটি ছাড়া আর কোনো রবীন্দ্র-বাক্-এর সঙ্গে পরিচিত নন সেই ধরণের অবাঙালী ভারতীয়দের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ আজ পরিণত হয়েছেন আমাদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীকতুল্য এক মূর্তিতে। অবশ্য এ ঘটনা ঘটেছে কিছু ধাক্কাধাক্কির পরেই। ষাটের দশকের শেষে, সত্তরের দশকের আরম্ভে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন ভারতের উনিশ-শতকী নবজাগরণের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিই। আজকে সেই চরমপন্থার সমর্থক খুব বেশী মিলবে ব'লে মনে হয় না। তেমনি পূর্বপাকিস্তানে এককালে রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র হিন্দুদের সম্পত্তিরূপে চিহ্নিত ক'রে কোণঠাসা করা হয়েছিলো, ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো তাঁর গান। তার পর অবশ্য পালে হাওয়া বদলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ডান-বাঁ দুই দিকেই তিনি এখন পূজনীয় প্রতীক। আর বাংলাদেশে তাঁর লেখা গান এখন জাতীয় সংগীত, ওখানকার গায়িকাদের কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত দেশে বিদেশে বাঙালীদের মন কেড়েছে,—যদিও মনে রাখা ভালো, বাংলাদেশের বাঙালীরা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন তাঁদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে, তাঁরা এখনও ব্যস্ত আত্মপরিচয়সন্ধানে।

আমরা যেখানেই থাকি না কেন, রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব আমাদের আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়। তিনি যে ছিলেন, সেই নিয়ে আমরা উৎসব করতে ভালোবাসি। কিন্তু একজন কৃতকর্মা সৃজনশীল প্রতিভার পক্ষে প্রতীকী মূর্তি হয়ে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। অমন একজন প্রতিভা তাঁর উত্তরসূরিদের কাছ থেকে যা দাবি করতে পারেন তার বদলে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় পৌত্তলিকতার উপকরণ। রঙ্গমঞ্চে তাঁর নামটা আওড়ানো হয় মন্ত্রের মতো, কিন্তু তাঁর কীর্তির তাৎপর্যকে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নেপথ্যে মৃত সৈনিকের ভূমিকায়। গোটা উপমহাদেশের কথা মনে রেখেই বলা যায়, পৌত্তলিকতা আমাদের সংস্কৃতির রক্তে নিহিত একটি শত্রু। যাকে আজকাল বলা হয়

'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্', তাকেও পৌত্তলিকতার প্রকারভেদ বলা চলে। এই প্রকারভেদে কতগুলি বদ্ধমূল ধারণা বা ডগমা পূজিত পুত্তলিকার স্থান গ্রহণ করে, এই যা তফাৎ। ডগমাগুলো ধর্মীয় হতে পারে, রাজনৈতিকও হতে পারে। ধর্মীয় আর রাজনৈতিক 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্'-এর মধ্যে বেশ খানিকটা সাধারণ এলাকা বা ওভারল্যাপ বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের নামটা বর্তমানে যেভাবে একটি পূজনীয় প্রতিমায় পরিণত হয়েছে, তা তন্মনস্ক রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে অনুকূল তো নয়ই, অপিচ তা অনিবার্যভাবে ডেকে আনে প্রতিক্রিয়াকে। কোনো একজনকে দেবতা বানিয়ে, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীকরূপে পূজাবেদীতে স্থাপন ক'রে, তাঁর জন্যে খুব বেশী কাঁসরঘণ্টা ধূপধূনার আয়োজন করলে মনুষ্যধর্মের নিয়মে কোনো-না-কোনো মহলে সেই আরতির বিরুদ্ধে একটা রিঅ্যাক্‌শন দেখা দেবেই। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সিরিয়াসভাবে কাজ করতে চান তাঁদের উদ্যম সেই দুই ঘটনার মাঝখানে বিপর্যস্ত হবে। প্রথমে বুঝতে পারি নি, এখন পারি—রবীন্দ্রনাথ পবিত্র প্রতীকে পর্যবসিত হওয়ার ফলে তাঁকে নিয়ে গভীর স্তরের কাজ করা কী-আন্দাজ পোলিটিসাইজ্‌ড্ বা রাজনৈতিকীকৃত হয়ে গেছে। সিরিয়াস রবীন্দ্রচর্চা করতে এগোলে কোনো-না-কোনো পর্যায়ে কাল্‌চারাল পলিটিক্স বা সংস্কৃতির রাজনীতির মুখোমুখি হওয়ার এবং 'রবীন্দ্রবিরোধী' লেবেল পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় অবধারিত। একবিংশ শতাব্দীর দেহলীতে দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার।

খবরের কাগজের প্রতিবেদনে আমার নামের আগে 'রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' শব্দটি দেখলে আমার প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ হয়। কবে কোন্ ফাঁকে আমি ও বস্তুটা হলাম? কাগজের লোকেরা লেবেল সাঁটতে ভালোবাসেন। হয়তো হেডলাইন আর ক্যাপ্‌শন তৈরি করতে করতেই তাঁদের মধ্যে এই প্রবণতাটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রচর্চায় আমি এসে পড়েছি ঘটনাচক্রে, পর-পর করা কয়েকটি কাজের ধারাবাহিকতার চক্রান্তে, কিন্তু রবীন্দ্রচর্চা আমার কাজের একমাত্র ক্ষেত্র নয়, এবং বিভিন্ন প্রোজেক্টের প্রয়োজনে যে-কাজ করেছি তার বাইরে কোনো বিশেষজ্ঞতা আমি দাবি করি না। অস্বস্তিবোধের আরেকটা কারণ এই, লেবেলটি ব্যবহৃত হলে তার কাছে-পিঠেই প্রায়ই একটা প্রহারও থাকে, অর্থাৎ লেবেল মেরেই একটা থাপ্পড়ও মেরে দেওয়া হয়। হেডলাইন থেকেই মালুম হয়, আবারও নিজের অজান্তে কোনো-একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি!

§

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে কী বলতে চাইছি তা আরেকটু পরিষ্কার ক'রে বোঝানো যাক। আমি রবীন্দ্রচর্চায় এলাম আমার *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর*

সন্ধানে বইটির অন্তর্গত গবেষণার সূত্রে। এই বইটিতে সৃজনশীল সাহিত্য আর রবীন্দ্রচর্চাকে যেভাবে বেণীর মতো বেঁধে দিয়েছিলাম, সেই নির্মাণের মাধ্যমে এমন কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম, এবং আমার ধারণা বলতে পেরেওছিলাম, যেগুলি আমাদের প্রজন্মের অভিজ্ঞতার গভীরতম স্তর থেকে উঠে আসতে চায়, উচ্চারণ দাবি করে। প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি, তবে কিছু লোক অসন্তুষ্টও হয়েছেন। যদিও আমি রবীন্দ্রনাথ বা ভিক্তোরিয়াকে 'ফিক্‌শনালাইজ়' করি নি, তাঁদের নিয়ে কোনো গল্প ফাঁদি নি,—যেটুকু গবেষণা ঐ বইয়ে দিয়েছি তা সাচ্চা গবেষণা,—তবু একই বইয়ের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিজয়াকে নিয়ে গবেষণা আর একটি আধুনিক প্রেমের কাহিনীর সহাবস্থান তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাঁদের দৃষ্টিতে আমি একটি পবিত্র জিনিসের উপরে একটি অশুচি বস্তুকে লেপ্‌টে দিয়েছি।[২]

ঠিক তেমনি কিছু লোক রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় বই *ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন*-এ পরিবেশিত বিপুল তথ্যসম্ভারকে উপেক্ষা ক'রে একটি ছোট কাহিনীর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, কারণ গল্পটা তাঁদের হৃদিস্থিত পবিত্র প্রতিমার সঙ্গে খাপ খায় না। তাঁদের মতে খবরটা আমার চেপে যাওয়া উচিত ছিলো। আমার মতে একজন বিষয়নিষ্ঠ গবেষক হিসাবে আমি তা কোনোমতেই করতে পারতাম না, চেপে যাওয়াটা হতো অসাধুতা—ঘটনাটি ছোট হলেও আর্জেন্টিনায় অনেকেই তার খবর রাখেন, এবং সেটি ঐ দুই ব্যক্তিত্বের মিথস্ক্রিয়ার উপর এবং তাঁদের রচনার কোনো কোনো দিকের উপর আলোকপাতও করে।

এ ছাড়া আর্জেন্টিনায় ভারতের জনৈক প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত দাবি ক'রে বসলেন যে সান ইসিদ্রোয় ভিক্তোরিয়ার অতিথিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে-বাড়িটায় ছিলেন সেই বাড়িটা সম্পর্কে আমি ভুল খবর দিয়েছি। বাড়িটা নাকি আর নেই, অনেক দিন আগেই নাকি তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিন্তু বাড়িটা—ভিক্তোরিয়ার একটি আত্মীয়পরিবারের সম্পত্তি 'মিরাল্‌রিও'—অবশ্যই দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজে সেখানে গিয়েছি, একটি দিন কাটিয়েছি ; সেই দিনটি আমার স্মৃতিতে অবিস্মরণীয় !

বাড়িটা নেই, এই ভ্রান্ত খবর প্রচারের জন্য দায়ী ওকাম্পোর এস্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক মহিলা, মারিয়া রেনে কুরা। ও কথা তিনি আমাকে আর্জেন্টিনাতেই বলেছিলেন। আমি সেই প্রচার অগ্রাহ্য ক'রে বাড়িটা খুঁজে বার করেছিলাম। 'মিরাল্‌রিও' নেই, এই কথাটা প্রচার করতে পারলে 'ভিলা ওকাম্পো'র সুবিধা, কেননা প্রথম বাড়িটাই প্রকৃত রবিতীর্থ! এটি একটি সুপরিকল্পিত প্রচার। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভিক্তোরিয়ার একটি ছোট্ট বই আছে, শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে যেটির সঙ্গে বাঙালীরা পরিচিত। মূল স্প্যানিশ বইটির প্রথম সংস্করণে (১৯৬১) 'মিরাল্‌রিও'র কয়েকটি ছবি ছিলো। ওকাম্পোর মৃত্যুর পরে শ্রীমতী কুরার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে

(১৯৮৩) ছবিগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এবং তাদের জায়গায় এমন কিছু নতুন ছবি আমদানি করা হয়েছে, বইয়ের মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন 'আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাম্পোর সম্পর্ককেও একটি পবিত্র প্রতীকী সম্পর্কে পরিণত ক'রে ফেলতে পারলে কারও কারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি হয়—তা ভারত ও আর্জেন্টিনার সম্পর্কের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। আর্জেন্টিনার তরফে মারিয়া রেনে কুরা সেই সম্পর্কের মুখপাত্রী-ভূমিকা দাবি করেন, এবং উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরাও প্রয়োজনমতো ভূমিকা পালন করেন। এই সম্পর্কটাকে ওকাম্পো-এস্টেটের জন্য সুদে আসলে খাটানোর উদ্যোগে দরকার হলে সে-উদ্দেশ্যে একটা আস্ত বাড়ির অস্তিত্বও অস্বীকার করা যেতে পারে!

মনে আছে, ১৯৮৩ সালে আমি যখন আর্জেন্টিনায় যাবার জন্য আর্থিক মদত খুঁজছিলাম তখন কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে আমার একবার পত্রবিনিময় হয়েছিলো। তিনি তখন দিল্লীতে ছিলেন, আমি ছিলাম শান্তিনিকেতনে। তিনি বলেছিলেন, কাজটা শেষ করবার জন্য আর্জেন্টিনায় যাবার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, যা-কিছু জিজ্ঞাস্য তা মারিয়া রেনে কুরাকে চিঠি লিখেই জেনে নেওয়া যেতে পারে। এই মহিলা যে তথ্যদাত্রী হিসাবে কতটা অবিশ্বাসযোগ্য ও অসহযোগী হতে পারেন তা পরে জেনেছি। ইয়োরোপ-আমেরিকার ওকাম্পো-গবেষকরা এঁর অসহযোগিতার সঙ্গে সম্যক পরিচিত। ভাগ্যিস আমি সে-সময়ে কৃপালনীর পরামর্শ নিই নি!

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নূতন একটি গবেষণাগ্রন্থ—যা আমার এবং আমার সহযোগী গবেষকদের মিলিত চেষ্টায় লিখিত—আশা করছি শীঘ্রই বেরোবে।[৩] এ সূত্রে ১৯৯১-৯২-এ শান্তিনিকেতনে কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমি বিলেতে ফিরে আসার পর ১৯৯২ সালে খবরের কাগজ মারফৎ কিছু দিন একটি অপপ্রচার চলে. আমি নাকি রবীন্দ্রভবনের অফিসারদের ঘুষ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির ভিডিও-ক্যাসেট বিদেশে 'পাচার' করেছি এবং তার বাণিজ্যায়ন দ্বারা লাভ লুটছি। বলা বাহুল্য, খবরটি ছিলো সর্বাংশে অসত্য। বৈধ চ্যানেলে আবেদন ক'রে বিশ্বভারতীর উপাচার্যর সম্মতিক্রমে রবীন্দ্রভবন থেকেই রিসার্চ মেটিরিয়ল হিসাবে ঐ জিনিস পেয়েছিলাম। কোনো-কিছু 'পাচার' করার প্রশ্নই ওঠে না। গবেষণাটি করার জন্য আমার এবং আমার জনৈক গবেষণা-সহযোগীর যোগ্যতা আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। বইটি বেরোলে সুধীজনই তার মীমাংসা করবেন।

বর্তমান সময়ে স্ট্র্যাটফোর্ডে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানোর ব্যাপারটা নিয়ে আবারও আমার সম্পর্কে ভারতীয় প্রেসের কোনো কোনো অংশে তথ্যবিকৃতিসহ অপপ্রচার চলছে। এবারকার মারটা রবীন্দ্র-অনুবাদক আমার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আধুনিক ইংরেজীভাষী কবিতাপাঠকদের কাছে পরিচিত করার চেষ্টায়

বিশ্বভারতীরই আমন্ত্রণে ও উদ্যোগে আমি তাঁর একটি নূতন *সিলেক্টেড পোয়েম্‌স্‌* প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিই। সেই অনুবাদের বইটি (*আই ওন্ট লেট ইউ গো*) ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে, বিদগ্ধজনের প্রশংসাও অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের মূর্তির নীচে শেক্সপীয়রের উদ্দেশে লেখা তাঁর মূল কবিতাটির পাশে কোন্‌ অনুবাদটি যাবে সেই নিয়ে কোনো তর্ক গোড়ায় আদৌ ছিলো না, তাকে তৈরি করা হয়েছে। উইলিয়ম র‍্যাডিচির পরামর্শ অনুসারে লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার পূর্বোক্ত বইয়ে প্রকাশিত আমার অনুবাদটি ব্যবহার করার জন্য ১৯৯৪ সালের অগাস্ট মাসে নিজে টেলিফোন ক'রে আমার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁকে লিখিতভাবেও অনুমতি পাঠিয়ে দিই, এবং আমার প্রকাশককে সে-কথা জানিয়ে দিই। কিন্তু এর পর হাই কমিশনার আমাকে কিছু না জানিয়ে এক বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলা কবির পরামর্শ মেনে র‍্যাডিচিকে দিয়েই আরেকটি তর্জমা করিয়ে নেন। র‍্যাডিচি ছিলেন সেই মহিলা কবির বিশেষ স্নেহভাজন। আমার প্রতি হাই কমিশনারের এই অসৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে আমি প্রায় বৎসরকাল অনবহিত ছিলাম। ১৯৯৫-এর জুলাইয়ে মূর্তিটি যখন কলকাতা থেকে স্ট্র্যাটফোর্ডে পৌঁছয় তখনও প্রেসে অনুবাদক হিসাবে আমার নামই বেরোয়। তার পর ১৯৯৫-এর অগাস্টে হঠাৎ র‍্যাডিচি মারফৎ রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত গদ্য সারানুবাদটির সন্ধান পেয়ে হাই কমিশন আমাদের উভয়েরই পাশ কাটিয়ে সেটি ব্যবহার করারই সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি সুরক্ষিত হবে না এই বিবেচনায় আমরা কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছি। হাই কমিশন দ্রুতগতিতে তাঁদের নবতম সিদ্ধান্তকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা রাবার স্ট্যাম্প করিয়ে নিলেন। প্রতিবাদ করার আস্পর্ধার জন্য আমাকে এখন শাসন করা হচ্ছে—চিঠিতে তো বটেই, বিংশ শতাব্দীর সব থেকে সুবিধাজনক উপায়েও, অর্থাৎ গণমাধ্যমে আমার নামের উপর মসীলেপনে। বলাই বাহুল্য, আমি এখন একজন 'রবীন্দ্রবিরোধী' 'আত্মপ্রচারকারী'!

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণগুলি দিলাম একটি জিনিস বোঝানোর জন্যে। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলছে, রবীন্দ্রক্ষেত্রে কাজ করতে আসার পর থেকেই আমি কোনো-না-কোনো দিক থেকে একটা বিশেষ ধরণের বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছি। তার আগে এই ধরণের মার খাই নি। প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলির কেবলমাত্র চুম্বক সরবরাহ করলাম। রবীন্দ্রবিষয়ক আমার প্রতিটি উদ্যোগকে ঘিরেই এক-একটা ঘটনাপুঞ্জ জ'মে উঠেছে। সাংস্কৃতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রত্যেকটা পুঞ্জেরই 'কেস স্টাডি' করা যায়। আগে এভাবে ভাবি নি, কেননা প্রতি উদ্যোগেই কিছু শুভার্থী সুধীজনের সহযোগিতা, সৌহার্দ্য তথা গুণগ্রাহিতাও মিলেছে, এবং সেটাও কিছু কম প্রাপ্তি নয়। এই যে-লেখাটি লিখছি, এটি তৈরি করছি সুচিত্রা মিত্রর অনুরোধে। শৈশব

থেকেই যাঁর নাম শুনছি, যাঁর গান শুনে বড় হয়েছি, সেই সুচিত্রা মিত্রর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ পাওয়া কি কিছু কম প্রাপ্তি! এই-সব পাওয়ার ফলে মার খাওয়াগুলোর উপরে একটা আবরণ প'ড়ে যায়, সেগুলোকে ক্রমশঃ ভুলে যাই, ঠিক যেমন মেয়েদের জীবনে প্রসবযন্ত্রণার স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু জীবনে যন্ত্রণা যে পাওয়া যায় সেটাও তো একটা 'ক্লিনিকাল' সত্য। এবং মধ্যে মধ্যে সেই সত্যকে একটু 'ক্লিনিকাল' ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করাও দরকার, নয়তো যে-যন্ত্রণাটা প্রতিবিধেয় তার প্রতিকার করা হবে কী ক'রে? প'ড়ে মার খাওয়ায় আমি বিশ্বাস করি না। অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা তো চালিয়ে যেতে হবে! তাই এখন সাম্প্রতিকতম প্রহারের ধাক্কায় একটু বিশ্লেষণ করতে বসেছি, এবং উল্লিখিত ঘটনাপুঞ্জের পরম্পরার মধ্যে একটা নকশা দেখতে পাচ্ছি। আমার ধারণা, আলোচিত ঘটনাগুলি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র জাতীয় মূর্তিতে পর্যবসিত হবার এবং তাঁর নামের রাজনৈতিকীকরণের বিষফল। বিষয়নিষ্ঠ আধুনিকমনস্ক রবীন্দ্রচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই আবহ অনুকূল নয়। আত্মসম্মান বজায় রেখে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আত্মসম্মান ও সংবেদন থাকলে অন্যায় আক্রমণকে উপেক্ষা করা যায় না, বারে বারে অযাচিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়, যাতে ক'রে শক্তি ও সময়ের অপচয় ঘটে। হিতৈষী বন্ধুরা চামড়াকে শক্ত করার উপদেশ দেন, কিন্তু সে-উপদেশ কেবল কিছু দূর পর্যন্ত মানা যায়। যাঁরা নিজেরা শিল্পী তাঁদের চামড়া তো একটু পাতলা হবেই! ফলে আক্রান্ত হওয়া আর আত্মরক্ষার চেষ্টা করার একটা দুষ্টচক্র তৈরি হয়ে যায়। একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চাকে আমরা যদি অর্থপূর্ণ করতে চাই, তা হলে এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার এবং এর প্রতিকার করা দরকার, কেননা উচ্চমানের রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে এ অবস্থা একরকমের অভিশাপ!

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রচর্চায় বিঘ্নস্বরূপ গুরুবাদ তো বরাবরই ছিলো, জিনিসটা নতুন নয়। প্রচলবিরোধী কোনো কথা বলতে গিয়ে সুধীজনেরা তো এর আগেও মার খেয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে' প্রবন্ধটি লেখার পর শিবনারায়ণ রায় মহাশয়কে যে-বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তার কথা কে না জানেন। বরং হাল আমলেই রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে কিছু প্রকৃত বাক্স্বাধীনতা পাওয়া গেছে।

কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। সেকালে আমার বয়স অল্প ছিলো। তখনকার গুরুবাদের স্রোতগুলির হালচাল আমার সরজমিনে জানা নেই। আমি যখন রবীন্দ্রচর্চায় এলাম তখন বাক্স্বাধীনতার আবহ কিছুটা তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার আবহকে ধ'রে নিই ব'লেই হয়তো উল্টো অবস্থাটা আরও পীড়া দেয়। তবে আমার ধারণা, আগেকার গুরুবাদ আর এখনকার রবীন্দ্রপূজার মধ্যে একটা তফাৎ আছে। ঐ যে বললাম, রবীন্দ্রনাথ পড়ি বা না-ই পড়ি, তাঁর বাণী শুনি বা না-ই শুনি, তার মর্ম বুঝি

বা না-ই বুঝি, তাঁকে পুজো দেওয়া এখন একটা আবশ্যিক জাতিগত রিচুয়ালে, একটা পবিত্র রাজনৈতিক কর্তব্যে পরিণত হয়েছে—বোধ হয় এককালে খদ্দর পরাটা যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ইশ্যুটা রাজনৈতিকীকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে এখনকার স্বাধীনতাবিরোধীদের অস্ত্রশস্ত্রও শাণিততর।

§

আরও অনেক বাংলাভাষীর মতো রবীন্দ্রনাথকে আমি পেয়েছিলাম মাতৃভাষার সূত্রে, আমার ঐতিহ্যের একজন স্বীকৃত গৃহীত ক্লাসিকরূপে। তাঁর দুটি প্রিয় ফুলের নামে বাবা-মা আমার এবং আমার পরের বোনটির নাম রাখেন! মায়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে বড় হয়েছি। *শিশু* আর *কথা ও কাহিনী* ছিলো আমার শৈশবে বারবার নাড়াচাড়া-করা দুখানি বই। পরে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো *সঞ্চয়িতা, গল্পগুচ্ছ, গীতবিতান*। আমার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী আমার থেকে দশ বছরের ছোট হওয়ায় কখনও কখনও তাকে পড়াবার ভার আমার উপর পড়তো : সে-কাজ করতে গিয়ে *সহজ পাঠ*-এর ভাষার প্রেমে প'ড়ে যাই—আমার সেই ভালো-লাগার ঘোর এখনও কাটে নি। আরও অনেক বাঙালীর মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়ায় নিজে কবিতা লেখা আরম্ভ করেছি। তাঁর লেখা আমার বরাবরই প্রিয়, তাঁর গান চিরকালই আমার প্রাণের কাছাকাছি, কিন্তু রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে তবেই ঠিক ক'রে বুঝেছি বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কত বড়। সাম্প্রতিক গবেষণার সূত্রে সমগ্র *রবীন্দ্ররচনাবলী*-র পাতা আমাকে উল্টাতে হয়েছে। সে-কাজ করা মানে দিনের পর দিন এক বিরাট মাপের মনের সান্নিধ্যে থাকা। সেটা একটা প্রাপ্তি। তাঁর কীর্তির মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয়, সংবেদন, শিল্পনৈপুণ্য এবং দূরদর্শী সমাজচিন্তার এক চমৎকারী মিশ্রণ আমাদের প্রশংসা দাবি করে। আমার ধারণা, বাঙালীদের মধ্যে তাঁর বৌদ্ধিক দিকটার অ্যাপ্রিসিয়েশন কম। গান বা নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে তাঁর নান্দনিক দিকটা যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাঁর কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, বৌদ্ধিকতা ততটা সমাদর লাভ করে নি। গ্যয়টে নাকি বলেছিলেন, সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে সেই চন্দ্রাতপে মিকেল-এঞ্জেলোর শিল্পকর্ম যিনি না দেখেছেন, তিনি জানেন না মনুষ্যচিত্ত কী করতে পারঙ্গম। একই কথা রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই বলা যায়, কিন্তু কথাটা যান্ত্রিকভাবে বলা আর গভীর নিমগ্নতা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁর মতো একজন প্রতিভার কাছ থেকে আমরা যে-উত্তরাধিকার পাই সেটার সংরক্ষণ একটা গুরুদায়িত্বও বটে।

অংশতঃ সেই উত্তরাধিকার হচ্ছে তাঁরই সৃষ্টিগুলি : তাঁর বই, তাঁর গান, তাঁর নৃত্যনাট্য, তাঁর ছবি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি—রক্ত দিয়ে গড়া শান্তিনিকেতন,

অনেক উদ্যোগের পথিকৃৎ শ্রীনিকেতন, অনেক স্বপ্নের বিশ্বভারতী। তাঁর মৃত্যুর পরে এদের সঙ্গে আবশ্যিকভাবেই যুক্ত হয়েছে তাঁর পাণ্ডুলিপি, তাঁর চিঠিপত্র, তাঁকে লেখা অন্যদের চিঠিপত্র ইত্যাদি—এক কথায় তাঁর আর্কাইভ্‌স্। সব কিছুর সংরক্ষণেই আমাদের লাগবে বুদ্ধি, বিবেচনা, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, আধুনিক প্রযুক্তি। কেবল সংরক্ষণ করলেই চলবে না। যাঁরা রবীন্দ্রচর্চা করতে চান তাঁদের সেই ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকারও দিতে হবে। বই যেন ছাপা অবস্থায় পাওয়া যায়, ছবির প্রিন্ট এবং অ্যালবাম যেন পাওয়া যায়। সুপরিকল্পনা ও উদ্যোগের সহযোগিতায় বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে, ওঠা উচিত। সমগ্র রবীন্দ্রচিত্রসংগ্রহকে বিধিবদ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করা ও ডিজিটাল ফর্মাটে সুরক্ষিত করা একটি গুরুদায়িত্ব।

রবীন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমাদের দায়িত্ব জটিল। এদের সামনে সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতার মূল উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে—কার্যতঃ সেই উদ্দেশ্যগুলির একেবারে বিপরীত মেরুতে চ'লে গিয়ে—পরীক্ষাযন্ত্র ও চাকরিযন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলির আত্মাবলোপ। কেন—না বাঙালীর চিরকালের লোভের সামগ্রী চাকরির জন্য। কয়েকটা পাশ দিয়ে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নেওয়ার দিকে বাঙালীর যে-প্রবণতা, তার বেদীতে এদের যেন বলি দেওয়া না হয়। প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমকালের সঙ্গে সৃষ্টিশীল সংলাপ চালাতে হবে—চালাতেই হবে, নয়তো তারা পর্যবসিত হবে অচলায়তনে। নিশ্চল স্থিতি কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কাম্য হতে পারে না। বই বা ছবি এক জিনিস—জড়সামগ্রী হিসাবে তারা নির্মিত, অবসিতনির্মাণ, এখন তাদের জড়ো ক'রে সুরক্ষিত করা দরকার। কিন্তু বইয়ের তাকে বই বা দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতো একটা প্রতিষ্ঠান তো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—তার পরিচালনা কেমনধারা হবে, কখন কোন্ খাতে বইবে, সেই প্রশ্নগুলো তো থেকে থেকে উঠবেই। প্রতিষ্ঠান জিনিসটা এক অর্থে সদানির্মীয়মাণ। তাকে বদলাতেই হয়, কালের সঙ্গে মিটমাট করতে হয়, অনড় হলে তার চলে না। তবে যাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং প্রশাসক তাঁদের ভাবতে হয়—কী-কী পরিবর্তন লাগবে, কতটুকু, কেন, কখন কোন্ দিকে কিভাবে টানতে হবে, এই সমস্ত। এই ভাবনাচিন্তায় সূক্ষ্মতা দরকার।

বই, গান, নাটক, নৃত্যনাট্য—সব ব্যাপারেই উত্তরসূরিরা যে 'ইন্টারপ্রিটেশন'-এর একটা ন্যায্য স্বাধীনতা দাবি করবেন সেটাও প্রত্যাশিত। শেক্সপীয়রের স্বকালে বালকরা স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হতো ব'লে তাঁর নাটকের প্রযোজনায় চিরকালই সেই নিয়ম চলবে এটা তো কখনো হতে পারে না। তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজনায় বা পরিবেশনে বা ভাষ্যনির্মাণে কোনো নূতনত্ব, কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা

দেখা গেলেই 'গেলো গেলো' রব তোলাটা ঠিক নয়। তা করলে রবীন্দ্রকীর্তি কুলুঙ্গিতেই তোলা থাকবে, জীবিত ঐতিহ্যরূপে সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হবে না। সৃজনশীলতাকে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিরাট মূল্য দিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে কেউ যখন কাজ করেন, তখন সেই নতুন কাজের মধ্যে সৃজনশীলতার বিদ্যুচ্চমক তো প্রশংসার্হই, নিন্দনীয় তো নয়।

গবেষকরা অবশ্যই গবেষণার স্বাধীনতা দাবি করবেন। সেই-সব গবেষণার একটা অংশ যুগধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হবে, এটা ধ'রেই নেওয়া যায়। আধুনিক শৈলীর গবেষণায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আখেরে বিদ্যাজগতেরই লোকসান। আর রবীন্দ্রনাথ বাঙালীদের সম্পত্তি নন। পৃথিবীর সব দেশের সুধীজনেরই তাঁকে নিয়ে কাজ করবার অধিকার আছে। তিনি এত বিরাট মাপের স্রষ্টা এবং ভাবুক যে তাঁকে নিয়ে অনেক দিন ধ'রে অনেক দেশের বিদ্যার্থী রিসার্চ করতে চাইবেন। তার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করতে তাঁরা নানা দেশ থেকে শান্তিনিকেতনে, কলকাতার রবীন্দ্রভারতীতে পদার্পণ করবেন। উভয়পক্ষেরই কিছু অধিকার এবং কিছু দায়িত্ব থাকবে। নিয়মকানুন কিছু লাগবেই, আবার যথার্থ গবেষকরা পূর্ণ সহযোগিতাও প্রত্যাশা করবেন। এই আদানপ্রদানের পথ সুগম করার জন্য বুদ্ধি-আলোকিত প্রশাসনব্যবস্থা চাই। একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা যদি আরও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে তা হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না, কিন্তু সেই ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হলে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেও বিশ্বমুখিতার এবং আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার বর্ধিততর আয়োজন চাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের প্রয়োজনের কথা অবশ্যই এসে যায়। অনূদিত না হলে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভারতের বাইরে দুরধিগম্য থেকে যান তা-ই নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যেও অপরিচিত রয়ে যান। আমার ব্যক্তিগত মতে, ভারতের পাঠকদের মধ্যে তিনি কেবলই ইংরেজীতে প্রচারিত হতে থাকলে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। আমি আশা করবো, একবিংশ শতাব্দীতে তিনি ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও ব্যাপকভাবে অনূদিত হবেন। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্য ভারতীয় সর্বসাধারণের হৃদয়-অন্তঃপুরে যেভাবে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে, এলিট শ্রেণীর ভাষা ইংরেজীর মাধ্যমে তা কখনো পারে না। একটি ভারতীয় ভাষা থেকে আরেকটি ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য অনুবাদ করার সুবিধা অনেক, কেননা ভাষাগুলি মোটামুটি বিচারে একটি সাধারণ ভাবলোকের অন্তর্গত। উপমারূপক, চিত্রকল্প, দার্শনিক ভাবনাচিন্তা, প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি-আশ্রয়ী মেজাজ, গাছপালা ফুলফলের নামধাম থেকে শুরু ক'রে চরিত্রদের নামধাম পর্যন্ত খুঁটিনাটি, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পৌরাণিক উল্লেখ—এ-সমস্তই একটি ভারতীয় ভাষার উষ্ণ হাত থেকে আরেকটির উষ্ণ হাতে সরাসরি চালান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইংরেজীর মধ্যস্থতা

সেখানে দস্তানার অনর্থক আড়াল রচনা করে।

উচ্চশিক্ষিতদের কথা একটু স্বতন্ত্র। ইংরেজীর সঙ্গে যাঁরা সবিশেষ পরিচিত তেমন ভারতীয়রা দস্তানার আড়াল সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা লাভবান হন। এখানে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আবারও কিছু কথা বলি। বিলেতে আমেরিকায় অভিবাসী বাঙালীদের ছেলেমেয়েদের এমন এক প্রজন্ম গ'ড়ে উঠেছে, যারা বাংলায় একটু-আধটু কথাবার্তা চালাতে পারলেও মূল বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসগ্রহণে অপারগ। ম্যাকমিলান-প্রকাশিত পুরোনো অনুবাদগুলো এই প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। এইরকম ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা আমার রবীন্দ্র-অনুবাদের বইটিকে বিশেষভাবে স্বাগত করেছেন। তাঁরা বইটি কিনে নিজেদের ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন, এবং পরে রিপোর্ট দিয়েছেন, 'আপনার অনুবাদগুলি প'ড়ে ওরা অবশেষে বুঝতে পেরেছে যে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই একজন বড় কবি।' আমার বইটিতে আমি চব্বিশটি গানেরও অনুবাদ করেছি।[৪] কয়েকটি অনুষ্ঠানে প্রথমে অনুবাদ পড়েছি, পরে কণ্ঠশিল্পী গানটি গেয়েছেন, এমন হয়েছে। অবাঙালী ভারতীয়রা বিপুল আনন্দ প্রকাশ করেছেন তাতে। আমার করা 'পরিশোধ', 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ'-এর অনুবাদ নৃত্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসী ছেলেমেয়েদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে এভাবে পৌঁছে দিতে যাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী ও উদ্যোগী, দেখতে পাই তাঁরা সাধারণতঃ মহিলা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান অনুবাদ করা যায় না, এমন কোনো দাবি তাঁরা স্বীকার করেন না।

ভারতের বাইরে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে হলে অন্যান্য বিদেশী ভাষার সহায়তা অবশ্যই লাগবে। একবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীতে তো বটেই, তা ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও নতুন ক'রে রবীন্দ্রানুবাদ হবে, এমন ভাবতে ভালো লাগে, এবং তেমন অনুবাদের একটা নবতরঙ্গ দেখা দিয়েছে এ কথাও ঠিক। কিন্তু স্ট্র্যাটফোর্ডের ব্যাপারটাতে বোঝা গেলো, বিদেশীদের কাছে রবীন্দ্রটেক্সট্‌কে ঠিক ক'রে পৌঁছে দিতে গেলে যে-বুদ্ধিবিবেচনা, দূরদর্শিতা ও সাহিত্যবোধ অবলম্বনীয়, প্রচারযন্ত্রের সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে-সমস্ত প্রত্যাশা করা দুরাশা। একবিংশ শতাব্দীতে কবি রবীন্দ্রনাথকে বহু লোকের কাছে একটু তুলে ধরার এক সুবর্ণসুযোগ আমরা হেলায় হারালাম। প্রতি বৎসর এক নিযুত দর্শনার্থী পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ থেকে শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে প্রায় তীর্থ করতে আসেন। তেমন এক স্থানে রবীন্দ্রমূর্তির নীচে *বলাকা-র* সেই কবিতাটির ('যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে ...') একটি আধুনিক কাব্যানুবাদ উৎকীর্ণ হলে রবীন্দ্রকবিতার প্রচারকে তা ধাক্কা মেরে এগিয়ে দিতো। নিঃসন্দেহে তার একটা অভিঘাত হতো। কিন্তু তা হলে যে আধুনিক অনুবাদকের কাজকে স্বীকৃতি দিতে হয়! কর্তৃপক্ষ সেদিকে একটু এগিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রাণে ধ'রে

সেটি করতে পারলেন না। যাঁরা মূর্তিটা বসাচ্ছেন তাঁদের গৌরবে কোনো অনুবাদক ভাগ বসাবেন, সেটা হয়তো তাঁদের কাছে সহনীয় নয়।

হ্যাঁ, গণ্ডগোলটা এইখানেই। বৃহৎ জগতে রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আধুনিক অনুবাদকদের মর্যাদা দিতে হবে এবং তাঁদের কাজকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদের এই কেন্দ্রিক ব্যাপারটা বোঝানো গেলো না। কিংবা তাঁরা বুঝেও বুঝতে চাইলেন না। আমরা স্ট্র্যাটফোর্ডে মূর্তি বসানোর সমালোচনা করছি না। সে তো ভালো খবর। একজন আধুনিক বাঙালী ভাস্করের কাজ সেখানে শোভা পাবে, সেও তো এক বিজয়বিশেষ। ভাগ্যিস বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ, যিনি একাধিক আত্মপ্রতিকৃতি এঁকে রেখে গেছেন, নিজের মূর্তিও গ'ড়ে রেখে যান নি ! তা হলে আজকের ভাস্করকে আর কমিশন পেতে হতো না ! কিন্তু একটা মূর্তি রবীন্দ্রনাথের নামটা চেনাতে পারে, তাঁর কবিতাকে চেনাতে পারে না। যাঁরা বাংলা বোঝেন না তাঁদের কাছে কবিতাটি পৌঁছে দিতে হলে একটি দক্ষ কাব্যানুবাদ চাই। সাদা কথা। কিন্তু কর্তাদের তা বোঝানো গেলো কই। কবির সুনাম নিয়ে তাঁদের কোনো সত্যিকারের মাথাব্যথা আছে কি ? যাদের ঘটা ক'রে 'রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' বলা হয়, কাজের বেলায় তাদের পরামর্শ নেওয়া হয় না। পরামর্শ দিতে গেলে উল্টে বেধড়ক মার খাবার ভয় এবং প্রেসের আয়নায় নিজের বিকৃত চিত্র দেখবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা যারা এ ব্যাপারে লড়লাম কিন্তু জিততে পারলাম না, সেই আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের উদ্যোগ অনেক বছর পিছিয়ে গেলো।

রবীন্দ্রকবিতার কবিকৃত ইংরেজী গদ্যরূপগুলি যে তাঁর কাব্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় বহন করে না, তাঁর কবিতাকে বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দেয় না, এ তথ্য কি আজ আর নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করার দরকার আছে ? স্কলারমহলে এটি যে একটি স্বীকৃত তথ্য, প্রায় বস্তাপচা কথা—এতদিন তা-ই তো জানতাম। ঐ পুরোনো গদ্য সারানুবাদগুলি বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিকে টিঁকিয়ে রাখতে পারে নি, তাঁকে উপেক্ষা-অবজ্ঞা-উপহাসের পাত্র করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর জন্য ঝকঝকে আধুনিক ভাষায় যুগোপযোগী নূতন কাব্যানুবাদ চাই—এ কথা কৈশোর থেকে শুনছি। সেজন্যেই তো অনুবাদের আসরে আধুনিকদের ডাক পড়েছে। আমাদের কাজের জন্য আমরা দেশে তথা বিদেশে প্রশংসা পাই নি এমনও নয়। হঠাৎ দেখছি, পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রচার করতে হলে কী ধরণের অনুবাদ উপযুক্ত সে-ব্যাপারে আমাদের মতো 'বিশেষজ্ঞ'দের মতামত একদল লোকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক, এবং শুধু তা-ই নয়, রীতিমতো অবাঞ্ছিত। আমাদের মতামতের আর প্রয়োজন নেই ; রাষ্ট্রদূত-আমলা-মন্ত্রীদের মতামতই যথেষ্ট। এমন কি, আমাদের প্রতি সৌজন্য রক্ষা করারও প্রয়োজন নেই !

রবীন্দ্রনাথের নিজের করা ঐ সারানুবাদগুলি তেমন সার্থকতা লাভ করে নি, এ কথা স্বীকার করলে তাঁকে কোনোভাবেই খাটো করা হয় না। তিনি ভালো ইংরেজী জানতেন না তা নয়। চিঠিপত্র বা ভাষণ লেখার জন্য যে-স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন তা তাঁর যথেষ্ট পরিমাণেই ছিলো। কিন্তু কবিতার ভাষান্তর একটি স্বতন্ত্র আর্ট, একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া, এবং তার কিছু নিজস্ব শর্ত আছে। একটা জিনিস মূল ভাষায় কবিতা ছিলো, তাকে অনুবাদেও কবিতা ক'রে তুলতে হবে। এর মধ্যে ক্রাফ্‌ট্‌ বা কারুশিল্পের ভূমিকা আছে। ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-তে সৃজনশীল পরীক্ষানিরীক্ষার যে-সূত্রটি ছিলো, পরে তাঁর ব্যস্ত জীবনের অন্য অনুবাদের কাজে সেটি রক্ষিত হয় নি, আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিড়ম্বনায় সম্পাদক-প্রকাশকদের তাগাদায় করা অনুবাদগুলি নিতান্তই দায়সারা হয়ে উঠেছে। ঐ বিশেষ সংকলনটি তার নিজের মতো ক'রে একটি নতুন সৃষ্টি হয়েছিলো, এবং পুরস্কার পাবার দরুন তার একটা আলাদা মূল্যও আছে, কিন্তু মূল কবিতাগুলি যে আরও বেশী সার্থক সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। এতে আমাদের কবির পক্ষে অগৌরবের কিছুই নেই। বিদেশী ভাষায় নিজের কবিতার সার্থক অনুবাদ ক'জন আর করতে পারেন? বিদেশী ভাষাটা যখন আর বিদেশী থাকে না, একেবারে আপন হয়ে যায়, হয়ে যায় ঘরের ভাষা, যখন সে-ভাষায় প্রাণের কথা বলার আঙ্গিক রপ্ত হয়, আয়ত্ত হয় তার কাব্যবাচনের ভঙ্গিগুলি হাবভাবগুলি, কেবল তখনই সেই ভাষায় রসোত্তীর্ণ কাব্যানুবাদ করার স্বাচ্ছন্দ্য আসে। এটা পুঁথিগত বিদ্যার ব্যাপার নয়, জীবনাভিজ্ঞতার ব্যাপার। যারা আলোচ্য ভাষাটিতে কথা বলে তাদের জীবনের বহমান স্রোতের সঙ্গে, অন্তরঙ্গ জীবনের ছন্দের সঙ্গে, তাদের আধুনিক কাব্যবাচনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই। এও একরকমের বিশেষজ্ঞতা—জীবনাভিজ্ঞতাজাত বিশেষজ্ঞতা। এই বিশেষজ্ঞতা আমার কিছুটা না থাকলে রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি কখনোই সাহস পেতাম না। কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ অনুবাদকদের—কাছ থেকে উন্নত মানের কাজ পেতে হলে আমাদেরও তো কিছু সম্মান ও সৌজন্য দিতে হবে, আমাদের বক্তব্য শ্রদ্ধাসহকারে শুনতে হবে, নয় কি! নয়তো আমাদের পোষাবে কেন? আমরাও তো মানুষ, এবং আমাদেরও তো শিল্পীর অহংকার আছে। আমাদের কিছু-কিছু অন্য আত্মপরিচয়ও আছে। আমরা অন্যান্য কাজও করি। আমরা নিজেরাও কম-বেশী গদ্যপদ্য লিখি। এবং আমাদের সেই-সব লেখালেখির কাজ থেকেই আমাদের অনুবাদকসত্তা তার পুষ্টি আহরণ করে। লিখি ব'লেই তো অনুবাদক হতে পারলাম, তা-ই না? অনুবাদকর্ম লিখনশিল্পের একটি ধারা। রবীন্দ্রপৌত্তলিকতা এই জিনিসটা বোঝে না, তাই এখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং বেসুর রচনা করে। কাব্যানুবাদকের ভূমিকাকে বাঙালীরা যদি আরও সম্মান দিতে না শেখেন তা হলে রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের পথ কিছুতেই বাধামুক্ত হবে না, এ কথা আমি লিখে দিতে

পারি। এবং কেবল অনুবাদ নয়, যিনিই কোনো সৃজনশীল পদ্ধতিতে রবীন্দ্রচর্চা করেন তাঁর কাজকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবন বা শিল্পী-জীবনের সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দরকার। তা না করলে তিনি ঠিক কী করতে চাইছেন, কী দিতে চাইছেন তা বোঝা যাবে না।

অনুবাদের সঙ্গে সংগীত বা নাট্যকলার পরিবেশনের একটা তুলনা বেখাপ হবে না। টেক্স্‌ট্‌ প'ড়ে একটা নাটক সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নেওয়া যায়। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়েছি তাদের এ কাজ করতেই হয়েছে। তেমনি সংগীতজগতের পেশাদাররা একটা স্বরলিপি প'ড়ে তার সংগীতকে 'মাথার ভিতরে' পেয়ে যান। এগুলো হলো বিশেষজ্ঞদের নিত্যকর্ম তথা সাহিত্য বা সংগীতের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক হোমওয়ার্ক। কিন্তু বাখ-বেঠোফেন যত বড় সংগীতস্রষ্টাই হোন, রবীন্দ্রনাথ যত বড় গীতরচয়িতাই হোন, শেক্সপীয়র-চেকভ-ব্রেখ্‌ট্‌ যত বড় নাট্যকারই হোন, গায়কবাদক-অভিনেতাদের সহযোগিতা ছাড়া *সাধারণ্যে* এঁদের কাজের পরিবেশন কি সম্ভব? তেমনি একটা ভাষার সাহিত্যকেও অন্য ভাষাভাষীদের কাছে পরিবেশন করতে গেলে অনুবাদকদের সাহায্য লাগে। গায়ক-বাদক-অভিনেতাদের মতো সাহিত্যের অনুবাদকও একজন শিল্পী। কবিতার অনুবাদককে অবশ্যই শিল্পী হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যত বড় হোন না কেন, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি উত্তরসূরি শিল্পীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এই কথাটা একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতেই হবে। উৎকৃষ্ট অনুবাদের কাজকে স্পন্সর না ক'রে, যোগ্য অনুবাদকদের উৎসাহ না দিয়ে, যে-অনুবাদগুলো ভালো নয় সেগুলোকে প্রচারিত হতে দিয়ে বিশ শতকের অনেকগুলি দশক আমরা নষ্ট করেছি।

আসলে দাসানুদাসের মনোবৃত্তি নিয়ে আর্ট বা গবেষণা কোনোটাই সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে যতক্ষণ একটা উঁচু বেদীর উপর মূর্তির মতো বসিয়ে পূজা করি, ততক্ষণ তাঁকে দূরে রাখি, এবং ততক্ষণ তাঁকে নিয়ে আধুনিক শৈলীতে কোনো সিরিয়াস কাজ করা অসম্ভব। তিনি বড়, তবু তার থেকেও বড় কথা এই যে তিনি আমাদের বন্ধু এবং আমাদের কাছাকাছি, তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে মনে মনে সংলাপ বা তর্ক চালানো সম্ভব। আমি যখনই তাঁকে নিয়ে কোনো কাজ করি তখনই তাঁর সঙ্গে একটা নৈকট্য, একটা আত্মীয়তা, একটা সহপথিকত্ব অনুভব করি। এই অনুরণন অনুভব না করলে তাঁকে নিয়ে কোনো অর্থপূর্ণ কাজ করতেই পারতাম না। আমিও শিল্পী সেই অহংকার যদি কিছুটা না থাকে, তা হলে তাঁর কবিতা অনুবাদ করবো কী ক'রে? আমিও শিল্পী এই অভিমানটুকু যদি কোনো গায়ক বা গায়িকার না থাকে, তা হলে তিনি যখন রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বসবেন তখন তাঁর কণ্ঠে সুর খেলাবেন কেমন ক'রে? এ হচ্ছে অনেকটা সেইরকমের আত্মবিশ্বাস, যার তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন : 'তুমি যখন গান গাহিতে বল/ গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে ;' অথবা : 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,/ তুমি তাই এসেছ নীচে—/ আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,/ তোমার প্রেম হত যে মিছে।' আধুনিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রভক্ত 'ওল্ড গার্ড'দের প্রায়ই এই জায়গাগুলিতেই বিবাদ ঘটে। ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলা যাক।

§

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার তো আসলে একটা বিরাট এলাকা। শিল্পসাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই তিনি তাঁর ছাপ রেখে গেছেন। কেবল তাঁর ভাষার কথাটাই মনে আনা যাক। আমরা আজকে যে-বাংলাভাষায় লিখি তার পিছনে তাঁর অবদান অসামান্য, তার এক বৃহদংশ তিনিই গ'ড়ে-পিটে তৈরি ক'রে দিয়ে গেছেন। এখন থেকে একশো বছর আগে লেখা *ছিন্নপত্রাবলী*-র চিঠিগুলিতে আমরা যে-গদ্যকে পাই তা এত তাজা যে তা আজও আমাদের মডেল হতে পারে। আধুনিক বাংলা কবিতা এবং গদ্যকে তিনি যেখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেখান থেকেই ফের রওনা দিয়ে নূতনতররা সেগুলিকে নিয়ে গেছেন দূরতর দিগন্তের অভিমুখে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অর্সেছে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর উত্তরাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমন যদি হতো যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যে আর কিছুই ঘটে নি, তা হলে সেটা আমাদের সংস্কৃতির এক গভীর দীনতারই জানান দিতো। বছরের পর বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী ক'রেও সেই দৈন্য ঘোচানো যেতো না। যে-উত্তরাধিকার নূতনের জন্ম দিতে পারে না তাকে জীবিত উত্তরাধিকার বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার কিন্তু বারবার নূতনের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে—সেইখানে তার বিশেষ জিত। আজ আমরা বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে যা-কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারছি তা সম্ভব হতো না যদি তিনি এই সাহিত্যের চলার জন্য একটা প্রবাহপথ খনন ক'রে দিয়ে না যেতেন। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাহকে সচল রাখাও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের ঋণমোচনের বৃহত্তর দায়িত্বের অন্তর্গত।

আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রানুরাগের তাই একটা সমঝোতা দরকার। নয়তো উত্তরাধিকার জীবিত থাকবে না, পাথরে পরিণত হবে। সম্মানের লক্ষ্যকে পাথরে পরিণত করবার দিকে আমাদের যে-প্রবণতা আছে তার নিয়ামনে রবীন্দ্রনাথকে পুজো দিতে গিয়ে আমরা তাঁকে পাথরে পর্যবসিত করি। তাঁর প্রস্তরমূর্তির দিকে নিক্ষেপ করি ফুলচন্দন, আর তাঁর জীবিত উত্তরসাধকদের দিকে ছুঁড়ে দিই ঢিল-কাদা, ধুলো-বালি। উত্তরাধিকার কিন্তু এভাবে রক্ষা করা যায় না। বরং এভাবে রবীন্দ্রনাথকেই হেয় করা হয়। নিছক রবীন্দ্রভক্তি দিয়ে একুশ শতকে রবীন্দ্রচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না,

আধুনিকদেরও বুঝতে শিখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আর বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তাঁর কীর্তি, এবং বেঁচে আছি আজকের দিনের আমরা। এখন যা দরকার তা হলো এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক ঘণ্টা ধ্যান করলে অন্ততঃ পাঁচ-দশ মিনিট তাঁদের কথাও ভাবতে হবে, তাঁদের মঙ্গলের জন্যও চিন্তা করতে হবে—যাঁরা তাঁর উত্তরসূরি, যাঁরা তাঁর ঐতিহ্যকে সচল রাখার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন, যাঁদের কথা ভেবে তিনি নিজে লিখেছিলেন : 'এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি/ তোমাদের ঘরে ?' যে-ঐতিহ্যে নূতনেরা দেখা দেন না, স্বাগত হন না, সে-ঐতিহ্য অতীতের শত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ক্ষীণপ্রাণ হয়ে আসে। শুধু তাকেই বলা যায় জীবিত ঐতিহ্য, যেখানে পুরাতনের উৎসমুখ থেকে নূতনের জলধারা বিরামহীন বয়ে চলে।

আমাদের সৌভাগ্য এই, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাহকে আমরা মোটামুটি সচল রাখতে পেরেছি। আজকের বাংলাভাষা একটি ঋদ্ধ, নমনীয়, সম্ভাবনাময় মাধ্যম। এতে লিখে কত আনন্দ ! একে দিয়ে কত রকমের কাজ করানো যায় ! কত রকমের নূতন ভাবনাকে এর মাধ্যমে রূপ দেওয়া যায় ! আমি নিজে অহরহঃ অনুভব করি যে বাংলায় লেখা আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার নিজের ঋণমোচনের অন্তর্গত কর্ম। আমি জানি, ইংরেজী লেখাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লোকের অভাব নেই। বাংলার প্রবাহকে সচল, বাধামুক্ত রাখার ব্যাপারেই আমি একটা দায়বদ্ধতা অনুভব করি। আমাদের ভাষার উন্নতির পথ খোলা রাখতে হলে তাকে আধুনিক জগতের চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে, তাকে আধুনিক জীবনের প্রসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে ; ক্রমাগত নূতন শব্দ, নূতন শব্দসমাহার সৃষ্টি করতে হবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের ব্যবহার করতে হবে। আমার কাছে এ সমস্তই সৃজনশীল রবীন্দ্রসেবার অন্তর্গত। 'ওল্ড গার্ড' রবীন্দ্রভক্তদের বুঝতে হবে যে নূতন সৃজনের প্রতিভা ছাড়া ভবিষ্যতের পথকে কখনো সুগম করা যায় না, এবং আমরা তেমন গোষ্ঠীতে পরিণত হতে চাই না—যারা বছরের পর বছর পিছনে তাকিয়ে পঁচিশে বৈশাখ পালন ক'রে যায় কিন্তু যাদের ভাষা ও সাহিত্যের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কোনো নূতন হয়ে-ওঠা নেই।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাভাষা জাতীয় আত্মপরিচয়ের চিহ্ন হয়ে ওঠার ফলে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। বাংলার চর্চায় সেখানে তাই একটা নতুন প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার যেমন সুবিধা আছে তেমনি বিপদও আছে—রাজনৈতিক বিপদ। সরকার যদি বলে, ভাষাকে বা সাহিত্যকে অমুক দিকে টানো, তা হলে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য সেই দিকে টান মারার লোভ সামলানো কঠিন হতে পারে। ঔপনিবেশিক সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার উন্নতিসাধন করেছিলেন। হ্যাঁ, বলা যায়,

তাঁর সামাজিক শ্রেণী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলো। তবে পৃষ্ঠপোষকতার ঐ-যে পরোক্ষতাটুকু, ওটুকু খুব জরুরী। নয়তো স্বজনের স্বাধীনতা থাকে না। বাংলার পূর্ব-পশ্চিম দুই দিকেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পাশে একটা প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়ায়—তার সঙ্গে স্বাধীনতাও থাকছে কি? এক দিকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ভয় কাটে নি, অন্য দিকে সরকারী বা পার্টির পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে অলিখিত রাজনৈতিক শর্ত থাকলে অবাক হবো না আমরা। সরকারী মদতের বিকল্প বাণিজ্যিক সেক্টর, কিন্তু বাংলাভাষী সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যেরকম তাব ফলে এই সেক্টর যথেষ্ট পরিমাণে বিচিত্রিত নয়, তার প্রবণতা একচেটিয়া স্বার্থের দিকে। বাঙালী শিল্পপতিরা সংখ্যায় কম; মধ্যবিত্ত বাঙালীর আভিমুখ্য প্রথমে ডিগ্রী অর্জন, তার পর চাকরির নিশ্চয়তার দিকে, প্রয়োজন হলে তার জন্য বিদেশে যাওয়ার দিকে; বাঙালী সংস্কৃতির বিবর্ধন ও বিকাশের জন্য পুঁজির বিনিয়োগও তাই খুব বেশী নয়। অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ কি সম্ভব? জমিদারির বিরুদ্ধে আমাদের যত অভিযোগই থাক না কেন, জমিদারির ভিত্তিভূমি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কি উঠতে পারতেন?

গোড়ার দিকে তাঁর একের পর এক বই পারিবারিক খরচে ছাপা হয়েছে; তার পর তো তাঁর নিজের তৈরি বিশ্বভারতীই নিয়েছে তাঁর ভার। তিনি যদি আজকের মানুষ হতেন, তাঁকে যদি প্রতি বছর একটা-দুটো পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাণিজ্যিক প্রকাশকদের দরজায় লাইন দিতে হতো, তা হলে আজকের প্রকাশকদের কাছ থেকে কত কড়া কড়া কথা শুনতে হতো তাঁকে! শুনতে হতো যে তাঁর বইয়ের তেমন বাজার নেই, তাঁর বই চলে না; তিনি বেশী আঁতেল, বেশী সিরিয়াস; আরও হালকা ক'রে, পাঠকসাধারণের বিনোদনের দিকে দৃষ্টি রেখে লেখা উচিত তাঁর!

আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু গোলাম মুরশিদের মতে বাংলাদেশের বাঙালীরা তাঁদের ভাষাকে এখনও নির্মাণ করছেন। সেই নির্মাণকার্য সময়সাপেক্ষ। তাঁর বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত বাংলা শাণিততর, নাগরিক বৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধতর। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে তিনি বলেন, ভারতের এতগুলি ভাষার ভিড়ে বাংলা তার ভবিষ্যৎকে কিভাবে টিঁকিয়ে রাখবে? কিন্তু একই সঙ্গে ঐক্য এবং বৈচিত্র্যকে টিঁকিয়ে রাখার মহাস্বপ্ন নিয়েই তো আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের অ্যাডভেঞ্চার আরম্ভ হয়েছিলো। ভারত স্বাধীন হবার অনেক আগে, 'হে মোর চিত্ত' বা 'জনগণমন-অধিনায়ক'-এর স্রষ্টাও সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন—যে-স্বপ্ন কেবল ভারতের পক্ষে নয়, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই জরুরী থেকে আরও জরুরী হয়ে উঠছে প্রতিদিন। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি যদি পাশাপাশি অবস্থান করবার সূত্রাবলী আয়ত্ত করতে না শেখে, আত্মবিকাশের জন্য প্রত্যেকটি মানবগোষ্ঠীরই যদি থেকে থেকেই লাগে একটি জাতীয় পতাকা, একটি সেনাবাহিনী, একপাক্ষিক

স্বাধীনতাঘোষণার ইস্তাহার, তা হলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার. এবং অনেক বড়াই সত্ত্বেও উলকি-পরা আদিম কাল থেকে আমরা বেশী দূর এগোই নি।

আমার ধারণা, ভারতের বাংলার বিপদ অনেক ভাষার ভিড় থেকে নয়, বিপদ অন্য এক মানসতা থেকে—যার শরিক ভারতের অন্য ভাষাভাষীরাও। বিপদ ঠিক অনেকের ভিড়ে নয়, বরং একের দাপটের নীচে। বিপদ আধুনিক ভারতের উচ্চমধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক সম্প্রদায়ের সেই জড়বাদী মানসতার মধ্যে, যা কেবল ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির অন্বেষণে নিজেদের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে প্রায় বিসর্জন দিয়ে ইংরেজীর দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়েছে। ভারতের মহানগরগুলিতে এখন এমন এক প্রজন্ম গ'ড়ে উঠেছে ইংরেজীই যাদের সংস্কৃতির একমাত্র ভাষা। তারা হয়তো অন্য কোনো ভাষায় দোকানে সওদা করতে পারে, ট্যাক্সি বা রিকশা ডাকতে পারে, দাসদাসীদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, হিন্দী ফিল্মের দৌলতে তাদের কৌতুকবোধ হয়তো হিন্দী-ইংরেজীর মিশালে প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু ইংরেজী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় তারা লেখালেখির আসল কাজ করতে পারে না, উচ্চ স্তরের চিন্তা প্রকাশ করতে পারে না। তাদের অবস্থা ঠিক আগেকার আমলের ভারতীয় প্রশাসনের ইংরেজ আমলাদের মতোই, যাঁরা দৈনন্দিন জীবন চালাবার মতো বাজারী হিন্দী আয়ত্ত ক'রে নিতেন, কিন্তু যাঁদের বৌদ্ধিক জীবনে ইংরেজীই অবশ্যই থেকে যেতো উচ্চ চিন্তা প্রকাশের এবং বই লিখবার একমাত্র ভাষা।

কিন্তু তাঁদের তো ইংরেজীটাই ছিলো আপন ভাষা। সেই ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের যা শোভা পেতো, আধুনিক ভারতের উচ্চশিক্ষিতদেরও তা শোভা পায় কি? এমন কি, এই উচ্চশিক্ষিতরা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে চেঁচামেচিও হয়তো করছেন. হয়তো তার নির্মাণ খুলে ভেঙে দেখাচ্ছেন সাড়ম্বরে—বইয়ে পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সভাসমিতির অধিবেশনে, কিন্তু সেই চেঁচামেচিটাও করছেন ইংরেজীতে, ঔপনিবেশিকতার সেলাই খুলে দেখাচ্ছেন প্রাক্তন প্রভুদেরই ভাষায়, কেননা সংস্কৃতিতে এঁরা একভাষী, আর কোনো ভাষায় আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা এঁদের নেই। আজকাল আমরা প্রায়ই শুনি, এতে কোনো দোষ নেই, কেননা ইংরেজী তো এখন একটা ভারতীয় ভাষা। কিন্তু ইংরেজীর ভারতীয়ত্বের একটা সীমা আছে! ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি এবং ভারতীয় ভাষাগুলি কয়েক শতাব্দী ধ'রে ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে, ভিন্ন জলবায়ুতে, ভিন্ন সভ্যতার অভ্যন্তরে বিবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেক ভাষারই একটা সাংস্কৃতিক চেহারা থাকে। ভাষাকে যদি জাহাজ ভাবা যায়, তা হলে বলা যায়, হ্যাঁ, সে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিতে সক্ষম, কিন্তু প্রত্যেক ভাষারই একটা ঘরে ফেরার বন্দর থাকে, যেখানে ফিরে এসে নোঙর ফেলতে সে ভালোবাসে। প্রথম দফার লিখনে যে-ভাষায় লেখা হচ্ছে তার হাবভাব, গতিপ্রকৃতি, নিজস্ব বিবর্তনের ইতিহাস বড়

মাপের নিয়ন্তা। সেখানে সক্রিয় হবে তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ইতিহাস-ভুগোল-অর্থনীতি, ঋতুচক্র, নিজস্ব পরম্পরাগত সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের নানা মাত্রা, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণার নানা জটিলতা ও সূক্ষ্ম মোচড়, দিনরাত্রির এবং পারিবারিক-সামাজিক জীবনযাত্রার ছন্দ, তার আপন শারীরিক-মানসিক ভুবন থেকে সংগৃহীত প্রিয় উপমারূপক, আবেগের স্বাভাবিক টানটোন। সেটাই তো প্রত্যাশিত। ভাষার বুনটের মধ্যেই এই খুঁটিনাটিগুলি গ্রথিত থাকে। এবং সেজন্যই তো সাহিত্যবস্তুকে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় পৌঁছে দিতে হলে দক্ষ অনুবাদক লাগে। প্রথম দফার লিখনে ভাষামাধ্যমের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যাকর্ষণ তো থাকবেই। একটা জিনিস একবার লেখা হয়ে গেলে লিখনের এক দ্বিতীয় দফায় নিহিত অভিকর্ষ থেকে তাকে একটু ছাড়িয়ে-সরিয়ে এনে অন্য ঘাটে পৌঁছে দেওয়া যায়। তারই নাম অনুবাদ।

§

আধুনিক ভারতে ইংরেজীর দাপট মূলতঃ শ্রেণীরই দাপট—উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। আগেকার সঙ্গে তফাৎ এই, আগে তুলনীয় শ্রেণীর স্বার্থের অন্তর্গত ছিলো জাতীয় আত্মঘোষণার স্বার্থেই মাতৃভাষার চর্চা করা, তার উন্নতি করা। এটা এক আশ্চর্য কূটাভাস যে যত দিন ইংরেজরা ভারতে ছিলো তত দিন দেশপ্রেমের প্ররোচনায় এবং সাংস্কৃতিক আত্মানুসন্ধানের তাগিদে ভারতীয়রা মাতৃভাষার চর্চা করেছে; আজকে যখন ঔপনিবেশিক প্রভুরা স্থূলদেহে উপমহাদেশে নেই, তখন মাতৃভাষার প্রতি সে-আনুগত্যও আর নেই, এখন 'সর্বভারতীয়' ইংরেজীর রাজত্ব কায়েমী বন্দোবস্তর রূপ নিয়েছে। ইংরেজী এখন পেয়েছে সর্বভারতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা, এবং অন্যান্য ভাষাগুলি অবনমিত হয়েছে নিছক 'আঞ্চলিক' ভাষার পদমর্যাদায়। এভাবেই প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের উত্তরাধিকার এখন সূক্ষ্মদেহে সততসঞ্চরমাণ, এবং একবিংশ শতাব্দীতে এই মঞ্চেই রবীন্দ্রচর্চা করতে হবে।

আমি নিজে যদিও ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী ছিলাম, এবং যদিও ঘটনাচক্রে আমার জীবনের বেশীর ভাগটা এই ভাষার আদিভূমিতেই কেটে গেলো, তবু আমার জীবৎকালেই নব-অবতাররূপে ইংরেজীর এই-যে অবতরণ, তা আমাকে একটা স্তরে এখনও চমৎকৃত করে। আবার সেই প্রক্রিয়ার কার্যকারণ বুঝি না এমন নয়।

ইংরেজীর প্রয়োজন আমি কোনোমতেই অস্বীকার করি না। বহুভাষাভাষী দেশে উচ্চস্তরে যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত একটি ভাষা লাগবেই, এবং সেই প্রক্রিয়ায় ভাষাটি অনিবার্যভাবেই ক্ষমতায়িত হবে। কথা হচ্ছে, ইংরেজী এখন কেবল ভারতের ভিতরে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মঞ্চেই যোগাযোগের ভাষা। ইংরেজী এখন বিশ্বজোড়া

শিক্ষিত সমাজের যোগাযোগের ভাষা, 'বিশ্বভাষা'। বিশ্বজোড়া তার ফাঁদ এবং দাপট—বৃটিশ সাম্রাজ্যের শীর্ষকালে যেমন ছিলো তার থেকেও বেশী, বলাই বাহুল্য মার্কিন ছুনিয়ার প্রতিপত্তির কারণে। কোনো সন্দেহ নেই, আধুনিক ভারত ইংরেজীকে বাদ দিতে পারে না, ইংরেজীবর্জন হবে আত্মহত্যার সামিল। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের গাঁটছড়া বাঁধা, এবং আমি ভালোভাবেই জানি যে আজকের পৃথিবীতে ইংরেজী হচ্ছে ইলেক্‌ট্রনিক্স-সংযুক্ত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, হাটবাজার, এবং বিদ্যাজগতের আদানপ্রদানের ভাষা। ভারতীয়রা স্বভাবতঃই এই ভাষার অধিকারী হতে চায়, কেননা তাতে ক'রে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সপ্রতিভভাবে, জোরালোভাবে অংশ নেওয়া যায়, তর্ক করা যায়, দর কষাকষি ক'রে নিজেদের জন্য সুবিধা ছিনিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সেই অধিকার এবং সুবিধা আদায় করতে গিয়ে একটা গোটা শ্রেণী কি তার সাংস্কৃতিক অভিমানকে জলাঞ্জলি দেবে, এবং এতে ক'রে তারা যে একরকমের নব্য ঔপনিবেশিকতারই শিকার হয়ে পড়ছে সে-বিষয়ে চেতনা হারাবে ?

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিন্যস্ত ছুই পৃথক স্তরে—ইংরেজী-মাধ্যমিক এবং আঞ্চলিক-ভাষা-মাধ্যমিক। প্রথম করিডরটা দিয়ে যারা বেরিয়ে আসছে তারা সর্বভারতীয় সুযোগসুবিধার কলকাঠিগুলোকে বজ্রমুষ্টিতে আটকে রেখেছে। যারা এই দিকটাতে ভিড়ছে তাদের কাছ থেকে মাতৃভাষার জন্য কোনো ক্রিয়াশীল চিন্তা, কোনো একাগ্রচিত্ত সেবা, কোনো আত্মনিবেদন আমরা আজ আর প্রত্যাশা করতে পারি না। সেই-সব ছেলেমেয়েরা আজকের দিনে আমাদের মাতৃভাষাগুলিতে কেবল যে লিখতে অক্ষম তা-ই নয়, তারা ঐ ভাষাগুলিতে আধুনিক বই পড়তেও অক্ষম। তারা কেবল ইংরেজী বই পড়ে, ইংরেজীতে ঠাট্টামস্করা করে, কেবল ইংরেজীতে লেখে, লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কের প্রকাশভবন থেকে প্রকাশিত হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে। এতে ক'রে আমরা, আধুনিক ভারতীয় ভাষার লেখকরা, ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্য থেকে সহযাত্রী লেখক হারাচ্ছি, পাঠক হারাচ্ছি, চিন্তাশীল বইয়ের বাজার হারাচ্ছি, পত্রিকার গ্রাহক আর থিয়েটারের দর্শক হারাচ্ছি। সোজা কথায়, একটা গোটা শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা—যাদের বিশেষ অর্থবল আছে তাদেরই মদত—আমরা হারাচ্ছি। ভারতে বইয়ের দাম বাঁধা হয় ছুটো হারে—ইংরেজী বইয়ের দাম অনেক দূর পর্যন্ত উঠতে পারে, কারণ তাদের ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত ধনী। একই আকারের এবং গুরুত্বের 'আঞ্চলিক' ভাষার বইয়ের দাম অনেক নীচে রাখতে হয়, নয়তো সে-বই বিক্রি হবে না। শ্রেণীবিশ্লেষণের কঠিন ভাষায়, আজকে আমরা যখন বাংলায় লিখি তখন আমাদের সে-লেখা যত শাণিত, যত বিদগ্ধই হোক না কেন, চকচকে ঝকঝকে ইংরেজীমাধ্যমিক-স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েরা যে তা পড়বেন তেমন কোনো ভরসা আমাদের নেই। এতে ক'রে পশ্চিমবঙ্গের

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সৃজনশীল সাহিত্য থেকে গবেষণার জগৎ পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে শূন্যতার নানা কুঠুরি তৈরি হয়েছে বৈকি। বৈদগ্ধ্যের জগতে যেখানে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও একটা রমরমা ছিলো এখন সেখানে বিদগ্ধ মানুষদের আঙুলে গোনা যায়—যেজন্যে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষপদের মতো পদ বছরের পর বছর শূন্য থাকে।

আগেই বলেছি, আমি অনুভব করি যে বাংলায় লেখা আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার নিজের ঋণমোচনের অন্তর্গত কর্ম। আমরা যারা এই ঋণমোচনের তাগিদে আমাদের বাংলা লেখাকে উঁচু তারে বাঁধতে চাই, বাংলায় কেবল মনোরঞ্জন করতে চাই না, উচ্চতর ভাবনাকেও পরিবেশন করতে চাই, উঁচু মানের গবেষণার ফলাফলও পেশ করতে চাই, সাহিত্য নিয়ে আধুনিক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাই, সাহিত্যে বৌদ্ধিকতার জন্য আসন সংরক্ষণ করতে চাই—আমাদের সমস্যা অনেক।

ভারতের ভিতরেই যখন এই অবস্থা, তখন ভারতের বাইরে ভারতীয় ভাষাগুলির পদমর্যাদা কী ক'রে উঁচু হবে? আর ভারতীয় ভাষাদের পদমর্যাদা উচ্চতর না হলে আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রচর্চা কী ক'রে বাধামুক্ত ও সম্মাননার যোগ্য হবে? একটা বই তার সাহিত্যগুণ বিচারাধীন হওয়ার ঢের আগেই ইংরেজীতে লিখিত হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে এমনভাবে প্রচার পেতে থাকে যে গুণাগুণের প্রশ্ন লোপ পেয়ে যায়, কেবল থাকে একটা ঝলমলে প্রতিমা, এবং মানুষ তার স্বাভাবিক পৌত্তলিকতাবশতঃ সেই প্রতিমার সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আজকাল এমন হয়েছে যে ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্য বলতে ইংরেজীতে লেখা বইই বোঝায়। অন্য ভাষাগুলোর কোনো প্রোফাইল নেই বললে ভুল বলা হয় না। দিল্লী এই প্রবণতাকে প্রশ্রয়ও দিচ্ছে। কিছু সময় আগে ভারত সরকার এবং বৃটিশ আর্ট্স্ কাউন্সিলের সহায়তায় চারজন ভারতীয় লেখক বৃটেন সফর করেছিলেন—তাঁরা চারজনই কেবল ইংরেজীতে লেখেন। বাইরের জগতের যদি ধারণা হয়, সিরিয়াস ভারতীয় লেখকরা আজকাল কেবল ইংরেজীতেই লেখেন, তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। বিশ শতকের বড় বড় বাঙালী সাহিত্যপ্রতিভাদের নাম একেবারে বাইপাস্ ক'রে যে-দু'-চারজন বাঙালী ইংরেজীতে লিখছেন তাঁদের নামই গণমাধ্যমগুলিতে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ভাষায় লেখা সাহিত্যের জন্য পাশ্চাত্য দুনিয়ায় কোনো প্রচার, মদত বা সুযোগসুবিধা পাওয়া দুরূহ। অন্যদের কথা বাদই দিলাম, রবীন্দ্রনাথের নতুন অনুবাদ বেরোলে দৈনিক পত্রিকায় তার রিভিউয়ের জন্য জায়গা করা হয় না। অথচ সেই-সব কাগজ সাল্‌মান রুশ্‌দি বা বিক্রম শেঠের উপর কলাম ব্যয় করতে কার্পণ্য করবে না। অতএব রবীন্দ্রনাথ নন, রুশ্‌দি বা শেঠই বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি। আমি ত্রিশ বছরের বেশী সময় ভারতের বাইরে থেকে বাংলায় লিখছি।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে বাধ্য, এই-যে আমি ত্রিশোর্ধ্ব বছর ধ'রে বাংলায় লিখছি তা আমার একলার চেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকদের সহযোগিতায়, সেখানকার সম্পাদকদের টানাটানিতে এবং দূরের পাঠকদের অনুপ্রেরণায় সম্ভব হয়েছে। এর পিছনে বৃটিশ সরকারের কোনো মদত যেমন নেই, তেমনি এর পিছনে বিলেতের বাঙালী সম্প্রদায়ের কোনো পৃষ্ঠপোষকতাও নেই। একটু আগে বলেছি যে অভিবাসী বাঙালীরা আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদের বইটিকে স্বাগত করেছেন এবং সে-বই কিনে তাঁদের ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। সেই কথাটার সঙ্গে এখন যা বলছি তার কোনো বিরোধ নেই। যে-রবীন্দ্রকবিতার মর্যাদা বাঙালী অভিভাবকরা তাত্ত্বিকভাবে জানেন অথচ পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যা মূলে পড়িয়ে নিতে পারেন না, সেটা ইংরেজী টেক্সটে পেয়ে গেলে তাঁরা অসম্ভব খুশী হন। এটা বাস্তব অবস্থার একটা দিক। বাস্তব অবস্থার আরেকটা দিক এই যে দশকের পর দশক আমার *বাংলায়* লিখে যাওয়ার পিছনে বৃটেনের অভিবাসী বাঙালী সমাজের কোনো বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা নেই। সেখানে আমার সম্পর্ক সরাসরি জন্মভূমির সাহিত্যিক মূলধারার সঙ্গে। সেই সম্পর্ক রাষ্ট্রসীমানা-অতিক্রমী। দুটো উক্তিই বাস্তবতার দুটো দিক। অব্যবহিত পরিবেশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সৃজনশীল কাজের জন্য যদি বা খরচ চালানো যায়, গবেষণার বেলায় বাধে মুশকিল। তখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হয়। বিলেতে থেকে রবীন্দ্রনাথের উপরে উচ্চপর্যায়ের গবেষণা করা যে কত কঠিন, তার জন্য অনুদান যোগাড় করা যে কী দুরূহ, তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের বোঝানো মুশকিল। বিশেষ ক'রে যে-বই বাংলায় লেখা হবে তার মধ্যে গবেষণা যত উচ্চমানেরই হোক না কেন, তার জন্য কোনো অনুদান যোগাড় করা সম্ভবই নয়। তেমন কাজকে মদত দেবার জন্য কোনো সংস্থাই নেই। এই অনুষঙ্গে বাংলাভাষার কোনো স্টেটাসই নেই। ফলতঃ আমরা দু'-একজন যারা এই ভাষাতে বিদ্যাজগতের কাজ করতে চাই—এই মুহূর্তে বিলেতে সেইরকম লোক বোধ হয় কেবল আরেকজনই আছেন, তিনি প্রাগুল্লিখিত গোলাম মুরশিদ—তাদেরও কোনো স্টেটাস নেই। রবীন্দ্রনাথ একজন মহৎ লেখক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ভাষার সেরকম কোনো পদমর্যাদা নেই। যতক্ষণ আমরা ইংরেজীতে লিখি ততক্ষণ ঠিক আছি, যে-মুহূর্তে বাংলাতে লিখি সেই মুহূর্তে স্টেটাস হারাই, ব্রাত্যজন হয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথকে এখানেও বছর বছর আবাহন করা হচ্ছে, কিন্তু তা করলে কী হবে, তিনি যে-ভাষায় লিখে গেছেন তার পদমর্যাদা তেমন উচ্চ নয় ব'লে একটা রবীন্দ্রগবেষণার প্রোজেক্ট যত মৌলিক হবে, রবীন্দ্রনাথের কাজের যত গভীরে যেতে চাইবে, তার জন্য অনুদান পাওয়া এখানে তত কঠিন হবে। শুধু 'কঠিন' বলি কেন, কোনো সাহায্য পাওয়াই অসম্ভব। খুচরো বা অগভীর কাজের জন্য বাতাসে টাকা ওড়ে। সিরিয়াস কাজের জন্যই মরুভূমি খুঁড়ে জল মেলে না। আমি বর্তমানে যে-

রবীন্দ্রপ্রোজেক্টে নিযুক্ত আছি সে-সূত্রে জার্মান সরকারের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছি, কিন্তু বিলেতের কোনো সংস্থার কাছ থেকে কোনো মদত পাই নি। বিলেতের বাঙালীদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আছে ব'লেও মনে হয় না।

সৃজনশীল সাহিত্যের তথা উচ্চপর্যায়ের গবেষণার জগতে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি এক বিশেষ ধরণের বৈদগ্ধ্য দাবি করে—আন্তর্জাতিকতা, আন্তর্বিদ্য দৃষ্টিভঙ্গি, নানাভাষাজ্ঞান, পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে আর আর্কাইভ্‌সে গিয়ে রিসার্চ করবার ক্ষমতা ইত্যাদি। কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, মাইকেল মধুসূদন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু—এঁদের অনেকের জীবনেরই একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা আছে। এটা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য নয় যে মাইকেল সম্বন্ধে নতুন উপাদান ব্যবহার ক'রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন বই লিখলেন বাংলাদেশ থেকে বৃটেনে আগত গোলাম মুরশিদ, যিনি আমার মতোই এ দেশে অভিবাসী। আজকে যাঁরা বাংলা জানেন তাঁদের হয়তো আন্তর্জাতিক দক্ষতা নেই, যাঁদের সে-দক্ষতা আছে তাঁরা প্রায়ই বাংলা জানেন না, বা তার চর্চা করেন না। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধনার পথ এইভাবেই বিঘ্নিত। আজকের দিনে অনেক বাঙালী ছেলেমেয়ে কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাইয়ে বা ভারতের বাইরে মানুষ হয়ে খুব চৌকসভাবে ইংরেজী লেখেন, কিন্তু বাংলার সাহিত্যসংস্কৃতির পক্ষে তাঁদের দক্ষতা ফেলা যায়, কাজে লাগে না। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তাঁদের দক্ষতা অবান্তর, যতক্ষণ না তাঁরা বাংলাতেও দক্ষতা অর্জন করছেন। বাংলার সঙ্গে অগভীর পরিচয়ের ফলে প্রায়ই এঁদের বাংলা থেকে অনুবাদ করার ক্ষমতাও নেই। দ্বৈভাষিক দক্ষতা অর্জন করলে আধুনিক জগতে নানাভাবে বাংলার যে-সেবা করা যায়, ইংরেজীতে একভাষী হলে তা সম্ভব হয় না! দ্বৈভাষিক দক্ষতা অর্জন করা তেমন কঠিন নয়, তবে একটা চেতনা, একটা দায়বদ্ধতা, একটা নিবেদিত চেষ্টা চাই। এগুলির অভাবে আমাদের প্রজন্ম পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে যা অনায়াসেই সম্ভব হয়েছে তা নতুন প্রজন্মদের মধ্যে সহজে সম্ভব হচ্ছে না। ব্যক্তির আয়ু সীমাবদ্ধ. তারই মধ্যে যা করবার তা ক'রে নিতে হয় তাকে, তাই সময়বিশেষে ব্যক্তি বিলাপ করে। স্থানকালের ভূমিকা অমোঘ—তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেমন সত্য ছিলো আমাদের পক্ষেও তেমনি। তাই দুঃখ হয় যখন দেখি একটা সামাজিক শ্রেণীর একটা গোটা প্রজন্মের মধ্য থেকে যারা আমাদের সহকর্মী ও সহপথিক হতে পারতো, হতে পারতো আমাদের পাঠক, সহগবেষক, সহলেখক—সেই-সব ছেলেমেয়েরা আমাদের দিগন্ত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা কেমন হবে বা হতে পারে তার একটা বড় আকারের প্রেক্ষাপট যেন আমরা মাথায় রাখি, সেটা বলাই এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য। এই কাজ বাংলাভাষীরা তো করবেনই, কিছু নিবেদিত বিদেশীও যে করবেন তাতে সন্দেহ নেই, আশা করি কিছু-কিছু অবাঙালী ভারতীয়ও এই কাজে যোগ দেবেন।

আধুনিক বাংলাভাষাটাই যেহেতু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া আমাদের এক বৃহৎ উত্তরাধিকারের অন্তর্গত, তাই একুশ শতকে সেই ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকেও আমি বৃহত্তর অর্থে রবীন্দ্রস্মরণ-কর্মসূচীর অন্তর্গত ব'লে মনে করি।

আমি জানি, বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, হতে পারে না। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে তাকে ভালোবাসে। বাংলার তথা রবীন্দ্রনাথের বিদগ্ধতর সেবার জন্য তারা একদিন ঠিকই নিজেদের তৈরি ক'রে নেবে। একবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রসাধনায় তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এই-সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই নানা সামাজিক সুতোর ওঠা-নামা আছে, আছে 'কাল্‌চারাল পলিটিক্স'-এর নানা অদৃশ্য খেলা। তাদের সম্বন্ধে অবহিত হলে হয়তো বা কিছু করা যায়—কিছু বিপদ এড়ানো যায়, কিছু পথ ঠিকঠাক বেছে নেওয়া যায়। বুঝে কাজ করার দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে, বৌদ্ধিকতার প্রয়োগের প্রতি একটা পক্ষপাত আছে, তাই এ প্রবন্ধে কিছু বিশ্লেষণ দিলাম—আশা করি ফেলা যাবে না।

১ এই কথাটা প্রথম যখন লিখেছিলাম—১৯৯৩ সালে—তখন তা মোটের উপর সত্য হলেও বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটা সংযোজন দাবি করে। আধুনিক কবিরা হয়তো আর পুরোনো অর্থে গান করেন না, তবে যাঁরা গান লেখেন এবং গান করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই লক্ষণীয় মাত্রায় আধুনিক কবিতার দিকে এগিয়ে এসেছেন, আধুনিক কবি হয়ে উঠেছেন। গীতরচনার এই নতুন যুগটা নব্বইয়ের দশকেই শুরু হয়। সুমনের 'তোমাকে চাই' (১৯৯২) অ্যালবামের প্রকাশকে এই পর্বের সূচনাবিন্দু হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। ক্যাসেটে সে-গান আমি প্রথম শুনলাম নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগে।

২ আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ পরলোকগত গৌরী আইয়ুবও এই মতাবলম্বী ছিলেন এবং *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় আমার এই আঙ্গিকের তীব্র সমালোচনা করেন। আমার যা বলার তা তখন বলেছিলাম, এবং সে-বক্তব্য আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধসংগ্রহ *চলন্ত নির্মাণ*-এ সংকলিত হয়েছে। যেটা দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ আর ওকাম্পোকে নিয়ে যে-অংশটুকু শুধু সেটুকু সম্পর্কেই তাঁর কৌতূহল ছিলো, একই বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রবহির্ভূত উপাদানগুলির কোনো দাম ছিলো না তাঁর কাছে। অনামিকা নামে আমার নায়িকার রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়া-অন্বেষণ বা আত্মানুসন্ধানের দিকটা তাঁর কাছে কোনো তাৎপর্য বয়ে আনে নি। একজন আধুনিক শিল্পীর পরীক্ষামূলক আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি কোনো জিজ্ঞাসা দেখান নি। আমি কী করতে চেয়েছিলাম, কী দিতে চেয়েছিলাম, তা বুঝে নেবার কোনো তাগিদ ছিলো না তাঁর। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমার প্রতিক্রিয়াশীল এবং

একজন আধুনিক লেখকের পক্ষে অবমাননাসূচক মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যদি কোনো কাজ করি, তা হলে সে-কাজ আমার সাহিত্যিক জীবনের সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে, নয়তো তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কেননা যা-কিছু করি তা আমার বাদবাকি আত্মপরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেমন, লিখি ব'লেই অনুবাদক হয়ে উঠতে পেরেছি। অনুবাদ একটি লিখনকলা। তা ছাড়া আছে প্রাসঙ্গিক জীবনাভিজ্ঞতার প্রশ্ন। দুই দফায় ইংরেজী সাহিত্য পড়েছি, বেশ অল্প বয়স থেকে ইংরেজী আমার বিবাহিত জীবনের ঘরের ভাষা হয়েছে, আমার জীবনের বেশীর ভাগটা বিলেতে কেটেছে, ইংরেজদের জীবনের ছন্দের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, যেমন আছে আধুনিক ইংরেজী কবিতার ভাষার সঙ্গে। ইংরেজীতেও কবিতা লিখি, কবিতা-ওয়ার্কশপ করি, ইংরেজ কবি-বন্ধুরা আমার কবিতা পছন্দ করেন—রবীন্দ্র-অনুবাদে বা পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব-অনুবাদে যদি কিছু সাফল্য লাভ ক'রে থাকি, তা হলে এই কারণগুলোর সমষ্টি তো তার পিছনে কাজ করেছে! কিন্তু এই-যে অভিজ্ঞতাগুলো একটা কঠিন কাজের জন্য একজন সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয় শিক্ষানবিশি, পশ্চিমবঙ্গে অনেকে এদের মর্ম বোঝেন না, সম্মান দেন না, বোঝাতে গেলে গালি খেতে হয়।

৩ বইটি হচ্ছে সুশোভন অধিকারী ও আমার *রঙের রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় রঙের ব্যবহার*, বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় এড্রিয়ান হিল ও রবার্ট ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

৪ ২০১০ সালে বইটির একটি পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ বেরোবে; সেখানে আরও সতেরোটি গানের অনুবাদ যোগ করেছি। মোট গানের সংখ্যা এখন হবে একচল্লিশ।

[এই প্রবন্ধের একটি রূপ প্রকাশিত হয় একটি সংকলনগ্রন্থে: *আমি যে গান গেয়েছিলেম*, রবিতীর্থ সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৯৪৬-১৯৯৬, রবিতীর্থের পক্ষে সুচিত্রা মিত্র-কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৬। 'একটি রূপ' কেন বলছি তা হয়তো বোঝানো উচিত। ১৯৯৩ সালে আমেরিকার নিউ জার্সির রবীন্দ্রমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে 'রবীন্দ্রনাথের পরে' শিরোনামে একটি বক্তৃতা দিই। সেটি কখনো কোথাও প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু তার একটি কপি আমার ফাইলে রক্ষিত আছে। সেই বক্তৃতা আর *আমি যে গান গেয়েছিলেম*-এ প্রকাশিত 'একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধটির মধ্যে কিছু সাধারণ এলাকা আছে। দুটি জিনিস নতুন ক'রে মিলিয়ে প'ড়ে বুঝতে পারছি যে অপ্রকাশিত বক্তৃতাটি প্রকাশিত প্রবন্ধের মডেল হিসাবে কাজ করেছে, আবার সেটির

কিছু অংশ বর্জনও করেছিলাম। নতুন ক'রে পড়ার সময়ে সেই বর্জিত অংশগুলির কিছু কিছু টুকরো প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় সেগুলি যথাস্থানে চয়ন ক'রে দিলাম। তা ছাড়া প্রয়োজনমতো এখানে-সেখানে পুরো প্রবন্ধটার কিছু সম্পাদনা ও পরিমার্জনাও করেছি। কিন্তু স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতটা বদলাই নি।

নব্বইয়ের দশকের অবস্থান থেকে এবং বৃটেনে অভিবাসী একজন বাঙালীর দৃষ্টিকোণ থেকে আগামী একুশ শতকের দিকে তাকিয়ে লেখা হয়েছিলো এই প্রবন্ধ। একুশ শতকে পৌঁছে এই লিখন হয়তো কিছু 'পুনশ্চ' দাবি করে সেই বিবেচনায় নীচের প্যারাগুলিতে সেটা সরবরাহ করার চেষ্টা করছি।]

॥ পুনশ্চ ॥

বিগত দশ-পনেরো বছরে রবীন্দ্রচর্চার প্রাঙ্গণ যে একটু একটু ক'রে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বভারতীর প্রকাশনার কাজ অব্যাহত। প্রশান্তকুমার পাল যদিও তাঁর কাজ অসমাপ্ত রেখে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেলেন, তবু তাঁর *রবিজীবনী*-র বেশ কয়েকটি নতুন খণ্ড এই পর্বে বেরিয়েছে, বেরিয়েছে নতুন সংস্করণে জগদীশ ভট্টাচার্যের *কবিমানসী*-র দুই খণ্ড, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের গীতবিতান আর্কাইভ ইত্যাদি—কেবল কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি—বঙ্গীয় মূলধারার রবীন্দ্রচর্চায় যেগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

পাশ্চাত্য জগতে তথা ভারতে নতুন অনুবাদ আর রবীন্দ্রসংক্রান্ত অন্য গোত্রের বইও বেশ কয়েকটি বেরিয়েছে—উইলিয়ম র‍্যাডিচির রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদকে দিয়ে যে-পর্বের আরম্ভ তা থেমে যায় নি। কোনো কোনো কাজ উচ্চমানের, কোনোটা মাঝারি ধরণের, তবু তাদের সাহায্যে রবীন্দ্রজীবনের পটভূমিকা এবং তাঁর কীর্তির আদল অবাঙালীদের কাছে ক্রমশঃ আরেকটু স্পষ্ট হচ্ছে এ কথা ভাবতে অবশ্যই ইচ্ছে করে। লণ্ডনের টাগোর সেন্টারের লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুরা বইপত্র দেখতে যান সে-কথা জানি, এবং গ্লাসগোতেও তার একটি শাখা খুলেছে। পাশ্চাত্য দেশে অভিবাসী ডায়াস্পোরার বাঙালীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য এবং রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়ের উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষাদান এবং পার্‌ফর্মেন্সের একটা ধারা অব্যাহত রাখছে। যা আমাদের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ, লণ্ডনের বৃটিশ মিউজ়িয়মের মতো বৃটিশ মূলধারার প্রতিষ্ঠানও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সভা ডেকেছে, তাঁর কাজের প্রচারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। পাশ্চাত্য সুধীজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা বা 'সবুজ' চিন্তা সম্পর্কে কৌতূহলও বাড়ছে। আগামী ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতের ভিতরে যেমন অসংখ্য

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিদ্যাজাগতিক সভা-সেমিনার হবে, তেমনি বাইরেও যে অনেক কিছু ঘটবে তার প্রস্তুতিপর্ব আমরা এখনই টের পাচ্ছি। এ সমস্তই অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

তবে বৃটেনে অভিবাসী বাঙালীদের জন্য যা কার্যতঃ কমই বদলাচ্ছে, তা রবীন্দ্রনাথের *ভাষাটার* পদমর্যাদা, এবং তারই সঙ্গে জড়িয়ে সেই অন্য ব্যাপারটা, যাকে আমি বলেছি বৃহত্তর অর্থে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সম্পর্কে চেতনা। বলছি না যে এখানকার বাঙালীরা বাংলাকে ভালোবাসেন না। তা নয়। বিশেষতঃ এখানে অভিবাসী বাংলাদেশের বাঙালীরা যে মাতৃভাষা-সংক্রান্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত তা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে। সেই ক্রিয়াকলাপ তাঁদের আইডেন্টিটির জন্য খুবই মূল্যবান। তাঁরা বাংলায় লেখেন, বাংলা খবরের কাগজ চালান, যেখানে কবিতা পর্যন্ত ছাপা হয়, কবিতা-উৎসবের আয়োজন করেন। ২০০৮ সালে সেরকম একটি কবিতা-উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এও উল্লেখ্য যে লণ্ডনের বাংলাদেশীরা যেচে এসে আমার সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছেন—একবার নয়, দু'বার।

তবে যা বলার চেষ্টা করছি তা এই: এ ধরণের ক্রিয়াকলাপ এখানকার মূলধারার সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রান্তেই থেকে যাচ্ছে। মূলধারায় যাঁদের বলা যায় আমাদের সমকক্ষ গোষ্ঠীর সাহিত্যিক তাঁদের সঙ্গে আমাদের সহজ পথে সমানে-সমানে আদানপ্রদান ঘটতে চায় না। অথচ ভারতীয় উৎসের লেখকদের মধ্যে যাঁরা *কেবল* ইংরেজীতে লেখেন, ভারতীয় গোষ্ঠীর কোনো ভাষায় লেখেন না, তাঁদের পক্ষে সে-আদানপ্রদান সহজতর। তাঁরা এখানকার মূলধারায় ঢের বেশী স্বাগত এবং দৃশ্যমান। একটা জাতিভেদের বাতাবরণ থেকেই যাচ্ছে। আমি তো ইংরেজীতেও বেশ কয়েকটি বই লিখেছি, এবং সেই ভাষায় আদানপ্রদান চালাতে আমার তো বিন্দুমাত্র অসুবিধা বা জড়তা নেই: আমিই যদি সেই জাতিভেদের বাতাস গায়ে অনুভব করি, তবে যাঁরা কেবল মাতৃভাষায় লেখেন তাঁরা যে করবেন তা তো বলা বাহুল্য। এই ধরণের বাতাবরণে উচ্চ পর্যায়ের রবীন্দ্রচর্চা করতে হলে অব্যবহিত পরিবেশের লেখকগোষ্ঠী বা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে কোনো মদত বা অনুপ্রেরণাদায়ক মিথস্ক্রিয়া পাওয়া যায় না। ঢাকা-কলকাতা-শান্তিনিকেতনের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হয়।

সম্প্রতি ইন্টারনেটে অন্য এক সূত্রের পিছনে ছুটতে ছুটতে দৈবাৎ উইলিয়ম র‍্যাডিচির একটি বক্তৃতার প্রতিলিপি পড়লাম, যেখানে বিশ্বব্যক্তিত্ব হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও বিচক্ষণ প্রতিবেদন ধরানো আছে। সেটির করিডর দিয়ে আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। বক্তৃতাটির নাম 'Tagore the world over. English as the vehicle', এবং

অনুসন্ধিৎসুদের জন্য তার প্রাপ্তিস্থল :
http://www.williamradice.com/Recent%20Events/Tagore_the_world_over.htm

তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এইরকম। নিকট অতীতে ইংরেজী ভাষাতে সুধীজনদের লেখা যে-সব রবীন্দ্রবিষয়ক বইপত্র বেরিয়েছে, তাদের সাহায্যে ভারতের তথা বৃহত্তর পৃথিবীর ইংরেজীভাষী দুনিয়ার সামনে রবীন্দ্রনাথের করা আত্ম-অনুবাদগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা স্পষ্টতর ভাবে ফুটে উঠছে। একজন লেখক যখন আনফ্যাশনেবল্ হয়ে পড়েন তখন স্কলারদের কাজ তাঁর প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উদ্ঘাটিত ক'রে তাঁর পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটি ঘটেছে। তিনি কী করতে চেয়েছিলেন, কেন করতে চেয়েছিলেন—সেই জিনিসগুলি বোঝা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে তাঁর কবিতাকে ইংরেজীতে পূর্ণাঙ্গভাবে শিল্পিত রূপ দেওয়া—ছন্দমিল ও অন্যান্য অলংকরণ-সহ—তাঁর পক্ষে অসাধ্য, ইংরেজী ভাষার কবি নন তিনি। অথচ তাঁর বৈশ্বিক কল্পনা ও সর্বমানবের কাছে পৌঁছনোর তাগিদ নিয়ে বাংলাভাষীদের বাইরের জগৎটাকে তিনি ছুঁতে চেয়েছিলেন। (র‍্যাডিচি খোলসা ক'রে বলেন নি, কিন্তু এখানে আমরা যোগ ক'রে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের সেই পর্বের ব্যক্তিগত জীবন তথা মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতটা—একের পর এক শোকের আঘাতে বিধ্বস্ত রবীন্দ্রনাথ তখন সত্যিই 'বিশ্বসাথে' যোগ অন্বেষণ করছেন, জানেন যে ক্ষুদ্রের সীমানা ডিঙিয়ে বৃহতের সঙ্গে মিলনের মধ্যেই আছে শান্তি এবং সান্ত্বনা। আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা যায় যে ১৯১২-র বিলেতযাত্রার প্রাক্কালে এবং সেই নৌযাত্রায় নিজের কিছু কবিতাকে ইংরেজীতে পুনর্জন্মদানের খেলায় নিমগ্ন হওয়া তাঁর পক্ষে হয়ে উঠেছিলো একরকমের থেরাপি।) আত্ম-অনুবাদের জন্য তিনি বেছে নিলেন এমন একটি স্টাইল যা তাঁর সাধ্যায়ত্ত, ইংরেজী বাইবেলের আদলে গদ্যকবিতার শৈলী। এর থেকে ভালো বিকল্প তাঁর সামনে ছিলো না।

ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-তে বাইবেলের অনুরণনটা আমরা অনেকেই শুনতে পাই, কিন্তু র‍্যাডিচি আরও একটি কথা বলেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর এক বাঙালী ছাত্রীর কণ্ঠে কলকাতার ইংরেজী অ্যাকসেন্টে ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র দুটি কবিতার নাটকীয় আবৃত্তি শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে ওখানে ভারতীয় ছন্দও আছে। ভারতীয় কণ্ঠে ভারতীয় উচ্চারণে আবৃত্তি শুনলে সেই নিহিত টানটোন কানে উঠে আসে, যা অনুবাদক কবির মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলো। হয়তো আপনা থেকেই, স্বজ্ঞার চালনায় তিনি এগিয়ে গেলেন এমন একটি বাচনভঙ্গির দিকে, যা তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দিতে পারে—কেবল ইংরেজীভাষী দুনিয়ায় নয়, তার বাইরেও, যেহেতু ঐ বিশেষ

স্টাইলটাকে খুব সহজেই এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর রচিত ইংরেজী রূপগুলির পুনরনুবাদ অত্যন্ত সহজ এবং সমস্যাবর্জিত হওয়ার ফলেই তিনি এক বিশাল পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছতে পারলেন।

মূল বাংলার রবীন্দ্রনাথকে যদি বলা যায় 'প্রথম রবীন্দ্রনাথ', আর আত্ম-অনুবাদের রবীন্দ্রনাথকে যদি বলা যায় 'দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ', তা হলে গত বিশ-পঁচিশ বছরে যেসব নতুন অনুবাদ আর পণ্ডিতী বইপত্র জ'মে উঠেছে সে-সমস্ত থেকে উঠে আসেন আরেক রবীন্দ্রনাথ, যাঁর নাম দেওয়া যায় 'তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ'—এই নামকরণ নাকি করেছেন দিল্লীর অধ্যাপক হরিশ ত্রিবেদী।

র‍্যাডিচি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি নিজে এক সময়ে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না—রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রতি এমন অবিচার করতে গেলেন?—কিন্তু পৃথিবীর কাছে তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উন্মোচিত হবার পর থেকে অবস্থাটা বদলেছে, বিশ্বের সুধীজন এখন একটা বৃহত্তর চালচিত্রের মুখোমুখি হতে পারছেন। এখন তাই তাঁর নিজের পক্ষে এবং অন্যান্য বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে বোঝা এবং স্বীকার করা সহজতর হয়ে এসেছে। এখন তিনি ঐ আত্ম-অনুবাদগুলিকে বারবার মূলের সঙ্গে তুলিত না ক'রে সহানুভূতির চোখ দিয়ে দেখতে পারছেন, এখন সেগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে মানতে পারছেন। শিশিরকুমার দাশ আর সুকান্ত চৌধুরীর মতো অধ্যাপকরা নাকি ওগুলিকে আদৌ তর্জমা হিসাবে দেখেন না, তাঁদের কাছে ওগুলি একজন 'দ্বৈভাষিক' লেখকের স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল লিখনগুলির উপর একপ্রকারের ভাষ্য রচনা করেছেন।

অবশ্য র‍্যাডিচি জানেন যে রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভব নিজেকে 'দ্বৈভাষিক লেখক' ব'লে মেনে নিতেন না, কারণ নিজের ইংরেজীজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ছিলো। শেষ জীবনে তিনি তাঁর আত্ম-অনুবাদগুলির উপর ভয়ংকরভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এবং ঐ কাজ করার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। তবু আজকের দিনে ঐ রচনাগুলির দিকে নতুন, ক্ষমাসুন্দর, গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে তাকানো যায়—

> When I read Tagore's translations now, I no longer have an outraged sense of injustice. Rather I see in them vulnerability, sensitivity, oddity, vitality and above all courage. Those, for me, are Tagore's great gifts to English.

র‍্যাডিচি এখানে যা বলতে চাইছেন তা সহমর্মিতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি। তবু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমতঃ, ইংরেজী *গীতাঞ্জলি* যে তার নিজের জোরেই একটি সার্থক পুনঃসৃষ্টি হয়ে উঠতে পেরেছিলো, বা একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টির মাত্রা লাভ

করেছিলো,—কথাটা যেভাবেই বলা যাক না কেন,—*সে-কথা কি একেবারে গোড়া* থেকেই স্বীকৃতি পায় নি? তাকে কি আবার নতুন ক'রে আবিষ্কার করার বা প্রতিষ্ঠা দেবার দরকার আছে? তা ছাড়া আনুষঙ্গিক গল্পগুলোও তো অনেক দিন ধ'রেই আমাদের জানা। কিভাবে আত্ম-অনুবাদের খেলা কবিকে পেয়ে বসেছিলো, কিভাবে জাহাজে যেতে যেতে অনুবাদগুলো এক খাতা ছাপিয়ে আরেক খাতায় পৌঁছেছিলো, কিভাবে সেই মূল্যবান-পাণ্ডুলিপি-বাহী ব্যাগটি লণ্ডনের পাতাল রেলে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলো, আবার 'লস্ট প্রপার্টি' অফিসে তাকে ফিরে পাওয়া গেছিলো, কিভাবে রবীন্দ্রনাথ সেই পাণ্ডুলিপি সসংকোচে রোটেনস্টাইনের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, কিভাবে রোটেনস্টাইনের গৃহে বিদগ্ধ শ্রোতাদের সামনে ইয়েট্স্ তা থেকে একের পর এক কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছিলেন, শ্রোতাদের অন্তঃকরণে সেই আবৃত্তির কী অভিঘাত ঘটেছিলো—সবই তো একাধিক উৎস থেকে অনেক দশক ধ'রে আমাদের জানা। এগুলো তো আমরা গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের নতুন স্কলারদের কাছ থেকে প্রথম শুনলাম না। ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র সাফল্য ইতিহাস-স্বীকৃত। কবি পাশ্চাত্য সুধীজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেন, নোবেল পুরস্কার পেলেন, সারা পৃথিবীতে একজন 'সেলিব্রিটি' হয়ে উঠলেন, নিমন্ত্রণ পেলেন নানা দেশ থেকে, সারা পৃথিবী ঘুরলেন, তাঁর চিন্তাভাবনা আরও আন্তর্জাতিক, আরও মানবতান্ত্রিক হয়ে উঠলো—এ সবই আমাদের বিদিত তথ্য।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, তার পর কী হলো? প্রচার পেলেন ঠিকই, এবং তাঁর গদ্য সারানুবাদগুলির পুনরনুবাদ সহজসাধ্য ব'লে সেই প্রচার পৃথিবীজোড়া হতে পারলো, কিন্তু আত্ম-অনুবাদের পরবর্তী খেপগুলি যে তাঁর সেই হঠাৎ-পাওয়া খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি, সেই করুণ ঘটনাকে নিয়েই তো আমরা বাঙালীরা অনেক বছর ধ'রে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, কেননা আমরা যারা তাঁকে মূল বাংলায় পড়তে পারি, সেই আমরা তো জানি শিল্পোৎকর্ষের মানদণ্ডে তাঁর স্থান কোথায়।

অর্থাৎ র‍্যাডিচি যখন বলেন যে রবীন্দ্রনাথ 'hit on a style that would enable his reputation to spread rapidly not only in the English-speaking world but elsewhere, because the style *was very easy to translate into other languages*', তখন এই প্রশ্নটাই জেগে ওঠে, তা হলে প্রচারের কৌশল হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-অনুবাদের ফর্ম্যুলাটাকে কি সত্যিই দীর্ঘ মেয়াদে সফল বলা যায়? না কি তা ভয়ংকরভাবে দ্ব্যর্থক ভূমিকা পালন করেছে? প্রচারটা ব্যাপ্তির বিচারে বিপুল হলেও তা কি অবশেষে গুণের বিচারে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলো? তা কি তাঁর যথার্থ কবিপরিচয়কে তুলে ধরতে পেরেছিলো, না কি একটা বিশেষ ধরণের ভঙ্গুর প্রতিমা নির্মাণ ক'রে তার পর তাকে বিসর্জন দিয়েছিলো?

এ ব্যাপারে আর কিছু না পড়লেও যদি কেবলমাত্র বাংলায় ও ইংরেজীতে বুদ্ধদেব বসুর বিশ্লেষণগুলি প'ড়ে নেওয়া যায়, তা হলে আমরা পরিপ্রেক্ষিত ফিরে পাই। আর সেগুলি কত দিন আগে লেখা—হাল আমলের লেখা তো নয়! তিনি ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র তুলনারহিত সাফল্যকে যেমন স্বীকার করেন, তার কারণ বোঝেন ও বোঝান, তেমনি ঐ বইয়ে এবং তৎপরবর্তী ভাবানুবাদের খেপগুলিতে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের টেকনিককেও আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণের অধীন করেন, দেখান কোথায় তার শক্তি, আর কোথায় তার অক্ষমতা। লণ্ডনের যে-সাহিত্যিক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করেছিলেন, তাঁরাই যে পরে তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহ হারালেন, সেই ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অনুবাদের বিবর্ধমান ম্লানিমা তার একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নেই' (*কবি রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৬, পৃঃ ১২৯)। অর্থাৎ ঠিক যে-কারণে র‍্যাডিচি সেই ইংরেজী রূপগুলি সম্বন্ধে অ্যালার্জি বোধ করতেন সেটাই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু, এবং সেটা রবীন্দ্রনাথ নিজেও উত্তরজীবনে বুঝতে পেরেছিলেন। প্রচার পেয়ে, সেলিব্রিটি হয়ে কী লাভ হলো, যদি কবিতার পাঠকরা তাঁকে মহৎ কবি ব'লে না চিনলেন। যে-ইয়েট্‌স্ ১৯১২ সালের ঘরোয়া আসরে এত দরদ দিয়ে *গীতাঞ্জলি* থেকে একের পর এক কবিতা পাঠ করেছিলেন, তিনিই একসময়ে, সম্ভবতঃ ১৯৩৫-এ, একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে রুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বললেন যে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু 'thought it more important to see and know English than to be a great poet, he brought out sentimental rubbish and wrecked his reputation' (*কবি রবীন্দ্রনাথ*, পৃষ্ঠা ১৩০-এ উদ্ধৃত)। রবীন্দ্রনাথের আত্ম-অনুবাদ-ভিত্তিক কবিখ্যাতি তাই দ্ব্যর্থকতায় ভারাক্রান্ত—সেই বস্তু তাঁর জীবনে যেমন বিশেষ উপহার বয়ে এনেছে, তেমনি এনেছে বিড়ম্বনা।

আমার আশঙ্কা, শিশিরকুমার দাশ বা সুকান্ত চৌধুরীর পরামর্শ মেনে অবাঙালী স্কলাররা যদি রবীন্দ্রনাথের আত্ম-অনুবাদগুলিকে তাঁর মূল বাংলা কবিতাগুলির উপরে ভাষ্য হিসাবে দেখতে আরম্ভ করেন, তা হলে তাদের আবারও এমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, এমনভাবে জাতে তোলা হবে, যা আখেরে সমস্যাকে জটিলতর করবে। বাংলা আদৌ না জেনে, বা প্রায় না জেনে, কেবলমাত্র ইংরেজীমাধ্যমিক উৎস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে প্রান্তিক গোত্রের গবেষণা-প্রোজেক্ট করার একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য জগতের ক্যাম্পাসগুলিতে এখনই দেখা দিয়েছে। সেই প্রবণতা প্রশ্রয় পাবে, এবং চাকা ঘুরলে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি আরেক দফা বিপন্নতার সম্মুখীন হবে। কী দরকার এই টেক্স্‌ট্‌গুলিকে আবারও অতটা গুরুত্ব দেবার? তার চাইতে অবাঙালী গবেষকদের মূল বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়তে উৎসাহিত করাই কি প্রাজ্ঞতর হবে না? একে তো এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর ওরিয়েন্টালিজ্‌ম্-তত্ত্ব দিয়ে বিদেশী স্কলারদের প্রাচ্য ভাষা আয়ত্ত করার সাধনায় ব্যারিকেড খাড়া ক'রে

গেছেন, তার উপর যদি এই ইংরেজী সারানুবাদগুলিকে নতুন ক'রে স্বতন্ত্র সৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া হয়, অপিচ অধ্যাপকীয় অনুমোদনে মূল বাংলা কবিতার উপরে কবির ভাষ্য ব'লে দেখা হয়, তা হলে বিদেশের ক্যাম্পাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতীয়-ইংরেজী কবিদের পথিকৃৎ প্রমাণ করতে চেয়ে যে-সব দরকাঁচা, অলীক তত্ত্বের ফাঁকা আওয়াজে ভরা থিসিস জমা পড়তে পারে, তা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়। 'পোস্টকোলোনিয়াল' মন্ত্রের উদ্গাতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগগুলির তরফে ঐ জমিটাতে তাঁদের উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তাকে দখল ক'রে ফেলবেন, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত রবীন্দ্রভুবনের দিকে ফিরে না তাকিয়ে। তাঁর আত্ম-অনুবাদগুলির পুনর্বাসন ঘটিয়ে তাঁকে 'ইণ্ডিয়ান ইংলিশ পোয়েট' বানানোর চেষ্টা চলবে। থিওরি তৈরিই আছে, প্রয়োগ কঠিন হবে না। কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ বাংলাভাষীদের, বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত 'প্রথম' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাঁর সমুদ্রোপম বাংলা রচনাবলীর জোরেই তিনি সাহিত্যিক হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান, এটাই আমরা চাইবো। বুদ্ধদেবের শাণিত ভাষায়, "আমরা কেউ কি কল্পনাও করতে পারি যে ভালেরি বা হোফমানস্টাল বা পাস্টেবনাক একজন 'ইংরেজ' কবি ব'লে গণ্য হবেন ?" (*কবি রবীন্দ্রনাথ*, পৃঃ ৯৭)

এখানে বলা দরকার, ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে র‍্যাডিচি তাঁর আলোচ্য বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ২২ মার্চ ২০০৬ তারিখে 'Tagore's gifts to English' নামের একটি বিচিত্রায়িত সান্ধ্য অনুষ্ঠানে, যেখানে আবৃত্তি, গান আর নৃত্যের মাধ্যমে সেই রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিলো, যিনি ইংরেজী ভাষাকেও তাঁর দানে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীকে কী দিয়ে গেছেন তার উপরে পড়েছিলো বিশেষ ফোকস্। বর্ণনা প'ড়ে বুঝতে পারছি যে অনুষ্ঠানটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিলো। এটা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছিলেন 'ইংলিশ-স্পীকিং ইউনিয়ন' এবং 'রয়াল কমনওয়েল্থ্ সোসাইটি'। ঠিক আছে, তবে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগে : আধুনিক স্কলারদের 'তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ' গঠনের ফলশ্রুতিতে কি আবারও 'প্রথম রবীন্দ্রনাথ'-এর পাশ কাটিয়ে 'দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ'কেই আবাহন করা হবে ? মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর ক্ষুব্ধ উক্তি, " 'ইংরেজি ভাষায়' রবীন্দ্রনাথের কোনো অবদান আছে কিনা এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, আসল কথা এই যে গ্যেটে বা পুশকিন বা বোদলেয়ারের মতো তিনি বিশ্ব-কবিতার অন্তর্ভুক্ত কিনা ..." (*কবি রবীন্দ্রনাথ*, পৃঃ ১৩২)। তিনি ঠিকই বলেন যে ইংরেজী ভাষার লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'অবাস্তব প্রতিষ্ঠা'র ফলে অন্যান্য ভাষাভাষীরা বাংলা শিখতে এগিয়ে আসেন নি (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৬) ; ইংরেজীর মাধ্যমেই যদি তাঁকে জেনে ফেলা যায়, তবে বিদেশীরা কেউ কষ্ট ক'রে বাংলা শিখতে যাবেন কেন ? এতদিন বাদে ঐ গৌণ ইংরেজী টেক্সট্‌গুলির উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দিগন্তের উপরে দৃশ্যমান

ক'রে তোলার সুযোগ আবারও নষ্ট হবে।

'ইংলিশ-স্পীকিং ইউনিয়ন' বা 'রয়াল কমনওয়েল্‌থ্‌ সোসাইটি' যদিও ঐ বিশেষ সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছিলেন বোঝা যাচ্ছে, তবু বিদগ্ধ রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে বা বাংলাকে ছুঁয়ে-থাকা কোনো তন্নিষ্ঠ সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে—যাকে চিহ্নিত করেছি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারকে সচল-সজীব রাখার দায়িত্বরূপে—ঐ গোত্রের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা বিশেষ কোনো পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করতে পারি না। ঐ স্তরের সঙ্গে আমাদের মতো সাহিত্যকর্মীদের 'নেটওয়ার্কিং' দুরূহ, এবং আজকাল সব কাজই নেটওয়ার্কিং-নির্ভর। ভারতের ভিতরেও যাঁরা শুধু ইংরেজীতে লেখেন, তাঁদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করা আমাদের পক্ষে ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে উঠছে। আমি তাই মনে করি যে মাথা উঁচু ক'রে রবীন্দ্রচর্চা করতে হলে আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাকে আরও উন্নত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (২০১০)

ইংরেজীতে নতুন রবীন্দ্রজীবনী

ইংরেজীতে লেখা একটি নবপ্রকাশিত রবীন্দ্রজীবনীকে* উপলক্ষ্য ক'রে বিলেতের বাঙালীদের মধ্যে অসন্তোষমিশ্রিত উদ্বেগের তরঙ্গ উঠছে। তাঁদের প্রধান অভিযোগ, লেখকদ্বয় চান বা না চান, বইটিতে রবীন্দ্রনাথকে বাইরের জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করা হয়েছে। লণ্ডন থেকে একজন আমাকে ক্ষুব্ধস্বরে টেলিফোনে বললেন, 'জানেন, বইটা প'ড়ে *সান্‌ডে টাইম্‌স্*-এ কী লিখেছে? লিখেছে, রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন—Mystic or mistake?'

সত্যিই, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫-এর *সান্‌ডে টাইম্‌স্*-এ ও কথা লেখা হয়েছে বটে। জনৈক হাম্‌ফ্রি কার্পেন্টার সমালোচনা লিখেছেন। বইটি প'ড়ে তাঁর কেন অমন ধারণা হলো সেই প্রশ্নের জবাবটা দেওয়া আছে সমালোচনার মধ্যেই: 'Krishna Dutta and Andrew Robinson's lengthy new biography seems uncertain whether to admire or apologise for Tagore, and ends up doing both half-heartedly'।

৯ মার্চ ১৯৯৫-এর দৈনিক *টাইম্‌স্*-এর সমালোচনার শিরোনাম: The wisest fool in Calcutta; রবীন্দ্রনাথের ছবির নীচে ক্যাপ্‌শন: artist posing as a sage; এবং সমালোচক পি. এন. ফার্‌ব্যাংকের মতে, 'One can hardly claim that, in any serious sense, Tagore was a thinker at all'।

যাকে বলে কেলেঙ্কারি। কেন এমন হলো?

বইটিকে ঘিরে বি-বি-সি রেডিওর একটি আলোচনাচক্রে যোগদানের সূত্রে সেটি হাতে পেলাম। ছাপা-বাঁধাই সুন্দর, তর্‌তর্ ক'রে পড়া যায়, ভিতরে অনেক ছবি রয়েছে, কিছু অনুসন্ধানও যে নেই তা নয়। কিন্তু লেখকদুজনের লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি আমার মনে কিছু মৌল অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। তাঁদের ভূমিকায় তাঁরা জানান যে তাঁদের ফোকসের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে 'মানুষটা, তাঁর কাজ নয়', জীবনীকার হিসাবে তাঁদের রহস্যবোধমিশ্রিত কৌতূহল জাগরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের দ্বারা, নিছক তাঁর কৃতির দ্বারা নয়। বিদ্যাচর্চার একাধিক সংস্থা থেকে অনুদান-পাওয়া একটি বৃহদায়তন বইয়ের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে এই অবস্থান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না বোধ হয়।

---

* Krishna Dutta and Andrew Robinson, *Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man*, Bloomsbury, London, 1995, pp. 493, £ 25.00.

মানুষটা আর তাঁর কাজের মধ্যে সীমারেখা টানা হবে কিভাবে, কোথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের শেষ আর কোথায় তাঁর কৃতির শুরু? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের যে-প্রগাঢ় কৌতূহল, তা তো তাঁর বিস্ময়কর কীর্তির কারণেই। সেই সুমহৎ কীর্তিকে পরিপ্রেক্ষিতের অন্তর্গত না ক'রে তাঁর কোনো সিরিয়াস জীবনী লেখা কি সত্যিই সম্ভব? বা সেই প্রচেষ্টার সার্থকতাটা কোথায়? এ কথা বিশেষভাবেই প্রযোজ্য ইংরেজীতে লেখা, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একটি প্রায় পাঁচশো পাতার হার্ডব্যাক বই সম্পর্কে, যার দাম করা হয়েছে পঁচিশ পাউণ্ড। রবীন্দ্রনাথ যে-কাজ রেখে গেছেন তা সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। ইংরেজীভাষী পাঠকদের সামনে একটি নতুন রবীন্দ্রজীবনী পেশ ক'রে কী লাভ, যদি তার দ্বারা পাঠকদের মনে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্পর্কে নতুন ক'রে কৌতূহল, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত করতে না পারা যায়? যদি তার বদলে জাগিয়ে তোলা হয় বিদ্রূপ, তা হলে কি জীবনী লেখার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হলো না?

আলোচ্য বইয়ে বিতর্কিত বিড়ম্বিত আন্তর্জাতিক তারকা রবীন্দ্রনাথ মন্দ ফোটেন নি। বৃটিশ রাজত্বের পটভূমিকা বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারগুলো, যাদের বলা যায় রবীন্দ্রনাথের পাবলিক কেরিয়রের দিক—সেগুলো সরসভাবেই আঁকা হয়েছে। বেশ কিছু মজাদার চুটকি গল্পও পরিবেশিত হয়েছে, যেমন রুমানিয়ার মহিলারা রবীন্দ্রনাথের হাতে চুমো খেয়ে খেয়ে তাঁর হাত কেমন রাঙিয়ে তুলেছিলেন সেই খবর। কিন্তু এই ধরণের ন্যারেশনের অশুভ পরিণামও ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথকে খেলো ক'রে ফেলা হয়েছে। দৈনিক *টাইম্‌স্*-এর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মানবতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, তাঁর আন্তর্জাতিক দিকটাকে একেবারেই গুরুত্ব দেন নি, সেটাকে বলেছেন 'the nonsense side of his career'।

অল্প বাংলা জেনেই রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার চেষ্টা করেছিলেন এডওয়ার্ড টম্পসন—রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই। সেজন্যে ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবিনসন কতটা বাংলা জানেন তা আমরা জানি না। আলোচ্য বইয়ে যুগ্ম কাজটা লেখকদ্বয় যে ঠিক কিভাবে ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছেন, সে-কথাও কোথাও খোলসা ক'রে জানানো হয় নি। তবে বইটি প'ড়ে মনে হয়, লেখকরা রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা রচনাবলীর সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত নন। বাংলা টেক্সটের চাইতে ইংরেজী অনুবাদের উপরেই তাঁরা নির্ভর করেছেন বেশী। যেমন, *জীবনস্মৃতি*-র সাক্ষ্যের উপরে তাঁরা অনেকটাই নির্ভর করেছেন, কিন্তু মনে হয় ইংরেজী অনুবাদের মধ্যস্থতায়। নবগোপাল মিত্রকে বালক কবির কবিতা শোনানোর বৃত্তান্তে রবিনসন আর দত্ত এনেছেন 'দ্বিরেফ' আর 'মৌমাছি'র কথা। তাঁদের বক্তব্য, 'দ্বিরেফ' Sanskritic শব্দ, 'মৌমাছি' তা নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমটা পছন্দ করেছিলেন। রচনাবলী খুলে দেখছি,

মূল *জীবনস্মৃতি*-তে কিন্তু আছে 'দ্বিরেফ' আর 'ভ্রমর'-এর কথা—দুটোই সংস্কৃত শব্দ—'মৌমাছি'র কথা তো দেখছি না। তা ছাড়া 'মৌমাছি' তৎসম না হলেও তদ্ভব শব্দ, এসেছে 'মধুমক্ষিকা' থেকে, তাই তাকে Sanskrit না বলতে পারি, কিন্তু Sanskritic নিশ্চয় বলা যায়। অনুমান করি কৃষ্ণা দত্ত রবিনসনের অনুসন্ধানাদিতে ভাষাসহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন, বাংলা উপাদানগুলো জড়ো ক'রে দিয়েছেন, তর্জমা ক'রে দিয়েছেন ইত্যাদি। তৎসত্ত্বেও কিছু ভাষাগত ভুল রয়ে গেছে। যেমন, ৮৬ পৃষ্ঠায় আমাদের জানানো হয়েছে যে নামের পর 'দেবী' লেজুড়টি কেবল বিবাহিতা মেয়েদের বেলাতেই ব্যবহৃত হয়। আমরা সকলেই জানি, এ কথা মোটেও ঠিক নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালীন, যখন আমি তর্কাতীতভাবে অবিবাহিতা ছিলাম, নিয়মিত 'কেতকী দেবী' সম্বোধন পেতাম। এক জায়গায় 'মন্ত্র' শব্দটার মানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না। আজকাল ঐ শব্দের মানে সব শিক্ষিত ইংরেজীভাষীই জানে, না জানলেও অভিধানে দেখে নিতে পারে। অক্সফোর্ড অভিধানের মতে শব্দটা ১৮০৮ সালে ইংরেজীতে ঢুকেছে। অথচ আরেক জায়গায় সোনার হরিণ শিকার করার তাৎপর্য বোঝানো হয় নি। ওখানে যে একটা শ্লেষ আছে তা লেখকেরা বুঝেছেন কিনা বোঝা গেলো না।

তাঁদের সামনে কোনো পণ্ডিতোপযোগী লক্ষ্য না থাকায়, তাঁদের গবেষণাকর্মের ভিত্তি তথা তাত্ত্বিক কাঠামো শিথিল হওয়ায় লেখকদ্বয় তাঁদের মালমশলা যেভাবে সাজিয়েছেন তা জীবনীরচনার অ্যাকাডেমিক নিকষে অনেকটাই খামখেয়ালী হয়েছে। একটা গল্প-বলা তৈরি হয়েছে ঠিকই, এক অর্থে তা সুখপাঠ্যও হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাজ সম্পর্কে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি সুচিন্তিত হয় নি, এলোপাতাড়ি ভঙ্গিতে করা হয়েছে, এবং প্রায়ই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়েছে। বেশ কিছু কথা তাঁরা বলেছেন একঝোঁকা ডগমাটিক ভঙ্গিতে, রাখেন নি তর্কের অবকাশ। বহু ক্ষেত্রেই তর্কের বিপুল অবকাশ রয়ে গেছে।

তাঁদের নির্মাণকর্মে লেখকেরা বারংবার সাক্ষী মেনেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং সত্যজিৎ রায়কে। এঁদের সাহায্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দিকে এঁরা প্রায় তাকাতেই পারেন না। এইটি এই বইয়ের একটি পদ্ধতিগত দুর্বলতা। সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রকাহিনীভিত্তিক ছায়াছবিকে প্রায় রবীন্দ্রজীবনের উৎসের মতো ব্যবহার করা হয়েছে, যা একেবারেই বৈধ নয়। *চারুলতা* 'নষ্টনীড়' গল্পের ভিত্তিতে তৈরি ছবি, সেই 'নষ্টনীড়'-এর মধ্যে খুব সম্ভব আছে জীবনের ছায়া। রবীন্দ্রজীবনকে বুঝতে 'নষ্টনীড়' সহায়ক হতে পারে, কিন্তু *চারুলতা*-কে সেখানে সাক্ষী মানা যায় না, সেটি সত্যজিতের নির্মাণ। অথচ ছেলেমানুষের মতো ঠিক তা-ই করেছেন লেখকেরা , এবং একবার নয় একাধিকবার। অপ্রয়োজনে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর উত্তেজক উক্তি উদ্ধৃত করা এই বইয়ের

আরেকটি মুদ্রাদোষ। নব্বইয়ের দশকের পশ্চিমের চোখের সামনে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক ক'রে প্রোজেক্ট করা যদি লেখকদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে এর দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি, বরং অনেক উদ্ধৃতিই পাঠকচিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ।

এই বই সম্পর্কে আমার এবং আরও অনেকের সব চেয়ে গুরুতর আপত্তি এই যে এখানে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে, সাধারণভাবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে সঠিক তুলে ধরা হয় নি। কবি এবং গদ্যলেখক দুই ভূমিকাতেই তাঁর পরিচয় যে কী, কত বড়—তার কোনো আন্দাজ এই বই থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। মুশকিলটা হয়েছে এইখানেই। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে বাইরের জগতের কাছে তুলে ধরার এত বড় একটা সুযোগ পেয়ে লেখকেরা কেবল যে সেটার সদ্ব্যবহার করেন নি তা নয়, এ বিষয়ে পাঠকের জিজ্ঞাসাকে তাঁরা নির্মমভাবেই চেপে দিয়েছেন—এই দাবি ক'রে যে অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সাহিত্যিক কাজের রসগ্রহণ আদৌ সম্ভব নয়। পুরোনো অনুবাদগুলো তত ভালো নয় ব'লে নয়। এঁরা বলছেন যে অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের রস পাওয়াই দুরূহ। অবাঙালীরা নাকি বড় জোর রস পেতে পারেন সেরা ছোট গল্পগুলির, কিছু চিঠির, কিছু প্রবন্ধের, স্মৃতিচারণার (অনূদিত *জীবনস্মৃতি*-র সাক্ষ্যকে বাদ দিলে তাঁদের নিজেদের ন্যারেশনই এগোতো না), তার পর হয়তো গোটা পঞ্চাশেক কবিতার, তার পর অতিকষ্টে হয়তো দু'-একটা উপন্যাসের, আর নাটকের রস অনুবাদে একেবারেই লভ্য নয়, এক যদি না কষ্টেসৃষ্টে *ডাকঘর*-এর রস কিছুটা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের রসও নাকি বাইরের লোকের জন্য নয়, কেননা গানগুলো কথা ও সুরের সম্পূর্ণ মিলন: কথা না বুঝলে গানগুলো একঘেয়ে শোনায়, এবং কথাগুলোর অনুবাদ সম্ভব নয়, অতএব ...। সম্পূর্ণ বৃত্তাকার যুক্তি। তবে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার মাধ্যমে নাকি রবীন্দ্রসংগীতের কিছু রস অবাঙালীরা পেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে অনুবাদে উতরোয় না এই কথাটি এই বইয়ে প্রায় গানের ধুয়ার মতো পুনরাবৃত্ত। কেন, তার কোনো বিশদ আলোচনা এঁরা করেন নি। কেবল এই সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন, 'Nirad C. Chaudhuri and Satyajit Ray, brilliantly bilingual in Bengali and English, both thought Tagore's poetry virtually untranslatable'। ভাবখানা এই—যেহেতু এই দুই নামী ব্যক্তি এমন মত প্রকাশ করেছেন, অতএব বিষয়টা নিয়ে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনার বদলে অথরিটিদের নাম ডাকা—এও একধরণের উপদ্রব-সৃষ্টিকারী গুরুবাদ। বিখ্যাত ব্যক্তিরা কখন কী বলেছেন তা কি জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের বুকের উপরে চেপে ব'সে থাকবে? যাচাই করার, প্রয়োজনবোধে চ্যালেঞ্জ করার দরকার নেই? লেখকদের মতে, রবীন্দ্রনাথের ভাষাটা জানা না থাকলে কেবল তাঁর ছবির রসটুকুই পাওয়া যেতে পারে—সেইটিই নাকি অবাঙালীদের পক্ষে রবীন্দ্রচিত্তে পৌঁছনোর শ্রেষ্ঠ

করিডর।

স্থচিন্তিত নয় এই-সব কথা, এবং অনুদানপুষ্ট হার্ডব্যাক বইয়ের ভিতরে ছাপা অক্ষরে এদের প্রচার ক'রে লেখকদ্বয় বহির্জগতে রবীন্দ্রচর্চার যথেষ্ট ক্ষতি করলেন। বইটা যতদিন বাজারে চালু থাকবে ততদিন অবাঙালী মহলে রবীন্দ্রকীর্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। ১৯৮৫ সালে র‍্যাডিচি তাঁর রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদ বার করার পর থেকে গত দশ বছরে রবীন্দ্র-অনুবাদের একটা নবতরঙ্গ দেখা দিয়েছে এমন কথা বললে মিথ্যে বলা হয় না। ১৯৯১ সালে ব্লাডঅ্যাক্স বুক্স্-প্রকাশিত আমার করা রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদ বা ১৯৯৩ সালে হাইনেমান-প্রকাশিত কায়সার হকের করা *চতুরঙ্গ*-এর অনুবাদকে এই নবতরঙ্গের অন্তর্গত বলা চলে। ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষাতেও মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু নতুন অনুবাদ বার হয়েছে। তথ্য এই যে বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এই-সব উদ্যোগকে স্বাগত করেছেনও বটে। কিন্তু দত্ত আর রবিনসন বিগত দশকের অনুবাদের এই নবতরঙ্গের কোনো মূল্যায়ন করার চেষ্টা তো করেনই নি, বরং সে-সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা থেকেও নিবৃত্ত থেকেছেন। র‍্যাডিচির নামটা একবার আলগোছে উল্লেখ করা ছাড়া এ নিয়ে এঁরা কোনো আলোচনাই করেন নি। নতুন অনুবাদগুলো এঁদের ভালো না লেগে থাকলে সেগুলো কেন ভালো হয় নি তা নিয়েও আলোচনা থাকতে পারতো, কিন্তু তা-ও নেই। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ বার করার ব্যাপারে বিলেতের প্রকাশকদের একটা নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছিলো। সেই উৎসাহ ঝিমিয়ে যাবে এইরকম একটা ভয় জাগছে আমাদের কারও কারও মনে। রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যিই এতটা untranslatable হন, যেমন এঁরা দাবি করছেন, তা হলে বাইরের প্রকাশকরা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন কেন? যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক কাজকে বাংলার বাইরে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তাঁরা এজন্যেই দুঃখিত বোধ করছেন। সাধারণভাবে ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যাপারেই একটা ক্ষতি হয়ে গেলো কিনা সে-কথা ভাবছেন কেউ কেউ।

একটু খুঁটিয়ে তাকালে বোঝা যায়, দত্ত আর রবিনসন নিজেরা সাহিত্যের যে-যে শাখায় তর্জমা করেছেন কেবল সেগুলিকেই অনুবাদযোগ্য ব'লে দাবি করেছেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছবিকে আশ্রয় ক'রে রবিনসনের একটি বই আছে; তাই কি রবীন্দ্রনাথের ছবিকে রবীন্দ্রচিত্তে পৌঁছনোর শ্রেষ্ঠ পথ বলা হয়েছে? অথচ ১৯৮৬ সালে রবিনসন যখন বিলেতে রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, তখন বেশ কিছু অশিক্ষিত সমালোচনা কাগজে বেরিয়েছিলো, যাদের নমুনা তাঁর *দ্য আর্ট অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর* বইটিতেই সংকলিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের কৃতি এই লেখকদের ফোকস্ না হলেও জীবনী-রচনার সূত্রে এঁরা কিছু কিছু রবীন্দ্রকবিতার টুকরো পরিবেশন করেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলি বিশেষভাবে

সমস্যাবিজড়িত। লেখকদের ভূমিকা অনুযায়ী প্রায় সমস্ত টুকরো নাকি তাঁদের নিজেদের তর্জমা। কার্যতঃ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের অনুবাদই উদ্ধৃত হয়েছে। অনুবাদকদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তা ছাড়া টম্পসন, কৃপালনী, বোল্টন, স্টিফেন হে, সত্যজিৎ রায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, নরেশ গুহ, রামানুজন, র‍্যাডিচি ; এমন কি আমিও আছি। এক জায়গায় আমার করা অনুবাদ থেকে আট লাইন উদ্ধৃত হয়েছে—যদিও কিছু ছাপার ভুল আছে—এবং নোটে উৎস স্বীকৃতও হয়েছে ; কিন্তু আরেক জায়গায় আমার দেওয়া ইংরেজী শিরোনাম-সহ আমার করা অনুবাদে চারটি লাইন উদ্ধৃত হয়েছে—কোনো স্বীকৃতি ছাড়াই, যেন ওটা ওঁদেরই অনুবাদ। তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলি উদ্ধৃতিতে এঁরা র‍্যাডিচির আর আমার করা অনুবাদগুলিকে সামনে রেখে, মডেল হিসাবে তাদের ব্যবহার ক'রে, এখানে ওখানে শব্দ পাল্টে নতুন অনুবাদ ব'লে পরিবেশন করেছেন। আমাদের দুজনের বই থেকে বেশ কিছু উপাদান এই বিশেষ পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়েছে—কখনও টুকরো, কখনও বা পুরো কবিতাই তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অদলবদলগুলো করার ফলে ইংরেজী রূপগুলোর জোর ক'মে গেছে, কবিতার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। এই উপায়ে কবি রবীন্দ্রনাথকে একেবারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার চাইতে পুরো স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের তর্জমাগুলো তুলে দিলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করা হতো বোধ হয়। র‍্যাডিচির ও আমার তৈরি-করা সংকলন-দুটির কবিতাচয়ন, অনুবাদকর্ম তথা ভূমিকা-টীকা যে এই লেখকদের দ্বারা মানচিত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে যে জীবনী রচনার কিছু কিছু সংকেত তথা উদ্ধৃতিযোগ্য টুকরোর সন্ধান পাওয়া গেছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্যে আমাদের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

আরও একটা রহস্যজনক ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। কাদম্বরী দেবী কী ধরণের ডিপ্রেশন থেকে আত্মহত্যা ক'রে থাকতে পারেন তার একটা আনুমানিক মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ আমার *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* বইটাতে আছে। আমার রবীন্দ্র-অনুবাদের ভূমিকায় সেদিকে ক্রসরেফারেন্স দিয়েছিলাম। দত্ত-রবিনসন সেখান থেকে কিছু মূল্যবান সূত্র তুলে নিয়েছেন, কোনো ঋণস্বীকার না ক'রে।

লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে কারণে অকারণে ধমকে দিয়েছেন অনেকবার—কখনও পশ্চিমকে বড় বেশী গৌরবান্বিত ক'রে দেখিয়েছেন ব'লে, কখনও বেশী স্পর্শকাতরতা দেখানোর জন্যে, স্তালিনের নৃশংস ক্রিয়াকলাপ ঠিক বোঝেন নি সেই অপরাধেও। শান্তিনিকেতন সম্পর্কে কিছু কড়া কথা আছে, যা সেখানে স্বাগত হবে না ব'লেই মনে হয়। স্বাগত হওয়া বা না হওয়া অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ; আমাদের কনসার্ন হচ্ছে চিত্রের সত্যতা নিয়ে। শান্তিনিকেতনের কৃতির প্রতি সুবিচার করা হয় নি ব'লেই বিশ্বাস আমার। তা ছাড়া রাধাকৃষ্ণনকে বলা হয়েছে 'হাম্বাগ' ; অমিয় চক্রবর্তীকে বলা হয়েছে

'a mediocre, pretentious and devious man', তাঁর কবিতাও নাকি ফালতু জিনিস, এবং ম্যাকমিলানের বহুসমালোচিত রবীন্দ্রসংকলনটির জন্যও নাকি দায়ী তিনিই। এই মন্তব্যগুলিকে সুবিবেচিত মনে হয় না। সব চেয়ে দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি ব'লে এই দুই লেখক রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনকেও ঠিক ক'রে দেখাতে পারেন নি। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে কবির শোকের গভীরতাকে এঁরা ধরতে পারেন নি, তাকে খাটো করেছেন। এঁরা বোঝেন নি, কেবল *স্মরণ*-এ নয়, *শিশু* বা *খেয়া*-র মধ্যেও তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে কবিতাতেই বিপত্নীক সাথীহারা কবির শূন্য গৃহের যে-বেদনাটি ফুটে ওঠে তা এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এমন কি, এঁদের ভাষা থেকে পাঠকের ধারণা হবে যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর গয়নাগুলো মৃণালিনী দেবী স্বেচ্ছায় দেন নি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বেচে দিয়েছিলেন।

চিন্তার শক্ত কাঠামো না থাকার ফলে বইটির মধ্যে নানা অবস্থানগত অন্তর্বিরোধ, পরিপ্রেক্ষিতের অভাব, অতিশয়োক্তি এবং অর্ধসত্য জমেছে, যাদের সম্পর্কে লেখকরা অনবহিত, এবং এই কারণে বইটি বাংলার বাইরে বিপজ্জনক। একটি দরকারী জায়গায় বাংলার আগে 'পশ্চিম' বিশেষণটি বসাতে তাঁরা ভুলে গেছেন। *গোরা* সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যে পুরো আধুনিক ভারতেরই পিঠ চাপড়ে দেওয়া হয়েছে: *গোরা* নাকি মূলতঃ সেই ভারতীয় সমস্যাটি সম্বন্ধে—'আধুনিক ভারত কি পশ্চিমের অভিঘাতের নীচে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের নকল ছাড়া আর কিছু হতে পারবে'—এবং এই তর্ক নাকি ১৮৭৩ বা ১৯২৪-এ যত প্রবল ছিলো এখনও তেমনি।

বিশেষ হাস্যকর মন্তব্য হিসাবে আমার নির্বাচন এইটি—'রবীন্দ্রনাথের গানকে ইংরেজী সাহিত্যে অনুবাদ করা যায় না। ব্যস্, এর পর আর কিছু বলার নেই।' তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন, এক অর্থে তাঁর গানের অঞ্জলিকে ইংরেজী সাহিত্যে রূপান্তরিত ক'রেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন, এবং এই জীবনীর অন্যত্র ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র প্রশংসাও করা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই গভীর দুঃখ এই, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার এমন চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে দত্ত ও রবিনসন তার সদ্ব্যবহার করলেন না, বরং একটা অবিবেচক দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হয়ে এই বিরাট মানুষটিকে বিলেতের বিদ্রূপপরায়ণ গণমাধ্যমজগতের কাছে উপহাসের পাত্র ক'রে তুললেন।

[ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত (১৯৯৫)।]

কোন্ অনুবাদটি যাওয়া উচিত ? আমার বক্তব্য

শেক্সপীয়রের জন্মস্থানের উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানো হবে, তার নীচে একদিকে শেক্সপীয়রের উদ্দেশে লেখা তাঁর মূল কবিতাটি, অন্যদিকে তার একটি ইংরেজী অনুবাদ খোদাই করা হবে। কোন্ অনুবাদটি যাওয়া উচিত ?

শেক্সপীয়র সেন্টারের দিক থেকে দেখলে, বাগানে রবীন্দ্রমূর্তি বসলেই তাঁদের আর্থিক লাভ, কেননা ট্যুরিস্ট আকর্ষণ বাড়বে। তাঁদের পক্ষে কবিতাটির যে-কোনো একটা তর্জমা খোদাই হলেই যথেষ্ট, পাথরের গায়ে রবীন্দ্রনাথের নামটা কোনোমতে লটকে থাকলেই কেল্লা ফতে। ভারতের কবি বিলেতের কবিকে সেলাম জানিয়েছেন, সেই সেলাম ঠোকা দেখতে লোক ভেঙে পড়বে। অনুবাদের গুণাগুণে যায়-আসে তাঁদেরই, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভালোবাসেন, বাংলার বাইরে তাঁর কাজকে চেনাতে চান। অনুবাদটা ভালো না হলে ক্ষতি শেক্সপীয়রের নয়, ক্ষতি রবীন্দ্রনাথের, এবং সেই সুবাদে আমাদের। শেক্সপীয়র তো সুলতানই থাকবেন, রবীন্দ্রনাথ যাবেন গোলাম হয়ে। দুজনের সমকক্ষতা ফুটে উঠবে না।

একটা তর্জমা সাহিত্যিক বিচারে নিম্নমানের হলেও রবীন্দ্রকৃত ব'লেই তা গ্রহণীয়, এই যুক্তি যে আসলে রবীন্দ্রনাথকে সেবকের ভূমিকাতেই আটকে রাখতে চায়, সেই সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে কিছুতেই তাঁকে মুক্তি দিতে চায় না, তা কি আমরা বুঝবো না ? আশ্চর্য ! এই বছরই রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে 'মিস্টিক অর মিস্টেইক' জাতের হেডলাইন বেরোলো, খুশবন্ত সিঙের মন্তব্যগুলি সারা পৃথিবীর প্রেসে ছড়িয়ে প'ড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলো, তবু কি আমাদের চোখ খুলবে না ?

প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে নিযুত দর্শনার্থী স্ট্র্যাটফোর্ডে আসেন। ৯৯.৯% দর্শক হুমড়ি খেয়ে মূল কবিতাটি নয়, তর্জমাটিই পড়বেন। অধিকাংশ দর্শক তখনই জীবনে প্রথম একটি রবীন্দ্রকবিতার মুখোমুখি হবেন। পশ্চিমবঙ্গের করদাতাদের খরচে ওখানে রবীন্দ্রমূর্তি যখন বসছেই, এবং নিম্নমানের অনুবাদের বদলে একটা ভালো অনুবাদ খোদাই করতে খরচ যখন বেশী পড়বে না, তখন তাঁর কবিখ্যাতিকেও একটু উজ্জ্বলতর করা যাক না, তাঁর জন্যেও একটু লাভ ছিনিয়ে নেওয়া যাক না। তাঁকে কবি হিসেবে তুলে ধরার এ কি এক সুবর্ণসুযোগ নয় ? নিযুতজনের মধ্যে একশোজনকে তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারলেও তো লাভ।

আমাদের দিক থেকে দেখলে কোন্ অনুবাদ যাওয়া উচিত এই প্রশ্নের

একটিই জবাব সঙ্গত: একটি উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদ, যেটি বিদেশীদের কাছে মূল কবিতাটিকে পৌঁছে দেবে, চিনিয়ে দেবে ; তার রস, মেজাজ, বক্তব্য, ঝোঁকপ্রদান, গঠন ও উপমারূপকের কিছু পরিচয় দেবে ; একবিংশ শতাব্দীতে বৃহৎ জগতে আমাদের মহাকবির তথা আমাদের আদৃত মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করবে।

শেক্সপীয়রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি তো তাঁর একলার নয়, তিনি বলছেন সমগ্র ভারতীয় রেনেসাঁসের হয়ে। মূল কবিতাটি ষোলো লাইনের হলেও শেক্সপীয়রের সনেটের আদলে গঠিত, এবং তার মধ্যে শেক্সপীয়রীয় অনুরণন আছে। তার গঠনভাস্কর্য, শব্দকারুকার্য, ইঙ্গিতময়তা অনুবাদে একটু ধরিয়ে দিতে হবে। এমন একটি মনোজ্ঞ অনুবাদ চাই যেটি দর্শকরা দাঁড়িয়ে প'ড়ে আনন্দ পাবেন, কবিতা ব'লে চিনতে পারবেন, যেটি কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসাকে উস্কে দেবে। অর্থাৎ সেটিকে ইংরেজীতেও 'রসাত্মক বাক্য' হতে হবে। তবে তা হতে গিয়ে অনুবাদ যেন অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরকে প্রশ্রয় না দেয়, অতিরঞ্জন দিয়ে ছলনা না করে। মূল বাচনভঙ্গির টোন্‌টা ঠিকঠাক ধরতে পারা চাই। আমার মতে, এ ছাড়া বিচারের আর কোনো নিক্তি থাকতে পারে না।

কবিতাটির রবীন্দ্রকৃত ইংরেজী রূপ এই শর্ত পূরণ করে না, মূলের সৌন্দর্যের আন্দাজ দেয় না। এটি আসলে পূর্ণ অর্থে অনুবাদ নয়, একটি গদ্য সারাংশ, দায়সারাভাবে করা। সম্পাদক-প্রকাশকদের তাগাদায় নিজের কবিতার এই জাতের গদ্য সারানুবাদ তিনি ক'রে পাঠাতেন, এবং এগুলি দ্বারা পশ্চিমে তাঁর কবিখ্যাতি যে বিপন্ন হয়েছে তা পণ্ডিতমহলে সুবিদিত তথ্য, নতুন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না। এগুলি এখন তাঁর খ্যাতির অন্তরায়। এমন একটি গদ্যগন্ধী সারাংশকে স্ট্র্যাটফোর্ডের মতো সাংস্কৃতিক তীর্থস্থানে পাথরে উৎকীর্ণ করার অর্থ হলো তাঁর কবিমূর্তিকে প্রহার করা। এটি একবার খোদাই হয়ে গেলে সারা একুশ শতক ধ'রে তাঁর অসম্মান ঘটাবে, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারবে না।

কেউ কেউ বলছেন, এটির নাকি একটি 'ঐতিহাসিক মূল্য' আছে। এই দাবি হচ্ছে একটি 'অশ্বত্থামা হতঃ, ইতি গজঃ'। যে-কোনো নামী লেখকের টুকরো লিপির একটা ন্যূনতম দলিলগত মূল্য থাকে, এটিরও আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মূল কবিতাটিই আসল টেক্স্‌ট্। ইংরেজী গদ্যরূপটির কোনো স্বতন্ত্র টেক্স্‌ট্‌গত মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই। এটির একটা 'কিউরিওসিটি ভ্যাল্যু' আছে—স্কলারদের জন্যে। তাঁরা দেখলে বুঝবেন, জিনিসটা কেন দাঁড়ায় নি। শুধু এজন্যে নয় যে ভাষাটা পুরোনো হয়ে গেছে। মূল কবিতাটির ভাষাও আজকের বাংলার বিচারে পুরোনো, কিন্তু একদিন কবিতা হয়েছিলো ব'লেই তা ঐ ভাষার নিরিখে চিরকাল কবিতা। আর ঐ ইংরেজী রূপটা তখন কবিতা হয়ে ওঠে নি ব'লেই আজও উত্তীর্ণ হতে পারছে না। যা আর্কাইভ্‌সের জিনিস তা

আর্কাইভ্‌সেই থাক। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে আছে, সেখানেই থাক না, সন্ধানীদের চোখের জন্য। পাবলিকের জন্য পাথরের উপর তাকে খোদাই করলে যিনি মহাকবি তিনি প্রতিভাত হবেন একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবি হিসেবে।

ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে তা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলো ব'লে। ওখানে রবীন্দ্রনাথ একটা সৃষ্টিশীল পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তি যে বাইরে তাঁর কবিখ্যাতিকে রক্ষা করতে পারে নি তা এখন আর তর্কের বিষয় নয়, তর্কাতীত। তাঁর মূল কবিতাবলীর শক্তিময় ধ্বনিঋদ্ধ কারুকার্যকে ইংরেজী কাব্যভাষায় পুনর্জন্ম দেবার মতো মেজাজ বা সময় যে তাঁর ছিলো না, এ কথা স্বীকার করলে তাঁকে কোনোভাবেই খাটো করা হয় না। ও কাজ যে ঠিক পেরে উঠবেন না সে-কথা মনে মনে জেনেই কাব্যানুবাদের চেষ্টা করেন নি তিনি, গদ্যে একটা সারমর্মকে কোনোমতে ধরিয়ে দিয়েছেন কেবল। আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করবার পর তাঁর উপরে এসে পড়ে প্রবল বাণিজ্যিক ও প্রচারগত চাপ। বিশ্বের কাছে পরিচিত হবার জন্য তাঁকে নামতে হয় আত্ম-অনুবাদের কাজে। কোনো প্রকৃত কবির পক্ষে এ এক দুঃসহ ভার। কেউ ভালো কবি হলেই নিজের কবিতার সেরা অনুবাদকও হবেন, এ কথা কে বলেছে? শেক্সপীয়রকে যদি বিশ্বের কাছে পরিচিত হবার জন্যে ফরাসীতে বা ল্যাটিনে আত্ম-অনুবাদ করতে হতো, তবে তিনি কি উত্তীর্ণ হতেন? সন্দেহ করি। শেক্সপীয়র 'বিশ্বকবি' হতে পেরেছেন তাঁর মাতৃভাষাটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৌলতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে ব'লেই, দেশে দেশে শিক্ষিত লোক তাঁকে মূল টেক্সটে পড়তে সক্ষম ব'লেই। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তা হবার নয়, তাই আরও বেশী ক'রেই তাঁর কবিস্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এ দায়িত্ব আমাদেরই।

একটা তুলনা দিই। রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতাটি যেন নাট্যলিপি। তাঁর নিজের করা ইংরেজী রূপটা হচ্ছে অ্যামেচর অভিনয়ের সগোত্র। সেটা পারিবারিক ভিডিওতে চলতে পারে। কিন্তু একটা মনুমেন্ট হচ্ছে পাবলিক মঞ্চের মতো। এখানে চাই দক্ষ অভিনয়, নয়তো নাট্যকারের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।

শেষ বিচারে একজন কবির কাজকে বিদেশীদের কাছে যাঁরা পৌঁছে দেন তাঁরা মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত নন। পৌঁছে দেন অন্য শিল্পীরা, যাঁরা নিজেরা কবি এবং দুটো ভাষা ভালো ক'রে জানেন। কবিতার ভাষান্তর একটি আর্ট। এই শিল্পকলাকে মর্যাদা না দিলে কুযুক্তির শিকার হতে হবে। রাজনীতি নয়, আর্টের উপরে ফোকস্‌ করুন, তা হলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসবে। অনুবাদটা কার, সেটাই বড় কথা নয়, কবি রবীন্দ্রনাথের সম্মানরক্ষাই শেষ কথা। আমার অনুবাদটা প্রথমে নির্বাচিত হয়েছিলো এবং অনেকেরই অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে, কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে অন্য কারও অনুবাদ তার চাইতেও ভালো, তা হলে বেশ তো, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ বোঝেন, শেক্সপীয়র বোঝেন, ইংরেজী

কবিতার বাচনভঙ্গি বোঝেন, কাব্যানুবাদের আর্ট বোঝেন, এমন বোদ্ধা লোকেদের প্যানেল বসিয়ে পেশাদার আলোচনার মাধ্যমে একটা পেশাদার সিদ্ধান্তে পৌঁছনোই কাম্য।

[*আনন্দবাজার পত্রিকা*-র আহ্বানে লিখিত এবং সেখানে সম্পাদকীয় স্তম্ভের পাশে প্রকাশিত (১৯৯৫)।]

ইংরেজীতে রবীন্দ্রকাব্য : সাম্প্রতিক বিতর্ক

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে সম্প্রতি যে-সব কথা উঠেছে, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রিকায়[১] কিছু আলোচনা করতে আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এই আহ্বান আমার কাছে স্বাগত। এ ব্যাপারে সত্যিই এমন কিছু ইশ্যু জড়ো হয়েছে যেগুলিকে নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা হলে ভালো হয়। আমার যা-কিছু বক্তব্য সবই রবীন্দ্রকবিতার একজন অনুবাদক হিসেবে সাম্প্রতিক কালে আমার যে-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জমেছে তার ভিত্তিতে। আমার আলোচনাকে গোছাবো বিভিন্ন ঘটনাবলীর সূত্রে চারটি ভাগে। সাম্প্রতিকতম ঘটনাগুলি থেকে ক্রমশঃ পিছু হটবো নিকট অতীতের দিকে। প্রথমতঃ বিবেচনা করা যাক 'স্ট্র্যাটফোর্ড অ্যাফেয়ার'টি থেকে কী শিখলাম।

॥ ১ ॥

গত বছর দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র অনুরোধে এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে পেশ করেছিলাম।[২] প্রতি বছর এক নিযুত দর্শনার্থী পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে তীর্থ করতে আসেন। সেখানেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচে স্থাপিত হবে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি, তার নীচে খোদাই হবে ইংরেজ কবির উদ্দেশে তাঁর মূল কবিতাটি ও তার একটি ইংরেজী অনুবাদ। কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, এমন এক জায়গায় কবিতাটির একটি আধুনিক কাব্যানুবাদ উৎকীর্ণ হলে তা বিদেশে রবীন্দ্রকবিতার প্রচারকে এক ধাক্কা মেরে এগিয়ে দিতো। কিন্তু তা হতে গিয়েও হলো না। নৌকোটা আটকে গেলো রাজনীতির জলজ দামে। সভয়ে দেখলাম, বিদেশে কবি রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে হলে যে-পরিণামদর্শিতার প্রয়োজন, কর্তাদের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা দুরাশা। কিছু উল্টোপাল্টা কাজ ক'রে ফেলার পর নিজেদের মুখরক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত সেই তাঁরা এখানকার সুধীজনের মূল্যবান মত এবং অভিবাসী চিন্তাশীল বাঙালীদের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে কবির নিজের-করা পুরোনো গদ্য সারাংশটির দিকেই ঝুঁকলেন, যেটি আলোচ্য কবিতাটির সম্যক পরিচয় বহন করে না। কবির নামটা নিয়ে রাজনীতির এই-যে খেলা দেখা গেলো, কবির কবিখ্যাতি যেখানে গৌণ, তা অবশ্যই নতুন নয়। বিপদটা আরম্ভ হয়েছে যেদিন তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে আন্তর্জাতিক তারকা হয়েছেন সেদিন থেকেই। সেদিন তিনি হয়ে

গেছিলেন একটা গোটা সাম্রাজ্যের সম্পত্তি। কেবল যে বাঙালীরা তাঁকে নতুনভাবে দাবি করতে আরম্ভ করেছিলেন তা-ই নয়, তাঁকে নিয়ে ইংরেজদেরও তৈরি হয়েছিলো এক স্বার্থের বৃত্ত। তাঁর রচনার অনুবাদ হয়েছিলো এর ভুক্তভোগী। তাঁর কাটতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছিলো বিলেতী প্রকাশকের স্বার্থ। অনুবাদের মান যেমন হোক না কেন, কবির পৃথিবীজোড়া নামের ফলে বইয়ের কাটতি হলেই তাঁরা খুশী। মানরক্ষা না ক'রে অনুবাদ বেরিয়েছিলোও প্রচুর। নতুন অনুবাদের কাজকে উৎসাহ দেওয়া হয় নি। ১৯৯১ পর্যন্ত বিলেতের সেই প্রকাশক দাবি করেছেন যে কবি নাকি ইংরেজীতে তাঁদের একচেটিয়া প্রকাশাধিকার দিয়ে গেছেন। ইংরেজী অনুবাদগুলির পুনরনুবাদও ছিলো তাঁদের পক্ষে ফী-র দিক দিয়ে লাভজনক। সেই-সব বিক্রির সঙ্গে বিশ্বভারতীর স্বার্থও জড়িয়ে গেছিলো কিছুটা, কেননা এতে ক'রে রয়াল্‌টি আসে। এই চিন্তাবর্জিত বাণিজ্যায়ন থেকে লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নটা চাপা প'ড়ে গেছিলো। টম্পসন চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়াকে যথাসময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। মনস্তত্ত্ববিদ য়ুং-এর ভাষা অবলম্বন ক'রে বলা চলে, এই বিপদ কবির খ্যাতির ছায়ারই দিকটা, যে-সম্পর্কে কবি নিজেও শেষের দিকে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

নকশাল আমলের রবীন্দ্রবিরোধিতার পর্ব পেরিয়ে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ পরিণত হয়েছেন একটি রীতিমতো পবিত্র মূর্তিতে, একটি জাতীয় প্রতীকে। তাঁর নাম পেয়েছে একটি নতুন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মাত্রা, যা সাম্রাজ্যবাদী আমলের পুরোনো মাত্রাটার নব অবতার। তাঁর নামটা এখন আরও গভীরভাবে রাজনীতির শিকার—যে-অবস্থা তন্মনস্ক রবীন্দ্রচর্চার পরিপন্থী, তাঁর উত্তরাধিকারকে ব্যাপকতম রসিকসমাজের কাছে পৌঁছে দেবার পথে যা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। স্ট্র্যাটফোর্ডের ঘটনাগুলিতে প্রধানতঃ এটাই দেখা গেলো।

আরও একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝলাম। কেবল কর্তা-ব্যক্তিরা নন, বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রানুবাদের বিষয়টাকে ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যিক অনুবাদের ক্ষেত্রভুক্ত হিসেবে দেখে ভাবনাচিন্তা করতে অভ্যস্ত নন। এইটে সমস্ত তর্কের মধ্যে একটা বিষম যানজট সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হোন না কেন, তাঁর রচনাকে বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে যে আধুনিক অনুবাদকদের মদত লাগবে, তাঁদের কাজকেও যে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে হবে, তাঁদেরও যে একটা মর্যাদা দিতে হবে, এই ব্যাপারগুলি অনেকেই আজও হৃদয়ঙ্গম করেন নি। কাব্যানুবাদের শর্তসমূহ সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা নেই, তাঁরা কেবল হুজুগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের নামের দড়িটা ধ'রে ঝুলে পড়েন। কাব্যানুবাদকের ভূমিকাকে বাঙালীরা যদি আরও সম্মান দিতে না শেখেন, তা হলে রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের পথ বাধামুক্ত হবে না।

রবীন্দ্রকবিতার দায়িত্বশীল অনুবাদক হিসেবে এটুকু বলতে চাই, আমাদের কাছ থেকে উঁচু মানের কাজ পেতে হলে আমাদেরও কিছু সম্মান-সৌজন্য দিতে হবে, নয়তো আমাদের পোষাবে কেন? আমরা নিজেরা শিল্পী এবং আমাদেরও শিল্পীর অহংকার আছে। আমরা নিজেরা কবি ব'লেই তো রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদের কাজে হাত দিতে সাহস পেয়েছি। কেমন ধরণের অনুবাদ বিদেশে কবির সম্মানরক্ষা করবে, বিশ্বের কবিতাপিপাসুদের মনে তাঁর বিষয়ে কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলবে, সেই আলোচনায় আমাদের বক্তব্যকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হলো না। তার বদলে স্ট্র্যাটফোর্ডসংক্রান্ত ঘটনাবলীর সূত্রে পেয়েছি অসম্মানের পেয়ালা। এটা গভীর দুঃখের বিষয়।

॥ ২ ॥

গত বছর 'স্ট্র্যাটফোর্ড অ্যাফেয়ার'-এর কিছু আগে ঘ'টে গেলো 'রবিনসন অ্যাফেয়ার'। বিবেচনা করা যাক এইটি থেকে আলোচ্য বিষয়ে কী শেখা গেলো। রবিনসনরা তাঁদের রবীন্দ্রজীবনীতে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি, জানিয়েছেন যে তাঁদের ফোকসের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে 'মানুষটা, তাঁর কাজ নয়', এবং কোনো আলোচনার মধ্যে না গিয়ে কেবল দুজন নামী ব্যক্তির মত উদ্ধার ক'রে জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'অনুবাদ করা যায় না'। বিগত দশকে ইয়োরোপে রবীন্দ্র-অনুবাদের যে-নবতরঙ্গটি দেখা দিয়েছে তার কোনো মূল্যায়ন করার চেষ্টা তাঁরা করেন নি, এমন কি সে-সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা থেকেও নিবৃত্ত থেকেছেন। উইলিয়ম র‍্যাডিচির নামটা আলগোছে একবার উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু আমার নামটা বইয়ের মূল টেক্সটের মধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে রবীন্দ্র-অনুবাদক হিসেবে আমার নামটা সেখানে অদৃশ্য থাকে। অথচ যা বিস্ময়কর—রবিনসনরা তাঁদের বইয়ে রবীন্দ্রকবিতার যে-টুকরোগুলি নিজেদের অনুবাদ ব'লে দাবি ক'রে পরিবেশন করেছেন, তাদের অনেকগুলির মধ্যেই র‍্যাডিচির এবং আমার অনুবাদের ভাষার প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। জিনিসটা এতই দৃষ্টিকটু যে আমরা দুজনে আমাদের অনুবাদকস্বার্থের খাতিরে এ নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম। রবিনসনরা অবশ্য আমার অনুবাদ থেকে হুবহু তুলে দেওয়া একটি টুকরো ব্যতীত আর কোথাও কোনো ত্রুটি স্বীকার করেন নি। এটিকে তাঁরা বলেছেন অনবধানতাজনিত। এ ধরণের ভ্রান্তিকে মনস্তত্ত্বে বোধ করি বলা হয় 'ফ্রয়েডীয় ভুল'। আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করা দূরে থাক, রবিনসনরা দাবি করেছেন যে তাঁদের দুজনের করা অনুবাদের টুকরোগুলিই এ-যাবৎ করা রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এখানেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি এক শোচনীয় রাজনীতিকে।

যা আরোই বিস্ময়কর, র‍্যাডিচির আর আমার প্রতিবাদসূত্রে আমরা এবং

আমাদের দুই প্রকাশক, রবিনসনরা এবং তাঁদের প্রকাশক, এই ছয় পক্ষের মধ্যে যে-চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছে, সেখানে এই রবীন্দ্রজীবনীকারদ্বয় অনুবাদক হিসেবে আমাকে হেয় করার একটা বিচিত্র চেষ্টা করেছেন। তাঁদের বিচারে আমার অনুবাদগুলো নাকি খুব বাজে হয়েছে, এ কাজ করার যোগ্যতাই আমার আদৌ নেই, কেননা ইংরেজী আমার মাতৃভাষা নয়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের যে-অসুবিধা ছিলো, আমারও নাকি ঠিক সেই অসুবিধাই বর্তমান। আমার বিস্মিত প্রকাশক আমার দীর্ঘকাল বিলেতবাস, ইংরেজী সাহিত্যে আমার অক্সফোর্ডীয় শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজীতে লেখা আমার বিভিন্ন প্রকাশিত বই ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে যে-সুদীর্ঘ এবং সুতীব্র প্রতিবাদ পেশ করেছিলেন, তার কোনো সদুত্তর বলা বাহুল্য পাওয়া যায় নি। সত্যি বলতে কি, গত বছর প্রথমে এই 'রবিনসন অ্যাফেয়ার', তার অব্যবহিত পরেই 'স্ট্র্যাটফোর্ড অ্যাফেয়ার'—এই দুই ঘটনাপুঞ্জের পর বেশ কয়েকবারই আমার রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র থেকে স'রে আসতে ইচ্ছে করেছে, কেননা এই ক্ষেত্রটিতে নিশ্চিন্ত মনে মাথা উঁচু ক'রে কাজ করবার জো নেই, পলিটিক্সটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

আমার ব্যক্তিগত বেদনাবোধকে পাশে সরিয়ে রেখে এই মাতৃভাষা বনাম দ্বিতীয় ভাষার তর্কটার দিকে একটু তাকানো যাক। ইংরেজী যাঁর 'মাতৃভাষা' নয়, তাঁর পক্ষে কি কখনোই সম্ভব নয় মাতৃভাষা থেকে ইংরেজীতে কবিতা অনুবাদ করা? অন্য ভাষা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করাকে বলা যাক 'translating in', আর মাতৃভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করাকে বলা যাক 'translating out'। অধিকাংশ অনুবাদকই নিশ্চয় প্রথম কাজটাতেই স্বচ্ছন্দতর বোধ করবেন, কিন্তু প্রচুর দ্বিভাষী ত্রিভাষী ব্যক্তি দ্বিতীয় ধরণের অনুবাদেও অবিসংবাদিত বৈদগ্ধ্য দেখিয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় এ. কে. রামানুজনের কথা। কন্টিনেন্টাল ইয়োরোপের বেশ কিছু কবি আপন আপন ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে থাকেন। জীবনের চক্রান্তে অল্প কিছু লোক হয়তো 'ইন' আর 'আউট' দুটো দিকেই অনুবাদ করার দক্ষতা অর্জন করেছেন, আজ এ কথা মেনে নিলে ক্ষতি কী? যাঁরা আমার শ্রদ্ধাভাজন তেমন বিদগ্ধ ব্যক্তিরা যদি মনে করেন আমার মধ্যে এ দক্ষতা অর্সেছে, তা হলে এ ধরণের কাজের আহ্বান এলে আমার কি তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত? রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদ করার জন্য বিশ্বভারতী যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, তখন কি আমার 'না' বলাই সঙ্গত ছিলো? প্রসঙ্গতঃ, প্রশ্ন করা যেতেই পারে: আমি বাঙালী ব'লে আমার অনুবাদগুলি যদি এত বাজে হয়ে থাকে, তা হলে বইটা কিভাবে ব্লাডঅ্যাক্স বুক্‌স্ দ্বারা প্রকাশিত হলো,—যাঁরা বর্তমানে বিলেতের সর্বাগ্রগণ্য কবিতাপ্রকাশক,—কিভাবেই বা বইটা পোয়েট্রি বুক সোসাইটির সম্মানিত অনুমোদন অথবা অধ্যাপক জন বেইলির মতো বিদগ্ধ সমালোচকের সাধুবাদ লাভ করলো, কেনই

বা প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় প্রকাশকমহাশয় বইটা আবার ছাপলেন?

তর্কটার আরেকটু গভীরে নামা যাক। তাঁর প্রবন্ধ 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ'-এ বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'সাধারণভাবে ও বৈশ্বিকভাবেই এ-কথা সত্য যে শুধু মাতৃভাষাতেই কবিরা কবি হ'তে পারেন, এবং অনুবাদকেরা সার্থকভাবে অনুবাদক। ...সৃষ্টিশীলভাবে একাধিক ভাষা ব্যবহার করতে পারেন এমন লেখক মহৎ প্রতিভার চেয়েও বিরল' (*কবি রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৬, পৃঃ ৯৮)। তিনি যখন এ কথা লিখেছিলেন, সেই সময়কার তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এটা হয়তো মোটের উপর ন্যায্য ভাবনা ছিলো, কিন্তু তার পর সাঁকোর নীচে অনেক জল বয়ে গেছে। সমাজে কোনো নিশ্চয়তাই তো চিরনিশ্চয়তা নয়। জীবনযাত্রা বদলায়, বাস্তবতা বদলায়। কয়েক দশকের মধ্যে এক-একটা সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত এমনভাবে বদলে যেতে পারে যে অনেক ভাবনাই আবার নতুন ক'রে ভেবে নিতে হয়।

মাতৃভাষায় কবিতা রচনা, অন্য ভাষার কবিতা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ— এইটে কবিতারচনার এবং কাব্যানুবাদের একটা গ্রাহ্য ধ্রুপদী মডেল। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে বড় বড় সব সামাজিক ভাঙাগড়ার টানাপড়েনে সর্বত্রই অন্যান্য বিকল্প মডেলও সম্ভব হয়েছে। আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কালিদাস যে-ভাষাতে কাব্য লিখেছিলেন তা কি সকলেরই মুখের ভাষা ছিলো? নাট্যসাহিত্যের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়, সেই সংস্কৃত ছিলো কেবল শিক্ষিত অভিজাত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভাষা, আর বিভিন্ন প্রাকৃতই ছিলো সাধারণ মানুষের, মেয়েদের, শিশুদের মুখের ভাষা। এক অর্থে কালিদাসের মতো কবিরা সাবালক বয়সে শেখা দ্বিতীয় ভাষাতে কাব্য লিখেই কবিত্বের শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

মানতেই হবে, মাতৃভাষা বনাম দ্বিতীয় ভাষার পুরোনো স্টাইলের তর্কটা আজকের দিনে বেশ খানিকটা অবান্তর হয়ে গেছে। শব্দদুটোর সংজ্ঞার্থে অনিবার্যভাবেই অদলবদল হয়েছে। এ-সবই এখন নৃতত্ত্ববিদদের অন্বীক্ষার বৈধ বিষয়। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের যুগ্ম চক্রান্তে কারও কারও মাতৃভাষাটা সাহিত্যরচনার পক্ষে কাঁচা, কিন্তু তথাকথিত 'দ্বিতীয় ভাষা'য় সাহিত্যিক দক্ষতা তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত। অন্য দিকে কেউ কেউ হয়তো এতটা দ্বিভাষী হয়ে গেছেন যে তাঁদের পক্ষে নিজেদের সৃষ্টিশীলতাকে দুটো ভাষাতেই কম-বেশী চারিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কবিতা লেখা যায় না বা সার্থক অনুবাদ করা যায় না, একাধিক ভাষায় সৃষ্টিশীল হওয়া যায় না, এমন দাবি আজকের দিনে অচল, কেননা ভাষাব্যবহারের ব্যাপারে যাঁরা সব্যসাচী তাঁরা কাজগুলো ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষের কর্মকাণ্ডে হাতে কলমে কাজ ক'রে দেখিয়ে দেবার বাড়া আর কোনো প্রমাণ লাগে না। আর এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপারও নয়। সবই একটা শিক্ষানবিশি, একটা

আঙ্গিককে একটা ঐতিহ্যের ভিতরমহল থেকে আয়ত্ত করার ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন নানা ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন, এও তেমনি। একজন নিপুণ অভিনেতা রাজা আর ভাঁড় দুই ভূমিকাতেই পাকা অভিনয় করতে পারেন। একজন বাদক দুটো বাদ্যযন্ত্রে কুশলী হতে পারেন। কত শিল্পী নৃত্য আর গীত উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দবিহারী। বেশ কিছু দৃশ্যশিল্পী ছবি আঁকা আর ভাস্কর্য দুটো মাধ্যমেই দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। পিকাসোর কথা একবার ভাবুন। 'করা যায় না' ব'লে কোনো লাভ নেই। চেষ্টা করলে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছে রোজ। কত কত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় কাজ করতে যাচ্ছেন প্রতিদিন। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে মানুষ নিয়ত যে-সব অসাধ্যসাধন করছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষের পক্ষে দুটো ভাষায় সৃষ্টিশীলতা অর্জন করা তেমন কোনো মিরাক্‌ল্ নয়। কিছু মানুষের পক্ষে দ্বৈভাষিকতা জীবনযাত্রার একটা আঙ্গিক। তাঁদের জীবনে 'প্রথম' আব 'দ্বিতীয়' ভাষার পার্থক্য প্রায় মুছে গেছে। কার্যতঃ তাঁদের দুটো মাতৃভাষা। আজকের দিনে কাব্যানুবাদের আঙিনায় তাঁদের বিশেষভাবেই স্বাগত করতে হবে।

একটা সময় ছিলো যখন আমিও মনে করতাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ নিয়ে এত বিভ্রাট হয়ে গিয়েছে যে বাঙালীদের আর ঐ কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়, একদিন বিদেশীরাই বাংলা শিখে নিযে তাঁকে অনুবাদ ক'রে তাঁদের দেশবাসীদের কাছে পৌঁছে দেবেন। তার পর ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম, বিপুল জটিল ঐতিহাসিক কারণপুঞ্জের দরুন তেমন মানুষ খুব ধীরে ধীরেই তৈরি হতে পারেন, এ ঘটনা তাড়াহুড়ো ক'রে হবার নয়। উইলিয়ম র‍্যাডিচি নিঃসন্দেহে একজন উল্লেখ্য পথিকৃৎ। তবু মানতে হবে ভারতীয় ভাযা থেকে অভারতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদ করতে হলে যে-ধরণের দ্বৈভাষিক দক্ষতা ও দ্বৈসাংস্কৃতিক চেতনা দরকার, তা অনিবার্য সামাজিক কারণে অভারতীয়দের মধ্যে সহজে তৈরি হয়ে ওঠে না। প্রতিতুলনায় ঐ দক্ষতা ও চেতনা ভারতীয়রা অর্জন করেছেন আরও বেশী ক'রে। ভাগ্যের চক্রান্তে আমি যদি সেরকম দ্বৈভাষিক ও দ্বৈসাংস্কৃতিক মানুষ হয়ে উঠে থাকি, তা হলে ইংরেজীতে অনুবাদ করার আমন্ত্রণ পেলে তা প্রত্যাখ্যান করবো কেন? হয়তো এ কাজ আমার একেবারে অসাধ্য নয়।

আমার বিবেচনায়, 'প্রথম ভাষা', 'দ্বিতীয় ভাষা' ইত্যাদি বর্গীকরণের কাঠিন্য থেকে একটু স'রে এসে আজকের দিনে আমাদের ফোকস্ করতে হবে এই ব্যাপারটির উপরে: যিনি কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদ করার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি দুটো ভাষাই ভালো ক'রে জানেন কিনা, যে-ভাষায় অনুবাদ করছেন সেই ভাষাটাতে কবিতা লেখার কিছু অন্ততঃ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে কিনা। আমার ধারণা, এইটেই কেন্দ্রিক ইশ্যু। যে-

ভাষাতে কাব্যানুবাদ করা হবে সেই ভাষার আধুনিক কাব্যবাচনভঙ্গির সঙ্গে অনুবাদকের অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকা দরকার, সে-ভাষায় হাতে কলমে কিছু কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। এই অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা কিছু পরিমাণে না থাকলে নতুন কবিতার শরীর নির্মাণ করা যায় না। ঐ নির্মাণ একটা কারুশিল্প। সেই কারুশিল্পের অভাব সাংবাদিক বা অধ্যাপকীয় গদ্যে পারদর্শিতা দ্বারা পুষিয়ে নেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার দুঃসাহস আমার এজন্যে হয়েছে যে আমি দীর্ঘকাল ইংরেজীভাষী দেশেরই বাসিন্দা, ইংরেজীই বিবাহসূত্রে বহুকাল ধ'রে আমার ঘরের ভাষা, রোজকার মুখের ভাষা, ইংরেজদের অন্তরঙ্গ জীবনের ছন্দের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, আধুনিকতম ইংরেজী কবিতার ভাষার সঙ্গেও পরিচয় আছে, নিজে ইংরেজীতে কিছু কবিতা লিখি, তা প্রকাশিতও হয়েছে, বিখ্যাত কবিদের দ্বারা পরিচালিত ওয়ার্কশপে গিয়েছি এবং নিজে ওয়ার্কশপ পরিচালনাও করেছি। এই ভিতরমহলের অভিজ্ঞতাগুলি না থাকলে এ কাজে হাত দিতে কখনোই সাহস পেতাম না।

রবিনসনদের একটি তর্ক খেয়াল করবার মতো। আমি যেহেতু বাঙালী, সেহেতু আমার ইংরেজীতে অনুবাদ করার যোগ্যতা নেই, কিন্তু যদিও তাঁরও মাতৃভাষা বাংলাই তবু অনুবাদক হিসেবে শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত ঠিক আছেন, যেহেতু তিনি রবিনসনের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করেছেন। এই তর্কের ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। আজকাল কোনো কোনো অ্যাকাডেমিক মহলে 'প্রাইমারি' ও 'সেকেণ্ডারি' দুজন অনুবাদকের সহযোগিতায় দু' দফায় কবিতা অনুবাদ করার যে-রীতি চালু হয়েছে সেই পদ্ধতি দ্বারা 'বিশ্বসাহিত্য' বা 'তুলনামূলক সাহিত্য' পড়ানোর জন্য পাঠ্য বই তৈরি করা গেলেও সেটাকে কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদ করার শ্রেষ্ঠ পথ ব'লে মনে হয় না আমার, বিশেষতঃ যখন 'সেকেণ্ডারি' অনুবাদক মূল ভাষাটা প্রায় জানেন না, যেমন প্রায়ই হয়ে থাকে। রবিনসনের বাংলাজ্ঞান যে খুব মজবুত তা তো মনে হয় না। আমার বিচারে কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদ দু' ধাপে করার কাজ নয়। একটা ভাষার বাক্যবন্ধ থেকে অন্য একটা ভাষার বাক্যবন্ধে হনুমানের মতো এক লাফে চ'লে যেতে হবে। অনুবাদে সহযোগিতা কি তবে কখনোই সম্ভব নয়? হ্যাঁ, সম্ভব। দুজন লোক দুটো ভাষা ভালো ক'রে জানলে ওয়ার্কশপের আঙ্গিকে কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই সম্ভব। যিনি শেষ রূপটা তৈরি করছেন তাঁকে সে-ভাষায় কাব্যদক্ষ তবু হতেই হবে, আর অপর জন কবি না হলেও নিদেনপক্ষে কাব্যরসিক ও ভাষাবিদ হবেন।[৩]

॥ ৩ ॥

এবারে আসতে চাই আমার আলোচনার তৃতীয় ভাগে। আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদগ্রন্থটির যে-ভারতীয় মুদ্রণ বর্তমান, তার কোনো কোনো রিভিউ প'ড়ে এবং কলকাতায় দু'-একটি সেমিনার বা ওয়ার্কশপে যোগ দিয়ে আমার মনে হয়েছে, একজন কবির জন্য বিদেশে নতুন পাঠকসম্প্রদায় তৈরি করতে হলে কী ধরণের অনুবাদ প্রয়োজন তার তাত্ত্বিক বা থিওরির দিকটা পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকদের আরও অনুশীলন করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ব্যাপকতর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যদি তাঁদেরও কাম্য হয়, তা হলে অনুবাদের কী এবং কেন নিয়ে তাঁদের চিন্তাকে আরও জোরদার করা দরকার, নয়তো কেবল জল ঘোলা হবে।

সাহিত্যবস্তুর অনুবাদ তো সত্যিই একাধিক উদ্দেশ্যে হতে পারে। উদ্দেশ্যটা হতেই পারে অ্যাকাডেমিক, ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠনের সঙ্গে জড়িত। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের দেখাতে হতে পারে যে তারা একটুকরো গদ্য বা পদ্যের বাচ্যার্থ ব্যাকরণেব খুঁটিনাটিসহ ভালোভাবে ধরতে পেরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বা অ্যাংলোস্যাক্সন সাহিত্য পাঠকালে আমাদের জানান দিতে হয়েছে যে আমরা একটা টেক্স্‌টের ভাষাগত খুঁটিনাটি, অন্বয়, প্রকৃতি-প্রত্যয়গত তাৎপর্য, দ্ব্যর্থকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত। এই ধরণের পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের তৈরি করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিতেরা ছাত্রপাঠ্য সংস্করণে ক্লাসিক টেক্স্‌টের অনুবাদ ক'রে থাকেন। সংস্কৃত কলেজে আমরা *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এর যে-সংস্করণটা ব্যবহার করতাম তাতে মূল টেক্স্‌টের সঙ্গে অন্বয়, ইংরেজী অনুবাদ, এমন কি প্রাকৃত টুকরোগুলোর সংস্কৃতানুবাদও দেওয়া ছিলো। অক্সফোর্ডে *বেওউল্‌ফ্* পড়ার সময়ে আমরা মানে বুঝতে অসুবিধা হলে ক্লার্ক হলের গদ্যানুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতাম। এই পর্যায়ে আমি কত সময় হুয়ান মাস্‌কারোর অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে *গীতা* পড়ার চেষ্টা করেছি। অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ-সহ স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত তিন খণ্ডে *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী*-ও ১৯৬৫ সাল থেকে আমার সহযাত্রী। মূল টেক্স্‌ট্ গদ্য হোক, বা কাব্য হোক, এ-জাতীয় অনুবাদ সর্বদা গদ্যানুবাদ। এ কাজে ফোকস্‌টা পড়ে অর্থের উপরে। কবিতার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনাকেও রূপ দেওয়া এখানে কোনো বড় লক্ষ্য নয়।[৪] রবীন্দ্রনাথের কবিতার জন্য যদি বিদেশে নতুন পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে চাই, তা হলে এই গদ্যাশ্রিত অনুবাদপদ্ধতিকে উপযুক্ত ব'লে মনে হয় না আমার।

সাহিত্যানুবাদের আরেক উদ্দেশ্য হলো বিশুদ্ধভাবে সাহিত্যিক—সাহিত্যের রসকেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা, কেবল স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, সাহিত্যরসপিপাসু যে-কোনো পাঠকের জন্য। যে-ভাষাটা

পাঠকরা জানেন না, বা অল্পই জানেন, সেই ভাষার কোনো সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পাঠকদের 'সহিতত্ব' ঘটাতে হবে। এই ধরণের কাজ সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গেই সমান্তরাল, তারই সঙ্গে তুলনীয় একটা ক্রিয়া। এই ধরণের অনুবাদকর্মের মধ্যে স্বভাবতঃই সব থেকে জটিল কাজ হচ্ছে কবিতার অনুবাদ। মূলের কাব্যরসকে কবিতাপিপাসুর কাছে পৌঁছে দিতে হলে কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদ করতে হবে। এটা অ্যাকাডেমিক কাজ নয়, পুনঃসৃষ্টির কাজ, যদিও ভূমিকা ও টীকা রচনায় বিদ্যাজগতের কাজের সঙ্গে এই কাজের অবশ্যই একটা ওভাবল্যাপ বা পরস্পরপ্রাবরণ থাকবে। কেবল সহজ অর্থ দিয়ে নয়, গূঢ়তর ব্যঞ্জনায়, ধ্বনিগত নকশা ও তার দ্যোতনায় মিলিয়ে একটা নতুন কবিতার শরীর, একটা কাব্যসমগ্রতা গ'ড়ে তুলতে হবে। এ একরকমের সমান্তরাল নির্মাণ—হুবহু নকল নয়, ফোটোগ্রাফ নেওয়া নয়, একটা গঠনের আদলে আরেকটা গঠন তৈরি করা। তার অনিবার্য অর্থ এই যে এ কাজ সততই কিছুটা নির্বাচনভিত্তিক। কিছু রাখা যাবে, কিছু ছাড়তে হবে। দুটো ভাষার ধর্ম যত আলাদা হবে, কাজটা তত কঠিন হবে। উপমা-রূপক রাখতে হলে খুব সম্ভব মিল বজায় রাখার লোভ ছাড়তে হবে। মূলের বক্তব্যের সঙ্গে অনুবাদের ভাষার আপন ভঙ্গিটুকুরএকটা সমঝোতা ঘটাতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে-অনুবাদ আমি নিজে করেছি, তা এই দ্বিতীয় ধরণের অনুবাদ। সংকলনটির মধ্যে আগাগোড়া যে-অনুবাদনীতি কাজ করেছে সেটি হলো কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদ করার নীতি।

বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ আধুনিক বাঙালী কবি-অনুবাদকরা এভাবেই বাংলায় অন্য ভাষার কবিতার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছিলেন। কালিদাস, শেক্সপীয়র, বোদলেয়র, হাইনে, গ্যেটে, ভালেরি, রিল্‌কে, হ্যেল্ডার্লিন, এলিয়ট, র‍্যাঁবো এবং আরও কত কবিকে বাংলাভাষার আঙিনায় টেনে এনেছিলেন তাঁরা। বাংলাভাষার স্বভাবের সঙ্গে এই-সব কবিদের বক্তব্যের একটা গাঁটছড়া এঁরা বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। আমাদের প্রজন্মে আমরা এঁদের করা অনুবাদ-কবিতা দ্বারা এমনভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম, যেন মূল বাংলা কবিতা পড়ছি। অনুবাদের টুকরোগুলো মূল কবিতার মতো বেজে উঠেছে আমাদের কানে। দশকের পর দশক পেরিয়ে তেমন কত টুকরো আজও তাই স্মৃতিসঞ্চারী—ঠিক যেন মূল বাংলা কবিতা, তবে একটু ভিন্ন স্বাদের। চেনা, আবার একটু অচেনাও বটে—কবিতা কার্যতঃ যেমনটা হয়ে থাকে, বিশেষতঃ আধুনিক কবিতা।

তাঁদের আদর্শই মূলতঃ আমারও আদর্শ। তাঁদেরই মডেল আত্মস্থ ক'রে আমিও অন্য ভাষার কবিতা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি—অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতা, ডেভিড কনস্টান্টাইন বা ডি. এম. টমাসের মতো আধুনিক ইংরেজ কবির কবিতা, আধুনিক আর্জেন্টাইন কবিতা, স্প্যানিশ লোকগীতিকার টুকরো ইত্যাদি। সেই একই

আদর্শ কাজ করেছে আমার রবীন্দ্র-অনুবাদের ক্ষেত্রেও, কেবল এ ক্ষেত্রে অনুবাদের গতিটা ভিন্নমুখী। বিশ্বভারতী আমাকে বলেছিলেন ইংরেজী অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের কবিতার এমন একটি সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করতে, যা রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার একটা পরিচয় পৌঁছে দেবে তেমন পাঠকদের কাছে, ইংরেজীই যাঁদের মাতৃভাষা।

একটু অবাক হয়েছি এই দেখে যে কাব্যানুবাদের এই মডেলে শ্রীমতী নবনীতা দেব সেনের মতো কবি-সমালোচকের ঠিক আস্থা নেই। কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদের 'ঝুঁকি'র কথা উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছেন: 'The creative writer's ego overcomes the translator's humility, and things go wrong. Fidelity is important, since the translator is not creating her own poem, she is only transferring another's poem into a different language. Humility is of the essence here ... perhaps accessibility alone should be the aim of a translation'। আমার বিনীত মত এই যে নবনীতা এখানে যে-কার্যক্রমের আভাস দিয়েছেন তা অনুসরণ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য ছাত্রপাঠ্য অনুবাদ বার করা গেলেও বা পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষককে খুশী করা গেলেও ইংরেজীভাষী দেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতার জন্য নতুন পাঠকগোষ্ঠী মোটেই তৈরি হবে না। নবনীতা এখানে অধ্যাপকের এজেণ্ডা দিয়েছেন, কবির এজেণ্ডা দেন নি। 'ট্রান্সফার' কথাটা তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা থেকেই এই মডেলের দুর্বলতা প্রতীয়মান। কবিতার অর্থ কি ওরকম যান্ত্রিকভাবে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় 'বদলি' করা যায়? এটা কি ঠিক বোতল থেকে গেলাসে দুধ ঢালার মতো, বা ব্যাংকে ভারতীয় মুদ্রা দিয়ে নির্দিষ্ট হারে স্টার্লিং বা ডলার নেওয়ার মতো? অর্থকে 'অধিগম্য' করা আর কবিতাকে 'অধিগম্য' করা কি এক? কবিতার অনুবাদ তো শুধু একটা শব্দের জায়গায় আরেকটাকে বসিয়ে দেওয়া নয়। শব্দগুচ্ছ নিয়ে কাজ করতে হয়; নতুন কবিতাটিতে ঝোঁক, স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের সম্পর্ক, ছন্দের ওঠানামা সব মিলিয়ে একটা ধ্বনির প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে কিনা তার দিকে কানকে সতর্ক রাখতে হয়। সেই প্যাটার্নকে অনুবাদের ভাষার স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। কবিতা যে ওভাবেই কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। নবনীতার দর্শনে কবিতায় ধ্বনির ভূমিকাটি কী, তার স্থান কোথায়, তা বুঝলাম না। শুধু ট্রান্সফার-যোগ্য অর্থ নিয়েই যদি কবিতার কারবার, তা হলে লোকে কবিতা লেখে কেন? সাদামাঠা কম্যুনিকেশনের জন্য গদ্য তো আছেই। অনুবাদকের বিনয়ের ব্যাপারেও আমার মত কিছুটা ভিন্ন। আমার মতে ওরকম বৈষ্ণববিনয়ের মনোভাব নিয়ে কবিতা অনুবাদের কাজে এগোনো যায় না। চাই সৃষ্টিশীলতার জেদ। বুদ্ধদেব বসুর কালিদাস বা বোদলেয়রের অনুবাদে কোনো বৈষ্ণববিনয় নেই, আছে এক দৃপ্ত স্রষ্টার তেজ, শিল্পীর অহং। তাই তো তিনি আমাদের ঠোঁটে জিভে প্রচণ্ড ধাক্কায় আছড়ে ফেলতে পারেন ঐ কবিদের সমুদ্রের ফেনা, তার

নোন্‌তা স্বাদ। কবিতা থেকে কবিতা নির্মাণ করতে হলে মূল কবিকে বেদীতে বসিয়ে পূজা করলে চলে না। ঐ কবির সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব, একটা সহপথিকত্ব অনুভব করতে হয়। দাস্যভাব নয়, লাগে সখ্যভাব।

উপমা দিয়ে বলা যায়, এক জীবন্ত কাব্যদেহ থেকে আরেক জীবন্ত কাব্যদেহ তৈরি করার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের সৃষ্টির মতো। মূল কবিতাটিকে অনুবাদের ভাষায় একটা নবজন্ম দিতে হবে। এই নবজন্ম না পাওয়া পর্যন্ত তর্জমাটা ছাত্রদের জন্য, পণ্ডিতদের জন্য, অ্যাকাডেমিকদের জন্য ঠিক হতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক কবিতাপাঠকদের স্পর্শ করে না, তাদের মনে অভিঘাত সৃষ্টি করে না। মূল কবিতাকে যদি পিতা বলা যায়, অনুবাদককে তবে রীতিমতো প্রতিস্পর্ধী মাতা হয়ে উঠতে হবে, নয়তো সন্তানের সৃষ্টি হবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষেত্রে সেই পুনর্জন্মদাত্রীর ভূমিকাই পালন করার চেষ্টা করেছিলাম।

কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদটা কাদের জন্য করা হচ্ছে সেটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুনঃসৃষ্টির কাজে সফল হতে হলে 'টার্গেট অডিয়েন্স' সম্পর্কে তীক্ষ্ণ চেতনা এবং পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। আধুনিক বাংলা কাব্যবাচনের রীতিনীতি না জেনে যেমন বোদলেয়রকে বাংলায় নবজন্ম দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি আধুনিক ইংরেজী কবিতার ভাষাব্যবহার না জেনে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আধুনিক ইংরেজী কবিতার পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। তেমন পাঠকদের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিতে হলে তাঁর কবিতার সঙ্গে এখনকার ইংরেজী কবিতার ভাষার একটা সেতুবন্ধন ঘটাতে হবে—একরকমের শৈল্পিক এঞ্জিনীয়রিং। আমার অনুবাদে সেই কাজই আমি করতে চেয়েছি। অনিবার্য কারণে আমার অনুবাদের ভাষা মূলতঃ ইংরেজদের ইংরেজী, 'মার্কিন ইংরেজী' নয়, বা 'ভারতীয় ইংরেজী' নয়। এই দ্বীপের কবিতাপাঠকরাই আমার প্রথম টার্গেট অডিয়েন্স। তবে মার্কিন দেশেও এই সংস্করণ বিক্রি হয়েছে, এবং সেখানকার সমালোচকরা আমার ভাষাব্যবহারের প্রশংসাই করেছেন।

প্রাথমিক সৃষ্টির ভাষার মতো অনুবাদের ভাষাও দেশকালনির্ভর। প্রত্যেক যুগ ও গোষ্ঠীকে আপন প্রয়োজনের জন্য অনুবাদের ভাষা নির্মাণ ক'রে নিতে হয়। গ্রীক ভাষাটা আমার জানা নেই। গ্রীক ট্র্যাজেডির ইংরেজী অনুবাদ আগেও পড়েছি, কিন্তু কোনোদিন সেভাবে ধাক্কা পাই নি। যেদিন টেলিভিশনে আজকের দিনের নাম-করা ইংরেজ কবি টোনি হ্যারিসনের কাব্যানুবাদে *Oresteia*-র অভিনয় দেখলাম, সেদিন উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলাম। সেদিন যথার্থ বুঝেছিলাম, অন্য একটা ভাষা থেকে সমকালীন ইংরেজীতে কবিতার স্রোতকে কিভাবে চারিয়ে দেওয়া যায়। আমি কিছু শিখে নিতে পেরেছিলাম।

সন্তান সৃষ্টির রূপকটা আবার টেনে এনে বলি, সন্তানের মধ্যে যেমন, তেমনই সৃজনশীলভাবে অনূদিত কবিতার মধ্যেও দুটো দিকেরই উত্তরাধিকার থাকবে, পিতার এবং মাতার, মূল কবির এবং অনুবাদক কবির। কেবল সেই শর্তেই কবিতার অনুবাদ দুরন্তভাবে জীবন্ত হয় এবং অচেনা কবির জন্য নতুন পাঠক রেক্রুট করে। আমার ধারণা বাঙালী ক্রিটিকরা রবীন্দ্রনাথের পদমর্যাদা দ্বারা এতটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন যে অনুবাদ-কবিতার শরীরে মাতৃ-উত্তরাধিকারকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চান না। তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক ভঙ্গিতে কেবল বলতে থাকেন, যাঃ, ছেলেটা একদম বাবার মতো দেখতে হয় নি! ব্যাপার হচ্ছে, কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদে ছেলেটা কখনোই পুরোপুরি বাবার মতো হবে না, কেননা তার অর্ধেক জেনেটিক উত্তরাধিকার যে মায়ের দিক থেকে!

আমার অনুবাদের মডেলকে বোঝেন নি অথবা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারেন নি ব'লে পশ্চিমবঙ্গের কোনো-কোনো অধ্যাপক-সমালোচক আমার কোনো-কোনো শব্দচয়নের যে-সমালোচনা করেছেন তা আমার টার্গেট অডিয়েন্সের নিরিখে অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। এখানে বেশী খুঁটিনাটির মধ্যে যাবার জায়গা নেই। মাত্র দু'-একটি উদাহরণ দিতে পারি। 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি'র অনুবাদে নবনীতা আমার 'maniac' শব্দটা পছন্দ করেন নি। তাঁর ধারণা ওটা একটা টেকনিকাল টার্ম, যার ব্যঞ্জনা সাধারণতঃ নঞর্থক। কিন্তু শব্দটা বিলেতে এখন সম্পূর্ণ মুখের ভাষা, মোটেই সর্বদা নঞর্থক নয়, রবীন্দ্র-অভিপ্রেত পাগলামির সঙ্গে খুবই খাপ খায়। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইংরেজীতে ঐ শব্দের অনুরণন ভিন্ন হলে আমি নিরুপায়। আমার অনুবাদগুলোর প্রধান টার্গেট অডিয়েন্স যে বিলেতী সেই তথ্যটা মনে রাখলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায়। এইটুকু পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের মেনে নিতে হবে। বইটা ভারতীয় ইংরেজীর গ্রাহকদের জন্য পুনঃসম্পাদনা ক'রে ছাপা সম্ভব নয়।

আমার প্রাক্তন শিক্ষক জ্যোতি ভট্টাচার্য একইভাবে আমার কয়েকটি শব্দচয়নের সমালোচনা করেছেন। তিনি আমার অনুবাদের ভাষায় কিছু 'গুরুচণ্ডালী' পেয়েছেন। তাঁকে কী ক'রে বোঝাই, এই গুরুচণ্ডালীই যে আধুনিক কবিতার ভাষার প্রাণ, শুধু ইংরেজীতে নয়, আজকের বাংলা কবিতাতেও![৫] লঘু-গুরুর অপ্রত্যাশিত বিন্যাসের অভিঘাতে কাব্যরসের শ্যাম্পেনের ছিপিটা খুলে যায়। 'আঁচল' শব্দটাকে আমি যেভাবে অনুবাদ করেছি সেটা তাঁর মনঃপূত হয় নি। আমার টার্গেট অডিয়েন্স ভারতীয় হলে আমি হয়তো 'anchal'-ই লিখতাম, কিন্তু বিলেতের ইংরেজীতে 'sari', 'curry', 'tandoori' ঢুকলেও 'anchal' ঢোকে নি, তাই ওটা এখানে চলবে না, রসভঙ্গ করবে। আমি জানি, শব্দচয়নের ব্যাপারে র‍্যাডিচি আমার চাইতে বেশী রক্ষণশীল। তার কারণ আমাদের দুজনের কবি-ব্যক্তিত্ব আলাদা। ঐ যে বললাম, সৃষ্টিশীলভাবে অনূদিত কবিতার শরীরে মাতৃ-অধিকারের উত্তরাধিকার থাকবেই। কিন্তু

এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন? পাঠকমাত্রই তো অনুবাদক। আমরা যে-কেউ যখন কোনো-একটা কবিতা পড়ি, তখন প্রত্যেকেই সেটাকে নিজের মতো ক'রে বুঝে নিই। প্রত্যেকের বুঝে নেওয়া একটু আলাদা, এবং সেই বুঝে নেওয়াটাও তো একধরণের অনুবাদ।

আমার কবিতানির্বাচন নিয়েও প্রত্যাশিতভাবে কিছু কিছু কথা উঠেছে। *কড়ি ও কোমল*-এর 'স্তন ২' কবিতাটির নির্বাচন জ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভালো লাগে নি। তিনি দেশপ্রেমবোধক গান বা কবিতার অভাবও বোধ করেছেন। কবিতা নির্বাচনে আমার প্রধান বিবেচ্য ছিলো—কবিতাটি ইংরেজীতে খুলবে কিনা, আমি তাকে একটা গ্রাহ্য রূপ দিতে পারবো কিনা। এবং জায়গা পেলে আমি আরও অনেক কবিতা অনুবাদ করতাম, কিন্তু বইয়ের প্রকাশক-অনুমোদিত আয়তনের মধ্যে আর কিছু ধরানো যায় নি।[৬] বিদেশীদের জন্য সংকলিত রবীন্দ্রনাথের 'নির্বাচিত কবিতা'র ফর্মাটে আমাদের কোনো প্রিয় কবিতা গেলো কি গেলো না, তাতে কিচ্ছু এসে যায় না, কেবল দেখতে হবে একগোছা ভালো অনুবাদ জড়ো করা হয়েছে কিনা, সেগুলো অনুবাদ হিসেবে উতরেছে কিনা। তা হলেই বিদেশীরা এক নূতন কবির সন্ধান পাবেন।

॥ ৪ ॥

তা হলে এই আলোচনার সর্বশেষ ধাপে প্রশ্ন করা যায়: সেই নূতন কবির সন্ধান কি আমরা আধুনিক অনুবাদকরা কিছুটা দিতে পেরেছি? আমার তো মনে হয়, হ্যাঁ, র‍্যাডিচির আর আমার অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এখানকার কবিতার জগতের প্রেক্ষা কিছুটা বদলেছে। একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। বিলেতের কবিতার জগতে হৈচৈ হয় না। এঁরা নিজেদের কবিদের নিয়েও সোরগোল করেন না। কিন্তু যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা কবিতা পড়েন। কবিতা এখানে সংস্কৃতিমঞ্চের মাঝখানটা দখল ক'রে নেই, কিন্তু আপন খাতে আপন অহংকারে সে বয়ে চলেছে। সেই খাতে রবীন্দ্রনাথের নতুন ক'রে একটা স্বীকৃতি মিলেছে। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের 'ক্লাসিক'রূপে গ্রাহ্য হয়েছেন। র‍্যাডিচির অনুবাদের বইটির একাধিক পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। আমার অনুবাদের বইটি দু' বছরের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়; সম্প্রতি দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরোলো। তার জন্য প্রকাশককে কোনো তাগাদা দিতে হয় নি। তিনি নিজের গরজেই বার করেছেন। অর্থাৎ চাহিদা আছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও আপনারা মনে রাখতে পারেন। আমার এখানকার প্রকাশক পেংগুইন, ম্যাকমিলান, হাইনেম্যান প্রভৃতির মতো বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রকাশকও নন। ব্লাডঅ্যাক্স বুক্‌স্‌ প্রধানতঃ কবিতারই প্রকাশক। শুধু যাঁরা সত্যিকারের কবিতাপাঠক, তাঁদের কাছেই এঁদের বিক্রি।

কলকাতার ভাষা ব্যবহার ক'রেই বলি, এখানকার কবিতাপাঠকদের নূতন কবিতা 'খাওয়াতে' হলে কেমন ইডিয়ম অবলম্বনীয় তা তো আমরা এখানে ব'সেই ভালো বুঝবো, নয় কি? দুটো বিকল্প শব্দচয়নের মধ্যে একটা যদি মোলায়েম আর অন্যটা জোরদার হয়, তবে নতুন পাঠকগোষ্ঠী গঠনের কাজে জোরদার বিকল্পটাই রেছে নিতে হবে। আমি তা-ই করার চেষ্টা করেছি। তাই, কলকাতার ভাষায়, 'এঁরা খেয়েছেন'— কবির নামটা নয়, তাঁর কবিতাই। জনৈক ইংরেজের ভাষায়, 'এতদিন জানতাম টাগোর একজন দাড়িওয়ালা মাস্টারমশাই, এখন আপনার অনুবাদ প'ড়ে দেখছি—আরে, ইনি যে রীতিমতো কবি!' আমার শব্দচয়ন এবং ধ্বনি-নকশা নির্মাণ আজকের ইংরেজী কবিতার শৈলীর সঙ্গে মানানসই হয়েছে ব'লেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের ওপরে আমি কোনো অত্যাচার করি নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথকে এখনকার ইংরেজীভাষী পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করার জন্যে তাঁকে আমি রবীন্দ্রত্ব থেকে বিচ্যুত করি নি। তাঁর কাব্যগুণকে আধুনিক ইংরেজীতে অধিগম্য করবার জন্যে যেটুকু 'অ্যাডজাস্টমেন্ট' দরকার তা করেছি। সেটাই অনুবাদের কারুশিল্প। 'অ্যাডজাস্টমেন্ট' নিশ্চয় দরকার, কেননা দুটো ভাষার স্বভাবে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। ইংরেজী যাথাতথ্য পছন্দ করে, ধ্বনিতে কাটা-কাটা ধাঁচের একমাত্রিক ব্যঞ্জনান্ত শব্দ পছন্দ করে। বাংলা কবিতার ঝোঁক হচ্ছে আবেগের দিকে, ধ্বনিতে স্বরান্ত শব্দের প্রবাহের দিকে। প্রত্যেকটা ভাষাই জগৎকে দেখবার একটা স্বতন্ত্র চশমা, প্রত্যেক ভাষাই কিছু ধ্বনিগত পক্ষপাত দ্বারা শাসিত। কবিতায় সেই দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্য, সেই ধ্বনিস্বাতন্ত্র্য প্রখর হয়ে ফুটে ওঠে। ভাষাগত সেই অনন্যতাকে ষোলো আনা খাটিয়েই কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে। তাই কিছুটা 'অ্যাডজাস্টমেন্ট' ছাড়া কবিতার ভাষান্তর অসম্ভব।

দুঃখ এই আমার প্রিয় কবি আত্মীয়োপম বুদ্ধদেব বসু আজকে বেঁচে নেই। তিনি ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না তাঁর জন্যে তৈরি হবেন 'একজন রয় ক্যাম্বেল বা মাইকেল হ্যাম্বার্গার' (*কবি রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৬, পৃঃ ১৪৩)। তিনি কি ভেবেছিলেন যে তাঁরই স্নেহভাজন একটি বাঙালী মেয়ে এ কাজের জন্য তৈরি হতে পারে? আসলে এ-সব কাজ জাতপাত বা রক্তের ব্যাপার নয়, সংবেদন ও শিক্ষানবিশির ব্যাপার। আজকাল কোরিয়া বা জাপানের মেয়েরা যেভাবে বেঠোফেন-মোৎসার্ট বাজান, বাদকের মুখ না দেখলে আপনারা বুঝবেন না যে সাহেব বা মেম বাজাচ্ছেন না, বাজাচ্ছেন এশিয়ার মেয়ে। আসল জিনিসটা ভেতরে থাকতে হবে—সেখানে গোঁজামিল থাকলে চলবে না। তার পর একটা ঘরানার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ট্রেনিং নিতে হবে। তা হলেই আর্টটা আয়ত্ত হবে। যে-কোনো শিল্পে যা নিয়ম, কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদের আর্টেও তা-ই। মাইকেল হ্যাম্বার্গার জন্মসূত্রে

জার্মানভাষী। ১৯৯২ সালে বি-বি-সি রেডিওর তৃতীয় চ্যানেলে কবিতা-অনুবাদকদের নিয়ে একটি সিরিজ় হয়। এই সিরিজে যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে হ্যাম্বার্গার আর আমি দুজনেই ছিলাম—কথাটা যে বুদ্ধদেব জেনে গেলেন না এটা আমার কাছে আক্ষেপের বিষয়। আমার রবীন্দ্র-অনুবাদের ভিত্তিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার-সহ সুইডিশ রেডিওতেও একটি সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

তবে রবীন্দ্রনাথ এক বিশাল ব্যাপার, সমুদ্রোপম তাঁর রচনাবলীর পরিধি। বহির্জগতে তাঁর একটা প্রাথমিক পুনর্বাসন ঘটলেও আমাদের হাত গুটিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। যাঁরা বাংলা জানেন না তাঁদের কাছে তাঁকে চেনানোর ব্যাপারে অনেক কাজ করার আছে। তা এক প্রজন্মে হবে না। ধীরে ধীরে করতে হবে, তাড়াহুড়ো করলে ভালো ফল মিলবে না। যুগে যুগে লোকে তাঁকে নতুন ক'রে তর্জমা করবে। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ভাষাতেও তাঁর অনুবাদ হওয়া দরকার—সরাসরি বাংলা থেকে, ইংরেজীর মধ্যস্থতায় নয়। রবীন্দ্রনাথকে ভারতের ভিতরে চেনানোর কাজেই এখনও বিপুল কাজের অবকাশ রয়েছে। ভারতে তাঁর প্রচার কেবলই ইংরেজীর মাধ্যমে হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর রচনাবলীর অনুবাদ হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

বিলেতে কবিতার জগতে তাঁর একটা পুনর্বাসন ঘটলেও তাঁকে নিয়ে এখানে সিরিয়াস গবেষণার কাজ করা যে কী কঠিন তা আমি জানি। সেই গবেষণাকে ধারণ করতে পারে এমন কোনো অফিশ্যাল অ্যাকাডেমিক খাত এখনও এ দেশে তৈরি হয় নি। তাই সেই কাজ করতে গেলে প্রচণ্ড জেদ রাখতে হয়, এবং অনুক্ষণ কলকাতা আর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে হয়। এর আগে সংস্কৃতির রাজনীতির কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু পুরো ছবিটাই অন্ধকার নয়। রাজনীতি যেমন আছে, তেমন সৎ রবীন্দ্রচর্চাকে এগিয়ে দিতে চান এমন লোকেরও অভাব নেই। তাঁরা কলকাতায় যেমন আছেন, তেমন শান্তিনিকেতনেও আছেন। বিলেতে এবং ইয়োরোপীয় কন্টিনেন্টেও আছেন। জানি, কেননা তাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি। রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি তাঁদের সবাইকেই, যাঁদের সহায়তা বিদেশে রবীন্দ্রগবেষণায় আমাদের পাথেয়। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি।

১ অর্থাৎ *দেশ* পত্রিকায়।

২ বর্তমান সংকলনের অন্তর্গত 'কোন্ অনুবাদটি যাওয়া উচিত : আমার বক্তব্য'।

৩ এই বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তা পরবর্তী কালে আরও বিবর্তিত হয়েছে। একুশ শতকে আমি বেশ কয়েক বছর একটি কবিতা-কর্মশালার সভ্য ছিলাম, যেখানে কবিরা তাঁদের নিজেদের কবিতা ছাড়াও অন্য ভাষা থেকে অনূদিত কবিতা প'ড়ে শোনাতেন। প্রথমে মূল কবিতাটি, তার পর স্বকৃত অনুবাদ পড়তেন। দুটো রূপের প্রতিলিপিই প্রত্যেকের সামনে রাখা থাকতো। তার পর আমরা যে-যার মন্তব্য পেশ করতাম, আলোচনার গভীরে নামতাম। সাধারণতঃ মূল ভাষাটি ফরাসী বা জার্মান হতো ব'লে আমাদের দলটার অনেকেই মূল কবিতাটিকেও মোটামুটি অনুসরণ করতে পারতেন। আমিও পারতাম। প্রয়োজনবোধে অনুবাদক-কবিকে আমরা প্রশ্ন করতাম, 'এই শব্দটার ব্যঞ্জনা ঠিক কী, বুঝিয়ে বলুন তো।' পরস্পরের কাছ থেকে আমরা কিছু-না-কিছু শিখে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। আমি যখন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ করছিলাম তখন বেশ কয়েকটি নমুনা এই কর্মশালায় এভাবে পেশ করেছিলাম। পরস্পরসহযোগিতায় করা কবিতা-অনুবাদ সম্পর্কে আমার ভাবনা আরও বিস্তৃতি লাভ করে ২০০৭ সালে স্লোভেনিয়ায় একটি সপ্তাহব্যাপী আবাসিক কর্মশালায় যোগ দিয়ে, কবিতা-অনুবাদই ছিলো যার ফোকস্। যোগদানকারীরা সকলেই ছিলেন কবি অথবা নিদেনপক্ষে কবিতাচর্চায় নিমগ্ন পেশাদার সাহিত্যকর্মী, সকলেই ছিলেন দ্বিভাষী ত্রিভাষী ইত্যাদি। যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো ইংরেজী। আমার ধারণা, এই 'আবাসিক-কর্মশালা পদ্ধতি' আর বিদ্যাজগতের 'প্রাইমারি অনুবাদক' আর 'সেকেণ্ডারি অনুবাদক'-এর সহযোগিতা—এ দুয়ের মধ্যে কিছু উল্লেখ্য পার্থক্য আছে। এই কর্মশালায় বিভিন্ন ভাষার কবিরা পরস্পরের কবিতা অনুবাদ করলেন, অনুপস্থিত কারও রচনা নয়। মূল কবির সঙ্গে অনুবাদক-কবির পর্যাপ্ত মিথস্ক্রিয়ার অবকাশ এই আবাসিক পদ্ধতির বিশেষ শক্তি। মূল কবির কণ্ঠে মূল কবিতা শোনার সুযোগ, তাঁকে সরাসরি অনেক প্রশ্ন করার সুযোগ, একাধিক নিবেদিত শব্দশিল্পীর মতামত সরজমিনে যাচাই ক'রে নেওয়ার সুযোগ—এই সুবিধাগুলি অবশ্যই আদরণীয়। সব মিলিয়ে আমার ধারণা হয়েছিলো যে মূল ভাষা থেকে এক লাফে অনুবাদের ভাষায় চ'লে যেতে পারলে সৃজনশীলতার যে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব তা এই পদ্ধতিতে সম্ভব না হলেও সহযোগীরা যদি সংবেদনশীল, ভাষাবিদ এবং বিবেকী কর্মী হন তা হলে এভাবে কিছু উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রস্তুত করতে পারেন। এবং এভাবে কাজ করার সুযোগ বিশেষভাবেই স্বাগত তাঁদের কাছে, যাঁদের ভাষাটা তাঁদের গোষ্ঠীর বাইরে খুব কম লোকই জানেন। সত্যি বলতে কি, এরকম কোনো সহযোগী পন্থা অবলম্বন না করলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের ভাষা থেকে অনুবাদ প্রায় অসাধ্য, তাঁদের কবিরা অজানাই রয়ে যাবেন। ভারতের মতো বহুভাষাভাষী দেশে এই অনুবাদপদ্ধতির প্রয়োগ সত্যিই ফলপ্রসূ হতে পারে। ঐ কর্মশালায় লব্ধ আমার অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন এবং ওখানে করা আমার

অনুবাদগুলি পাওয়া যাবে আমার এই রচনাটিতে: 'জ্লাতি চৌন কবিতা-অনুবাদ কর্মশালা', *অগ্রবীজ*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭।

৪ তবে ক্লার্ক হল বা হুয়ান মাস্কারোর মতো বিবেকী অনুবাদকর্মীর গদ্যে ছন্দের স্পন্দন অবশ্যই শ্রুতিগোচর হয়।

৫ জীবনানন্দের কবিতায এরকম গুরুচণ্ডালীর নমুনা পাওয়া যাবে।

৬ সংকলনটির আশু-প্রকাশিতব্য পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণে বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র ১০৬, ১০৭, আর ১০৮-সংখ্যক কবিতার অনুবাদ যোগ করেছি। তিনটি কবিতাই স্বদেশের মৌল কতগুলি সমস্যা সম্পর্কে সুতীব্রভাবে সচেতন।

[*দেশ*, ৪ মে ১৯৯৬ (২১ বৈশাখ ১৪০৩)।]

রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে আরও কিছু ভাবনা

গত চৌঠা মে ১৯৯৬-এর *দেশ*-এ আমার প্রবন্ধ 'ইংরেজীতে রবীন্দ্রকাব্য : সাম্প্রতিক বিতর্ক' ছাপা হবার পরে যে-সব চিঠিপত্র বেরোয় তাদের বক্তব্য সম্বন্ধে গুছিয়ে কিছু বলতে গেলে চিঠির আয়তনের মধ্যে ধরানো যায় না। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় আমাকে আহ্বান করেছেন আমার বক্তব্যকে নূতন একটি প্রবন্ধের আকারে বিন্যস্ত করতে। সর্বপ্রথমে এই আমন্ত্রণের জন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুঃখের বিষয়, যে-ধরণের আলোচনাকে আমি চাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তার দেখা পাই নি। আমার প্রবন্ধের কেন্দ্রিক বক্তব্য ছিলো এই যে সাহিত্য-অনুবাদের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করা যায় না। সাহিত্যবস্তুর অনুবাদ একাধিক উদ্দেশ্যে হতে পারে। উদ্দেশ্য যা হবে, অনুবাদের পদ্ধতিও সেই অনুসারে হবে। আমার উদ্দেশ্য কী, তদনুযায়ী কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, পূর্বসূরি কোন্ সাহিত্যিকরা আমার মডেল ও পথপ্রদর্শক—এ জিনিসগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। পত্রলেখকগণ এই প্রসঙ্গগুলি বিবেচনা ক'রে লিখলে আলোচনাটা এগোতো। কিন্তু অধিকাংশ চিঠিতে যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার বদলে জায়গা জুড়েছে আমার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। কোনো পত্রিকাকে আমরা যদি ফলপ্রসূ সাংস্কৃতিক আলোচনার প্রাঙ্গণরূপে দেখতে চাই, পেতে চাই, রাখতে চাই, তা হলে এটাকে ঠিক পথ ব'লে মনে হয় না আমার। আলোচনায় যুক্তির বদলে বিদ্রূপের ব্যবহার কোনো বৌদ্ধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না, কেবল অন্যকে আক্রমণ করার নঞর্থক স্পৃহাকে চরিতার্থ করে। কবিতার অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—এগুলো আদপে সাময়িক উত্তেজনার এবং কাউকে মার দিয়ে তামাশা দেখার ব্যাপারই নয়, স্থিতধী সাহিত্যিক আলোচনার উপযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী বিষয়। আমার প্রবন্ধে আমি তুলেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নামের দুঃখজনক রাজনৈতিকীকরণের কথা। চিঠিগুলি প'ড়ে আমার আগেকার ধারণাই দৃঢ়তর হয়েছে। এ বিষয়ে আমি কিছু আগে বিশদভাবে লিখেছি অন্য একটি প্রবন্ধে। 'একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা' শিরোনামে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম শ্রদ্ধেয়া সুচিত্রা মিত্রর আমন্ত্রণে তাঁর সংগীতবিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংকলিত সুভনিরের জন্য। সেটি বেরিয়ে গেছে। কারও কৌতূহল থাকলে সুভনিরটি (*আমি যে গান গেয়েছিলেম*) সংগ্রহ ক'রে লেখাটি দেখে নেবেন।[১]

বিভিন্ন আক্রমণের অভিঘাতে যত দুঃখই পাই না কেন, 'ক' যা বলেছেন তার

দায় 'খ'-এর উপর চাপানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তাই আমার পক্ষে ক্লেশকর হলেও প্রথমে পৃথকভাবে বিভিন্ন পত্রলেখকদের বক্তব্যের দিকে তাকানোর চেষ্টা করবো। এবং সেই সূত্রে আমি নিজে যা-যা বলতে চেয়েছিলাম সেই কথাগুলি প্রয়োজনমতো আরেকবার বোঝানোর চেষ্টা করবো। দরকার হলে অতিরিক্ত ভাবনাও যোগ করবো। আক্রান্ত হলে আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা বলার অধিকার মানুষের থাকে। সেই অধিকার নিতে সংকোচ বোধ করবো না। তা ছাড়া এও সত্য যে বাদপ্রতিবাদের জট ছাড়াতে ছাড়াতেই নতুন অন্তর্দৃষ্টিও লাভ করা যায়। জবাব খোঁজার প্রক্রিয়া কাজ করে বিমানের টেক-অফের মতো। তারও একটা মূল্য আছে।

§

সুকুমার সিকদার (২৯ জুন ১৯৯৬) আমার প্রবন্ধে কোনো সারবস্তু পান নি, পেয়েছেন 'অভিমানাহত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ধূমায়িত উদ্‌গিরণ'। তাঁর মতে স্ট্র্যাটফোর্ডে আমার অনুবাদটি উৎকীর্ণ না হওয়ার জন্য আমার নাকি প্রচণ্ড ক্ষোভ হয়েছে এবং সেটিই নাকি আমার প্রবন্ধের 'মূল ভাব'। আমার আরও কিছু ক্ষোভের বোধ তিনি তালিকাবদ্ধ করেছেন, তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপকে আঘাতসমর্থ ক'রে তোলার জন্য করেছেন অনেক ভাষাগত কসরত। আমি নাকি 'রবীন্দ্রনাথের পুচ্ছগ্রাহিতা' ক'রে, তাঁর 'কাঁধে ভর দিয়ে ... আপাত-অমরত্বলাভের' চেষ্টা করেছিলাম। সে-সুযোগটি 'হাতছাড়া' হয়ে যাওয়ায় আমি নাকি ক্ষুব্ধ। অগত্যা আমি নাকি অন্যদের চোখ রাঙিয়েছি, কটাক্ষ করেছি, 'শিল্পীর অভিমান' প্রকাশ করেছি (যা নাকি ভারতীয়-উত্তরাধিকার-সম্মত নয়), 'আত্মপ্রচারে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে' ফেলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই মতগুলিকে কি শ্রদ্ধেয় বলা যায়? কোনো পত্রিকার তরফে একটা বিশেষ বিতর্কমূলক বিষয়ে আমাকে যদি লিখতে আহ্বান করা হয়, তা হলে আমাকে কি নিছক দায়িত্বপালনেই খানিকটা প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে হয় না, কিছু তথ্য ও মতামত পেশ করতে হয় না? নির্দিষ্ট-ক'রে-দেওয়া শব্দসংখ্যার মধ্যে সে-কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম। কাউকে আমি চোখ রাঙাই নি অথবা কটাক্ষ করি নি। কারও সন্দেহ থাকলে প্রবন্ধটা আবার প'ড়ে দেখবেন। আমার মতামত ওখানে দৃঢ়ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু কারও প্রতি একতিল অসম্মান দেখানো হয় নি। পুরো প্রবন্ধটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে উঠে দাঁড়িয়ে পাঠ করা যায়---তেমন টোনেই লেখা। নঞর্থক ক্ষোভ নয়, ওখানে ছিলো গভীরদুঃখবোধজাত কিছু উচ্চারণ এবং আলোচনার বিষয় সম্পর্কে আমার কিছু খাঁটি কনসার্ন। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে না পারলে অথবা সাহিত্যিক আলোচনায় অন্য কারও সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত

হতে না পারলে সেই মতানৈক্য প্রকাশ করার অধিকার স্বাধীন সমাজে নিশ্চয় থাকে?

স্ট্র্যাটফোর্ডের ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি সংক্ষিপ্ততম আঁচড়েই লিখেছিলাম। হয়তো তাতে ক'রে কারও কারও চোখে প্রেক্ষাপটটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। সমস্ত জিনিসটা এখন ইতিহাস। ফাইলে অনেক কাগজপত্র জড়ো হয়েছে এবং গণমাধ্যমে বিস্তর আলোড়নও হয়েছে। তবু এই পত্রিকার পাঠকদের জন্য আরেকটু ব্যাকগ্রাউণ্ড না-হয় দেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের মূর্তির নীচে শেক্সপীয়রের উদ্দেশে লেখা তাঁর কবিতাটির কোন্ অনুবাদটি যাবে, তা নিয়ে প্রথমে কোনো 'বিতর্ক'ই ছিলো না। সেই বিতর্ক ধাপে ধাপে গ'ড়ে উঠেছে। কারও কারও (মনে হয় সুকুমারবাবুরও) ধারণা, মূর্তির নীচে খোদাইয়ের জন্য আমাকে ঐ কবিতাটি অনুবাদ করতে বলা হয়েছিলো। তা নয়। কেউ আমাকে কখনো তা করতে বলেন নি। ঐ কবিতাটির অনুবাদ আমার রবীন্দ্রকবিতার *সিলেক্টেড পোয়েম্‌স্*-এর অন্তর্গত হয়ে অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। তখন স্ট্র্যাটফোর্ডে রবীন্দ্রমূর্তি বসানোর কোনো পরিকল্পনাই গৃহীত হয় নি। কবিতাটি ইংরেজী অনুবাদে ভালো আসবে, বিষয়বস্তুর কারণে ইংরেজ পাঠকরা সেটিতে ইন্টারেস্টেড হবেন, এই বিবেচনাতেই ওটি অনুবাদ করেছিলাম।

১৯৯৪-এর অগাস্টে র‍্যাডিচির পবামর্শে ভারতের লণ্ডনস্থ হাই কমিশনার আমার অনুবাদটি স্ট্র্যাটফোর্ডে ব্যবহার করার জন্য নিজে আমাকে টেলিফোন ক'রে আমার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখনই মৌখিকভাবে এবং পরে লিখিতভাবে অনুমতি দিই। আপনাদের জানা প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পনাটা ঠিক মূর্তি বসানো নিয়ে ছিলো না, কথা ছিলো একটি প্রস্তরফলকে মূল কবিতাটি ও তার ইংরেজী অনুবাদ খোদাই করা হবে। এর পর তিনি আমার অজ্ঞাতে জনৈক ইংরেজ মহিলা কবির পরামর্শে র‍্যাডিচিকে দিয়ে আরেকটি অনুবাদ করিয়ে নেন, আমার কাছ থেকে যে তার আগেই অনুমতি নেওয়া হয়ে গেছে সে-কথা তাঁকে খোলসাভাবে না জানিয়ে। র‍্যাডিচির ধারণা হয়েছিলো তাঁর অনুবাদটাই যাবে। আমার প্রতি অসৌজন্যমূলক এই বিচিত্র ঘটনাটি সম্পর্কে আমি বৎসরকাল সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। ১৯৯৫-এর জুলাইয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্ট্র্যাটফোর্ডে একটি রবীন্দ্রমূর্তি পৌঁছে দেন। আমি সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত না হলেও আলোচ্য কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদক হিসেবে প্রেসে আমার নামই বেরোয়, শেক্সপীয়রভবনের কোনো একটি কক্ষে আমার অনুবাদটি প্রদর্শিত হয়, জনৈক সাংবাদিক তাঁর রিপোর্টে আমার অনুবাদের পুরো টেক্স্‌ট্ পর্যন্ত তুলে দেন। আমি বন্ধুবান্ধবদের অভিনন্দন পেতে থাকি।

এর অল্প পরে, যাকে বলেছি 'রবিনসন অ্যাফেয়ার' তার জটিল ফলশ্রুতিতে হাই কমিশন রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত গদ্য সারানুবাদটির খবর পান—ঠিক কিভাবে পেলেন

সে আরেক ইতিহাস, এখানে বলার জায়গা নেই। তার আগে এটি সম্বন্ধে এঁরা অবহিত ছিলেন না। বৎসরব্যাপী প্রগাঢ় নীরবতার পর ১৯৯৫-এর অগাস্টে তাঁরা আমাকে জানান যে তাঁরা এইটিই ব্যবহার করবেন, যদিও হাই কমিশনারের নাকি আমার অনুবাদটির কথা 'খুবই মনের মধ্যে ছিলো'।

তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে বেশ কিছু সুধীজন সুবিবেচিত মনে করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মূল কবিতাটির যথার্থ পরিচয় বহন করে না। ওটি একটি গদ্য সারাংশ, যা ১৯১৬ সালে একটি স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের পর সম্পাদকদের তাগাদায় অন্যমনস্কভাবে এবং দায়সারাভাবে এই ধরণের সারানুবাদ তিনি ক'রে পাঠাতেন, সম্পাদকরা নির্বিবেচনায় সেগুলো ছাপতেন, এবং এর ফলে বাংলার বাইরে তাঁর খ্যাতি যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে-বিষয়ে তিনি নিজেও পরে অবহিত হয়ে উঠেছিলেন। স্কলারদের কাছে এগুলি জানা কথা, ক্লিশের মতো। রবীন্দ্রনাথের নিজের করা ব'লেই এই অনুবাদটির 'ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক' এমন দাবি করলে (যেমন করেছেন সুকুমার সিকদার) অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, এবং 'ঐতিহাসিক' শব্দটির কিছু অপপ্রয়োগ করা হয়। সাহিত্যিক নামকরণের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা কবিতাটিই আসল canonical text। তাঁর করা ইংরেজী রূপটির সেরকম কোনো চূড়ান্ত গুরুত্ব নেই। ওটি একটি দলিল, সব-কিছুর মতোই ইতিহাসের অন্তর্গত, এবং সেই ন্যূনতম অর্থেই 'ঐতিহাসিক', তার বেশী নয়। ওটির কিছু 'কিউরিওসিটি ভ্যাল্যু' আছে পণ্ডিতদের কাছে—কবির স্বকৃত অনুবাদ কেন যে অবাঙালী পাঠকদের মনোযোগ বেশী দিন ধ'রে রাখতে পারে নি তারই আরেকটি কারণনির্দশন হিসেবে। সম্প্রতি এই অনুবাদটি সাহিত্য আকাদেমি-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনাসংকলনের অন্তর্গত হয়েছে। সেই ফর্মাটে এই অনুবাদের স্থান হতেই পারে। গ্রন্থাগারে রেফারেন্স-বই হিসেবে সে-প্রকাশন থাকুক, স্কলাররা দেখবেন। সেটিই তার যথার্থ জায়গা।

কিন্তু স্ট্র্যাটফোর্ডের উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির নীচে ওটিকে 'বেস্ট চয়েস' মনে করেন নি স্থানজ্ঞ কালজ্ঞ অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই। অধিকাংশ পর্যটক তো বাংলা পড়তে পারবেন না, ইংরেজী রূপটাই পড়বেন। যেখানে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে দর্শনার্থী আসবেন, সেখানে গদ্য সারানুবাদ, যে-ধরণের অনুবাদ বহুসমালোচিত, তা কেন দেওয়া হবে, যদি তার চাইতে ভালো বিকল্প, একটি শিল্পিত রূপ, আমাদের হাতের কাছেই থাকে ? কোনো বিকল্প না থাকলে আলাদা কথা, কিন্তু বিকল্প যখন আছে, তখন কেন এ কাজ করা ?

অনুবাদ তেমন ভালো না হলেও ওটাই দিতে হবে, যেহেতু ওটা কবির নিজের করা—এটা একদম জেদের কথা, রবীন্দ্রপৌত্তলিকতার কথা, যুক্তির কথা নয়,

এবং আখেরে রবীন্দ্রস্বার্থবিরোধী। মূর্তি তো কলকাতায় বসে নি, বসেছে শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে। এটা ইংরেজীভাষীদের দেশ, এবং কবিতাটি তাঁদেরই বিশ্ববন্দিত মহাকবির উদ্দেশে প্রশস্তি। সেটি ইংরেজী অনুবাদে যতটা সুচারুরূপে পৌঁছে দেওয়া যায়, ততই তাতে সকলের লাভ—বাঙালীদের লাভ, কবির নিজের লাভ। এক নিযুত দর্শনার্থীর মধ্যে একশোজনও যদি কবিতা বোঝেন, তা হলে সেই একশো রসগ্রাহীর কাছেই বা কবি রবীন্দ্রনাথকে কেন তুলে ধরা হবে না—যদি একটি ভালো কাব্যানুবাদ হাতের কাছে থাকে? যে-কোনো কবিই নিজের করা মাঝারি মাপের গদ্যানুবাদের চেয়ে অপরের করা উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদের মাধ্যমেই বিদেশীদের কাছে পরিচিত হতে চাইবেন, এ কথা লিখে দেওয়া যায়। অপিচ আমার অনুবাদটি যে-সংকলনের অন্তর্গত সেটি বিশ্বভারতীরই পৃষ্ঠপোষকতায় সমারব্ধ একটি পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসকে বিদেশীদের কাছে নতুন ক'রে পৌঁছে দেবার জন্যে একটি উদ্যোগেরই অন্তর্গত। সেদিক থেকে দেখলেও আমার অনুবাদটি গৃহীত হলে বেমানান কিছুই হতো না, বরং অনেকের বিবেচনায় খুবই মানানসই হতো।

কেউ কেউ বলেছেন, ঐ কবিতা যেহেতু শেক্সপীয়রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য. তাই তাঁর ইংরেজী কথাগুলোই ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যেই বা যুক্তি কোথায়? কবিতাটি একজন কবির প্রতি আরেকজন কবির নিভৃত উক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নি, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষ থেকে। ভারতসমুদ্রতীরে নারিকেলকুঞ্জবনে শেক্সপীয়রের জয়ধ্বনি বেজে উঠছে—এটাই তাঁর বক্তব্য। কবিতাটি আসলে শেক্সপীয়র-রসপিপাসু বঙ্গীয় তথা ভারতীয় নবজাগরণের উচ্চারণ। আমার বইয়ের টীকা-অংশে যথাস্থানে আমি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার অনুবাদটি ব্যবহৃত হলে মোটেই কিছু বেমানান হতো না। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আমি নিজেও, আজকের বাঙালী সাহিত্যিকরা সকলেই, সেই বিশাল নবজাগরণেরই একজন উত্তরসূরিমাত্র। বহুকাল আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই-সব অধ্যাপকের কাছেই শেক্সপীয়রে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম, যাঁরা ছিলেন ঐ শেক্সপীয়র-রসিক জয়ধ্বনিদাতাদের সগোত্র।

আমার প্রশ্ন বরাবর ছিলো এইটি : পশ্চিমবঙ্গের করদাতাদের খরচে মূর্তি যখন বসছেই, মূল কবিতা এবং তার অনুবাদ তার নীচে যাবে সে-সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েই গেছে, তখন তা থেকে কবি রবীন্দ্রনাথের জন্য কিছু লাভ আমরা ছিনিয়ে নিই না কেন? এই স্মারকস্থাপন তো সত্যিই একটি কূটনৈতিক ক্রিয়া, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের করায়ত্ত ব্যাপার। সে-ক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের জন্য এই প্রোজেক্ট থেকে কিছু 'মাইলেজ' আদায় ক'রে নেওয়াই তো সব থেকে যৌক্তিক ও কূটনৈতিক হতো।

সুকুমার সিকদার একটি বিচিত্র যুক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

যেহেতু আলোচ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের মধ্যে পড়ে না', সেহেতু তার অনুবাদের গুণাগুণ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কবিতাটি সেরা কবিতাদের দলে না পড়ুক, সেটি যখন স্ট্র্যাটফোর্ডের মতো 'স্ট্র্যাটেজিক' জায়গায় যাচ্ছে, তখন তার অনুবাদের কোয়ালিটি নিয়ে কিছুটা ভাবতে হবে না? কোনো-একটা কাজ যদি আদৌ করার যোগ্য হয়, তা হলে সেটা তো যথাসাধ্য ভালো ক'রেই করা উচিত। আধাআধি কাজ করার কোনো মানেই হয় না।

এখন এই বিতর্কে আমাকে আঘাত দিয়ে কথা বলা অত্যন্ত সহজ, যেহেতু এই নাটকে আমি একটি চরিত্র। ঘটনাচক্রে আমার অনুবাদই প্রথমে নির্বাচিত হয় এবং অনেকের মতে সেটিই ছিলো উত্তম নির্বাচন। 'ওঃ, কেতকী তো নিজের অনুবাদের সপক্ষে বলবেই, তাতে যে ওর লাভ; বলছে বটে রবীন্দ্রনাথের কথা, কিন্তু আসলে আছে স্বার্থান্বেষণ আর আত্মপ্রচারের ধান্দায়, রবীন্দ্রনাথের লেজ ধ'রে অমর হয়ে যাবার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে জ্ব'লে-পুড়ে মরছে'—এই ধরণের অসূয়াযুক্ত সস্তা উক্তি উচ্চারণ করা সহজ, কিন্তু ধোপে টিঁকবে না। আমার অনুবাদের সপক্ষে কেবল আমিই ছিলাম না, আলোচ্য ইশ্যুকে ঘিরে একটি ছোট আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিলো। আমার অনুবাদটিই ব্যবহার করা হোক, এই মর্মে পরামর্শ দিয়ে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা বৌদ্ধিক মর্যাদা আছে। তাঁরা কবি, অনুবাদক, অধ্যাপক, সমালোচক। একজন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য, আরেকজন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত 'ওয়ার্টন প্রোফেসর'। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এই মানী ব্যক্তিরা আমাকে খুশী করার জন্য কলম ধরেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবেই কলম ধরেছিলেন। তা ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ১৯৯৫-এর লণ্ডন জমায়েতেও আমার অনুবাদের সপক্ষে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। কর্তৃপক্ষের কি উচিত ছিলো না এঁদের কথা আরেকটু মন দিয়ে শোনা? আর কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি মতানৈক্য প্রকাশ করা হয়, গণতান্ত্রিক সমাজে তা কেন 'চোখ রাঙানি' ব'লে গণ্য হবে?

আমার অনুবাদের সপক্ষে দৃঢ়ভাবে মত দিয়েছিলেন এমন একজনের কথা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে চাই। বিলেতে ভারতীয় সাহিত্যের ভালো নতুন অনুবাদ হোক, তার যথাযোগ্য প্রচার হোক, এর জন্য বিগত বছরগুলিতে লণ্ডনের ডঃ রঞ্জনা সিদ্ধান্ত অ্যাশ্-এর মতো আর কেউ লড়েছেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে ১৯৯৩ সালে লণ্ডনে যে-আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়, তিনি ছিলেন সেই উদ্যোগের কেন্দ্রিক প্রাণশক্তি ও অক্লান্ত কর্মী। সেই কনফারেন্সে কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে আমি একটি পেপার পড়েছিলাম। এখন যা-যা বলছি সেই ধরণের কথাই ওখানেও বলেছিলাম। অনন্তমূর্তি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয় লেখকরা সেই সভায়

উপস্থিত ছিলেন এবং আমার বক্তব্যকে অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

আলোচ্য স্ট্র্যাটফোর্ড বিতর্কে রঞ্জনা দেবী রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি আর আমারটি পাশাপাশি রেখে ধাপে ধাপে তুলনা ক'রে দেখিয়েছিলেন কেন আমারটি বেশী নির্ভরযোগ্য, মূল কবিতার যোগ্যতর প্রতিনিধি। সেটি উৎকীর্ণ করার সুযোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন: 'It is an opportunity we cannot afford to lose'। এটি ছিলো তাঁর সুচিন্তিত মত, রবীন্দ্রস্বার্থে দূরদর্শিতা, আমার মন রাখবার জন্য তাঁর কোনো ছেঁদো কথা নয়। ইনিও আমার বয়োজ্যেষ্ঠা। অপিচ উল্লেখ করা যায়, লণ্ডনের বাঙালী মহলের তিনি একজন সুপরিচিত বামপন্থী। পশ্চিমবঙ্গের সরকার এঁর পরামর্শকে মূল্য দিলেন না কেন?

দেশ-এর পাঠকদের জানা প্রয়োজন, সরকারী মহল থেকেও আমরা কিছু সমর্থন পেয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে একজন আমাকে কলকাতা থেকে লিখেছিলেন, 'শেক্সপীয়রের উদ্দেশ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির অনুবাদ নিয়ে আপনার যুক্তি ও আবেগ আমি বোধহয় অনুভব করতে পারছি।'[২] এঁদের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ দেরিতে হলেও ন্যায্যতর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন, এইরকম একটা ভরসাও আমাদের ছিলো। আমরা তাই গণমাধ্যমে জল ঘোলা করতে চাই নি একেবারেই। কিন্তু কলকাতার অপর এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'যুদ্ধটা লড়া হয়েছিলো, কিন্তু জেতা যায় নি। আমি কতদূর নিরাশ হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না ... সংগ্রামটা ন্যায্য হলেও শেষ পর্যন্ত কেউই ঝুঁকি নিতে চাইলেন না, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্তই নিলেন। বলা বাহুল্য এটাই ছিলো সহজতম পন্থা—কোনো রক্তপাত নেই, আমলাতান্ত্রিক ঝামেলা নেই। কেবল রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে নিয়েই যা একটু সমস্যা—তা সে নিয়ে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে?'[৩] এখানেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ঘটনাবলীর প্রকৃত চুম্বক। ঘটনাগুলো কেবল অমরত্বপিয়াসী আহাম্মক কেতকীর আত্মপ্রচার নয়। সিকদারের মতে সরকার যথেষ্টই দায়িত্ব পালন করেছেন, বাঙালী নেতৃবৃন্দ 'যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন'। সে-মূল্যায়ন সকলের নয় কিন্তু। যাই হোক, সবই এখন ইতিহাস। উত্তরসূরিরাই বিচার করবেন, ঠিক কাজ করা হয়েছিলো কিনা।

§

ঐ কাহিনীতে কিছুটা ছেদ দিয়ে ফিরে আসা যাক সিকদারের চিঠিতে উল্লিখিত অন্যান্য প্রসঙ্গে; স্ট্র্যাটফোর্ড-প্রসঙ্গে পরে আবার আসা যাবে। সুকুমারবাবুর ধারণা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যে একজন বড় করি, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ থাকতেও পারে। তা-ই যদি হবে, তা হলে আবার তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হতে এত লালায়িত হবো কেন? এখানে

যুক্তিটা কোথায় ?

'অনুবাদ হলো নারীর মতো, একই সঙ্গে সুন্দরী ও সতী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়'—এই প্রবচনটি উদ্ধার করেছেন তিনি। কিন্তু এই বস্তাপচা নারীবিদ্বেষী লিঙ্গবাদী ফরাসী প্রবচনটি উদ্ধার ক'রে আজকের দিনে অনুবাদসংক্রান্ত কোনো আলোচনাসভায় পার পাওয়া যাবে না। এ কথা বললে সমালোচনাভাজন হতে হবে, এ কথা লিখে দিতে পারি। এই দুনিয়ায় বহুসংখ্যক নারী একই সঙ্গে সৌন্দর্যের অধিকারিণী তথা ঐতিহ্য-অনুমোদিত সতীত্বের পরাকাষ্ঠা। কেন, ভারতের সীতা-সাবিত্রীরা কি তা নন ? ভাষাবিদ সৃষ্টিশীল অনুবাদকের হাতে কবিতার অনুবাদও একই সঙ্গে সুন্দর এবং বিশ্বস্ত হতে পারে—ততটা বিশ্বস্ত, যতটা হওয়া দরকার। জীবনে আর আর্টে খেলা সেই একই। তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, "আমি মনে করি একটি মেয়ে দশটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও 'সতী' থাকতে পারে এবং একটি মেয়ে কেবল একটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও 'অসতী' হতে পারে।" ঠিক তেমনি, একটি কাব্যানুবাদ দশটি ছোট ডিটেলে মূলের থেকে স'রে এসেও সমগ্রের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত হতে পারে, এবং মূলকে ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রেও মূলের আত্মার প্রতি অবিশ্বস্ত হতে পারে।

সিকদারের বিবেচনায়, 'অনুবাদ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা', 'সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতা ... যাদের নেই, তাঁরা কালজয়ী সব কবিদের সাহিত্যকর্মের নামের পাশে লেজুড় হিসেবে নিজের নামটি ছাপিয়ে কিছু দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়েই' নাকি অনুবাদ করেন, আর তাঁদের অন্য উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে 'চট্‌জলদি টু-পাইস' কামিয়ে নেওয়া। প'ড়ে স্তম্ভিত হয়েছি, কেননা সাহিত্যের ইতিহাস এই অবস্থানকে একেবারেই সমর্থন করে না। দেশে দেশে প্রথম শ্রেণীর কবিরা কাব্যানুবাদ করেছেন, সেই কাজের মাধ্যমে আপন আপন ভাষায় ও সাহিত্যে জোয়ার টেনে এনেছেন। সিকদার নিজেই উল্লেখ করেছেন কৃত্তিবাস. কাশীরাম দাস, তুলসীদাসের কথা। এঁরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে যৌবনে বিদেশী কবিদের অনুবাদ ক'রে তা থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। তা ছাড়া নিজের কবিতার অনুবাদ করেছেন, টি. এস. এলিয়টের 'Journey of the Magi'-এর অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও কি তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ? ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র ফরাসী অনুবাদক আঁদ্রে জ়িদ বা স্প্যানিশ অনুবাদক হিমেনেথ কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ? নবনীতা দেব সেনের কথা উল্লেখ ক'রে এবং আমাকে বেশ একটু *ঠেস* দিয়ে সিকদার লিখেছেন, 'তিনি একজন কবি এবং শ্রীমতী ডাইসন অপেক্ষা একটু বেশি মাত্রায় কবি'। তিনি যে কবি এ কথা আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। একবার আমাকে তাঁর একটি কবিতার বই উপহার দিয়েছিলেন, সেখানে লিখে দিয়েছিলেন : 'কবি কেতকীর জন্য'। সেটি এখনও আমার কাছে একটি মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু নবনীতাও তো অনুবাদ ক'রে থাকেন।

তা হলে তিনিও কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ?

তর্কের খাতিরে না-হয় মেনে নেওয়া যাক, নবনীতা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, এবং আমি পঞ্চম শ্রেণীর কবি। তিনি কবি এ কথা জানি ব'লেই তাঁর কাব্যানুবাদের মডেলে অধ্যাপকীয় মনোভাবের আধিপত্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। সেজন্যেই লিখেছিলাম যে নবনীতা আমাদের 'অধ্যাপকের এজেণ্ডা দিয়েছেন, কবির এজেণ্ডা দেন নি'। আমি খানিক বিস্মিত যে বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রর কাব্যানুবাদের মডেল আজকের যাদবপুরে ত্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গগুলিতে পরে আবার আসছি।

আর 'চট্‌জলদি টু-পাইস' কামিয়ে নেবার ব্যাপারে বলতেই হয়, হায়, সে-কাজের জন্য কবিতার অনুবাদের রয়াল্‌টি শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়, তার চাইতে ঢের সহজতর রাস্তা আছে। প্রসঙ্গতঃ এ প্রশ্নও তোলা যেতে পারে, একজন ভাগ্যমন্ত প্রথম শ্রেণীর কবির কাজের ভালো তর্জমা ক'রে একজন হতভাগ্য পঞ্চম শ্রেণীর কবির পকেটে দুটো পয়সা যদি আসেই বা, তাতে আপত্তি কেন ? আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে সিকদার লিখেছেন, 'নিষ্কাম কর্ম তাঁর উদ্দেশ্য নয়।' আচ্ছা, বলুন তো, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ক'রে তাঁকে বাইরে চেনানো কি একটা কাজের কাজ নয়, একটা সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নয় ? যারা এ কাজ করবে, এ দায়িত্ব নেবে, তাদেরও তো খেয়ে-প'রে বাঁচতে হবে, নয় কি ? সকলেই তো যে-যার আখের গোছাচ্ছেন। তবে কবিতার অনুবাদকদের 'নিষ্কাম কর্ম' করতে হবে কেন ? কেন এই ডাব্‌ল্‌ স্ট্যাণ্ডার্ড ? আমাদের সংসারযাত্রার বিলগুলো তবে কারা পে করবেন ? আমার মতে, প্রত্যেকের শ্রমেরই মর্যাদা আছে, এবং তার জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক থাকা বিধেয়। আমি যেমন দাস-মনোভাবে বিশ্বাস করি না, তেমন দাস-শ্রমেও বিশ্বাস করি না।

সিকদার অভিযোগ করেছেন, আমা. লেখায় 'শিল্পীর অভিমান' যেভাবে ফুটে উঠেছে, 'অনভ্যস্ত ভারতীয় চক্ষুর পক্ষে তা পীড়াদায়ক'। মন্তব্য করেছেন, আমি বিবাহসূত্রে 'অন্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ' করেছি ব'লেই 'এটা সম্ভব হয়েছে হয়তো'। 'অনভ্যস্ত ভারতীয় চক্ষু' ? যতদূর জানি, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের মধ্যস্থতায় সারা পৃথিবীর সংস্কৃতিই আজ আপনাদের চোখের উপর আছড়ে পড়ছে। বিদেশী সিনেমার উৎসব দেখতে ভিড় করেন না আপনারা ? তবু আপনাদের চোখ আজও এত 'অনভ্যস্ত' ? আর আজকের বাংলার সংস্কৃতি অনেক দিন ধ'রেই দেশী-বিদেশী উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত মিশ্র সংস্কৃতি। বঙ্গীয় নবজাগরণ থেকে শুরু ক'রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থা পর্যন্ত ঘটনায় কি 'অন্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার' নেই ? অবিমিশ্র ভারতীয়ত্বের দিকে ঝুঁকলে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, শিশুকন্যাহত্যা, সতীদাহ, সাগরসঙ্গমে শিশুবিসর্জন সবই সমর্থন করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ডাক্তারী বিদ্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, খবরের কাগজ, রেডিও, দূরদর্শন, বিমান,

মোটরগাড়ি, আপনার নৈহাটীগামী বাস ও ট্রেন সবই কি সাগরপারে ফিরিয়ে দিতে রাজি আপনি ? কাজেই ওসব সুবিধাবাদী কথা না তোলাই ভালো। পৃথিবী এখন একটা পল্লী, সবাই সবাইকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সংস্কৃতিমাত্রেই কমবেশী মিশ্র। সেই সত্যে অভ্যস্ত হয়ে যান। যেখানে যেটুকু ভালো আছে তাকে মুক্ত মন নিয়ে সাদরে গ্রহণ করাই আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞান।

'শিল্পীর অভিমান' বলতে যদি বোঝায় শিল্পীর পক্ষে উপযুক্ত আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাস, তবে হ্যাঁ, তা আমার আছে। আমি মনে করি, সেইটুকু না থাকলে শিল্পী হওয়া যায় না। সৃষ্টিশীল কাব্যানুবাদও করা যায় না। ৪ মে ১৯৯৬-এর *দেশ*-এ আরও যাঁরা লিখেছিলেন, সেই শঙ্খ ঘোষ, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামীরও কি সে-অভিমান নেই ? জোর দিয়েই বলা যায় যে আছে। সবাইকেই চিনি। জানি সে-জিনিস তাঁদের মধ্যেও আছে। তাঁদের প্রকাশের ধরণটা আলাদা হতে পারে, এই যা। আমি যেহেতু অনেক দশক ধ'রে ভারতের বাইরে অভিবাসী, তাই আমার প্রকাশের আঙ্গিকটা হয়তো একটু ভিন্ন, কিন্তু নব্বইয়ের দশকের গণমাধ্যমে অভ্যস্ত আপনাদের চোখে তা সম্পূর্ণ অপরিচিত, এ কথা বললেও বিশ্বাস করা যায় না। নারী শিল্পীদের 'শিল্পীর অভিমান' থাকতে নেই বুঝি ? ঠিক, পিতৃতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমার লেখনীকে দৃঢ় করতে হয়েছে, নয়তো পাত্তা পেতাম না। সেই দৃঢ়তা কি দোষাবহ ?

'শিল্পীর অভিমান' ব'লে একটা জিনিসকে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেবার দরকার নেই, কেননা এটা শিল্পীদেরই আসর। এই আসরে কোনো শিল্পীকেই মুখঝামটা দেওয়া অসৌজন্য। শিল্পীর অভিমান দিয়েই আরম্ভ হচ্ছে কাহিনীটা। একজন শিল্পী আরেকজন শিল্পীর উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, সেই ক্রিয়ার মধ্যেও কিছু অহং ছিলো, তা থেকেই ঘটনাগুলো গড়াচ্ছে। যাঁরা কবিতা থেকে কবিতায় অনুবাদ করেন তাঁরাও শিল্পী, এবং তাঁদের যথোপযুক্ত মর্যাদার জন্য আমি লড়ছি। তার জন্য আমার কোনো লজ্জাবোধ নেই। আমি অনেকের জন্যে লড়ছি, এবং আমি মনে করি এটি একটি ন্যায্য লড়াই। আমার মূল প্রবন্ধে সেইটে ছিলো একটা জরুরী বক্তব্য।

সিকদার আরও অভিযোগ করেছেন, আমি 'উৎকটভাবে' বিখ্যাত অনুবাদকদের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছি, এবং আমার 'প্রিয় অধ্যাপক-কবি বুদ্ধদেব বসু' আমার 'কীর্তিসম্ভার না দেখেই মরে গিয়ে পরমপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত' হয়েছেন এমন দাবি করেছি। এগুলো আমার মূল প্রবন্ধের বিকৃতকরণ, নঞর্থক বিদ্রূপ—কেবল আমার বিরুদ্ধে নয়, এর দ্বারা বুদ্ধদেব বসুকেও খাটো করা হয়। বুদ্ধদেব বসু কি কেবল আমার 'প্রিয় অধ্যাপক-কবি' ? তিনি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল পুরুষ। একদিন তাঁর কাছ থেকে যে-উৎসাহ ও স্নেহ পেয়েছিলাম তা আজও আমার

সাহিত্যিক জীবনে পাথেয়র ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। তিনি নিজে ছিলেন একাধারে কবি ও অনুবাদক, কবিতার সৃষ্টিশীল অনুবাদে বিশ্বাসী। এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত থিওরি ছিলো। অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কবির দৃষ্টিকে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে দেন নি তিনি। রবীন্দ্র-অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধকে আজও একটি বৈজিক রচনা বলতে হয়। রবীন্দ্র-অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন ক্যাম্বেল বা হ্যাম্বার্গারের (দুজনেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ) আগমনের অপেক্ষায়, কিন্তু তাঁরই চেনা একটি বাঙালী মেয়ে যে তৈরি হতে পারে, এ কথা কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন—আমার এই প্রশ্নটি চ'লে-যাওয়া সেই পিতৃব্যতুল্য মানুষটির প্রতি আমার প্রীতিসিক্ত ঠাট্টা বৈ নয়, এবং এই ঠাট্টাটুকু করার অধিকার আমার আছে, কেননা তিনি ছিলেন ঢাকার সূত্রে আমার বাবার বন্ধুস্থানীয়।

আর হ্যাঁ, বি-বি-সি-তে হ্যাম্বার্গারের সঙ্গে এক সিরিজে সাক্ষাৎকার পেয়ে গর্ববোধ করেছি বৈকি। সস্তা ব্যঙ্গ দিয়ে একজন নারী শিল্পীর সেই কষ্টার্জিত আনন্দবোধটুকু না-ই বা পিষে দিলেন? আমি না জানালে *দেশ*-এর পাঠকরা কি জানবেন ঐ সাক্ষাৎকারের কথা, বা সুইডিশ বেতারের প্রতিনিধির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কথা? কোনো বাঙালী সাংস্কৃতিক রিপোর্টার কি ঐ খবরগুলো কলকাতার কোনো ফোরমে পরিবেশন করেছেন? শুনি নি তো। অথচ হয়তো এ ধরণের তথ্য থেকে পাশ্চাত্য দেশে আমার অনুবাদ যে-অভ্যর্থনা পেয়েছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়, ফলে আমার প্রবন্ধের আলোচনার কনটেক্স্‌টে এগুলো যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক উল্লেখ? সুইডিশ রেডিওব সম্প্রচারটি শুনে ওখানকার বাংলাদেশী দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (হয়তো প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, সঠিক মনে নেই, শামসুর রাহমানকে চেনেন বললেন) আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। এই ধরণের ছোটখাট অথচ অর্থবহ ঘটনা একজন অভিবাসীর জীবনে নির্মল আনন্দ বয়ে আনে। সে-আনন্দ যদি আপনাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে চাই, তাকে আত্মপ্রচার বলে না। সে আমার বাঁচবার আঙ্গিক। একজন বাঙালী মেয়ে যদি রবীন্দ্র-অনুবাদকরূপে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েই থাকেন, তাতে তো আপনাদের আনন্দিত হবারই কথা। যে-খবর আমি না জানালে আপনারা জানবেন না, অথচ আলোচনার কনটেক্স্‌টে যা জানানোই উচিত, তা আর কিভাবে পেশ করতে পারি আমি? আমার তো কোনো বেতনভুক্ PR অফিসার নেই, যাঁকে এ কাজের ভার দিতে পারি।

আমি কোথাও দাবি করি নি যে জ্যোতি ভট্টাচার্য-সমেত বাঙালী অধ্যাপকরা 'আমার অনুবাদ বোঝার জন্য যথেষ্ট বোধসম্পন্ন নন'। এ আমার ভাষা নয়, আমার ভাষাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত ক'রে দেখানো হয়েছে। বিদেশীদের কাছে কবি রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে হলে কী ধরণের অনুবাদ দরকার, সে-বিষয়ে অধ্যাপকদের থিওরিকে আরও পরিশীলিত করা দরকার, এইটি আমার মনে হয়েছে। এবং তা বলার

অধিকার নিশ্চয় আমার আছে।

সিকদার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রকবিতাকে ... ব্যাপকতর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেবার দাবিতে যথেচ্ছ অনুবাদ করার অধিকারও কোনও অনুবাদকের নেই।' এখানে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমি 'যথেচ্ছ অনুবাদ' করেছি এ কথা তো কেউ বলেন নি। দু'-চারটা ডিটেল নিয়ে ক্রিটিকরা তর্ক করতে পারেন,—কিছু মতভেদ প্রকাশিত হওয়াই স্বাভাবিক,—কিন্তু এটা একটা তথ্য যে সব মিলিয়ে আমার অনুবাদ ক্রিটিকদের সাধুবাদই অর্জন করেছে, এই *দেশ* পত্রিকার পাতাতেও।

সিকদার যে-জিনিসটা হিসেবের মধ্যে নিচ্ছেন না তা হচ্ছে ভাষান্তর যে-অ্যাডজাস্টমেন্ট দাবি করে তার সত্যতাকে। গিন্‌স্‌বার্গের ভাষা দিয়ে ম্যাকবেথ রচনা করা যাবে না, বা তারাপদ রায়ের ভাষায় মেঘনাদবধকাব্য লেখা যাবে না—তাঁর এ-সব কথার অর্থ কী ? এগুলো তো ভাষান্তরের নমুনা হলো না। আমার বক্তব্য : আজকের অনুবাদে আজকের দিনের কবিতার ভাষার সঙ্গে সমঝোতা ক'রে এগোতে হবে, ঠিক যেমন গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুবাদে এখনকার ইংরেজী কবিতার ভাষার সঙ্গে সমঝোতা ক'রে এগিয়েছেন টোনি হ্যারিসন, যেমন কালিদাসের বা বোদলেয়রের অনুবাদে আধুনিক বাংলা কবিতার রীতির সঙ্গে সমঝোতা ক'রে এগিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। গদ্যানুবাদেও সেই একই রীতি—রাজশেখর বসুর রামায়ণ-মহাভারতের ঝকঝকে গদ্যের কথা আর বাইবেলের আধুনিক ইংরেজী অনুবাদের কথা ভাবুন।

শুধুই নিজের আনন্দের জন্যে অনুবাদ ক'রে খাতায় রেখে দেওয়া যায়, বা কাছের বন্ধুদের প'ড়ে শোনানো যায়, কিন্তু যে-অনুবাদ বই হয়ে ছেপে বেরোবে, যাকে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে হবে, বিক্রি হতে হবে, অচেনা কবিকে চিনিয়ে দেবার ভার পড়েছে যার উপরে, তাকে তো কিছুটা লক্ষ্যনির্দেশিত হতেই হবে। টার্গেট অডিয়েন্সের ধারণা না থাকলে গ্রন্থভিত্তিক অনুবাদ-উদ্যোগ সফল হবে কী ক'রে ? এ কথা যে কেবল আমি বিশ্বাস করি তা তো নয়, অনুবাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আরও অনেকেই বিশ্বাস করেন। এই সেদিন সাহিত্য আকাদেমির সচিব অধ্যাপক ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো ঠিক এই বিষয়েই। দেখলাম, তিনিও এ কথা বিশ্বাস করেন। আমার কাজটি ছিলো একটি কমিশন-করা প্রোজেক্ট। ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা সেইরকম পাঠকদের জন্য অনুবাদ প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিলো আমাকে। আমার পক্ষে যা স্বাভাবিকতম তা-ই আমি করেছি—ইংরেজদের ইংরেজীতে অনুবাদ করেছি। এটাই এখন আমার সব থেকে পরিচিত ইংরেজী, এবং এতে অনুবাদ করার জন্য কোনো অ্যাপলজি দেবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। ইংরেজদের ইংরেজী এখনও ইংরেজী ভাষার মূল ধারা, এবং এই ভাষায় লিখলে মার্কিন দেশে, অস্ট্রেলিয়ায়, বা ইয়োরোপের সাহিত্যিক মহলে গৃহীত হতে কোনো বাধা থাকে না। একটা বই বৃটিশ ইংরেজীতে লেখা ব'লে

কোনো সমালোচককে কখনো আপত্তি করতে শুনি নি। এটা একটা তথ্য যে মার্কিন দেশে আমার অনুবাদের ভাষার বিশেষ সমাদর হয়েছে। এবং এটাও তথ্য—যে-সব ভারতীয় নিজেরা ইংরেজীতে কবিতা লেখেন তাঁদেরও কাউকে আপত্তি করতে শুনি নি। নিসিম এজেকিয়েল-সম্পাদিত বোম্বাইয়ের *PEN Review*-তে আমার অনুবাদ উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে। অহংকারবশতঃ নয়, নিজের বক্তব্যের সমর্থনেই এ-সব তথ্য উদ্ধার করতে হচ্ছে আমাকে।

অনুবাদ সফল হবার অর্থ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ 'সাহেব হয়ে গেছেন'। সে এক হাস্যকর কথা। ভাষান্তর মানে একটা পোশাকবদল। সফল ভাষান্তরের অর্থ এই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বকালের সর্বদেশের যে-কবি লীন হয়ে আছেন তাঁর একটা প্রোফাইল অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে, ভাষার ব্যবধান অতিক্রম ক'রে তাঁকে অন্যদের কিছুটা কাছে টেনে আনা গেছে। যে-কোনো দুটো ভাষার স্বভাবের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকবেই, নয়তো দুটো ভাষা আইডেন্টিকাল হয়ে যেতো। সেই ব্যবধানের উপরে সেতু রচনা করতে না পারলে সার্থক অনুবাদ হয় না। এই সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ্য দাবিটুকু করেছি ব'লে সিকদার আমাকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন। বই না দেখেই তাঁর মন্তব্য—আমি নাকি 'সসেজ বেকন বা বিফস্টিক'-এর (বীফস্টেক?) মতো শব্দ ব্যবহার করেছি। ইংরেজী যে 'কাটা-কাটা ধাঁচের একমাত্রিক ব্যঞ্জনান্ত শব্দ' ব্যবহার করে, সে-কথা আজকে প্রথম নয় বহু সেমিনারে বহুদিন ধ'রে বলছি। সেটা সে-ভাষার স্বধর্ম, ভাষাবিদদের জানা খবর। তার সঙ্গে মানিয়েই অনুবাদ করতে হবে।

অনূদিত কবিতার শরীরে মূল কবি আর অনুবাদক কবির উত্তরাধিকারকে পিতা আর মাতা দুই দিকের উত্তরাধিকারের সঙ্গে তুলিত করেছিলাম। সিকদার আমার বক্তব্য না বুঝে লিখেছেন: 'মাতৃত্ব পিতৃত্বের দায়ভাগ নিয়ে যে কূটপ্রশ্ন লেখিকা তুলেছেন, তার সমাধান স্বয়ং জীমূতবাহনও দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।' জীমূতবাহনের কাছে আদৌ যেতে হবে কেন? সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথা তো হচ্ছে না, জেনেটিক উত্তরাধিকারের কথা হচ্ছে। তিনি আরও তুলেছেন 'সারোগেট মাদারের' কথা। সে-কথাও হচ্ছে না। আমি বলতে চেয়েছিলাম, অনূদিত কবিতার শরীরে কিছু উত্তরাধিকার আসে মূল কবির দিক থেকে (বলা যাক পিতা), কিছু আসে অনুবাদক কবির দিক থেকে (বলা যাক মাতা)। ওটা একটা উপমা। অনুবাদক কবি পুরুষ হলেও, বা মূল কবি নারী হলেও, ভূমিকাগুলো একই থাকে। বলতে চাইছিলাম অনুবাদ একরকমের জন্মদান, পুনর্জন্মদান। কিন্তু আসলে কবিতার অনুবাদে সুকুমারবাবুর আদৌ আস্থা নেই, তাঁর সমগ্র চিঠিতে সেই তথ্যটিই বারে বারে ধরা পড়ছে। আস্থা নেই, সেই শূন্যস্থানটি তিনি ভরিয়েছেন বিদ্রূপ দিয়ে। অনুবাদ না ক'রে মূল কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করতে উপদেশ দিয়েছেন আমাকে। উদ্ধার করেছেন জীবনানন্দর লাইন—'বরং নিজেই তুমি

লেখো নাকো একটি কবিতা'। হায় ভগবান, কবিতা তো লিখেই থাকি। তাই তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের কাজে ডাক পড়েছিলো। একটি কেন, অনেক কবিতাই জীবনে লিখেছি, এবং দুটি ভাষায়। তাঁর পড়া না থাকলে কী বা করতে পারি। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সংলাপ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যও তিনি বোঝেন নি। কিন্তু সে-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার জায়গা এখানে নেই।

§

কল্যাণ দাশগুপ্তর চিঠিটিরও (২৯ জুন ১৯৯৬) প্রধান লক্ষ্য আলোচনা নয়, ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গবাণের প্রকৃত জবাব দেওয়া যায় না, এক পাল্টা ব্যঙ্গ ছাড়া, যা দুষ্টচক্র রচনা করে। কিন্তু ব্যঙ্গ করতে গিয়ে মানুষ যে কোথায় নামে, কিছুটা পোস্টমর্টেম না করলে তা ধরা পড়ে না। আমার 'দেশবাসী ব'লে পরিচয় দিতে' তাঁর নাকি 'লজ্জা বোধ হচ্ছে'। লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তো সত্যিই অনেক দশক ধ'রে অপবিত্র ম্লেচ্ছ দেশে অভিবাসী। আমার যে-'অসহিষ্ণু, অগ্রহিষ্ণু, আত্মপ্রচার-উন্মুখ অবয়ব লেখাটির লাইনে লাইনে প্রকট হয়েছে' তা দেখে নাকি তিনি 'সোজা কথায়,রীতিমতো বিরক্ত ও বিকর্ষিত বোধ করেছেন', এবং তাঁর অনুমান, তাঁর মতো 'অন্যান্য অতি সাধারণ বাঙালি পাঠক'ও একই বোধ দ্বারা আক্রান্ত। উগ্র আক্রমণ ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। এত বিরক্ত আর বিকর্ষিত বোধ করলে না পড়লেই পারতেন। একটা লেখা বাদ দিয়ে যেতেন। সব লেখারই যে আবেদন থাকবে সব পাঠকের কাছে, তা তো নয়। আর যুক্তির বদলে নিজের অতিসাধারণত্বের দোহাই দেওয়াটা একরকমের স্টান্ট। আলোচনার টপিকটা যদি অতিসাধারণ স্তরের না হয়ে উচ্চস্তরের হয়, তা হলে কী করবেন? আলোচক ব্যক্তিটিকে পেটাবেন? অসহিষ্ণু অগ্রহিষ্ণু কে? যিনি মার খান, অথবা যিনি মার দেন?

কবিতার অনুবাদকদের জন্যে আমি যে-মর্যাদা ও সৌজন্য দাবি করছি—কেবল নিজের জন্য নয়, সমস্ত সিরিয়াস অনুবাদকদের জন্য—তা তাঁর মনঃপূত নয়। আমার মতে, মর্যাদা ও সৌজন্য না পেলে কোনো কাজই পোষায় না, কারোই পোষায় না। আমার ব্যবহৃত 'পোষানো'র ধারণাটির মধ্যে তিনি 'সাধারণ বাজারি দর-দামের গন্ধ' এবং 'এক শ্রেণীর ইংরেজসুলভ বেনিয়া মনোবৃত্তি' পেয়েছেন। বেনিয়ারা কিন্তু সর্বপ্রথমে একটি ভারতীয় জাত। ভারতীয় বেনিয়াদের সঙ্গেই আমার তুলনা দিলেন না কেন তিনি? তার কারণ চট ক'রে ইংরেজদের উপর একহাত নেবার লোভ তিনি সামলাতে পারলেন না। এও একরকমের বর্ণবাদ—শ্বেত বর্ণবাদের দর্পণ-প্রতিবিম্ব। এই মনোভাব নিয়ে আলোচনা এগোবে কী ক'রে, প্রসঙ্গ যখন ইংরেজদেরই ভাষায়

বাঙালী কবির অনুবাদ? মনে করুন না আমি বিদেশী। তবু আলোচনার আসরে আমাকে সৌজন্য দিতে হবে, এইটেই সভ্য সমাজের নিয়ম।

রবিনসনদের সঙ্গে আমার তর্ককে তিনি মনে করেছেন 'ব্যক্তিগত ঝগড়া', যা কিনা আমি 'জনসমক্ষে টেনে' এনেছি। মোটেই নয়। তাঁদের ছাপা বইয়ে আমার বা র‍্যাডিচির ছাপা বই থেকে ধার নিয়ে তাঁরা যদি ঋণ স্বীকার না করেন, কোনো অ্যাপলজি না দিয়ে বরং চিঠিপত্রে অন্যায় আক্রমণ করতে থাকেন, তা হলে সমস্ত জিনিসটা আর 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার থাকে না। লেখকদের জীবনে এটা একটা পেশাগত ব্যাপার, পাবলিক ব্যাপার। বিলেতে অনুবাদকরা এবং অন্যান্য সুধীজন মোটেই এঁদের কাজকে সমর্থন করেন নি, নিন্দা করেছেন। যাঁরা এ ধরণের কাজ করেন তাঁদের মুখোশ খুলে দেওয়াই দরকার। এ প্রসঙ্গে কল্যাণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'শ্রীমতী কেতকী এক শ্রেণীর বাঙালির মজ্জাগত নিলাজ আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তিটি ছাড়তে পারেন নি।'। এটা একটা অন্যায় এবং অসংযত আক্রমণ--একে মেনে নেওয়া যায় না। নিলাজ আত্মপ্রচারের জন্য আমি কোনোদিনই খ্যাতি লাভ করি নি। উল্টোটাই সত্য। ঐ আত্মপ্রচারের কাজটি ঠিক ক'রে করতে পারলে নানা ব্যাপারে নিজের স্বার্থ আরও অনেক সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে নিতে পারতাম। রবিনসনরা দাবি করেছেন যে আমি বাঙালী ব'লে রবীন্দ্র-অনুবাদ করার যোগ্যতা আমার নেই, হুমকি দিয়েছেন যে র‍্যাডিচির আর আমার ক্ষতি করতে পারেন। এর জবাবে কিছু বলতে গেলেই সেটা 'নিলাজ আত্মপ্রচার' হয়ে যাবে? কারও আত্মরক্ষার চেষ্টাকে আত্মপ্রচার বলার অর্থ হলো--যে-লোকটি অন্যায় আক্রমণের শিকার হয়েছে তাকেই আরেকবার পিটিয়ে দেওয়া। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় রবিনসনদের বইয়ের একটি প্রাজ্ঞ এবং বিশদ সমালোচনা লিখেছেন লণ্ডন-অভিবাসী ডঃ গোলাম মুরশিদ।[৮] কৌতূহলীরা দেখে নেবেন।

অনূদিত কবিতার শরীরে পিতৃ-উত্তরাধিকার ও মাতৃ-উত্তরাধিকারের সহাবস্থানের যে-প্রতিমাটি আমি ব্যবহার করেছিলাম, কল্যাণ দাশগুপ্ত তার মধ্যে পেয়েছেন কেবল 'সেক্স-রিপ্রোডাকশন ইমেজারি'। প্রতিক্রিয়া ঐ স্তরে হলে ('অতি সাধারণ' স্তর?) জবাবে কী-ই বা বলা যায়। আমি 'খাওয়ানো' শব্দটির যে-ইডিয়মাটিক প্রয়োগ করেছিলাম, তাও ইনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। ওটি কলকাতার ইডিয়ম। ব্যবহার করেছি আমি। তার দ্বারা বিলেতের কবিতাপাঠকদের 'রুচির পরিচয়' কিভাবে দেওয়া হয়? 'এতদিন জানতাম টাগোর একজন দাড়িওয়ালা মাস্টারমশাই, এখন আপনার অনুবাদ প'ড়ে দেখছি—আরে, ইনি যে রীতিমতো কবি'—এ কথা আমাকে যিনি বলেছিলেন তিনি একজন বিদগ্ধ কবিতাপাঠক, বয়সেও 'চ্যাংড়া' নন। এটাকে তো আমার মোটেই 'অসংস্কৃত মন্তব্য' ব'লে মনে হয় না, যেমন দাবি করেছেন দাশগুপ্ত। মাস্টারমশাইয়ের ভূমিকার নীচে রবীন্দ্রনাথের কবিপরিচয় কিভাবে চাপা প'ড়ে

গিয়েছিলো, কিভাবে তা আবার পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছে, তারই অকপট স্বীকৃতি আছে এখানে। এবং এ খবর জেনে আমাদের তো আনন্দিত হবারই কথা। দাশগুপ্ত লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের 'পাগল'-এর প্রতিশব্দ 'maniac' না করলে, সত্যিই ওই কুরুচিসম্পন্ন আধুনিক ওদেশি চ্যাংড়া অডিয়েন্সকে রবীন্দ্রনাথ 'খাওয়ানো' যাবে না। অনুবাদক হিসেবে লেখিকার যাও বা মর্যাদা ছিল, তাঁর রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের সমঝদার হিসেবে ওই চ্যাংড়া সম্প্রদায়ের পরিচয়টি দিয়ে তাও তিনি খোয়ালেন।" লেখক এখানে তাঁর উগ্র ইংরেজবিদ্বেষের যে-পরিচয় দিয়েছেন, তা রবীন্দ্রকবিতার ইংরেজী অনুবাদের আলোচনার আসরে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাঁকে রীতিমতো ডিস্‌কোয়ালিফাই ক'রে দেয়। পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথকে আজ যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ছেন, যাঁদের কাছ থেকে আমি ফীডব্যাক পাই, তাঁরা সিরিয়াস কবিতাপাঠক, অনেকেই মধ্যবয়সী, কেউ কেউ প্রবীণ। তাঁরা 'কুরুচিসম্পন্ন ... চ্যাংড়া অডিয়েন্স' নন। কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পৃথিবীর সর্বত্রই আছেন, কবিতা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। এ দেশের কুরুচিসম্পন্নরা ব্লাডঅ্যাক্স বুক্‌স্‌-এর প্রকাশিত বইপত্র পড়েন না। ব্লাডঅ্যাক্স বুক্‌স্ হচ্ছেন সেই জাতের প্রকাশভবন, যেমন এককালে কলকাতায় ছিলেন সিগনেট বা নাভানা। আর তরুণদের 'চ্যাংড়া' ব'লে উড়িয়ে দেবার দরকার আছে কি? এটা একটা তথ্য যে অভিবাসী বাঙালীদের ছেলেমেয়েরা আমার অনুবাদকে স্বাগত করেছেন।

'পাগল'-এর অনুবাদ 'maniac' না করলে চলবেই না, এমন সার্বিক দাবি আমি কোথাও করি নি। আমার বক্তব্যকে এখানে সম্পূর্ণ বিকৃতায়িত ক'রে দেখানো হয়েছে। আমি কেবল বলতে চেয়েছি যে এখনকার বিলেতী ইডিয়মে এই শব্দটির অনুষঙ্গ কী তা সম্যক জেনেশুনেই এ শব্দ ব্যবহার করেছি। এ নিয়ে পরে আবার আলোচনা করছি।

জগন্নাথ চক্রবর্তীর লেখা থেকে কল্যাণ দাশগুপ্ত যে-উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন সেগুলি প'ড়ে বলতে হয়, কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে চক্রবর্তীর আদর্শটি আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। এটি একটি চরমপন্থী অধ্যাপকীয় মডেল। অনুবাদের ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্ বলা যায় একে। জগন্নাথবাবু নাকি বলেছেন যে সমান্তরাল সৃষ্টির বিপজ্জনক অধ্যাসকে ('dangerous illusion') প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। পুরুষোত্তম লালের 'transcreation'-এর মডেলটির কী হলো তা হলে? বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনুবাদসংক্রান্ত চিন্তার মতো কলকাতার ডামাডোলে সেটিও কি আজ ত্যক্ত হয়েছে? জগন্নাথ চক্রবর্তী বলেছেন, অনুবাদে কেবল ডিসিপ্লিন লাগবে, স্বাধীনতা একেবারেই চলবে না। ডিসিপ্লিন ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই সম্ভব নয়, কিন্তু অনুবাদককে যদি কাব্যরস পৌঁছে দিতে হয়, তা হলে তো শুধু ডিসিপ্লিন দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে না, কিছুটা স্বাধীনতা তো তাঁকে দিতেই হবে। জগন্নাথ চক্রবর্তী নাকি আরও বলেছেন যে অনুবাদ

বিজ্ঞানের মতো, সাবজেক্টিভ নয়, 'অবজেক্টিভ ফ্যাক্ট' অর্থাৎ টেক্স্ট্‌ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের মধ্যে 'সাবজেক্টিভ এলিমেন্ট' কিছু নেই এমন দাবি বিশাল এক দার্শনিক তর্কের দরজাকে খুলে দেয়, যে-পথে যাবার জায়গা এখানে নেই। কিন্তু কে না জানেন যে একটা সাহিত্যিক টেক্স্‌টের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কতরকমের দ্ব্যর্থকতা নানার্থকতা। অনুবাদের যে-সম্পূর্ণ যান্ত্রিক মডেলটি ওখানে তুলে ধরা হয়েছে তার দ্বারা টেকনিকাল বইয়ের অনুবাদ ছাড়া আর কী সম্ভব? এই অনমনীয় মডেল দিয়ে সাহিত্যের অনুবাদ সম্ভবই নয়—কবিতা দূরে থাক, গদ্যসাহিত্যও অনুবাদ করা যাবে না। সাহিত্যিক টেক্স্‌টের ইন্টারপ্রিটেশনে সাবজেক্টের ভূমিকা কি ছেঁটে ফেলা যায়? আমরা সকলেই যে-যার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অর্থ বার করি; পাঁচজন লোক একটা কবিতাকে পাঁচভাবে পড়েন। একটা বিশেষ ক্রম মেনে কতগুলি শব্দের সমষ্টি—এই পর্যন্ত তার অবজেক্টিভ সত্তা, কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা তাকে পড়তে বসি, পাঁচজন তাকে দেখি পাঁচ আয়নায়। পাঠক-অনুবাদকের 'আমি'কে বাদ দিয়ে অনুবাদ কী ক'রে সম্ভব? প্রসঙ্গতঃ শেক্সপীয়রের উদ্দেশে লেখা কবিতাটির বিষয়ে এই কথাটা মনে রাখলে ক্ষতি নেই: 'অবজেক্টিভ' বিচারে কিন্তু আমার অনুবাদটা কবির নিজের অনুবাদের চাইতে অনেক বেশী মূলানুগ।

জগন্নাথ চক্রবর্তী যদি ব'লে থাকেন, 'By good and standard translation I mean that which can bring to the reader poetic experience originally recorded in another language', তা হলে আমাদের বলতে হয়, he begs the central question. কেন্দ্রগত প্রশ্নটাই উনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এবং সেটি হচ্ছে: 'কী উপায়ে সাধিত হবে সেই মহৎ উদ্দেশ্য?' কবিতা একটা ভাষার মধ্যে প্রোথিত হয়ে থাকে। সেখান থেকে যান্ত্রিকভাবে খুলে আনা যায় না। শব্দের বদলে শব্দ বসিয়ে অন্য ভাষায় বিধৃত একটা 'পোয়েটিক এক্সপিরিয়েন্স'কে অনায়াসেই অন্য একটা ভাষায় চালান ক'রে দেওয়া যায়, প্রায় একটা সকেট থেকে বাল্‌ব্‌ বের ক'রে এনে আরেকটা সকেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো—এটাই কি নয় একটা চূড়ান্ত ইল্যুশন?

§

এর পর যাঁদের বক্তব্য আলোচনা করবো তাঁদের সকলের চিঠিই ১৩ জুলাই ১৯৯৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথম পত্রলেখক রঞ্জিত সেনগুপ্ত স্ট্র্যাটফোর্ডে কবিতা খোদাইয়ের মূল পরিকল্পনাটারই কিছু সমালোচনা দিয়ে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন। মূর্তি কিন্তু এখন ব'সে গেছে, কবিতাও খোদাই হয়ে গেছে। শুনেছি বাগানের মধ্যে খুব একটা ভালো জায়গায় বসানো হয় নি মূর্তি। জায়গাটা শৌচাগারের কাছে, প্রস্রাবের গন্ধ

নাকি পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। মূর্তি খুঁজে না পেয়ে যাঁরা রিসেপ্‌শনে খোঁজ নিচ্ছেন, তাঁদের বলা হচ্ছে, 'টয়লেটের কাছে'। এবং বাংলা-ইংরেজী দুটো ভাষাতেই খোদাই সাদার মধ্যে সাদা, রঙ বসানো হয় নি, ফলে পড়া যাচ্ছে না। লণ্ডনের কিছু রবীন্দ্রানুরাগী বন্ধু টেলিফোনে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আমার কাছে। কী আর করা, যদি কর্তৃপক্ষের প্রথম সিদ্ধান্তটা বহাল থাকতো, যদি তাঁরা পুরো কাজটার সঙ্গে আমাকে জড়িত রাখতেন, তা হলে শিল্পগত দিকটাও দেখে দিতে পারতাম। এখন আর ও বিষয়ে কিছু করার নেই। মূর্তি যাঁরা বসিয়েছেন, সমালোচনার দায়ও তাঁদেরই বইতে হবে।"

হ্যাঁ, ঐ কবিতার রবীন্দ্রকৃত রূপটি ১৯১৬-তে একটি স্মারকসংকলনে বেরিয়েছিলো, কিন্তু সে-বই এখন লাইব্রেরির কোণ ছাড়া আর কোথায়? ইংরেজীভাষীদের কথা ভুলে যান, ভারতীয় হাই কমিশনের লোকরাও তার খবর রাখতেন না। রঞ্জিতবাবুর চিঠি প'ড়ে মনে হয়, তিনিও অন্য পত্রলেখকদের মতো ভালো কাব্যানুবাদের সম্ভাবনায় গোড়াতেই অবিশ্বাসী। একটা কবিতার শিল্পগত সৌন্দর্যের কিছুটা অন্ততঃ যে চেষ্টা করলে অনুবাদে ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে—এটা আমার মত। রঞ্জিতবাবু প্রশ্ন করেছেন, 'ভাষান্তরে তা কি আদৌ সম্ভব?' আমার জবাব হবে—সকেট থেকে সকেটে বাল্‌ব্‌ সরানোর মতো সহজ নয়, আবার একেবারে অসম্ভবও নয়। সম্ভব যদি না হবে, তবে অধ্যাপক বেইলির মতো প্রাজ্ঞ সমালোচক কেন বলেছেন (*পোয়েট্রি রিভিউ* পত্রিকা, ১৯৯৩) যে আমার অনুবাদগুলির মধ্য দিয়ে এক মহৎ কবির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে? মূলের সৌন্দর্য কতটা ধরিয়ে দেওয়া যাবে তা নির্ভর করছে দুটো ভাষার স্বভাবের পার্থক্য, মূল কবিতার প্রকৃতি, এবং অনুবাদকের কারুনৈপুণ্যের উপরে। একটা কবিতা সব ভাষায় সমান খুলবে না। এজন্যেই অনুবাদককে বাছাইয়ের কাজ করতে হয়। এবং এজন্যেই অনুবাদের ক্ষেত্রে যোগ্য অনুবাদকদের প্রয়োজন আছে।

এই পত্রলেখক এর পর প্রশ্ন করেছেন, গদ্য সারানুবাদ একটা কবিতার শিল্পরূপকে ভালো ক'রে পৌঁছে দিতে পারবে না কেন, পেংগুইন তো গদ্যানুবাদে মালার্মের কবিতা প্রকাশ করেছেন। শুধু মালার্মে কেন, নানা কবিই পেংগুইন থেকে গদ্যানুবাদে প্রকাশিত হয়েছেন। আমার কাছে একটি *Penguin Book of Russian Verse* রয়েছে, যেখানে পাতার উপরের দিকে রুশ হরফে মূল কবিতা দেওয়া, তার নীচে ইংরেজী গদ্যানুবাদ। এই ধরণের এডিশন রুশ ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রদের দিকে টার্গেট-করা। তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই উপযোগী। কিন্তু আপনি যদি রুশ কবিতার ফেনিল স্বাদ পাবার জন্য এ বই খোলেন, তা হলে নিরাশ হবেন। আমি তো সে-স্বাদ পাই না। এ ধরণের অনুবাদ প'ড়ে লাফিয়ে ওঠা যায় না। বিদ্যুতের যে-ভোল্টেজ কবিতার

আত্মা, তা হারিয়ে যায়। সেই বিদ্যুৎপ্রবাহকে গদ্যানুবাদ কেবল তখনই কিছুটা ধরিয়ে দিতে পারে, যখন তার মধ্যে সৃষ্টিশীল স্বাধীনতাকে ইচ্ছে ক'রেই সঞ্চারিত করা হয়, যেমনটা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর আত্ম-অনুবাদক ভূমিকার প্রাথমিক পর্যায়ে, ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র প্রস্তুতিকালে।

রঞ্জিতবাবু জানিয়েছেন যে জো উইন্টার নামে এক কলকাতাবাসী ইংরেজ শেক্সপীয়র-উদ্দেশে কবিতাটির আমার করা অনুবাদ তেমন পছন্দ করেন না। ঠিক আছে। না-ই বা করলেন। কে তিনি জানি না। এই পৃথিবীতে সকলকে তো আর খুশী করা যায় না। কেবল এইটুকু বলা দরকার, উক্ত জো উইন্টারই তো এ ব্যাপারে একমাত্র বিচারক হতে পারেন না। কবি, অনুবাদক, সমালোচক-সমেত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা আমার ঐ অনুবাদটির উচ্চপ্রশংসা করেছেন। জো উইন্টারের চাইতে অধ্যাপক রেইলির মতকেই অধিকাংশ লোক অনেক বেশী মূল্য দেবেন। কিন্তু সে-কথা উদ্ধৃতিসহকারে তুলে ধরতে গেলে তো আবার আপনাদের দরবারে আত্মপ্রচারের বিষম দায়ে পড়তে হবে, তাই না?

আমি নিশ্চয় এ কথা মানি যে ঐ শ্রদ্ধার্ঘ্য-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'top ten' কবিতাগুচ্ছের একটি নয়, কিন্তু যেহেতু সেটি তা নয়, অতএব তার অনুবাদ খোদাই প্রসঙ্গে গুণাগুণ বিচারের দরকার নেই— এটা কি একটা যুক্তি? বহু লোকে যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন, বহু লোকের কাছে যা হবে রবীন্দ্রকবিতার প্রথম স্বাদ, ঠিক সেই জিনিসটির কাব্যগুণই কি প্রচণ্ডভাবে ম্যাটার করে না? জিনিসটা মাঝারি মাপের হলে দর্শকদের মনে দাগ কাটবে না। তাঁরা অন্যান্য দর্শনীয়ের দিকে এগিয়ে যাবেন। হয়তো মনে মনে বলবেন, যেমন বিশ শতক জুড়ে ভেবেছেন এবং বলেছেন ম্যাকমিলান-প্রকাশিত অনুবাদগুলির কত বিদেশী পাঠক 'শুনেছিলাম বড় কবি। কই, তা তো বোঝা গেলো না।' সেই ভ্রান্ত ধারণার কবল থেকেই কবির ভাবমূর্তিকে কি আমরা মুক্তি দিতে চাই না? জিনিসটা ভালো হলে, রবীন্দ্রনাথ যে সত্যিই একজন কবি সেই তথ্যটা তাঁদের মনে গেঁথে যাবে, তাঁদের কৌতূহলকে জাগরিত করবে। হয়তো হাজার-জনের মধ্যে একজন সত্যিই তাঁর কবিতার দিকে এগিয়ে যাবেন। পাবলিসিটি তো এভাবেই হয়, তাই না? এই অত্যন্ত সাধারণ কথাটা কর্তৃপক্ষ বুঝলেন না কেন?

আমার বিশ্লেষণ, বুঝেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাকে মানতে পারেন নি। কেননা, তা হলে যে একজন আধুনিক অনুবাদকের কাজকে স্বীকৃতি দিতে হয়। যাঁরা মূর্তি বসাচ্ছেন সেই উচ্চপদস্থ, মাননীয় ব্যক্তিদের গৌরবে অন্য কেউ— একজন নিছক অনুবাদক— ভাগ বসাবেন, তা কি চলতে পারে?

আলোচ্য কবিতাটিতে শেক্সপীয়রীয় সনেটের আদল ও অনুরণন রঞ্জিতবাবু ধরতে পারছেন না কেন জানি না। সনেটের পরিচয় কি কেবল চোদ্দ লাইন আর অন্ত্য মিলের প্যাটার্নের মধ্যে? বহিরঙ্গের মিল ছাড়াও অন্য মিল হয়— ভাবের মিল, ভঙ্গির

মিল, ঘনত্ব ও প্রতিমাপ্রয়োগের মিল, কবিতার সেই আত্মার মিল, যার কথা বারে বারে বলছি। শেক্সপীয়রীয় সনেটের সঙ্গে এই প্রশস্তি-কবিতাটির সেই আত্মার মিল আছে। যাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে তাঁর গুণ সেই প্রশস্তির মধ্যেই সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া প্রশস্তিধর্মী আর্টের একটি সুপরিচিত কৌশল। সব আর্ট-ফর্মেই এটা দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া 'পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে'র উল্লেখে *A Midsummer Night's Dream* নাটকটির দিকে একেবারে সরাসরি অঙ্গুলিনির্দেশও রয়েছে এই কবিতায়। আলোচ্য কবিতাটির অনুবাদে আমি যে-শেক্সপীয়রীয় অনুরণন সঞ্চারিত করতে পেরেছি তা ইংরেজ সুধীদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

রঞ্জিতবাবুর একটি মন্তব্য আমাকে স্তম্ভিত করেছে। তিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি রক্ষা নিয়ে কেতকী আজ এত চঞ্চল কেন বোঝা দায়।' তাঁর অভিযোগ, রবিনসনদের রবীন্দ্রজীবনীর তরঙ্গভঙ্গে বিলেতের মিডিয়ায় যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তামাশা চলছিলো, তখন আমি নাকি 'প্রতিবাদে সরব' হই নি। এ সূত্রে তিনটি তথ্য তাঁর জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রবিনসনদের রবীন্দ্রজীবনীর প্রকাশ্য সমালোচনা যাঁরা প্রথম করলেন, আমি তাঁদের একজন। বি-বি-সি রেডিওর একটি আলোচনা-অনুষ্ঠানে আমিই বোধ হয় সর্বপ্রথম এই বইয়ের জ্বলন্ত ত্রুটিগুলির দিকে দৃষ্টিনির্দেশ করি। আরও বলতাম, কিন্তু সময় দেওয়া হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, তার পরবর্তী পর্বে বিলেতের খবরের কাগজে 'প্রতিবাদে সরব' হতে র্যাডিচির আর আমার কিছু বাধা ছিলো। আমাদের প্রকাশকরা আমাদের বারণ করেছিলেন। কেননা, সে-সময়ে আমরা দুজন আমাদের বই থেকে স্বীকার না ক'রে ঋণ নেওয়ার জন্য রবিনসনদের প্রকাশকের দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছি। তৃতীয়তঃ, *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় বইটি আমি রিভিউও করেছিলাম।[১] রবীন্দ্রনাথকে যে ঐ বইয়ে সাহিত্যিক হিসেবে ঠিক ক'রে তুলে ধরা হয় নি, বইখানা যে বিলেতের খবরের কাগজগুলিকে তামাশার খোরাক যুগিয়েছে, এ-সব কথা সেখানে অবশ্যই বলেছিলাম। আমার করা এই সমালোচনাটি রঞ্জিতবাবু দেখেন নি মনে হচ্ছে। দেখেছেন কেবল *আনন্দবাজার*-এ প্রকাশিত স্ট্র্যাটফোর্ডবিষয়ক লেখাটি।[২] এবং সেই লেখাটি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, আমার বক্তব্য সেখানে নাকি 'বেশ সবিস্তারেই পেশ' করেছিলাম। এই ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিতও যথার্থ নয়। ন'শো শব্দের মধ্যে আমাকে লিখতে বলা হয়েছিলো, এবং আমি সে-নির্দেশ পালন করেছিলাম।

আমি অবশ্যই জানি ও মানি, 'ইংরেজীভাষী দুনিয়ার বাইরে আছে আরও বিস্তৃত দুনিয়া'। তা যদি না জানবো, না মানবো, তবে ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় অভিবাসী হয়েও বাংলায় লিখি কেন, যখন অধিকাংশ ভারতীয় অভিবাসী লেখক কেবল ইংরেজীতেই লেখেন? আমার দুনিয়াটা তো কেবল ইংরেজীভাষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ

নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি আর্জেন্টিনাতে এবং জার্মানিতে রবীন্দ্রবিষয়ক গবেষণা করেছি। এর বেশী বললে আবারও সেই আত্মপ্রচারের দায়ে পড়তে হবে। আর খুশবন্ত সিং এর মন্তব্য প্রসঙ্গে রঞ্জিতবাবুর জানা প্রয়োজন, ইংরেজীভাষী দুনিয়ার বাইরেও তার 'ফল্-আউট' হয়েছিলো বৈকি। জার্মানি থেকে দুজন আমাকে তার খবর পাঠিয়েছিলেন।

সব শেষে রঞ্জিতবাবুকে জানাই, 'আঁচল' এর অনুবাদে 'cloth-end' জ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে গ্রহণীয় মনে না হলেও এ ব্যাপারে একজন ইংরেজের কাছ থেকেও আমি আপত্তি শুনি নি। বরং 'anchal' লিখলেই তাঁদের ঠোক্কর খেতে হতো। 'With my own breast's cloth-end/ I've clothed your nakedness' বুঝতে কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না এখানে। বাংলা কবিতাকে এখানকার এবং এখনকার ইংরেজীতে গ্রাহ্য কাব্যরূপ দিতে হলে কী চলবে, আর কী চলবে না, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাছবিচারের ব্যাপারটা আমরা যারা এখানকার কাব্যভাষায় অভ্যস্ত, এখানে ব'সে কাজ করছি, তাদের কমনসেন্স ও এক্সপার্টিজের উপর ছেড়ে দিতে আপনাদের কারও কারও এত আধ্যাত্মিক আপত্তি কেন বলুন তো?* ঐ লাইনটা যদি ইংরেজদের কানে বেখাপ শোনাতো, তা হলে আমার প্রকাশভবনের এডিটরই আপত্তি করতেন। কিন্তু এটা একটা তথ্য (এবং আপনাদের জানা প্রয়োজন) যে সেই ঝানু সম্পাদক আমার পাণ্ডুলিপিতে একটি আঁচড় কাটতে পারেন নি। এই ঘটনা আমার ইংরেজী স্টাইলের উপর তাঁর প্রগাঢ় আস্থারই জানান দেয়। সেই খবরটুকুও তো আমি না দিলে আপনারা জানবেন না, আবার আমি দিতে গেলেও আমাকে আত্মপ্রচারের দায়ে ফেলবেন।

§

লণ্ডনের নিকটবর্তী সাটন-এর পত্রলেখক জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে আমি এবং আমার বাড়ির লোকেরা অনেক বছর ধ'রে চিনি। তাঁর চিঠিটি প'ড়ে আমি গভীর দুঃখ বোধ করেছি। প্রথমে র‍্যাডিচির ও আমার রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের কিছু প্রশংসা ক'রে নিয়ে তার পর আমার প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'এই ছেলেমানুষি আত্মম্ভরিতাপূর্ণ নিবন্ধটি বিশেষত শ্রদ্ধেয় শামসুর রাহমানের অপূর্ব প্রবন্ধটির পাশে তাঁর নিজেকেই ছোট করে দেয়।' তাঁর এই অভিমতের জন্য তিনি একটিও যুক্তি দেওয়া দরকারী মনে করেন নি—একটিও না। যেন কারও সম্বন্ধে 'লোকটা খুব খারাপ' ব'লে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারলেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দরবারে খারাপ প্রমাণিত হয়ে যাবে। একটিও যুক্তি না দেওয়ার ফলে চিঠিটি হয়েছে নিছক আক্রমণাত্মক, স্রেফ আমাকে অপমান করার জন্যে লেখা।

শামসুর রাহমান লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, যা একান্তভাবেই তাঁর। আমি লিখেছি আমার অভিজ্ঞতার কথা, যা আমার জীবনের বাস্তবতা থেকে উত্থিত, যার খবর কেবল আমিই দিতে পারি। তাঁর অভিজ্ঞতা আমার নয়, কোনোদিন হতে পারতো না। দেশ-এর সম্পাদক আমার কাছে চেয়েছেন আমারই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা প্রবন্ধ। জয়ন্তবাবুর কাছে 'শ্রদ্ধেয়' হয়ে ওঠার জন্য আমি তো অন্যের অভিজ্ঞতা ধার ক'রে প্রবন্ধ লিখতে পারবো না, তা সেজন্য জয়ন্তবাবুর চোখে আমি যত ছোট হয়েই যাই না কেন। আমি 'ছোট'ই থাকতে চাই, 'ছেলেমানুষ'ই থাকতে চাই, নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে 'বড' ক'রে তুলতে চাই না। বড়মানুষি আর পাকামো আমার সত্যি আসে না।

এর পর যাঁরা আমার অনুবাদের বইটি পড়েন নি 'তাঁদের অবহিতার্থে' জয়ন্তবাবু রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন এবং আমার অনুবাদ উদ্ধার ক'রে দিয়ে মন্তব্য করেছেন, তাঁর মনে হয় 'এই অনুবাদটির যথার্থতা সম্পর্কেও বিতর্কের কিছু অবকাশ আছে'। তাঁর এই মন্তব্য ইনোসেন্ট নয়। বইটি যে বছর বেরোয় সেই বছরই, অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে, আমার করা এই লাইন-দুটির অনুবাদ নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছিলেন। তখনই আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, আমি যেভাবে অনুবাদ করেছি তার কারণ কী। আমার বইয়ের ভূমিকাতেই ব'লে দেওয়া হয়েছে, আমি মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত ১৯৬১ সালের সংস্করণ অনুসরণ করেছি। সেখানে 'দুঃসময়' কবিতাটির ধুয়ায় 'এখনি' আর 'অন্ধ' এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো কমা নেই। আমি ইচ্ছে ক'রেই লিখেছি, 'already blind, don't fold your wings yet'। এতে ক'রে লাইনটির নিহিত কাব্যিক দ্ব্যর্থকতা বজায় থাকে। 'এখনই বন্ধ কোরো না', এই কথাটিও বলা হয়, আবার 'যদিও তুমি এখনই অন্ধ হয়ে গেছো তবুও উড়ে চলো' এই ইঙ্গিতটিও দেওয়া হয়। কবিতার লাইনের তো সব সময়ে শুধু একটা সহজ মানে থাকে না। এক-একটা লাইনের মধ্যে কত দ্যোতনা লুকিয়ে থাকে, হাতছানি দেয়। সেই ঋদ্ধির ইঙ্গিত ধরিয়ে দেওয়াও কাব্যানুবাদকের একটা কাজ।

জয়ন্তবাবু যে পাঁচ বছর বাদে আবারও ঐ দুটি লাইনকেই ঝোলা থেকে বার করলেন, এ থেকেই বোঝা যায়, আমার তর্জমার তরফে আমি যে-কারণ দেখিয়েছিলাম তাকে তিনি কোনো গুরুত্বই দেন নি। একটা কাজ আমি কেন করেছি তার ব্যাখ্যা যদি কেউ মানতে না চান, তা হলে আমার কিচ্ছু করার নেই : ভেদটা তাঁর। কিন্তু মজা এই, ও বিষয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর রীতিমতো আলোচনা হয়ে গেছে, আমি যে তাঁকে জানিয়েছি আমি কেন ওভাবে লিখেছি, তা তিনি ফাঁস করেন নি। তা হলে যে একজন ছেলেমানুষের কথাকে সিরিয়াসভাবে নিতে হয়। ভাগ্যকে ধন্যবাদ, এই অনেক বছরের অভিবাসী বাঙালী এঞ্জিনীয়র পাঁচ বছরের ব্যবধানেও বইটা থেকে আর কোনো 'বিতর্কযোগ্য' লাইন টেনে বার করতে পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আমি

মানুষটা খারাপ হতে পারি, কিন্তু যে-কাজটা করেছি তা নিতান্ত মন্দ না। এই যা, আবারও একটা বাচ্চা মেয়ের মতো শো অফ্ করলাম। কী করবো, সবাই যে বলে আমার বয়স কমতির দিকে, কথাটা বোধ হয় সত্যি।

§

পত্রলেখক অশোক মৈত্রর প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, আমার অনুবাদ 'কেবল একটি দ্বীপবাসী মানুষজনের জন্য' এ কথা তো আমি বলি নি। আমি বলেছিলাম, 'এই দ্বীপের কবিতাপাঠকরাই আমার প্রথম টার্গেট অডিয়েন্স'। 'প্রথম টার্গেট অডিয়েন্স' —তার মানে এ নয় যে আর কেউ প'ড়ে রস পাবেন না। বক্তব্যটা আবার বোঝাই। ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র ঠিক এক নয়। তার মধ্যে নানা ভেরিয়েশন আছে। যিনি অনুবাদ করতে বসবেন, তাঁকে কোনো-একটা অডিয়েন্সের উপর ফোকস্ করতে হবে, তাঁর কানকে কোনো-একটা বিশেষ অঞ্চলের ইংরেজীর সঙ্গে টিউন করিয়ে নিতে হবে। নয়তো অনুবাদ করা যায় না। ঠিক যেমন একটা বাদ্যযন্ত্র ঠিকমতো টিউন না ক'রে নিলে স্বর বাজানো যায় না। আমাকে বলা হয়েছিলো ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা তাদের টার্গেট ক'রে অনুবাদ করতে। আমি যে-দেশে থাকি, যেখানকার ইংরেজীতে আমার কান টিউনড় হয়ে আছে, স্বাভাবিক ভাবে সেখানকার ভাষাই আমার অনুবাদে প্রাধান্য পেয়েছে। 'ভাল অনুবাদ হয় নি—এ মত পোষণ করা চলবে না, কেননা সেই বিলেতি ইংরাজিতে অনুবাদ আমাদের এ দেশীয় পাঠকদের বোধগম্যতার বাইরে' —এরকম কোনো স্থূল অশিক্ষিত মন্তব্য আমি করি নি।

আপনাদের যা মত তা আপনারাই পোষণ করবেন, কিন্তু ইংরেজীতে অনুবাদ তো প্রধানতঃ আপনাদের জন্য নয়, আপনারা তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাংলাতেই পড়তে পারেন। আমার শব্দচয়নের খুঁটিনাটিকে আপনারা যদি কেবল আপনাদের পরিচিত ইংরেজীর নিরিখে সমালোচনা ক'রে বলেন, এটা হয় নি, ওটা হয় নি, তা হলে আমি বলতে বাধ্য অনেকবার বললাম, আবারও বলছি আপনাদের সেই সমালোচনাগুলো আমার প্রাথমিক টার্গেট অডিয়েন্সের নিরিখে অপ্রাসঙ্গিক। ইডিয়মগত সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলো আমি কেন নিয়েছি তা বুঝতে হলে এখানকার এবং এখনকার ইংরেজীর সঙ্গে, তার কাব্যভাষার কলাকৌশলের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই। সেই পরিচয় থাকলে আপনার সমালোচনাগুলো আমি নিশ্চয় মন দিয়ে শুনবো। আমি বলছি, সমালোচনা করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু সমালোচনা করার অধিকারটুকু আগে আয়ত্ত ক'রে নিন, সমালোচনাগুলো যেন informed criticism হয়। উপরে উল্লিখিত জয়ন্তবাবু একজন এঞ্জিনীয়র। আমি যদি আজকে তাঁর কাজের সমালোচনা

ক'রে বলি, আপনার অমুক বা তমুক এঞ্জিনীয়ারিং প্রোজেক্টের কাজ ঠিক হয় নি, তিনি কি আমার সমালোচনা মেনে নেবেন? নেবেন না। কেননা আমি এঞ্জিনীয়র নই। কবিতার অনুবাদেও যে তেমনি একটা professional expertise-এর ব্যাপার থাকতে পারে, এই সামান্য কথাটুকু মেনে নিতে আপনাদের কারও কারও এত আধ্যাত্মিক কষ্ট হচ্ছে কেন?

"এতৎসত্ত্বেও 'রবিনসন অ্যাফেয়ার'-এর জন্ম হল কেন? তাঁরাও তো বিলেতবাসী দম্পতি"--অশোক মৈত্রর এই মন্তব্য আমি ঠিক বুঝলাম না। বিলেতবাসী হলেই বাংলা কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করা যাবে নাকি? রবিনসনের বাংলাজ্ঞান সীমাবদ্ধ, এবং তিনি বা কৃষ্ণা কেউই কবিতা লেখেন না। রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদকর্মে এখানেই তাঁদের পক্ষে মুশকিল। ওভাবে ফাঁকি দিয়ে এর ভাষা ওর ভাষা জোড়া দিয়ে কোলাজ় ক'রে কবিতার অনুবাদ খাড়া করা যায় না।

অশোকবাবুর প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, অনুবাদ 'কালনিরপেক্ষ' হতে পারে না। কেননা ভাষা বদলে যাবেই। 'আধুনিক অনুবাদেও ভালমন্দের বিচার আছে' - হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে, কিন্তু 'যা ভাল, তা চিরকালই ভাল' বলা যায় তখনই, যখন সুধীজন অনূদিত সাহিত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে ক্লাসিকসের মর্যাদা দিতে সম্মত হন। তার পূর্বশর্ত হচ্ছে সাহিত্যের আসরে অনুবাদক্রিয়াকে এবং যাঁরা সে-কাজ করেন তাঁদের মর্যাদা প্রদান। আপনারা কি তার জন্য তৈরি? আমার অভিজ্ঞতা তো তা বলছে না। তাই তো এত সব কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। যতদিন আপনারা ভাববেন যে 'অনুবাদ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা' (সুকুমার সিকদার), ততদিন অনুবাদসাহিত্যের চিরকালীন হবার চান্স কোথায়? তা ছাড়া, ভাষার চেহারা যখন বদলে যায়, তখন পুরোনো অনুবাদ যত সুন্দরই হোক না কেন, নূতন অনুবাদের একটা প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমার অনুবাদ কালভিত্তিক এবং স্থানভিত্তিক। আমি তাতেই খুশী। আমার করা তর্জমা অনুবাদসাহিত্যের ক্লাসিক হলো কিনা তা নিয়ে এ মুহূর্তে আমার মাথাব্যথা নেই। অনুবাদসাহিত্যের ইতিহাসে তা আপাততঃ চিহ্নিত হোক স্থানকালের তকমায়। এক মুহূর্ত ভেবে দেখুন---যাকে বলছেন 'কবির সঙ্গে চিরকালের পাঠকের যথার্থ সম্পর্ক', সেটা কী? কালে কালে পুরোনো ক্লাসিকদের কি আমরা নতুন ক'রে ইন্টারপ্রিট করি না, তাদের সঙ্গে নতুন ক'রে সম্পর্ক স্থাপন করি না? কাশীরাম দাস মহাভারতকে যেভাবে বুঝেছিলেন, রাজশেখর বসু বা বুদ্ধদেব বসু বা শাঁওলী মিত্র কি সেই একইভাবে বোঝেন? 'চিরকালের পাঠক' একটা বিমূর্তন, একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন। চিরকালের পাঠকের কথা ভেবে অনুবাদ করতে বসা যায় না। আমিও করি নি। ঠিক যেমন ঈশ্বর গুপ্তের বাংলায় আজকের বাংলা কবিতা লেখা যায় না, কবিতা লিখতে হলে লিখতে হবে আজকেরই ভাষায়, ঠিক তেমনি এক ভাষার কবিত্বকে আরেক ভাষায় ধরিয়ে দিতে

হলে অনুবাদ করতে হবে এখনকারই ভাষায়। নয়তো প্রতিমায় প্রাণ আসে না, তা পাষাণ হয়ে থাকে। 'চিরকালের' জন্য আছে মূল টেক্সট্। চিরকালের পাঠক ব'লে যদি কোনো সত্তা থাকে তবে তার সঙ্গে মূল টেক্সট্ই কারবার করবে। আর অনুবাদ হবে কালে কালে, চলিষ্ণু ভাষাদের নৃত্যের তালে তালে।

একটা কবিতার ভাষার মধ্যে তার নিজস্ব সময়ের ছবি ফুটে উঠবেই। অনুবাদটা হাল আমলের ডায়ালেক্টে হলেও দক্ষ অনুবাদকের হাতে সে-ছবি নষ্ট হয়ে যাবে না। এটা একধরণের সমঝোতা, দুই প্রজন্মের মধ্যে সংলাপের মতো। একই সঙ্গে মূল কবিতার চিরন্তন মানবিকতাটুকুও ধরিয়ে দেওয়া চাই, যাতে পাঠকরা মনে করেন, বাঃ, এ তো দূরের জিনিস নয়, আমার কাছেরই জিনিস। দূরকে নিকট করার জন্যই তো অনুবাদ। একরকমের বন্ধুত্ব পাতানো। তাই 'কোথায় কারা কতটুকু খাবে না-খাবে' অনুবাদককে তা ভাবতেই হবে। সেই ভাবনা থেকে ছুটি পাওয়া অসম্ভব। সেটা না ভাবলেই অনুবাদ শিল্প হয়ে উঠতে বাধা পাবে। আর টীকা-টিপ্পনী থাকলেই যে মনে করতে হবে অনুবাদ রসোত্তীর্ণ হয় নি, এমন কথা তো আমি কোথাও বলি নি। এক দেশের কবিতা অন্য দেশে পেশ করতে হলে ন্যূনতম কিছু টীকা-টিপ্পনী তো লাগবেই। আমার অনুবাদ-বইয়ের শেষেও টীকা-টিপ্পনী আছে।

§

বাকি রইলো সুধীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিখানি। ইনিও আমার 'maniac' শব্দটির ব্যবহার উল্লেখ ক'রে তারই জের টেনে অনুবাদের শব্দচয়ন কী পদ্ধতিতে হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই সূত্রে এবারে তা হলে নামা যাক আলোচনার আরেকটু গভীরে।

খুব সম্প্রতি আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেলাম, নবনীতা দেব সেন একদিন সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে-প্রসঙ্গে আমার করা কয়েকটা অনুবাদও আলোচনা করেছেন, তাদের পাশাপাশি তাঁর নিজের করা অনুবাদও সভায় পাঠ করেছেন। মার্জিনে মন্তব্যসহ আমার অনুবাদের পাতার জেরক্সও পেয়েছি। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবেদন আর এই-সব কাগজপত্র দেখার পর তাঁর অনুবাদের পদ্ধতি আর আমার অনুবাদের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো।

নবনীতার ঝোঁক আক্ষরিক অনুবাদ করার দিকে। তা করতে গিয়ে ভাষা যদি গদ্যধর্মী হয়ে যায়, তাতে তাঁর আপত্তি নেই বুঝতে পারছি। তিনি নিজে কবিতা লেখেন, তা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদের পদ্ধতিটি সাবধানী, রক্ষণশীল, সৃষ্টিশীল ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত

নয়। এর দ্বারা যে-তর্জমা তৈরি হয় তা মূলের সাদা অর্থের একটা জানান দেয়, বাংলা-না-জানা ছাত্রদের বাংলা পড়ানোয় কাজে লাগতে পারে। ছাত্ররা মূল আর অনুবাদ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে মূলের মানে বুঝে নিতে সহায়তা পাবেন। কিন্তু মূলের প্রাণস্পন্দনকে ধরাতে হলে, কবিতাকে কবিতা ব'লে চেনাতে হলে অনুবাদের অন্য একটা আঙ্গিক লাগে। আমার সেইটাতেই আগ্রহ। ঐ প্রথম জাতের অনুবাদ ছাত্রজীবনে বহু করেছি — শিক্ষক-পরীক্ষকদের খুশী করার জন্য, একটা ভাষা যে শিখেছি তার জানান দেওয়ার জন্য। ও কাজে আমার আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

এখন যদি কবিতা অনুবাদ করি তা হলে কেবল করি কবিতা থেকে কবিতায় সাঁতরে যাবার চ্যালেঞ্জে। কবিতার অনুবাদ আমার কাছে একপ্রকারের সমান্তরাল নির্মাণ। তার মানে এ নয় যে আমি মূলের অর্থকে অগ্রাহ্য করি। আমার দৃষ্টি সব সময়ই নিবদ্ধ থাকছে টেক্সটের দিকে। আমারও চেষ্টা আছে মূলের অর্থের যতটা কাছে থাকা যায় তার দিকে। তবে এটাও আমার প্রশ্ন . একটা কবিতা কি তার সাদামাঠা গদ্য অর্থের সঙ্গে 'আইডেন্টিকাল' ? একটা কবিতা কি তার গদ্যার্থ ? সেই অর্থটুকু ধরিয়ে দিতে পারলেই কি কবিতাকে পাওয়া যায় ? এ ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। '... কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোবানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়।'

কবিতা আর তার গদ্যার্থ যদি অবিকল এক হতো, তা হলে আমরা আদৌ কবিতা লিখতাম না, সব সময় সহজ গদ্য স্টেটমেন্ট দিয়ে কাজ চালাতাম। কবিতা লিখি, তার কারণ কবিতার মাধ্যমে আমরা অনেকভাবে কম্যুনিকেট করি। কবিতায় ধ্বনির নকশাও কথা বলে। তার একটা সাংগীতিক মাত্রা আছে। অর্থের সঙ্গে ধ্বনিজাল মিলে অন্য একটা ঐন্দ্রজালিক প্যাটার্ন তৈরি হয়, যা থেকে নানা অর্থের — অনেকান্ত ব্যঞ্জনার — ঝিলিক বেরোতে থাকে। সেই বৃহত্তর রূপময় প্যাটার্নটাই কবিতা-নামক আর্ট। গদ্যার্থটা তার একটা অংশমাত্র। অংশমাত্রের অনুবাদকেই চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতে হবে কেন ? আমার চেষ্টা বড় প্যাটার্নটার দিকে দৃষ্টি রেখে অনুবাদের ভাষায় তুলনীয় আরেকটা প্যাটার্ন তৈরি করা। সেটাই কাব্যানুবাদের আর্ট। তার মানে মোটেও এ নয় যে মূলের শব্দক্রম, অন্ত্য মিল ইত্যাদির হুবহু নকল করতে হবে। তা করতে গেলে সাব্লাইম থেকে রিডিকুলসে হড়কে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। রবীন্দ্রকবিতার ইংরেজী অনুবাদে যেখানে অমন চেষ্টা করা হয়েছে তেমন কিছু উদাহরণ দেখেছি। অন্ত্য মিল সর্বত্র বজায় রাখতে গেলে প্রায়ই ক্যারিকেচরের ভাব এসে যায়, জিনিসটা আধুনিক ইংরেজীতে কবিতা হয়ে ওঠে না। কবিতাপাঠকদের হাতে অমন জিনিস দিলে তাঁরা হাসবেন। নূতন রূপময় প্যাটার্নটা তৈরি করতে হবে যে-ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তার

আধুনিক কাব্যভাষার স্বভাবের সঙ্গেও সঙ্গতি রেখে। তবেই কবিতার রস সঞ্চারিত হবে। এখানে ডগমা অচল, যা দরকারী তা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো লাইন যদি আক্ষরিক অনুবাদেই সব থেকে ভালো খোলে, তা হলে তা করতে আমি দ্বিধা করি নি। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো'—এর অনুবাদ আমি করেছি : 'The moon's laughter's dam has burst:/ light spills out'—আক্ষরিক অনুবাদ, কিন্তু আধুনিক ইংরেজী কাব্যভাষার পরিপ্রেক্ষিতে অভিঘাতময়।

নবনীতার অনুবাদের মডেলকে যদি বলা যায় অ্যাকাডেমিক মডেল, আমারটাকে বলা যেতে পারে আর্টিস্টিক মডেল। এখানেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। এতে দোষ নেই—মেনে নেওয়া যাক দুটোর লক্ষ্য আলাদা। এ ছাড়া নবনীতার অনুবাদের ভাষা ভারতীয় ইংরেজীকে ঘেঁষে চলে, আমারটা চলে ইংরেজদের ইংরেজীকে ঘেঁষে। এও স্বাভাবিক, কেননা তিনি ওখানে থাকেন, আর আমি থাকি এখানে। আমার কেবল এটাই বক্তব্য, ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা তেমন কবিতাপাঠকদের কাছে অন্য ভাষার কাব্যরস পৌঁছে দিতে হলে আর্টিস্টিক পদ্ধতিটাই বেশী কাজ দেবে। এই মূল্যায়নের সঙ্গে আত্মম্ভরিতার কোনো সম্পর্ক নেই।

আরও উদাহরণ দেওয়া যাক। 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি/ আপন গন্ধে মম/ কস্তুরীমৃগসম।' এর অনুবাদে আমার অন্যতম লক্ষ্য হবে মূলের মধ্যে ধ্বনির যে-দাবিদার জাদু আছে, তারই সমান্তরাল একটা জাদু ইংরেজীতেও সৃষ্টি করা। কার্যতঃ সেই জাদুই মূল কবিতাটির কাজ সাধন করছে। নিজের নাভির গন্ধে পাগল মৃগকে বনে বনে ছুটতে আমরা ক'জন আর দেখেছি, সবাই তো আর বনচর বা শিকারী নই, কিন্তু একটা অপরূপ দৃশ্য যে আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে, একটা অ্যাডভেঞ্চারের উন্মাদনা যে আমাদের স্পর্শ করে, তার প্রধান কারণ ধ্বনির সম্মোহন। প-বর্গের ধ্বনির গুচ্ছটি (প-ব-ম) আর ন-ধ্বনির নকশাটি (নে, নে, ন্ধে) লক্ষ্য করুন। আমি এর অনুবাদ করেছি : 'Like a musk-deer/ maddened by my own scent,/ a maniac, I roam/ from forest to forest'—ইংরেজীর সঙ্গে মানানসই ছন্দ সৃষ্টি করতে গিয়ে একটা লাইন বেশী লেগে গেলো, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। ইংরেজীতে ধ্বনির যে-নকশাটা তৈরি করলাম (m, f, n) সেটা কান দিয়ে শুনুন। এমন কি 'maddened' আর 'scent'-এ 'ন্ধ'-র অনুরণনও পাবেন।

আমার যদি আরেকটু সাহস থাকতো, লিখতাম 'from glen to glen', তা হলে ইংরেজীতে সংগীতটা আরও দুর্দান্ত হতো, সুপরিচিত আইরিশ লোকগীতিকার অনুরণন আসতো ('from glen to glen/ and down the mountainside'), কিন্তু তাতে বাঙালী পণ্ডিত-সমালোচকরা আরও খুঁত দেখতেন, কেননা 'glen' হচ্ছে গিরি-উপত্যকা, রবীন্দ্রনাথ 'বনে বনে' বলতে যা বোঝান ঠিক তা নয়। তাই আসল কস্তুরীমৃগ

যদিও বোধ হয় পার্বত্যই—তিব্বতী বোধ হয়—তবু অনেকবার বিবেচনা ক'রে সেটা আর লিখলাম না। 'ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে'র অনুষঙ্গে মনে আনলাম আরেকটি জনপ্রিয় মার্কিন গানের কলি, যেখানে আছে 'You fill up my senses/ like night in a forest,/ like mountains in springtime,/ like a walk in the rain',—শেষে 'forest'-ই বেছে নিলাম।

এবং এখানে সেই 'maniac' শব্দটির ব্যবহার, যা নিয়ে তর্ক উঠেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কেবলই অর্থের খাতিরে নয়, ধ্বনি-নকশার সঙ্গেও (ম, ন) এই শব্দনির্বাচনের সম্পর্ক আছে। শব্দটি একলা দাঁড়িয়ে নেই, ধ্বনির নকশার মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে। কবিতার অনুবাদে শব্দচয়নে কেবল অর্থের সঙ্গে নয়, ধ্বনির সঙ্গেও একটা সমঝোতা চাই। আর গ্রীক উৎসের 'maniac' শব্দটা অনেক দিন আগেই নন-ক্লিনিকাল মাত্রা অর্জন করেছে। অক্সফোর্ড অভিধানে উদ্ধৃত হয়েছে ডিকেন্সের ভাষা : 'The performance of a maniac hornpipe'। ঐ শব্দ এখন সম্পূর্ণ মুখের ভাষা। কবিতারও ভাষা। সিংহলজাত কবি Michael Ondaatje, এখন থাকেন ক্যানাডায়, তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন 'the maniac monsoon'—বাদলদিনের পাগলামির সঙ্গে যা একেবারে খাপ খায়।

শান্তিনিকেতন থেকে পাঠানো কাগজপত্রে আমার করা একটি গানের অনুবাদের পাশে, যেখানে 'তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে' ইত্যাদির তর্জমায় আমি লিখেছি 'will ride your amnesia's tide', সেখানে লেখা মন্তব্য থেকে বুঝতে পারছি, ঐ 'অ্যাম্‌নেসিয়া' শব্দটাও নবনীতার বিচারে 'মেনিয়াক'-এর মতো ক্লিনিকাল টার্ম, একটা রোগের নাম, অতএব ঠিক নয়। কিন্তু এটাও এখন সকলের ব্যবহৃত শব্দ। মূল গ্রীক শব্দটির অর্থ ঐ 'বিস্মৃতি'ই। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি থেকে আহৃত শব্দ দ্রুতগতিতে মুখের ভাষায় ঢুকে যায়। কবিতার মধ্যে ঢুকে যেতে তাদের দেরি হয় না। সত্যি বলতে কি, 'অ্যাম্‌নেসিয়া' বা 'মেনিয়াক' যে কোনো-এক সময়ে ক্লিনিকাল শব্দ ছিলো তা-ই অধিকাংশ লোকে জানবে না। এগুলির ব্যবহার অনেক দিন যাবৎই পুরোপুরি সাহিত্যসম্মত। তা ছাড়া সর্বত্রই প্রাচীন বিদ্যাজগতের শব্দ আধুনিক বিদ্যাজগতের পরিভাষা থেকে নূতন অনুষঙ্গ আহরণ ক'রে ফের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার ভিতরে ঢুকে যায়। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলেছে।

কোনো শব্দের একটা ক্লিনিকাল মাত্রা থাকলেই কবিতার অনুবাদ থেকে তাকে বাদ দিতে হবে, এই যুক্তি ধোপে টিঁকবে না। একমুহূর্ত ভাবলেই বুঝবেন, বাংলা 'পাগল' বা 'উন্মাদ'-এরও ক্লিনিকাল মাত্রা আছে। এই সেদিন আমার পরিচিত এক বাঙালী ডাক্তারকে 'ওয়ার্ডের রোগীরা কেমন' জিজ্ঞাসা করতেই জবাব এলো: 'অধিকাংশই পাগল'। ওয়ার্ডটা ছিলো সাইকায়াট্রির। বাংলাভাষী ডাক্তার পাগলকে

পাগল ছাড়া আর কী বলবেন? সেটা তাঁর কাছে সে-মুহূর্তে ১০০% ক্লিনিকাল টার্ম। তাই ব'লে কি বাংলা কবিতায় 'পাগল' শব্দটা বাতিল হয়ে যাবে? পাগলামির পুরো রেঞ্জকে প্রকাশ করাই তাব কাজ। চবম পাগলকে আমরা বলি 'বদ্ধ উন্মাদ', তাও তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বাধে না চিত্রাঙ্গদার মুখে বসাতে: 'রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে'। আমার 'মেনিয়াক'-এব ব্যবহারও ঐ ছাঁদে।

'পাগল হইয়া' ইত্যাদিব বিকল্প অনুবাদ নবনীতা করেছেন: 'Bewildered, I wander from forest to forest/ Driven by my own aroma/ Like a musk-deer'। এখানে তিনি কাব্যভাষার কোনো নৃত্যমুদ্রা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি, এবং 'bewildered' শব্দে মূলের পাগলামি, উত্তেজনা বা উন্মাদনা অনেক বেশী পোষ-মানা হয়ে গেছে। তাঁর অনুবাদের দুটি নমুনা, এইটি আর 'বাদলদিনের প্রথম কদমফুল'-এর অনুবাদ, আমার কাছে এসেছে। দুটিতেই নবনীতা কবিতার সংগীত সৃষ্টি করাব চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন। লাইনগুলিকে কবিতার মতো ক'রে সাজিয়েছেন, কিন্তু গদ্য ঘেঁষে চলেছেন। বিন্যাস দেখে কবিতার মতো ক'বে পড়তে গেলে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে ফাঁক এসে যায়।

এব সঙ্গে খানিক জড়িয়ে আছে ভারতীয় ইংবেজীব ব্যাপাব। আমি যেখানে লিখি 'The south wind blows/ upon a night of Phalgun', তিনি সেখানে লেখেন 'In this night of spring/ In this southern breeze', আমি যেখানে বলি 'You gave me', তিনি বলেন 'You've gifted me' ইত্যাদি। ভারতীয় অ্যাকাডেমিক চক্র যদি তাঁর টার্গেট অডিয়েন্স হন, তা হলে তাঁদের কানে এই ভাষা হয়তো ঠিকই শোনাচ্ছে, কিন্তু ইংরেজীভাষী কবিতাপাঠকদেব মনে হবে, জিনিসগুলো ঠিক কবিতা হযে বেজে উঠছে না।

পত্রলেখক সুধীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার বক্তব্য, ঘাবড়াবার দবকার নেই, আধুনিক ইংরেজী ব্যবহার করছি ব'লে রবীন্দ্রনাথেব কবিতার রস উবে যাচ্ছে না, বরং সেজন্যেই বসটা ইংরেজ পাঠকদের কাছে পৌঁছচ্ছে। তিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো শুধুমাত্র কবিতা নয়!' কিন্তু কবিতাব অনুবাদককে যে কবিতার উপরেই ফোকস্ করতে হবে। কবিতাকে পৌঁছে দিতে পারলে যেখানে তার সঙ্গে 'আর্ষ' মেসেজ আছে তা-ও কবিতার হাত ধ'রেই পৌঁছে যাবে।

§

পশ্চিমবঙ্গের সুধীসমাজকে চিন্তা করতে হবে, কী তাঁরা চান। যদি চান যে বাংলা কবিতার আক্ষরিক, গদ্যঘেঁষা ইংরেজী অনুবাদ ভাবতীয় অ্যাকাডেমিক মহলের

'অভ্যন্তরীণ বাজার'-এর মধ্যে সার্কুলেট করতে পারাটাই যথেষ্ট, তা হলে তার জন্য নবনীতার মডেল ঠিক আছে। তবে আক্ষরিকতাকে চরমে টেনে নিয়ে গিয়ে সেটাকেই অনুবাদের একমাত্র পন্থা হিসেবে দাবি করলে সেটা হবে একরকমের অনুবাদগত ফাণ্ডামেন্টালিজ়্ম্। আর রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতীকমূর্তির ক্ষেত্রে সে-ধরণের দাবি হবে বিপজ্জনক। তাতে ক'রে যাঁরা বাংলা বোঝেন না তাঁদের কাছে কবি রবীন্দ্রনাথকে চেনানোর কাজ আরও পিছিয়ে যাবে। যদি চান যে বিদেশীরা বা অবাঙালী ভারতীয়রা কবি হিসেবেই আমাদের কবিদেব জানুক, আমাদের কাব্যসুধার স্বাদ পাক, তা হলে লাগবে অন্য মডেলটা। যাঁরা বাংলা জানেন না কিন্তু বাংলা কবিতার রস পেতে চান তাঁদের হাতে নিছক আক্ষরিক অনুবাদ তুলে দিয়ে কী লাভ, যদি তা কবিতাকেই কম্যুনিকেট করতে না পারে? শ্রীলঙ্কার সিংহগিরির গায়ে পর্যটকরা প্রাচীন সিংহলীতে যে-সব শ্লোক লিখে রেখে গেছেন তাদের আক্ষরিক অনুবাদ সংকলিত হয়ে আছে *Sigiri Graffiti*-নামধেয় দুটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ খণ্ডে। মূলের সঙ্গে তর্জমা মিলিয়ে পড়তে হলে ঐ বই অপরিহার্য। কিন্তু কবিতার স্বাদ পেতে হলে পড়ুন ঐ সব শ্লোক অবলম্বনে আধুনিক এক আইরিশ কবি রিচার্ড মার্ফির লেখা ব্লাডঅ্যাক্স-প্রকাশিত *The Mirror Wall* বইটি। কবিতাকে পৌঁছে দিতে ধ্বনির ভূমিকা যে কত বড় তা বুঝতে পারি শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া থেকে। এ দেশে পাবলিক কবিতাপাঠের আসরে রবীন্দ্র-অনুবাদ থেকে যখন পড়ি, শ্রোতারা উঠে এসে বই কিনে নিয়ে যান, বলেন, 'কানে শোনার ফলে বুঝতে পেরেছি যে এ জিনিস কবিতা'। একবার শুধু ভাবুন নাটকের অনুবাদ কেমন হওয়া উচিত সেই প্রশ্নটা। অনুবাদ যত আক্ষরিকই হোক, সংলাপটা যদি গতিশীল না হয়, অনুবাদের ভাষায় মঞ্চে বলার যোগ্য না হয়, তা হলে তা দিয়ে মূল-টেক্সট্-পাঠরত কলেজের ছাত্র ছাড়া আর কার কী কার্যোদ্ধার হবে? সফোক্লিসের এক অনুবাদক তাই তাঁর ভূমিকায় বলেন, 'Inaccuracies are, I hope, as few as is humanly possible; but an accurate rendering is not a translation'। অনুবাদক হিসেবে ঠিক এই কথাই আমারও বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকে উপলক্ষ্য ক'রে কোনো কোনো বাঙালী মহলে আমি অকস্মাৎ যে-আক্রমণের সম্মুখীন হলাম, তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার মতো বিষয়। রবীন্দ্রনামের রাজনৈতিকীকরণ সত্যিই আজ এক দুঃসহ অভিশাপে পরিণত হয়েছে। বাংলার অন্য কোনো কবির অনুবাদকে ঘিরে সংস্কৃতির রাজনীতি এতটা প্রখর হয়ে উঠতো কিনা সন্দেহ।[১০] কেউ কেউ বলছেন, অবাঙালী মহলে আমার অনুবাদের সাফল্যই এই আক্রমণের প্রকৃত উৎস। স্ট্র্যাটফোর্ডের ব্যাপারটা কিছু মানুষের মনের ভিতর থেকে নঞর্থক এক ধূলিঝড় তৈরি ক'রে তাকে বাইরে টেনে আনলো। সেই আঁধিতে সত্যমিথ্যার ভেদ গেলো মুছে। তাসদ্বীপের কৃষ্টি ঘুচে যাবে এমনই এক

দুর্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেউ কেউ। কলকাতার *স্টেট্‌স্‌ম্যান* তদন্ত না ক'রেই লিখে ফেললেন সম্পাদকীয়, 'Dyson vs. Tagore', যেন আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছি। আমার জবাবটি সে-কাগজে যেদিন বেরোলো সেই দিনই শ্যামশ্রী লাল ঐ কাগজে লিখলেন : 'A translator must learn to be humble at the very outset. He or she is, after all, a mere conveyor of another's vision. Think of the recent tiresome argument about the "poor quality" of Rabindranath's own translation of his tribute to Shakespeare, and the superior quality of the rendering by a certain self-important translator. Our respectful namaskars to Jyoti Basu for putting his foot down where it should be...' (৮/১২/৯৫)। এখানে তিনি স্পষ্টতঃ আমাকেই কটাক্ষ করেছেন। তির্যক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে 'a certain self-important translator' না ব'লে অনায়াসেই আমার নাম উল্লেখ ক'রে যা বলার তা বলতে পারতেন। কারও সঙ্গে মতে না মিললে সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ ক'রেই আলোচনায় নামা উচিত। বিদ্যাজগতের সেটাই মান্য রীতি। দিল্লীর *হিন্দুস্তান টাইম্‌স্‌*-এ ৭/১/৯৬ তারিখে আমাকে সরাসরি এবং বীভৎসভাবে আক্রমণ করলেন সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার অপরিচিত এক ব্যক্তি কলকাতা থেকে আমাকে পাঠালেন সেই সাংঘাতিক রচনাটির কাটিং, এবং আমাকে শাসালেন : 'And you definitely deserved the bashing she has given you .. People like you dare to deride Tagore and this is the only treatment you people deserve. Translate when only necessary and do not overestimate yourself'। সহসা আয়নায় নিজেকে আর চিনতে পারি না, আটকা পড়েছি কাফ্‌কার কাহিনীর মতো কোনো জগতে, রূপান্তরিত হয়ে গেছি ঘোরতর রবীন্দ্রবিরোধী এক মহারাক্ষসীতে। এ-সব কাজ তো লোকে ভেবেচিন্তেই করেছেন, মনের ভুলে করেন নি।

ব্যক্তিগত ঠেসটুকু একপাশে সরিয়ে রাখার পরও অনুবাদ বিষয়ে শ্যামশ্রী দেবীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমার অনুবাদের মডেলে কবিতার অনুবাদক 'mere conveyor of another's vision' নন, তিনিও যোগ করেন নিজস্ব কিছু বিদ্যুৎপ্রবাহ, যেমন করেন অভিনেতা বা বাদক, নাট্যলিপি বা স্বরলিপির রূপদানে। এ কথা শ্যামশ্রীও নিশ্চয় জানেন, কেননা তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কবিতা 'transcreate' ক'রে থাকেন। স্ট্র্যাটফোর্ডের অনুষঙ্গে অনুবাদের ভালো-মন্দের বিচার 'ক্লান্তিকর তর্ক' হবে কেন? সেটা ছিলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা। আর রাজনৈতিক নেতার 'putting his foot down' কোনো সাহিত্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আঙ্গিক হতে পারে কিনা সে-বিষয়ে গভীর সন্দেহ থেকেই যায়।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিতে যুক্তিপ্রদর্শনের চেষ্টাও নেই। তাঁর বক্তব্যের সার, রবীন্দ্রনাথের নিজের করা অনুবাদের কোনো সমালোচনা করা চলবে না,

বিশেষতঃ ভারতেব বাইরে থেকে। যে করবে তাকে পেটানো হবে। সোজা কথা। একজন অধ্যাপিকার কলম থেকে নিঃসৃত এই ধরণের রচনা দেখলে বাক্যহীন হতে হয়।

এজন্যেই লিখেছিলাম: 'স্ট্র্যাটফোর্ডসংক্রান্ত ঘটনাবলীর সূত্রে পেয়েছি অসম্মানের পেয়ালা। এটা গভীর দুঃখের বিষয়।' দেখছি দুঃখপ্রকাশ করাটাও আস্পর্ধা। তার সাজা হিসেবে এলো নবোদ্যমে আরও কিছু আক্রমণ। আগেকার আলোচনার জের টেনে বলা যায়, এ আর বাদলদিনের হাওয়ার খ্যাপামি নয়, একটা পুরোপুরি ক্লিনিকাল লক্ষণ, ভালোরকমের maniacal ব্যাপার।

§

একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই বচনা শেষ করছি। কবি, কবির অনুবাদক - প্রথম-দ্বিতীয়-পঞ্চম যে-কোনো শ্রেণীরই হোক না কেন তারা— এতটা উত্তেজনা ও মারপিট ডিজার্ভই করে না। এদের কাণ্ডকারখানা আরেকটু সহানুভূতিময দরদী হাস্যের সঙ্গে নেওয়াই বরং সুস্থতর। এই তো শুনছি, মূর্তিস্থাপনেব অনুষ্ঠানে একটি পুস্তিকা বিলি করা হয়েছিলো, যেখানে ছাপা হযেছে ঐ বিশেষ কবিতাটির একটি হিন্দী তর্জমা, যেটি করেছেন স্বযং ভারতের হাই কমিশনার। মূল বাংলা কবিতাটির পবেই নাকি হিন্দী রূপটি ছাপা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। তিনি অবাক হয়েছেন, কেননা এই তর্জমা মুদ্রণের জন্য বিশ্বভারতীর অনুমতি চেয়ে নেওয়া হয় নি। অনুবাদটি নাকি অনুষ্ঠানে সুরসহযোগে গেয়েও শোনানো হয়। আসলে স্ট্র্যাটফোর্ডের ব্যাপার তো, অনুমান করা যেতে পারে শেক্সপীয়রের ভূত ভর ক'রে আছে সব ঘটনার উপর। ঘটনাগুলোকে দিচ্ছে নাটকের মাত্রা। অদৃশ্য সেই মহান শিল্পী আমাদের যেন কিছু বোঝাতে চাইছেন। তিনি যেন বলছেন, মিছিমিছি লোকে ঠেঙিয়েছে ঐ মেয়েটাকে - 'শিল্পীর অভিমান' প্রকাশ করার জন্য, 'আত্মপ্রচার' করার জন্য, 'ছেলেমানুষি' করার জন্য। যারা ঠেঙিয়েছে, তারা নিজেরাই কি সব অভিমানমুক্ত, অহংবোধমুক্ত, ছেলেমানুষি থেকে মুক্ত? সকলের মধ্যেই আছে কিছু শিল্পীর অহংকার। সকলের মধ্যেই ফুট্‌ফুট্ ক'রে ফুটে চলেছে অহংবোধের উষ্ণ সীতাকুণ্ড। পাগল হযে বনে বনে ছুটছে যে-কস্তুরীমৃগটা, সে-ই 'মেনিয়াক'টাও কি পাগল নয় 'আপন গন্ধে মম'! সে যে কবিসওারই উপমা, খেয়াল আছে আপনাদের? সকলেই চায় তার কাজ ছাপা হোক, তাব নাম অন্যে জানুক, লোকে তাকে মনে রাখুক, তার লেখা পড়ুক। 'রেখো মা দাসেরে মনে ...'। 'দাঁড়াও, পথিকবর ...'। 'আজি হতে শতবর্ষ পরে/ কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/ কৌতূহলভরে '। 'My love shall in my verse ever

live young '। বড়দের অহংবোধ প্রকাশিত হয়ে গেলে কোনো দোষ নেই, সকলের যত রাগ কেবল ছোটদের উপর। দেখুন না কেন, একজন উচ্চপদস্থ মানী বর্ষীয়ান ব্যক্তি, যিনি জীবনে কত কী পেয়েছেন, তাঁব মধ্যেও লুকিয়ে আছে এক নিছক ছেলেমানুষ, যে কবিতা লিখতে চায়, কবিতা তর্জমা করতে চায়, একজন প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা অনুবাদ ক'রে তাঁর নামের পাশেই নিজের নামটা দেখতে চায়, কাগজে ছবি ছাপা হলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়, একটু পাবলিসিটি পেলে বর্তে যায়, অমর হতে চায়।

বড়রাই যখন দুমদাম বড-বড তেলের শিশি ভাঙে, তখন একটা ছোট তেলের শিশি ভেঙেছে ব'লে বেচারী খুকুর উপরে এতটা রাগ করা কেন? যদি আপনাদের জানিয়ে দিই, আমার ঐ প্রবন্ধের কিছু অকৃত্রিম সাধুবাদও আমার দপ্তরে পৌঁছেছে কিন্তু, তা হলে কি আরেকটা তেলেব শিশি ভাঙা হবে? মনে পড়ছে একটি সকালেব কথা, যেদিন সকালের ডাকে ৪ঠা মে ১৯৯৬ এর পত্রিকাটি পেয়েই লণ্ডন থেকে একজন টেলিফোন করলেন আমাকে। তিনি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়েরও চেনা। আমি তো ছেলেমানুষ আর আত্মম্ভরি, তাই সত্যি কথাটা ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। উচ্ছ্বসিত স্বরে ইনি বললেন, 'তুমি এত সুন্দর ক'রে যুক্তি দিয়ে সব বুঝিয়ে বলেছো, এর পর কার আব কী বলার থাকতে পারে! সত্যি, কেতকীদি, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে!' অ্যাঁ, ছোটদের পায়ের ধুলো কেউ কখনো নেয় নাকি?[11] আচ্ছা মুশকিল তো। নিয়তি তখন অদৃশ্যে হেসেছিলো নিশ্চয়ই— 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' যাহোক, ঐ রি-অ্যাক্শনটা যাঁর, তিনি নিজেও বোধ হয় ছেলেমানুষ। বরং উদ্ধাব করা যাক কলকাতার এক অধ্যাপকের লিখিত গম্ভীব বাণী, যা ঢের বেশী অপ্রমত্ত। তিনি লিখেছেন, 'এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্য *দেশ* পত্রিকাকে ধন্যবাদ, আপনাকে তো বটেই। অনুবাদশিল্পে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমবা বাঙালীরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি- European classics-এব ইংবেজী অনুবাদ পড়লেই তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের নতুন মূল্যায়নেও অনেক বাঙালী পণ্ডিতের আপত্তি রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি যে নতুন ধাবাব প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন তার জন্য অভিবাদন জানাচ্ছি।'

বড়রা মাপ ক'রে দেবেন। আসলে আমার দুটো পা-ই একদম গোল। আগে খেয়াল করি নি। কবে যে এরকম হলো তা-ও জানি না। যখন আরও ছোট ছিলাম, তখন তো আকৃতিটা ঠিকই ছিলো। পঞ্চম শ্রেণীর কবিতা লেখা, প্রথম শ্রেণীর কবিদের তর্জমা করা, বড়দের সঙ্গে মাখামাখি---এ-সব করতে গিয়েই হলো বোধ হয়। আমার গোল গোল ছোট্ট ছোট্ট দুটো পায়ের পাশে গডিয়ে চলেছে তেল, মেঝেতে ভাঙা কাচ। এই দশায় যখন উপনীত হয়েছি, তখন কী আর করা, আমি যে পাগল কণ্ঠ ভ'রে তা-ই

বরং জানিয়ে দিই সাহস ক'রে।

১ প্রবন্ধটি এই সংকলনেব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ সেই সময়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভার ছিলো এঁর উপরে। পরবর্তী কালে ইনিই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৯৭ সালের বইমেলায় তাঁব সঙ্গে আমাব দৈবাৎ দেখা হযে যায়। তখন আমাকে আডালে ডেকে দুঃখপ্রকাশ ক'রে বলেন যে ইচ্ছা থাকলেও ও ব্যাপারে তাঁর পক্ষে হস্তক্ষেপ কবা সম্ভব হয নি। এরকম একটা ব্যাপাবে তথ্য ও সংস্কৃতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে পাশ কাটিযে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো কেন, চাপটা এসেছিলো কোন্ দিক থেকে, সেটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন।

৩ ইনি সে-সময়ে ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ প্রশাসক, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন।

৪ গোলাম মুরশিদ, 'পাশ্চাত্যে নতুন রবীন্দ্রচর্চা', *জিজ্ঞাসা*, সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৩।

৫ যথেষ্ট ঢাকঢোল পেটানোর পরে শেক্সপীযবেব জন্মস্থান ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি যে কিভাবে উদ্যানের পাবলিক টয়লেটের কাছে বসানো হলো তা রহস্যজনক। প্রথম থেকে এটাই কি নির্বাচিত লোকেশন ছিলো, না কি শেষ মুহূর্তে কোনো রদবদল হয ? দূতাবাস যে কী ক'বে এটা অনুমোদন কবলেন তা ভেবে পাই না। একটা ভয়ংকব প্রশ্ন জাগে মনে। এ উপলক্ষ্যে স্ট্রাটফোর্ডের কর্তৃপক্ষ এক বছর ধ'বে দূতাবাসের অস্থিরচিত্ত অবস্থাব ও টালবাহানাব বিশদ পরিচয় পেয়েছেন। প্রস্তরফলক বসবে, না মূর্তি বসবে, বসলে কোন্ মূর্তিটি বসবে, কেননা শুনেছি প্রথম দফায় যে-মূর্তিটি পাঠানো হয়েছিলো সেটি বেশী ভারী আর বৃহৎ বিবেচিত হওয়ায় আরেকটি ক্ষুদ্রতর মূর্তিব জন্য অর্ডার যায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেটিই নাকি বসানো হয়। তার পর কোন্ অনুবাদটি খোদাই হবে, সে-ব্যাপারেও তাঁরা দেখেছেন যে দূতাবাস প্রথমে একরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে সেটা বদলেছেন। দূতাবাসের এই দীর্ঘসূত্রিতা ও অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় পেযে স্ট্র্যাটফোর্ড কর্তৃপক্ষ কি 'যাক গে, মরুক গে' ব'লে শেষ মুহূর্তে হাতের কাছে যে-জায়গাটুকু ফাঁকা পেয়েছিলেন সেটাই এজন্যে নির্দিষ্ট করেছিলেন ? জায়গাটা তো সত্যিই উপযুক্ত হওয়া উচিত ছিলো, সে-বিষযে প্রথম থেকেই একটা সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিলো। মূর্তির

লোকেশন কি দূতাবাসের অপটুতা, গড়িমসি, কূটনীতিজ্ঞানের অভাব ও অবিমৃশ্যকারিতার পরিণাম? কোন্ অনুবাদ যাবে সেই নিয়ে তুমুল তর্কের পরে যখন শুনলাম যে পাবলিক টয়লেটের কাছে রবীন্দ্রমূর্তি বসেছে তখন আমি এত গভীর বেদনা বোধ করি যে তার পরে আর সেই বাগানে যাই নি। এই সময়ে একবার কোনো-এক অতিথিকে স্ট্র্যাটফোর্ড দেখাতে হয়েছিলো বটে আমাদের। আমাদের এখান থেকে স্ট্র্যাটফোর্ড শহর গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ। আমার মনে আছে যে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু গাড়িতেই বসেছিলাম, নামি নি, সেই বাগানে ঢুকি নি। আমার স্বামী নেমে অতিথিকে বাগানটা দেখিয়ে আনলেন, আর জানালেন যে হ্যাঁ, খবর ঠিক, মূর্তি টয়লেটের কাছেই বসেছে বটে, আর খোদাইও সাদার উপরে সাদা হওয়াতে দুর্নিরীক্ষ্য।

৬ পরবর্তী কালে একবার তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আরও পরে *পোয়েট্রি রিভিউ* পত্রিকার অনুরোধে আমি তাঁর *গীতাঞ্জলি*-র অনুবাদ (বৃটিশ সংস্করণ, অ্যান্‌ভিল, ১৯৯৮) রিভিউ করি। মূল *গীতাঞ্জলি*-র সব ক'টি কবিতার ইংরেজী রূপ তৈরি করার চেষ্টা উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার বিচারে উইন্টারের কাব্যানুবাদের তাত্ত্বিক মডেলটা এত অনমনীয়—বলা যায়, এত 'মৌলবাদী'—যে তার সাহায্যে বাংলাভাষার কবিতা থেকে ইংরেজী ভাষার কবিতায় পৌঁছনো সহজসাধ্য নয়। তিনি সমান্তরাল বা তুলনীয় নির্মাণে বিশ্বাস করেন না। তাঁর প্রাথমিক এবং সার্বত্রিক লক্ষ্য হচ্ছে মূলের ছন্দমিলের প্যাটার্নটাকে অবিকলভাবে তর্জমায় টেনে আনা। এ প্রচেষ্টা ভাষাগোষ্ঠীগত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ভাষাদের মধ্যে অনেকাংশে সফল হতে পারে, যেমন ফরাসী, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ়-এর মধ্যে, বা বাংলা-হিন্দী-গুজরাটীর মধ্যে, কিন্তু বাংলার ফর্মাল নকশাকে ইংরেজীতে হুবহু টেনে আনা, একই সঙ্গে কাব্যগুণকেও রক্ষা করা, অনেক বেশী কঠিন কাজ, কেননা ইতিহাস-ভূগোল-সংলগ্ন বিবর্তনের কারণে দুটো ভাষার চলনবলনের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশী। উইন্টারের আদর্শ মেনে এক-মুঠো কবিতার ক্ষেত্রে যদি-বা কিছুটা সফল হওয়া যায়, একটা পুরো বইয়ের ১৫৭-টি কবিতার তর্জমায় সে-লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয়। ঠিক তা-ই হয়েছে। কয়েকটি কবিতা চমৎকার উতরেছে। কোনো কোনো কবিতা অংশতঃ উতরেছে। পাতা উল্টে গেলে চোখে পড়ে যে এখানে একটা স্তবক ওখানে একট স্তবক উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার চাইতে বেশী চোখে পড়ে যে অনেক তর্জমা ইংরেজীতে কবিতা হয়ে ওঠে নি, জবড়জঙ্গ হয়েছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে।

৭ সেই সমালোচনাটিকে এই প্রবন্ধসংকলনের অন্তর্গত করা হয়েছে।

৮ সেটিও আপনারা বর্তমান বইয়ে পেয়ে যাচ্ছেন।

৯ সম্প্রতি একজন বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের *রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুর ডায়ারি* বইটির দিকে (ভারবি, ২০০৯)। সেখানে তপোব্রত আমার অনুবাদের দুটি টুকরোর যথাযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একটি হচ্ছে *কল্পনা*-র 'দুঃসময়' কবিতার অনুবাদে 'অজাগর-গরজে'কে আমি যেভাবে রূপান্তরিত করেছি তাকে ছুঁয়ে। অনুবাদের বইটা বেরোনোর পর এই ডিটেলটি নিয়ে কোনো কোনো বাঙালী সমালোচক তর্ক তুলেছিলেন। আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি বিশদভাবে লিখেছিলাম *রঙের রবীন্দ্রনাথ* (১৯৯৭) বইয়ের ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায়। তপোব্রত সেই আলোচনা পড়েন নি বোঝা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কারও প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা থাকলে আলোচনাটি অবশ্যই দেখে নেবেন। তপোব্রতর অন্য অস্বস্তি একটি গানের অংশ নিয়ে। তিনি লিখেছেন: " 'যত সব মরা গাছের ডালে ডালে/ নাচে আগুন তালে তালে'—অনুবাদকের কতদূর স্বাধীনতায় 'All around me on branches of dead trees/ tarum tarum it dances in rhythmic beats' হয়ে উঠতে পারে সেই নিয়ে কিছুদিন তর্কাতর্কি চলেছিল।" এই টুকরোটা নিয়ে কোনো তর্কাতর্কির কথা আমার নিজের স্মরণে নেই। এখানে যে কোনো মাত্রাছাড়া স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে তা আদৌ মনে করি না। একজন অনুবাদক 'কতদূর স্বাধীনতা' নিতে পারেন সে-প্রশ্ন উঠলে জবাব দিতে হয়: মূলের ভাব, ছবি ও ধ্বনির মিলিত নকশার আদলে অনুবাদের ভাষায় একটা সমান্তরাল নির্মাণ তৈরি ক'রে সেই ভাষাব পাঠকদের কাছে কাব্যরসকে পৌঁছে দিতে হলে যতটুকু স্বাধীনতা নেওয়া দরকার ততটুকু। টার্গেট অডিয়েন্সের জন্য একটা উপযুক্ত ভাষা সৃজন ক'রে নিতে হয়, যাতে নতুন টুকরোটা নতুন ভাষার নিরিখে কবিতার লাইন হয়ে উঠতে পারে। তার নামই সৃষ্টিশীল অনুবাদ। ইংরেজী অনুবাদটাকে যে আধুনিক ইংরেজী কাব্যভাষার নিরিখে কবিতার লাইন হয়ে বেজে উঠতে হবে, সেখানে ধ্বনির যে একটা বড় ভূমিকা থাকবে, এই ব্যাপারটা কোনো কোনো বাঙালী পাঠক বা সমালোচক কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। একদিকে মূল শব্দগুলির সাদামাঠা মানেকে আশ্রয় ক'রে এবং ইংরেজী ভাষার নিজস্ব ধ্বনিস্পন্দনকে অগ্রাহ্য ক'রে বাঙালীদের 'মৌলবাদ', অন্যদিকে মূলের ছন্দমিলের নকশাটার হুবহু নকল করতে হবে এই ব্যাপারে জো উইন্টারের মতো ইংরেজেব অবাস্তব জেদ, যা তাঁর নিজস্ব 'মৌলবাদ'—দুই চরমপন্থী অবস্থানের মাঝখানে কাব্যানুবাদের আলোচনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কবিতার সুষ্ঠু অনুবাদ কিন্তু চরমপন্থা দ্বারা সাধিত হয় না, তাব জন্য নমনীয়তা আর সমঝোতা লাগে।

তপোব্রতর আপত্তি আছে আমার দেওয়া কিছু টীকা বিষয়েও। তিনি

লিখেছেন, 'কিছুদিন আগে টীকাগুলি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে এমন কিছু অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত আছে যেগুলি নিয়ে এখনই আলোচনা হওয়া দরকার। ইংরিজি ভাষার দৌলতে এইসব অনুমান শোচনীয় বিস্তৃতি পাবে, পেয়েও গিয়েছে হয়তো, তবু ...।' যে-প্রশ্নটিকে ঘিরে তাঁর সব চেয়ে বেশী দুর্ভাবনা, সে-সম্পর্কে আমার মত বদলায় নি, তবে তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নতুন আলোচনা যোগ করেছি আমার অনুবাদের বইটির আশু-প্রকাশিতব্য নতুন সংস্করণে। আশা করি সেই সংযোজিত আলোচনা যথাসময়ে তাঁর নজরে পড়বে। আমার মনে একটা প্রশ্ন তবু থেকে যাচ্ছে। তপোব্রতবাবু এই বিশেষ দিনলিপিটি লিখেছেন ১৯৯৪ সালে। বইটি প্রকাশ করেছেন ২০০৯ সালে। 'ইংরিজি ভাষার দৌলতে' রবীন্দ্রনাথের কবিতার অপব্যাখ্যার 'শোচনীয় বিস্তৃতি' ঘটিয়ে থাকতে পারি আমি, তা আশঙ্কা ক'রেও উনি এ ব্যাপারে পনেরো বছর নীরব ছিলেন কেন? তাঁর অভিমতটা অন্ততঃ আমাকে তো জানাতে পারতেন?

১০ ঠিকই, পরবর্তী কালে যখন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ করেছি, তখন এ ধরণের সাংস্কৃতিক রাজনীতির সম্মুখীন হই নি, কেননা রবীন্দ্রনাথকে অনেক বাঙালী মনে করেন তাঁদের সম্পত্তি, আগলে রাখার সামগ্রী, বুদ্ধদেবকে সে-আলোতে দেখেন না। কিন্তু একটি মজাদার জিনিস চোখে পড়েছে বুদ্ধদেব-অনুবাদের বইটির একটি রিভিউয়ে, যা ভারতের একটি বহুলপ্রচারিত ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়। অবাঙালী সমালোচক লক্ষ্য করেছেন যে কবিতাগুচ্ছের আগে দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে। তিনি একটু বিরক্ত হয়েছেন, কবিতা তো তার নিজের জোরেই কথা বলতে পারে, অনুবাদকের এত কথা বলার দরকার কি? তার পরমুহূর্তেই তিনি আমার ভূমিকাটি থেকে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে তথ্যাবলী চয়ন ক'রে কবিকে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তথ্যগুলো আমি সাজিয়ে না দিলে তিনি কী করতেন? সে-ক্ষেত্রে তাঁকে তো অনেক পরিশ্রম করতে হতো! অনূদিত কবির পটভূমিকা চেনাতে ভূমিকা তো লাগবেই, ওটা তো অপরিহার্য। ওটা যোগানো অনুবাদকের অবশ্যকর্তব্য। সেই তিনি আমার ভূমিকাটি ব্যবহার করলেন, অথচ প্রথমেই আমার দিকে একটি তিরস্কার নিক্ষেপ করার লোভ সামলাতে পারেন নি এই সমালোচক। সত্যি, যাঁরা খবরের কাগজের কলামে 'লিটরারি জার্নালিজ্‌ম্' ক'রে থাকেন তাঁদের আরও ঢের বেশী পেশাদারী প্রশিক্ষণ দরকার—সমালোচনাপদ্ধতি আর সৌজন্যসম্মত বাচনভঙ্গি দুই ব্যাপারেই।

১১ পায়ের ধুলো নেওয়া প্রসঙ্গে একটি গল্প না ব'লে পারছি না। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে হায়দ্রাবাদে একটি কনফারেন্সে অনুবাদ সম্পর্কে একটি পেপার পড়তে

আমন্ত্রিত হই। এক বিশাল সোপানশ্রেণী বেয়ে আমরা অনেকে সেই সভায় যাচ্ছি, এমন সময়ে কেউ-একজন আমাকে পাশের লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্মশ্রুভূষিত সেই লোকটিও উপরে উঠছেন, আমিও উঠছি। আমার নাম শোনামাত্র লোকটি অভিভূত কণ্ঠস্বরে ব'লে উঠলেন, 'আরে, আপনিই কেতকী কুশারী ডাইসন ?'—এবং মুহূর্তের মধ্যে, আমি বাধা দিতে পারার আগেই, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি সেই অবস্থাতেই, আমাকে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম ঠুকে ফেললেন। আমি তো রীতিমতো অপ্রস্তুত। প্রথমতঃ, আমি যে তাঁর কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণের অধিকারী, অর্থাৎ তিনি যে আমার থেকে বয়সে ছোট, তাঁর কাঁচাপাকা দাড়ির বাহার দেখে তো তা বুঝবার জো নেই ! দ্বিতীয়তঃ, কেন এই আবেগাপ্লুত সম্মাননা তা যে বুঝতে পারছি না ! প্রগাঢ় আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আপনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিযেছেন, আপনি আমাদের প্রণম্য।' জানলাম ইনি ভারতীয় ইংরেজীর কবি, রঙদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোশাং মার্চেন্ট। আমার অনুবাদ যে একজন অবাঙালী ভারতীয় কবিকে এতটা স্পর্শ করেছে তা জেনে নির্মল আনন্দ অনুভব করেছিলাম। সেই আনন্দ আপনাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিলাম।

[*দেশ*, ৩ মে ১৯৯৭ (২০ বৈশাখ ১৪০৪)। লেখাটি জমা দেবার বেশ কিছু সময় বাদে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রজন্মদিন ঘেঁষে ছাপা হয়। সঙ্গে ওঁরা কিছু আলোকচিত্রও ছেপেছিলেন। সেগুলো আমি পাঠাই নি, ওঁরা ওঁদের লণ্ডন প্রতিনিধির সাহায্যে নিজেরাই আনিয়ে নিয়েছিলেন।]

জার্মানির রবীন্দ্রবীক্ষা :
একজন শান্তিনিকেতনপ্রবাসী জার্মানের চোখে

যতদূর মনে পড়ে, মার্টিন ক্যেম্প্‌শেনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় শান্তিনিকেতনে ১৯৮৯ সালে। শান্তিনিকেতনের বহু মানুষের কাছে মার্টিনদা নামে পরিচিত এই জার্মান পণ্ডিত এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যার উৎস তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখ জীবন। তাঁর জন্ম জার্মানির বোপার্ড শহরে ১৯৪৮ সালে, প্রথম পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা বিভিন্ন ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ভারতে। ভিয়েনা থেকে জার্মান সাহিত্যে ডক্টরেট লাভের পর ১৯৭৩ সালে কলকাতায় কাজ করতে আসেন—গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কাল্‌চারে জার্মান পড়ানোর চাকরি নিয়ে। পড়াতেন সেখানে, কিন্তু থাকতেন আরেকটু দক্ষিণে, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের একটি ঘরে। জীবনের এই পর্ব তাঁকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ভারতীয় দর্শনে এম. এ. পড়তে। তার পর আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে তুলনামূলক সাহিত্যে ডক্টরেট করেন বিশ্বভারতীতে। সেই থেকে তিনি ডেরা বেঁধেছেন শান্তিনিকেতনে, বছরের একটা বড় অংশ সেখানে থাকেন। প্রতি বছর জার্মানিতেও ফেরত যান। তা ছাড়া তাঁর ভারতপর্যটনের অভিজ্ঞতাও বিস্তৃত। দেখতে দেখতে ভারতীয় ভূখণ্ডে তাঁর অনেকগুলি বছর কেটে গেলো—শান্তিনিকেতনেই কেটেছে দুই দশক। বর্তমানে তিনি শান্তিনিকেতনভিত্তিক ফ্রীলান্সার—লেখক ও গবেষক। এবং একজন উল্লেখযোগ্য সমাজসেবকও বটে। শান্তিনিকেতন থেকে অনতিদূরে ঘোষালডাঙা নামে একটি সাঁওতাল-অধ্যুষিত গ্রামে তাঁর গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ সেই কাজ গুরুত্ব ও বিস্তার লাভ করেছে, অন্যদের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছে।

লেখক হিসেবেও মার্টিনের কাজ বৈচিত্র্যচিহ্নিত। পরিশ্রম ক'রে নিষ্ঠাসহকারে বাংলা শিখেছেন তিনি, ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তিনি সেই বিরলসংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যাঁরা মূল বাংলা থেকে সরাসরি জার্মানে অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখেন। মূল বাংলা থেকে তিনি অনুবাদ করেছেন রামকৃষ্ণের *কথামৃত*-এর নির্বাচিত অংশ, রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা, রবীন্দ্রনাথের নাটক *ডাকঘর*। জার্মান ভাষায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট জীবনী। জার্মান প্রকাশকদের জন্য পণ্ডিতী সম্পাদনার কাজ ক'রে থাকেন এবং জার্মান সংবাদপত্রে ভারতসম্পর্কিত প্রবন্ধ

লেখেন নিয়মিত। গ্রামবাংলার জীবনকে ভিত্তি ক'রে মাতৃভাষায় রচনা করেছেন কথাসাহিত্য। আর রবীন্দ্রগবেষণায় তাঁর একটি মূল্যবান দান হচ্ছে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত বই *Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation* (ম্যাক্স ম্যূলর ভবন, কলকাতা, ১৯৯১)। ওখানে ইংরেজীর ঘষামাজায় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। বইটি আমি কলকাতার *স্টেট্‌স্‌ম্যান*-এ এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় রিভিউ করেছিলাম।[১] সেই বইটির সূত্রে একটি নতুন বাংলা বই জন্ম নিয়েছে।* দুটি বইয়ের মধ্যে উপাদানের একটা বড় ওভারল্যাপ আছে, আবার বাংলা বইটিতে কিছু নতুন উপাদানও আছে। ওভারল্যাপ সত্ত্বেও ইংরেজী বইটির সার কথাগুলি বাংলা-পড়ুয়া পাঠকদের জন্য সুলভ ক'রে দেওয়াব এই চেষ্টা ধন্যবাদার্হ। নতুন উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছে মার্টিনরচিত অন্যান্য ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে। এই অন্য লেখাগুলোও অনেক ক্ষেত্রে আমার চেনা-চেনা ঠেকছে, কারণ মার্টিন মধ্যে মধ্যে তাঁর ইতস্ততঃ প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের কর্তিকা আমাকে পাঠাতেন। সংক্ষেপে, মার্টিনের বিভিন্ন ইংরেজী রচনা থেকে সম্পাদনা এবং তর্জমা ক'রে নতুন বইটিকে সাজিয়েছেন জয়কৃষ্ণ কয়াল, যিনি মার্টিনের একজন পুরোনো বন্ধু এবং ভক্ত, এবং নিজেও লেখক। একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন স্বনামধন্য রবীন্দ্রগবেষক প্রশান্তকুমার পাল। সেটি থেকেই জানতে পারছি যে জয়কৃষ্ণ কয়ালের কাছেই 'মার্টিনের বাংলা শিক্ষার হাতেখড়ি'।

বইটির উদ্দিষ্ট পাঠকবর্গ যেহেতু বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকসমাজ, তাই পূর্বোক্ত ইংরেজী বইটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ শৈলীকে বাগে আনাব জন্য কিছু কিছু স্বাধীনতা নিয়েছেন সম্পাদক। টীকার সংখ্যা কমিয়ে এনে কিছু তথ্যসূত্রকে চারিয়ে দিয়েছেন টেক্সটের মধ্যেই। এতে বইটি সাধারণ পাঠকের পক্ষে হয়তো সহজপাঠ্যতর হয়ে উঠেছে, যদিও পৃঃ ৬৮-তে হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের যে-বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তার উৎসটা কিন্তু দেওয়া উচিত ছিলো, নয়তো বাক্যটা বেখাপ্পা লাগে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার একটু অস্বস্তিই লাগে যখন পরিশিষ্টে জয়কৃষ্ণ তাঁর কল্পিত পাঠকবৃন্দ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রে বলেন, 'তাঁরা রবীন্দ্র-আগ্রহী, রবি[-]অনুরাগী ... কেউ বিশেষজ্ঞের দাবিদার নন—নিতান্তই সাধারণ, আমার মতোই। তথ্য আর উপাত্তের খুঁটিনাটি ঘেঁটে বেতন কুড়োতে হয় না তাঁদেব। তাঁরা ভালোবাসেন রবীন্দ্রকথা শুনতে, রবীন্দ্রকথার স্বাদটুকু পেতে।' অস্বস্তি লাগে এইজন্যে যে আমার মনে হয় তথ্য আর উপাত্তের খুঁটিনাটির অনমনীয় গুরুত্বকে সাধাবণ পাঠকদের কাছে কোনোক্রমে খাটো ক'রে দেওয়াটা ঠিক নয়। যে-সব খবর আমরা সরাসরি যাচাই করতে পারি না,

* মার্টিন কেম্প্‌চেন, *জার্মানিতে রবীন্দ্র-বীক্ষা*, অনুবাদ ও সম্পাদনা : জয়কৃষ্ণ কয়াল, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৭, দাম আশি টাকা।

যা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে, সেগুলি আমরা নির্ভরযোগ্য গবেষকদের কাছ থেকে গ্রহণ করি এই ভিত্তিতেই যে তাঁরা তথ্য আর উপাত্তের খুঁটিনাটির ব্যাপারে তন্নিষ্ঠ, তাদের জট ছাড়াবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। গবেষণা নামে উদ্যোগটা সেই নিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর সেই তন্মনস্কতার জোরেই মার্টিন একজন শ্রদ্ধেয় গবেষক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তথ্যনিষ্ঠার যে অশেষ মূল্য আছে, এই কথাটাই সাধারণ্যে চারিয়ে দেওয়া দরকার, যখন একজন বিদ্বান ব্যক্তির কাজকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে তখনও। নয়তো সত্যের নাম ক'রে কেবলই মিথ এবং কিংবদন্তি চালু হয়। সেই সুযোগেই জ্যোতিষী আর ধর্মগুরু থেকে শুরু ক'রে গণমাধ্যমের সংবাদদাতা, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনদাতা আর রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত সুযোগসন্ধানীর দল সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করতে থাকেন। শুধু পুণ্যবান-কর্তৃক মহাভারতের অমৃতসমান কথা শোনার মতো স্বাদু রবীন্দ্রকথা শ্রবণের পিপাসাকে প্রশ্রয় দিলে সেই পুরাতন রবীন্দ্র-কাল্টকেই জাগিয়ে রাখা হয়—জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এককালে যে-গণহুজুগ হয়েছিলো তার সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকে না। সেই হুজুগকে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কিছু সুধীজনের মনে রবীন্দ্রবিরোধী বা রবীন্দ্র-উদাসীন মনোভাব কিভাবে তৈরি হয়ে উঠেছিলো সেই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন মার্টিন। সেটা তাঁর গবেষণার কৃতিত্ব। সে-ক্ষেত্রে তথ্য এবং খুঁটিনাটির প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা এবং মনোযোগকে শিথিল না ক'রে দিয়ে বরং তাদের উজ্জীবিত করা আর সদাজাগ্রত রাখাই জরুরী। পাঠক 'সাধারণ' হলেও তথ্যানুগমনের দায় থেকে তাঁকে রেয়াত দেওয়া যায় না, নয়তো আমাদের পাঠকরা কবে এবং কিভাবে, কোন্ সুদিনে, কোন্ দৈবানুগ্রহে সুশিক্ষিত হয়ে উঠবেন? যুক্তিবর্জিত রবীন্দ্রপূজার একটা স্রোত আমাদের মধ্যে বেশ বহমান ব'লেই এই কথাগুলি বলার তাগিদ অনুভব করছি।

আরও প্রশ্ন করি, সাধারণ পাঠকরাই যদি তাঁর উদ্দিষ্ট হন, তা হলে জয়কৃষ্ণ অনেক বিদেশী নামের পরিচিত চেহারা বদলে দিতে গেলেন কেন? অনুমান করি মূল উচ্চারণের কাছাকাছি যাবার জন্যেই তাঁর এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টা, আর পরিশিষ্টে তিনি উল্লেখ করেছেন যে 'উচ্চারণগুলো হাতে ধরে বসিয়ে দিয়েছেন' মার্টিন স্বয়ং। কিন্তু এই নতুন বানানগুলির সাহায্যে সাধারণ বাঙালী পাঠকের পক্ষে মূল উচ্চারণে পৌঁছনো যে সহজতর হবে এমন আমার মনে হয় না। আমার জার্মানজ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু যতটুকু জানি তা থেকে নির্ভয়ে বলতে পারি যে জার্মান উচ্চারণ বাংলা হরফে নির্ভুলভাবে ধরা যায় না, ওঁদের অনেক ধ্বনির জন্য লাগসই হরফ আমাদের নেই, যেমন আমাদের অনেক ধ্বনির জন্য উপযুক্ত অক্ষর নেই ওঁদের। আসলে এক ভাষার উচ্চারণ থেকে অন্য ভাষার হরফে প্রতিবর্ণীকরণ সর্বদাই একটা আপসের ব্যাপার। এই যেমন মার্টিনের পদবীটাকেই নেওয়া যাক না কেন। তাঁকে টেলিফোন করলে তিনি যখন জার্মান

কায়দায় তাঁর পদবীটা ব'লে নিজেকে সনাক্ত করেন তখন সেটা আমাদের অনেকের কানেই কেম্প্চেনের চাইতে ক্যেম্প্শেনের বেশী কাছাকাছি শোনায়। ওখানে আদ্য এ-ধ্বনির বেশ একটা দীর্ঘীকরণ আছে (যা মূল জার্মানে স্বরবর্ণের উপরে দুটি ফুটকি দ্বারা চিহ্নিত—Kämpchen, এই রূপে) ; এবং ঐ জার্মান ch-ধ্বনিটা ঠিক আমাদের চ-ও নয়, ঠিক আমাদের শ-ও নয়, ঠিক আমাদের খ-ও নয় ; যদিও অবস্থানবিশেষে এটার বা ওটার ছোঁয়া লাগে তার মধ্যে, তবুও সে এক স্বতন্ত্র জার্মান ধ্বনি, যার আঞ্চলিক রূপভেদও আছে (যথা ব্রেখ্ট্/ব্রেশ্ট্), এবং যার নিখুঁত চেহারা বাংলায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। মার্টিনের পদবীটা লিখতে গিয়ে আপস হিসেবেই আমরা হয় 'চ' নয় 'শ' বেছে নিই। জয়কৃষ্ণ লিখেছেন কেম্প্চেন, আমি লিখি ক্যেম্প্শেন।

সে-ক্ষেত্রে Wolff বোঝাতে 'উওলভ্', Schweitzer বোঝাতে 'শুভাইৎসার', Winternitz বোঝাতে 'উইন্টারনিচ্ছ্', Zweig বোঝাতে 'জুয়াইগ' ইত্যাদি বানান কাউকে সাহায্য করবে কি ? আমার তো মনে হয় না। বরং মূল উচ্চারণ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে মনে হয়। প্রথম দৃষ্টান্তে ভ-এর নীচে যদি হসন্ত বসে, তবে ল-এর নীচেও তাকে বসতে হবে, নয়তো লোকে তাকে ভুল পড়বে। 'শুভাইৎসার' দেখলে আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে 'শুভ' শব্দটি। শব্দটি তাৎপর্যের দিক দিয়ে শুভ সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ স্বনামধন্য মনীষীর নামের আদ্য ধ্বনির সঙ্গে তার যোগ অল্পই। জার্মান tz আর আমাদের চ্ছ-র মধ্যে কিছু দূরত্ব আছে, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক চ-এর রেশ অভিপ্রেত হলে তা আলাদা ক'রে জানিয়ে দেওয়া দরকার, নয়তো মূলধারার উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তার উপরে চ্ছ-র নীচে হসন্তচিহ্ন দিলে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বটুকু অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ সেই দ্বিত্বকে উচ্চারণে ধরানো যাবে না। আমাদের জ্ব-এর উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব নেই, আর আমাদের বর্গীয় জ-ও জার্মান z নয় (ইংরেজী z-ও নয়, ফরাসী j-ও নয়, যেজন্যে বুদ্ধদেব বসু ও দুটো ধ্বনি বোঝানোর জন্য জ-এর নীচে একটি বা দুটি ফুটকি বসাতেন)। অন্তঃস্থ ব আমাদের নেই। থাকলে অনেক অ-বাংলা নামের বেলায় সুরাহা হতো। সংস্কৃতে ছিলো, আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছি। আপসে লেখা হয় 'ভ' অথবা 'হ্ব'। আমার বিনীত ব্যক্তিগত মত এই: উল্লিখিত নামগুলির ক্ষেত্রে যথাক্রমে 'হ্বোল্ফ্' বা 'ভোল্ফ্', 'শোয়াইৎসার' বা 'শ্ভাইৎসার', 'উইন্টারনিৎস্' এবং 'ৎসোয়াইগ' আপস হিসেবে অধিক নিরাপদ। আরও বলি, রবীন্দ্র-অনুবাদক ফরাসী কবি André Gide-এর নামটা জয়কৃষ্ণ 'আঁদ্রে গীদ' লিখেছেন কেন বুঝলাম না। পদবীর আদিতে যে-ব্যঞ্জনবর্ণ আছে তার উচ্চারণ তো 'গ' নয়। তার যথার্থ রূপান্তর নতুন হরফ ছাড়া অসম্ভব। বুদ্ধদেব বসুর রীতি মেনে লেখা যায় 'জ়িদ'। কিন্তু ফন্টে 'জ়' না থাকলে আপসে স্রেফ 'জিদ' লেখাই নির্ঝঞ্ঝাট—আমরা ঐ বানান দেখতে যথেষ্ট অভ্যস্ত।

বিদেশী ভাষা থেকে আমাদের প্রতিবর্ণীকরণে আপসকে যেহেতু শেষমেষ মানতেই হবে, তাই আমার মনে হয, নামের লিখনে পরিচিত বানানের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রক্ষা করা মন্দ আইডিয়া নয়—এক যদি না পূর্বপরিচিত বানানে কোনো অমার্জনীয় অশুদ্ধতা থাকে। ইকবাল করিম হাসনু[২] আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমার *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোব সন্ধানে* বইয়ে আমি 'আর্হেন্তিনা' লিখি নি কেন। সে ঐ ভৌগোলিক নামটার পরিচিত রূপের সঙ্গে যোগরক্ষার জন্যেই। নামটা আমরা প্রথমে ইংরেজীর মধ্যস্থতাতেই পেয়েছি—সেটা ঐতিহাসিক সত্য, যেমন সত্য পারস্যদেশীয় উচ্চারণের কল্যাণে 'সিন্ধু'র 'হিন্দুতে রূপান্তরিত হওয়া, বা গ্রীকদের কল্যাণে ভারতীয় ভূখণ্ডের 'ইণ্ডিযা' নামকরণ এবং ইয়োরোপে ঐ নামের ছড়িয়ে পড়া। তো এখন 'সিন্ধুধর্মাবলম্বী' হওয়ার জন্য আন্দোলন ক'বে লাভ নেই। সারা পৃথিবীতে Bharat নামে চিহ্নিত হতে চাইলে কপালে 'ব্যারাট'-এর অধিক জুটবে না। ঐ আর্জেন্টাইন মহিলার নামের বানানে আমি আদিতে 'বি' বা 'হ্বি' বসাতে সাহস পাই নি, শুধু 'ট'র বদলে 'ত' আমদানি করেছি। পুরোনো আমলের টাইপরাইটারে 'ক্ত' বসাতে একটু ঝামেলা ছিলো,[৩] পাছে 'ত্ত' ছাপা হয়ে যায় সেই ভয়ে ওখানে যুক্তবর্ণটা ক-এর নীচে হসন্ত দিয়ে ভেঙে লিখতাম। আজকাল কম্পিউটারের বোতাম টিপে 'ক্ত' বার করা কোনো ব্যাপার নয়, ফলে 'ভিক্তোরিয়া' লেখাই সহজতর। কিন্তু মহিলার নাম নিয়ে অত ভাবনাচিন্তার পর মনে হলো, এর পর যদি 'আর্হেন্তিনা' লিখি লোকে পূর্ববঙ্গের গীতিকা উদ্ধার ক'রে বলবে, 'এ কোন্ দ্যাশে আইলাম কন্যা'। তাই ও পথে আর পা বাড়াই নি।

বর্হেস বা বোর্হেস-এর কথা আলাদা। তাঁর নাম আমরা প্রথম থেকেই স্প্যানিশ উচ্চারণে শুনছি। তেমনি জয়কৃষ্ণ-সম্পাদিত আলোচ্য বইয়ের পৃঃ ১৭৬-এ Joachim নামটা 'জোআখিম' না হয়ে অনায়াসে জার্মান রীতি অনুযায়ী 'হোআখিম' হতে পারতো, কেননা ওটা তো ইংরেজীর সূত্রে পাওয়া আমাদের কোনো অতিপরিচিত নাম নয়।

যা-ই হোক, মার্টিনের গবেষণার যেটি মুখ্য ফোকস্—জার্মানির মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন পর্বে কিভাবে দেখেছেন, কিভাবে বুঝেছেন—সেই ফোকস্ এই বাংলা বইয়ে সুরক্ষিত হয়েছে, এবং তাঁর উপাদানগুলিকে জয়কৃষ্ণ যেভাবে গুছিয়ে পেশ করেছেন তা সুসঙ্গত। কবির জার্মান প্রকাশকের বাণিজ্যশাসিত দ্ব্যর্থক দৃষ্টিভঙ্গি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কাইজারলিং-রিল্‌কে-মান-প্রমুখ বিভিন্ন জার্মান মনীষী ও সাহিত্যিকের বিচিত্র প্রতিবেদন—এই জিনিসগুলির আদল ইংরেজী বইটার পাঠকরা আগেই পেয়েছিলেন। এখন খবরগুলি সাধারণ বাঙালী পাঠকদের কাছেও পৌঁছবে আশা করা যায়। যে-খবরগুলি আমাদের পূর্বপরিচিত তাদের সম্বন্ধে নতুন ক'রে আর বিশেষ কিছু বলছি না। সূত্রাকারে বলা যায়, একদিকে গণ-উন্মাদনা ও ব্যক্তিপূজা,

অন্যদিকে ঔদাসীন্য ও উন্নাসিক অবজ্ঞা—এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে দোলায়িত হয়েছে জার্মানির রবীন্দ্রবীক্ষা। কিন্তু দুই মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু সুধীজনের আন্তরিকভাবে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে, পুরোনো আমলে জার্মানরা রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন প্রথম হাতে পেলেন তখন তা মূল বাংলা থেকে সুন্দর স্বচ্ছন্দ সরাসরি অনুবাদে নয়। তাঁরা যা হাতে পেলেন তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুবাদের অনুবাদ, এবং সেই ইংরেজী অনুবাদগুলোর অপূর্ণতার কথা আজকের দিনে অনস্বীকার্য। বাংলা শিখে রবীন্দ্রনাথকে মূল থেকে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র একজন—হেলেনে মায়ার-ফ্রাংক। এই মহিলা ইংরেজী থেকে প্রচুর রবীন্দ্র-অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু মূল বাংলা থেকে তাঁর রবীন্দ্র-অনুবাদের উদ্যমের ফসল মাত্র দুটি বই : একটি হচ্ছে তিনটি গল্প নিয়ে একটি চটি বই, অন্যটি একটি ছোট কবিতাসংকলন, যথাক্রমে ১৯৩০-এ এবং ১৯৪৬-এ প্রকাশিত। জার্মানির নিজস্ব ইতিহাসগত কারণে, নাৎসি আমলে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী কালে এই বইগুলির সেরকম অভিঘাত হতে পাবে নি।

হেলেনে মায়ার-ফ্রাংকের উপরে স্বতন্ত্র অধ্যায়টি এই বইয়ে আমাদের একটি বিশেষ প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথকে জানার এবং ঠিক ক'রে বোঝার জন্য এই নারীর ব্যাকুলতা এবং নিষ্ঠা আমাদের স্পর্শ না ক'রে পারে না। তাঁর এই অন্বেষণে তাঁর অধ্যাপক স্বামী হাইনরিশ্ মায়ার-বেনফ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁদের দুজনকার গল্পটা পাঠকদের মনে দাগ কাটবে। পড়তে পড়তে স্পেনের রবীন্দ্রানুরাগী ও রবীন্দ্র-অনুবাদক হিমেনেথ-দম্পতির কথা বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে আমার। মূল থেকে অনুবাদের যে-একক প্রচেষ্টা হেলেনে করেছিলেন, তা যে কালের ডামাডোলে হারিয়ে গেলো, তাঁর নাম যে জার্মানিতে আজ বিস্মৃত, তা ভাবলে মন মথিত হয়। ১৯৪৫-এ হেলেনের স্বামী মারা যান। বোধ করি সেটাও একটা কারণ যেজন্যে কবিতাসংলনটি আরও প্রচার পায় নি, যদিও জানা যাচ্ছে যে তার তিনটি সংস্করণ হয়েছিলো। আসলে একটা বইয়ের ভালো-মন্দ আর তার প্রচার দুটো আলাদা জিনিস। বইয়ের প্রচারে মুরুব্বির জোর লাগে। তার জোরে কত মাঝারি মাপের বই যে এভারেস্টে উঠে যায়, আর তার অভাবে কত উৎকৃষ্ট বই যে আউট অফ প্রিন্ট হয়ে সমুদ্রের তলায় প'ড়ে থাকে, সে তো আমরা হররোজ দেখছি।

তা ছাড়া আছে গোষ্ঠীগত বীক্ষণপ্রক্রিয়ারই মূলগত একটা স্বভাব : একবার এক জাতের প্রতিক্রিয়া হলে, এক ধরণের মূর্তি মাটিতে গেড়ে বসলে তাকে হটিয়ে দিয়ে ভিন্ন ধাঁচের প্রতিক্রিয়া, ভিন্ন গড়নের মূর্তির জন্য সেখানে জায়গা করা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। স্রোত যেদিকে বইছে তার বিপরীতে যাওয়া, মূর্তি একবার তৈরি হয়ে গেলে তাকে ভাঙা—এগুলো কঠিন কাজ। তার জন্য আবার কিছু নিবেদিত সাংস্কৃতিক

কর্মীর নতুন চেষ্টা, নব বৌদ্ধিক আন্দোলন লাগে। ব্যক্তিরা ব্যতিক্রমী হতে পারেন, কিন্তু যূথবদ্ধ মানুষের প্রবণতা হচ্ছে অভ্যস্ত পথে চলা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জার্মানদের দ্ব্যর্থক প্রতিক্রিয়ার যে-ছবি মার্টিন এঁকেছেন তা আমাকে একটুও বিস্মিত করে না। সাধারণ মানুষদের গণ-উত্তেজনা যেমন বোঝা যায়, বুদ্ধিজীবীদের একটু স'রে থাকা বা নাক উঁচু করাও তেমন বোধগম্য হয়, কারণ তাঁদেরও গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থরক্ষার দায় আছে। আর বর্ণবাদের ব্যাপারটাও মনে রাখতে হবে। হাজার হোক, নাৎসিবাদের অভ্যুত্থান যে ঐ সময়েই হয়েছিলো সেই তথ্যটা তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্টিনের আঁকা ছবিটা খুবই প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

বর্ণবাদের প্রসঙ্গে বলতে হয়, এই বইয়ে শান্তিনিকেতনের ইহুদী উদ্বাস্তু অধ্যাপক আলেক্স আরনসন-এর উপরে স্বতন্ত্র নতুন অধ্যায়টি আমাদের আরেকটি বাড়তি লাভ। এই অধ্যায়টিও আমার মন কেড়েছে। আরনসন ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে কাজ করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রভবনে আজকাল আমরা রবীন্দ্রসংক্রান্ত সংবাদপত্রকর্তিকার যে-মূল্যবান সংগ্রহটি পাই তার প্রাথমিক সাজানোগোছানো এই অধ্যাপকের হাতেই হয়। বিশ্বভারতী ছাড়ার পর তিনি দু' বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। জীবনের একটি বিনিশ্চায়ক সময়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রয়গ্রহণকারী একলা যুবক আরনসনের জন্য সমবেদনায় আমাদের মন উন্মথিত না হয়ে পারে না। হুজুগভিত্তিক যে-রবীন্দ্রমূর্তি জার্মানিতে গ'ড়ে উঠেছিলো তার স্বরূপ তিনি ধরতে পেরেছিলেন তিনি নিজে ইহুদী ব'লেই। তাঁর *Rabindranath through Western Eyes* বইটি সম্বন্ধে আমার অনেক দিন ধ'রেই কৌতূহল ছিলো; ১৯৯২ সালে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বইটির প্রথম সংস্করণ (এলাহাবাদ, ১৯৪৩) নিয়ে পড়ি, এবং নোট নিই। তখন বুঝতে পারি যে বইটির কিছু সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জটিল সাংস্কৃতিক রাজনীতির উন্মোচনকারী হিসেবে আরনসন ছিলেন তাঁর সমকালীনদের চাইতে অনেকটা এগিয়ে, এবং সেই কারণে শান্তিনিকেতনে তাঁকে বেশ খানিকটা মার খেতে হয়। *বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি* পত্রিকায় অমল হোম-কৃত 'বিধ্বংসী সমালোচনা' বা অমিয় চক্রবর্তী-কৃত সমালোচনামুখর মুখবন্ধ ঐ তরুণ বুদ্ধিজীবীকে না জানি কতটা আহত ক'রে থাকবে। সত্যের সামগ্রিক রূপের দিকে চোখ বুঁজে থাকা কোনো দেশের একচেটিয়া প্রবণতা নয়। প্রাচ্য জগতের জটিল সত্যের রূপ জানতে পাশ্চাত্য জগৎকে যদি অনাগ্রহী মনে হয়, পাশ্চাত্য জগতের জটিল সত্যের রূপ জানতে প্রাচ্য মানুষরাও সমান নিরুৎসুক হতে পারেন। আরনসন রবীন্দ্রনাথকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন, কবিকে খর্ব করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। আজকের দিনে আমরা যাকে বলি 'মিডিয়া স্টাডিজ্' তাঁকে বলা যায় তারই পথিকৃৎ। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, স্তুতিগায়ক আর নিন্দক দুই দলই নিজ

নিজ প্রয়োজনে প্রাচ্য কবিকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন—নিজেদেরই শূন্যতা ভরাতে হয় তাঁর উপরে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অভিক্ষেপ করেছেন, নয় তাঁকে বিকৃত ক'রে দেখে তার পর প্রত্যাখ্যান করেছেন। দ্ব্যর্থকতা এই প্রতিক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্রে, এবং তা কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রতি জার্মানির (বা ইয়োরোপের) প্রতিন্যাসেই লভ্য নয়, এর একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র বর্তমান। আমার ১৯৯২ সালে নেওয়া নোটে দেখছি আরনসনের একটি বাক্য আমার এতটা মনে ধরেছিলো যে টুকে নেওয়ার পর খাতার মার্জিনে দাগ পর্যন্ত দিয়ে রেখেছিলাম—'For these political ambiguities are inherent in modern man's approach to a poet, and indeed, to poetry in general' (১৯৪৩-এর সংস্করণ, পৃঃ ৫৫)। মার্টিন জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের স্বত্রে আরনসন এবং তাঁর মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিলো, ১৯৯৫ সালে ইস্রায়েলে আরনসনের মৃত্যু অবধি যা অটুট ছিলো। সেই সৌহার্দ্যের সৌরভ এই বইয়ে আমাদের একটি মূল্যবান নিবন্ধ উপহার দিয়েছে।[৪]

এই বইয়ে আরও যে-অংশগুলি আমাদের নূতন প্রাপ্তি—অর্থাৎ যেগুলি ইংরেজী বইটিতে ছিলো না, বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ থেকে এখানে সংকলিত হয়েছে—সেগুলি সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলতে ইচ্ছা করে। সর্বপ্রথম অধ্যায়টিতে মার্টিন বলেছেন তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু কথা, জানিয়েছেন কিভাবে তিনি পৌঁছলেন দুই জগতের মধ্যে সঞ্চরণশীল তাঁর 'অবিবাহিত, অনিকেত এবং অস্থায়ী ঠিকানার' জীবনে। এই অধ্যায়টিকে সর্বপ্রথমে বসিয়ে সম্পাদক জয়কৃষ্ণ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। মার্টিন সম্পর্কে যাঁদের সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা আছে তাঁদের কৌতূহল খানিকটা নিরস্ত হবে, আর মার্টিনের মতিগতি সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিহান—তেমন লোকও পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চয় আছেন!—আশা করা যায় তাঁরা নিরাশ হয়ে তাঁদের গোয়েন্দাগিরিকে অন্যত্র চালিত করবেন। যেহেতু আমি নিজে অনেক দিন ধ'রে মার্টিনের মতো দুই জগতের মধ্যে সঞ্চরণশীল ফ্রীলান্সার, তাই আমার বিশেষ ভালো লাগে মার্টিন যখন নির্ভীক ভঙ্গিতে ঘোষণা ক'রে দেন তাঁর ফ্রীলান্সবৃত্তি। জেনে ভালো লাগে যে জার্মানিতে ফ্রীলান্সাররা ওভাবে আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। মার্টিন জানান, 'জার্মানিতে ... স্বাধীন সারস্বত সাধনার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। বেশ কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এভাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্য রচনা বা গবেষণার কাজে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করার জন্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টান্ত সেখানে বিস্ময়াবনত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ... এ দেশে হয়তো চাকরি জোটেনি বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হবে তাঁদের। চাকরি এখানে সামাজিক সাফল্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।' মানতেই হবে, শেষ বাক্যটা ভয়ংকরভাবে সত্য। আর জার্মানিতে ফ্রীলান্সারদের মর্যাদা যে খাটো নয় এ কথা অন্যদের মুখেও শুনেছি। ভেবে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথও তো

এ ব্যাপারে আমাদের সহপথিক ! আমরা তবু দু'-চার বছর চাকরি করেছি, জমিদারপুত্র রবীন্দ্রনাথ সারাটা জীবন চাকরি না ক'রেই কাটিয়ে দিলেন ! হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও মর্যাদা পেলেন, কিন্তু তিনি তো সেই ব্যতিক্রম, যা নিয়মকে প্রমাণসিদ্ধ করে !

মার্টিন যখন দাবি করেন যে তাঁর 'কোনো পাণ্ডিত্যের তকমা নেই'—আশা করি জয়কৃষ্ণ এখানে মার্টিনের ভাষা ঠিকঠাক তর্জমা করেছেন !—তখন কিন্তু সায় দিতে পারি না ! কেবল একটা নয়, দু'-দুটো ডক্টরেট যাঁর ঝোলায় আছে, 'পাণ্ডিত্যের তকমা' তাঁর অবশ্যই আছে ! তবে মার্টিন যখন শান্তিনিকেতনে তাঁর মানসিক নিঃসঙ্গতার জন্য অংশতঃ দায়ী করেন তাঁর 'কোনো অধ্যাপকীয় তকমা না থাকা এবং সেই সুবাদে বিদ্বৎসমাজে কোনো বিশেষ সামাজিক মর্যাদা না থাকার ব্যাপারটা'কে, তখন তাঁর বেদনা আমি বুঝতে পারি, কেননা দেশী-বিদেশী একাধিক পরিস্থিতিতে ঠিক একই অভিজ্ঞতার শরিক আমি।[৫] আর তারিফ করি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মার্টিনের নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টিকে, যখন তিনি বলেন, 'বিপরীতমুখী বিভিন্ন বিষয়কে তিনি সংগতিসূত্রে একঠাঁই মেলাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অন্য নাম সমন্বয়। জীবন ও মৃত্যু, আনন্দ ও বেদনা, শব্দ ও নৈঃশব্দ্য, মিলন ও বিরহ, আলো এবং অন্ধকার—জীবন জুড়ে পরস্পর বিপরীতমুখী মেরুবিন্দুকে স্পর্শই আমার মতে তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব।' আরও বলি, মজা লেগেছে দেখে যে মার্টিনও তাঁর নিজের জীবনটাকে কখনও কখনও সেতু হিসেবে ভাবেন। আমারও একই কথা মনে হয় প্রায়ই, এবং লিখেওছি তা। ঠিকই, এ ধরণের জীবনের নিজস্ব কিছু অস্বাচ্ছন্দ্য আছে। মার্টিন যেমন বলেন, আছে 'পায়ে পায়ে ভুল বোঝার বিপদ'। আবার তারই পাশাপাশি 'এই জীবনটাই আবার সৃষ্টিশীল, চমৎকার এবং রোমাঞ্চকরও বটে'।

কাইজ়ারলিঙের উপরে অধ্যায়টিতে উল্লিখিত হয়েছে যে তিনি আর্জেন্টিনার 'কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ... আমন্ত্রণে ১৯২৯-এ দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে বক্তৃতা' দিয়েছিলেন। অনেক দেশে দিয়েছিলেন কিনা তা আরও দলিল না দেখে এই মুহূর্তে স্মৃতি থেকে বলতে পারছি না, তবে ভিক্তোরিয়া আর্জেন্টিনায় তাঁর লেক্‌চার ট্যুরের ব্যবস্থা করেছিলেন বটে।[৬] আর ভিক্তোরিয়াকে ঠিক কবি বলা যায় না, তিনি মুখ্যতঃ গদ্যলিখিয়ে, যদিও তাঁর গদ্য কবিতাধর্মী। কিন্তু রবীন্দ্র-কাইজ়ারলিং প্রসঙ্গে ভিক্তোরিয়ার সাক্ষ্যটাকে তাঁর বিবেচনার মধ্যে টেনে আনলে মার্টিন উপকৃত হতেন। ভিক্তোরিয়া দুজনকেই কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং কাইজ়ারলিঙের সঙ্গে এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ১৩ জুলাই ১৯২৯ তারিখে লেখা তাঁর চিঠিতে কাইজ়ারলিং সম্বন্ধে ভিক্তোরিয়া একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ কথা বলেছিলেন, 'He often speaks about you and admires you immensely as you well know. But I have never seen, in my life, a man so *r[h]ythmically* different from you as he is. I should like to know how you feel about him

...'। কাইজ়ারলিং তখন বুয়েনোস আইরেসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অবশ্য কাইজ়ারলিং সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবতেন তা বিজয়াকে চিঠিতে অন্ততঃ জানান নি তিনি। কিছু হদিস পাওয়া যাবে মার্টিনের এই আলোচ্য বইটিরই ৮৯-সংখ্যক পৃষ্ঠায়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কাইজ়ারলিং যে-বইটি লিখেছিলেন মার্টিন সেটির নাম নথিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু সেটির পাতায় চোখ বুলিয়েছেন কিনা বোঝা গেলো না। ওকাম্পো-গবেষণাসূত্রে বইটা আমি এককালে ইংরেজী অনুবাদে (*South American Meditations*) পড়েছিলাম। সাংঘাতিক বই—অনিয়ন্ত্রিত মিথনির্মাণ, সামান্যীকরণ ও নারীবিদ্বেষে ভরা। নাম দিয়ে সনাক্ত না ক'রে ওকাম্পোকে বিষাক্তভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাতে। ওকাম্পো এর জবাব দিয়েছিলেন বহু বছর বাদে, কাইজ়ারলিঙের মৃত্যুর পরে। ওকাম্পো আর কাইজ়ারলিঙের গল্পটা ডরিস মায়ারের ওকাম্পোজীবনীতে সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। আমিও কিছু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছি আমার রবীন্দ্র-ওকাম্পো-বিষয়ক বাংলা আর ইংরেজী বই-দুটিতে। মার্টিন যাকে বলেছেন 'Dialogical Principle'—জয়কৃষ্ণের তর্জমায় 'বিরুদ্ধ সাধনা নীতি'—তারই অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ আর কাইজ়ারলিঙের মিথস্ক্রিয়ার উপর ভিক্তোরিয়া আর কাইজ়ারলিঙের মিথস্ক্রিয়ার ইতিহাস কিছুটা আলো ফেলবে ব'লেই বিশ্বাস আমার।

মার্টিনের সমীক্ষা অনুযায়ী, হেলেনে মায়ার-ফ্রাংকের নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টাকে বাদ দিলে মূল বাংলা থেকে জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়েছে মাত্র দুই দশক আগে। 'কবি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি' অধ্যায়ে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন। মূল বাংলা থেকে ঋজু আধুনিক জার্মানে বেশ কিছু অনুবাদ—এইটেই হচ্ছে জার্মানিতে নবরবীন্দ্রবীক্ষার অভ্যুদয়ের শর্ত। এই দাবি মেটাতে পারলে তবেই পুরোনো দিনের ঐ দ্বিধাবিভক্ত প্রতিক্রিয়ার বদলে একটা যথার্থ রবীন্দ্র-গুণগ্রাহিতা গ'ড়ে উঠতে পারবে। এখানে আমার নিজের অভিমতটা সংক্ষেপে একটু বলি। এই সাহিত্যের অনুবাদের ব্যাপারটা আজকের দিনে একটা বিরাট আন্তঃসাংস্কৃতিক ইশ্যু। কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, বা আমাদের অন্যান্য সাহিত্যিকরা নন, আমাদের এই গণতান্ত্রিক যুগে এ কথা মানতেই হবে যে পৃথিবীর সব ভাষার সুসাহিত্যই বিশ্বজোড়া দরবারে পৌঁছনোর অধিকারী। কিন্তু কার্যতঃ যা চলছে তা সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদেরই দীর্ঘীকরণ, অথবা তার নয়া সংস্করণ: পৃথিবীব্যাপী পুস্তকপ্রকাশের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় যে এখনও পর্যন্ত ইংরেজী বইই সব থেকে বেশী তর্জমা হচ্ছে। পাশ্চাত্য জগতের ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজী হচ্ছে 'the most translated-from and the least translated-into language'। আপনি ইংরেজীতে একটা বেস্টসেলার লিখলে সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ভাষায় আপনার বই তর্জমা হয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু অন্য ভাষা থেকে ইংরেজীতে একটা ক্লাসিক বই তর্জমা করলে প্রকাশক পেতে আপনি গলদ্‌ঘর্ম

হবেন। অতলান্তিকের দুই কূলে ইংরেজী ভাষার প্রকাশভবনগুলি 'তর্জমার অধিকার' বিক্রি করতে চান, কিনতে চান না।[৭] অপিচ বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে অনুবাদের কাজ করার জন্যে চাই অনেক আন্তঃসাংস্কৃতিক কর্মী—ভাষাদক্ষ সাহিত্যবোধসম্পন্ন অনুবাদকের দল, আজকের প্রযুক্তিশাসিত বাণিজ্যশাসিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যাঁরা অত সহজে বেরোচ্ছেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা থেকে জার্মানে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে মার্টিন একজন বাঞ্ছিত বিরল কর্মী হিসেবে উদিত হয়েছেন, যাঁকে আমাদের স্বাগত করতেই হয়। কিভাবে তিনি নিজেকে এই কাজের জন্য গ'ড়ে তুলেছেন তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন 'কবির ভাষার ভাষান্তর: একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি' অধ্যায়টিতে। পশ্চিমবাংলায় আছেন তিনি দীর্ঘদিন, তাই বাংলা শেখার ব্যাপারে উৎসাহী শিক্ষক পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি ঠিকই, কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা হলেই তো আর অন্যকে বাংলা শেখানো যায় না। আপন ভাষা জানা এক, একজন প্রাপ্তবয়স্ক বিদেশীকে তা শেখাতে পারা আরেক ব্যাপার—তার জন্য আলাদা নৈপুণ্য ও প্রশিক্ষণ লাগে। তাই তাঁর সদিচ্ছাপ্রণোদিত বন্ধু-শিক্ষকদের সান্নিধ্যে 'অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর মতোই' শেখার পদ্ধতি আর উপায় বের ক'রে নিতে হয়েছে তাঁকে। 'আমি যে তাঁদের মাতৃভাষার কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করেছি, তাতেই তাঁরা ধন্য। আহ্লাদে আটখানা। ভুল ধরিয়ে দিতে আমি অনুরোধ করলেও তাঁরা কর্ণপাত করেননি। আমার বাংলা উচ্চারণ মধুবৃষ্টি করেছে তাঁদের কানে—যদিও সে উচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ। তাঁরা মনে করতেন আমার প্রচেষ্টা দুঃসাহসী।'[৮] সেই সাহস বা দুঃসাহস তাঁর ছিলো ব'লেই তিনি ক্রমে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক হয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁর অনুবাদগুলো কেমন উতরোচ্ছে সে-বিষয়ে মত দেবার মতো জার্মানজ্ঞান আমার নেই; কেবল এটুকু বলা যায়, গবেষণার কাজে তাঁর মেধা ও মননের যে-দীপ্তি ফুটে ওঠে, সাঁওতালপল্লীতে সমাজসেবার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়বত্তার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের তুল্যমূল্য প্রাসঙ্গিক কুশলতা তিনি যদি ঐ অনুবাদের কাজে প্রয়োগ করেন, তা হলে কিছু সিদ্ধিলাভ না হয়েই যায় না।

কলকাতার ম্যাক্স ম্যূলর ভবনে আয়োজিত এক সেমিনার বা কর্মশালায় আমাদের মধ্যে একটা ছোট তর্ক হয়েছিলো একবার; মার্টিন সেটার বিবরণ দিয়েছেন। আমি বলেছিলাম কবিতার অনুবাদ করতে হলে কবি হতে হবে। মার্টিন বললেন তিনি তো কবি নন, তা হলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করার যোগ্যতা হয়তো তাঁর নেই। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরোলো যে ছাত্রজীবনে তিনি অবশ্যই কবিতা লেখালেখি করেছেন, কয়েকটি ছাপাও হয়েছে, তার পর দীর্ঘদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন! তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে একমত হলাম যে যাঁরা 'হতাশ কবি, ব্যর্থ কবি, এমন কি

অপ্রকাশিত কবি', তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করতে পারেন! আলোচ্য বইয়ে মার্টিন অকপটে স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যসৃষ্টির অবদমিত প্রবৃত্তি ভাষা খুঁজে পায়। 'রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে আমি আমার কাব্যিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করি,' বলেছেন তিনি।[৯]

কবি হবার মতো হৃদয়বত্তা তাঁর আছে, কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার পল্লীজীবন অবলম্বনে তাঁর কিছু মৌলিক ছোটগল্পের ইংরেজী অনুবাদ প'ড়েও তাঁর সংবেদনের পরিচয় পেয়েছি। বাকিটা অনুশীলন ও কারিগরির ব্যাপার। এবং এখানেই নিজে কবিতা লেখার চর্চা জীইয়ে রাখতে পারলে কবিতা অনুবাদ করার ব্যাপারে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে। হয়তো সেই চর্চার অভাবেই মার্টিনের মনে হয় যে 'অনুবাদকের শিল্প আর কবির শিল্প—দু'টোর প্রকৃতি ... আমূল আলাদা'। আমার ঠিক ওরকম মনে হয় না। দুটো আলাদা ঠিকই, কিন্তু 'আমূল আলাদা' নয়, আমার কাছে দুটো কাজের মধ্যে বেশ একটা বংশগত সাদৃশ্য আছে। মার্টিন জানাচ্ছেন যে তিনি প্রথমে নির্বাচিত কবিতাটির একটা খসড়া অনুবাদ করেন গদ্যে, তার পর সেটাকে কবিতার ছাঁদে সাজাতে চেষ্টা করেন। আমি ওভাবে এগোই না। গদ্য খসড়া করি না। কবিতা থেকে সোজা চ'লে যাই কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদে আমাদের অবস্থা তো সত্যিই আলাদা। বাংলা কবিতার অর্থ নিয়ে মার্টিনের যে-ধ্বস্তাধ্বস্তি আছে আমার তা নেই, এবং তার মোকাবিলায় গদ্য খসড়া তৈরি ক'রে ফেলাটা তাঁর পক্ষে জরুরী প্রথম পদক্ষেপ। প্রত্যেক অনুবাদক তাঁর নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবিতার উৎকৃষ্ট অনুবাদ কেমনটি হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে আমাদের মতের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। মার্টিন বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক ইংরেজি অনুবাদক শব্দ ও বাক্যের আপাতগ্রাহ্য বাহ্যিক অর্থের একটা বিশ্বাসযোগ্য গদ্য ভাষান্তর করেই সন্তুষ্টি লাভ করেন। এ সব অনুবাদকের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই আমার। এ ধরনের অনুবাদ যতোটা সঠিক, ঠিক ততোটাই মামুলি আর বিরক্তিকর। ... শুদ্ধ অনুবাদের নামে তাঁরা আসলে কবিতাটিকে খুন করেন। ... একটা কবিতা সত্যিকারের কবিতা হয়ে ওঠে তখনই, অর্থ আঙ্গিক এবং ভাবের অবিচ্ছেদ্য অন্তর্বয়নে যখন তা একটা সামগ্রিক ঐক্য লাভ করে।' অর্থাৎ কবিতার অনুবাদককে কবিতার ভাষার কারিগরি জানতেই হবে, টার্গেট ভাষার এবং সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে। এর কোনো বিকল্প নেই।

মার্টিনের আরেকটি স্বীকারোক্তি তাঁর শিল্পীসুলভ মর্জির পরিচায়ক: তাঁর 'অনুবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অধিষ্ঠান এখানে, এই শান্তিনিকেতনে'। কেবল ওখানেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে কাজে এগোতে পারেন তিনি—'অনুবাদ শুরু করার জন্যে প্রয়োজনীয় ভাবটি মনের মধ্যে জাগাতে গেলে এই জায়গাটাই আমার

দরকার।' আরও বলেন, '... যোগ্য হই বা না হই, অনুবাদের কাজ আমাকে চালিয়ে যেতে হবে। চালিয়ে যেতে হবে তাব কারণ একটাই—কাজটা আমি না করলে অন্য কেউ করবেন না। কেননা, জার্মানিতে এই মুহূর্তে আমি ছাড়া অন্য কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করছেন না।' (তাঁর আগে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত করেছিলেন কিছু—সেই প্রকাশন-ছুটির খুঁটিনাটি এই বইয়ে দেওয়া আছে।) রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করতে হলে শান্তিনিকেতনে যে-আশ্রয়টুকু মার্টিনের দরকার, সেটা যেন তিনি পান বছরের পর বছর, তাঁর জন্যে এটাই আমরা কামনা করবো।

'কবির নাটক: রঙ্গমঞ্চ ইউরোপ' নামে অধ্যায়টিও আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মার্টিনের অভিমত, বর্তমান সময়ের আন্তঃসাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে নাট্যমঞ্চের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার শরিক করেছেন আমাদের। জার্মান নাট্যপরিচালক হোল্‌ফ্‌রাম মেহ্‌রিং মার্টিনের করা জার্মান অনুবাদেই প্রথম *ডাকঘর* পরিচালনা করেছিলেন, তার পর তাঁর নিজস্ব শৈলীতে বাংলায় প্রযোজনার জন্য কলকাতায় এসে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুনীল দাশ এবং তাঁর 'সংবর্ত' নাট্যগোষ্ঠীকে। হয়তো কেউ কেউ খবর রাখেন, সংবর্ত-র সেই মেহ্‌রিং-অনুপ্রাণিত *ডাকঘর* বিপুল সাফল্য লাভ করেছে এবং এখনও অভিনীত হচ্ছে। উইলিয়ম র‍্যাডিচির করা নতুন ইংরেজী অনুবাদে ইংল্যাণ্ডে *ডাকঘর*-এর প্রযোজনা করেছেন জিল পার্‌ভিন। অপিচ র‍্যাডিচি তাঁর নিজের করা 'দেবতার গ্রাস'-এর অনুবাদ অবলম্বনে লিব্রেটো লিখেছেন এবং তাকে পাশ্চাত্য ঘরানার অপেরায় পরিণত করেছেন সংগীতকার পরম বীর। সেটি মঞ্চায়িত হয়েছে প্রথমে মিউনিখে, পরে লণ্ডনে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কিছু কাজকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দিতে পারার ক্ষমতায় রঙ্গমঞ্চ নিঃসন্দেহে একটা ঈর্ষণীয় ভূমিকা দাবি করতে পারে। উল্লিখিত প্রযোজনাগুলির মধ্যে মেহ্‌রিঙের মূল জার্মান *ডাকঘর* আমি দেখি নি, তবে তদনুসারী সংবর্ত-র বাংলা *ডাকঘর* ছ'বার দেখেছি। সেই প্রযোজনা একবার দেখলে মনের মধ্যে চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। তার পাশে জিল পার্‌ভিনের প্রযোজনা আমার রুচিতে জায়গায় জায়গায় বেশী চড়া আর মূল নাটকের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবর্জিত ঠেকেছে। র‍্যাডিচি-রচিত সংলাপ অবলম্বনে পরম বীরের অপেরা লণ্ডনে দেখেছিলাম, যথার্থই দাগ কেটেছিলো মনে। মার্টিন নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, অনেক রূপান্তরের পর পরম বীরের সংগীতভিত্তিক নাটকটা 'কি আর আদৌ রবীন্দ্রনাথের নাটক থাকলো?' এবং নিজেই জবাব সরবরাহ করেছেন, 'অবশ্যই থাকলো ... এই কারণে যে তাঁর আখ্যান কবিতা "দেবতার গ্রাস"-এর মূল ধাক্কাটা এ নাটকে ষোলো আনা অবিকৃত আছে।' এ কথা ঠিক যে ঐ কবিতার মধ্যে আঞ্চলিকতার অন্তরালে যে-সর্বজনীন থীম নিহিত তার রসসমৃদ্ধ প্রকাশ ঘটেছিলো অপেরাটিতে। তবে আমি সেটিকে ঠিক 'রবীন্দ্রনাথের নাটক' বলবো না,

বলবো রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা অবলম্বনে র‍্যাডিচি ও পরম বীরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি— শেক্সপীয়রের অনেক নাটক যেমন অন্য মূল উপাদান অবলম্বনে নূতন সৃষ্টি, সত্যজিৎ রায়ের *চারুলতা* যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে নূতন সৃষ্টি, পীটার ব্রুকের *মহাভারত* যেমন সংস্কৃত মহাকাব্য অবলম্বনে নূতন সৃষ্টি। কিন্তু সেই ফাঁকে উৎস-উপাদানের রচয়িতা হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ যদি কিছুটা উজ্জ্বলতা ও প্রচার পেয়ে যান তো আমাদের লাভ।

প্রসঙ্গতঃ বলি, এই ধরণের কাজ আরও হচ্ছে। ফ্রান্সিস সিল্কস্টোন নামে এক ইংরেজ সংগীতরচয়িতা ও বাদক আছেন, যিনি বেহালা ও সেতার দুটোই বাজান, সেতারে তালিম নিয়েছেন ভারতে। তিনি *কল্পনা*-র কবিতা 'বিদায়'-এর প্রথম স্তবকটিতে ('ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো ...') সুরযোজনা করেছেন, এবং সম্প্রতি অক্সফোর্ডে একটি সাংগীতিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে মূল বাংলায় সেটি গাইলেন একজন ইতালীয় গায়িকা—আমেলিয়া কুনি, যিনি ভারতে দশ বৎসর অনুশীলনের পর ধ্রুপদ রীতির গায়িকা হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। সেই কাজও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অবলম্বনে এক নূতন সৃষ্টির মর্যাদা দাবি করতে পারে। আর হ্যাঁ, ১৯৯৩ সালে নিউ জার্সির রবীন্দ্রমেলায় 'পরিশোধ' কবিতাটির আমার করা অনুবাদ অবলম্বনে মনোজ্ঞ নৃত্যভিত্তিক নাট্য পরিবেশন করেছিলেন বার্মিংহ্যামের পিয়ালী রায় ও তাঁর দল। কাজেই এক সংস্কৃতির বার্তা আরেক সংস্কৃতির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মঞ্চকলার বা পার্‌ফর্মেন্স আর্ট্‌সের যে একটা সীমানা-ডিঙানো ক্ষমতা আছে তা স্বীকার করতেই হয়।

বইটির অনুবাদের কাজ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। জয়কৃষ্ণর অনুবাদ এমনিতে বেশ সরস ও স্বচ্ছন্দ, সাবলীল চলতি বাংলায় গ্রথিত। তাঁর কিছু কিছু বাগ্‌ভঙ্গি আছে যা প্রচলিত সাহিত্যিক বাংলার প্রান্তবর্তী, যেমন 'এখানকার', 'ওখানকার', 'সেখানকার' ইত্যাদির পরিবর্তে 'এখানের', 'ওখানের', 'সেখানের' ইত্যাদির ব্যবহার ('ওখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি', 'তখন সেখানের রবীন্দ্র-উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে', 'এখানের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলা যথেষ্ট কঠিন'), বা উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে 'নই'র জায়গায় সর্বত্র 'নয়'-এর ব্যবহার ('আমি সাঁওতাল বা বাঙালি নয়, বাবু কিংবা জমিদার নয়, পাদরি বা সমাজসেবক নয়')। প্রথমে আমার খটকা লেগেছিলো, পরে বুঝলাম তাঁর কলমে এই ধরণের ব্যবহার যে কদাচিৎ ঘটে এমন নয়, তা সার্বত্রিক, অর্থাৎ এটাই তাঁর রীতি। যেহেতু বাংলা তাঁরও মাতৃভাষা, অতএব অনুমান করি এই প্রয়োগগুলি তাঁর অঞ্চলে প্রথাসিদ্ধ।[১০] সে-ক্ষেত্রে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। সবাইকেই যে আঞ্চলিক টানটোন বর্জন ক'রে কোনো আদর্শ সাহিত্যিক ভাষায় লিখতে হবে এমন কোনো অলিখিত নির্দেশ আমার কাছে

মাননীয় মনে হয় না। আমি নিজে 'সাথে' শব্দটা ব্যবহার করার জন্য কলকাতার শৌখিন মহলের কৌতুকহাস্য পেয়েছি, কিন্তু পারিবারিক সূত্রে যে-ভাষা পেয়েছি তাকে পরিত্যাগ করার কোনো কারণ দেখি নি।

তবে অনুবাদের বেলায় জয়কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে ফাঁপরে পড়েছেন মনে হয়। 'পঁচিশ বছর কাটছে এখানে' বা 'শেষ আঠারো বছর কাটছে শান্তিনিকেতনে' হবে কি, না কি 'কাটছে'র জায়গায় 'কেটেছে' হবে? না কি এখানেও কোনো আঞ্চলিক প্রয়োগ প্রচ্ছন্ন? পূর্ববঙ্গীয় রীতির সঙ্গে একটা মিল আছে কি? 'শ্রেণী কক্ষেব শিক্ষা' কি 'ক্লাসরুমের শিক্ষা'? তা হলে কিন্তু তর্জমা ঠিক বাংলা হলো না।[১১] 'আমার সন্দেহ আছে যে সেই ভারতীয় সৈনিকটিও কবির সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবহিত ছিলেন'— এটাও ইংরেজীর আক্ষরিক তর্জমা হয়ে গেছে, শ্রেয়ঃ হতো 'সেই ভারতীয় সৈনিকটিও কবির সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবহিত ছিলেন কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে'। 'কবির নামের আদ্য শব্দ "রবি"-কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে প্রাচীন ইহুদি টীকাকার "রাব্বি"-র নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল'—এখানে কারও মনে হতে পারে যে 'রাব্বি' নামে বিশেষ কোনো ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু আসলে 'রাব্বি' বলতে সাধারণভাবে ইহুদী ধর্মশিক্ষককে বোঝায়, ওটা কাবও ব্যক্তিগত নাম নয়।

পৃঃ ৬১-তে 'গায়ক এবং নৃত্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' আসলে 'অভিনেতা এবং নৃত্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' হবে, মূল জার্মানে এবং মার্টিনের ইংরেজী অনুবাদে যথাক্রমে 'Schauspieler' এবং 'Actor' আছে। পৃঃ ৭০-এ শোয়াইৎসার প্রসঙ্গে 'তিনি প্রতিভাবান সংগীতকাব, সারা জীবন বাদ্যযন্ত্রের অনুশীলন করেছেন' অংশটি মূল থেকে স'রে এসেছে। মার্টিন লিখেছিলেন, 'He was a gifted musician, giving organ concerts all through his adult life'—'musician' বলতে ঠিক সুরস্রষ্টাকে বোঝায় না, প্রধানতঃ বোঝায় কোনো বাদ্যযন্ত্রের বাদককে, বা বাদ্যযন্ত্র বাজানোতে যার প্রতিভা আছে এমন কাউকে। পাশ্চাত্য সংগীতের চর্চায় সংগীতের রচয়িতা ('কম্পোজ়র') আর সংগীতের 'পারফর্মার' অর্থাৎ গায়ক-বাদকদের মধ্যে তফাৎ করা হয়। আরেকটি বাক্যে আমার খটকা লাগে: 'হিটলারের নাৎসিবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশাল এক ইহুদি জনগোষ্ঠির প্রায় উন্মূলিত দুর্দশা কি শান্তিনিকেতনের উপেক্ষিত দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল?' (পৃঃ ৯২) 'উপেক্ষিত দৃষ্টি' কথাটা অসঙ্গত লাগে, মূলে কী ছিলো জানতে ইচ্ছে করে। এখানে কোনো মুদ্রণপ্রমাদ হয়েছে কি? বাক্যটা যদি এরকম হয়—'হিটলারের নাৎসিবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশাল এক ইহুদি জনগোষ্ঠির প্রায় উন্মূলিত দুর্দশা কি শান্তিনিকেতনের উপেক্ষিত[,] [তার] দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল?'— তবেই তার অর্থ হয়।

জয়কৃষ্ণের টেক্সটে অবশ্য খুব বেশী মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ে নি, তবে ঐ

'উপেক্ষিত দৃষ্টি' একটি প্রমাদ হতেই পারে। আর অল্প যে-কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়েছে তাদের মধ্যে 'স্বজ্ঞা' শব্দটির তুবার 'সজ্ঞা' ছাপা হওয়া (পৃঃ ১২৩ ও ১৪৭) চোখকে ধাক্কা দেয়, এবং ১৮০-সংখ্যক পৃষ্ঠায় টীকানির্দেশক একটি সংখ্যা ভুল জায়গায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু প্রশান্ত পাল মহাশয়ের ভূমিকাটির প্রুফ কেউ দেখে দেন নি মনে হয়, ওখানে অল্প পরিসরের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রমাদ ঘটেছে। বিদ্বজ্জনরচিত গ্রন্থের প্রারম্ভে সেগুলি রসভঙ্গ করে। আশা করি পরবর্তী মুদ্রণে এগুলো শুধরে নেওয়া হবে। বইটির বহুল প্রচার ও সমাদর কামনা করি। যদিও জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠকদের মনে রেখে অনুবাদ করেছেন, তবু পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এর মধ্যে এমন কিছু মালমশলা পেয়ে যাবেন যা মার্টিনের আগের বইটার পরিপূরক।

আমি এই লেখা প্রায় ডাকে দিতে যাচ্ছি এমন সময়ে মার্টিন তাঁর আরও ছুটি প্রাসঙ্গিক বই আমাকে পাঠিয়েছেন। তাদের মূল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা আর সম্ভব নয়, তবে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করা নিশ্চয় দরকারী, তাই তাদের খুঁটিনাটি দিচ্ছি। একটি হচ্ছে *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জার্মানী/ একটি লেখ্যায়ন*, যা কিনা মূল *Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation* বইটির সরাসরি বাংলা অনুবাদ; অনুবাদ করেছেন সরদার আবতুস সাত্তার ও নাসিম আখতার হোসাইন; প্রকাশক: ঘাস ফুল নদী, ঢাকা, ১৯৯৮। মূলে যেখানে জার্মান দলিলগুলি আর পাশাপাশি তাদের ইংরেজী অনুবাদ ছিলো সেখানে কেবল বাংলা অনুবাদ রাখা হয়েছে। অন্য বইটি হচ্ছে মার্টিনেরই রচিত *Rabindranath Tagore in Germany/ Four Responses to a Cultural Icon* (Indian Institute of Advanced Study, রাষ্ট্রপতি নিবাস, সিমলা, ১৯৯৯)। এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাইজারলিং, কুর্ট ভোল্ফ্, হেলেনে মায়ার-ফ্রাংক ও হাইন্‌রিশ্ মায়ার-বেনফ্যে—এই নির্বাচিত চারজনের আদানপ্রদান সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা। প্রথম ইংরেজী বইটিতে যা ছিলো তার সঙ্গে গবেষণালব্ধ নতুন উপাদান সংযুক্ত ক'রে এই বইটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাক্স ম্যূলর ভবন-প্রকাশিত বইটিতে হেলেনে মায়ার ফ্রাংক সম্বন্ধে অল্পই ছিলো, আর তাঁর স্বামীকে নিয়ে কোনো আলোচনা ছিলো না। সেদিক দিয়ে জয়কৃষ্ণ-সম্পাদিত বইটির সঙ্গে এর উপাদানের ওভারল্যাপ রয়েছে।

পরিশেষে বলি, রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানি বিষয়টার কিন্তু সম্পূর্ণ আরেকটা দিক আছে। জার্মানিতে ওঁরা রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে দেখেছিলেন, কিভাবে নিয়েছিলেন, সেই বিষয়টির পাশাপাশি জার্মানি নিজেই সৃষ্টিশীল গ্রহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথের উপরে কিরকম প্রভাব ফেলেছিলো তা-ও একটি সমান ঔৎসুক্যকর বিষয়। আমার সহগবেষক সুশোভন অধিকারী আর আমি আমাদের বই *রঙের রবীন্দ্রনাথ*-এর গবেষণার সূত্রে সেই রাজ্যে কিছুটা পদচারণা করেছিলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত: তাঁর চিত্রকলায় তো বটেই,

সম্ভবতঃ তাঁর নাট্যসাহিত্যেও কিছু কিছু নিগূঢ় জার্মান প্রভাব পড়েছে। আমাদের বিপুলায়তন বইটিতে এ বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি দেওয়া হয়েছে। সেই গবেষণা জার্মান সুধীদের কাছে হয়তো ঔৎসুক্যকর হতে পারতো, যদি তার খবর তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতো। কিন্তু সে-কাজ করতে পারেন এমন কোনো সাংস্কৃতিক সংবাদদাতার খোঁজ পাই নি। জার্মানভাষীদের জগৎ আর বাংলাভাষীদের জগতের মধ্যে যে-ব্যবধানটা রয়েছে সেটা মোটের উপর দুস্তরই থেকে যাচ্ছে, আমাদের লেনদেনের সম্পর্ক এখনও খুবই অসমান। আমি যেমন মার্টিনের এই বইয়ের দীর্ঘ রিভিউ লিখলাম—এবং আগেও তাঁর ইংরেজী বইখানার রিভিউ লিখেছি যত্ন ক'রে, দু'জায়গায়—ঠিক তেমনি যেদিন দেখবো রবীন্দ্রনাথের উপরে জার্মানির প্রভাব সম্বন্ধে সুশোভন আর আমি কী লিখেছি সে-বিষয়ে খোঁজ করছেন কোনো জার্মান পণ্ডিত, অথবা ডার্মস্টাটের যে-রবীন্দ্রসম্মেলনের কথা মার্টিন তাঁর এই বইয়ে লিখেছেন তেমন কোনো তকমা-আঁটা বিদ্বজ্জনসভায় ডাক পড়ছে আমাদের, সেদিন বুঝবো যে আমাদের দুই জগতের সম্পর্কে একটা সমতা আসতে আরম্ভ করেছে। আপাততঃ তাঁদের আর আমাদের মধ্যে একটা জাতিভেদ কিন্তু থেকেই যাচ্ছে!

১ বাংলা রিভিউটি আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধসংকলন *চলন্ত নির্মাণ*-এ (দে'জ, ২০০৫) পাওয়া যাবে।

২ ক্যানাডার দ্বৈভাষিক পত্রিকা *বাংলা জর্নাল*-এর সম্পাদক।

৩ প্রথমে 'ও' টিপে তার পর 'ব্যাক স্পেস' ক'রে আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে তার মাথার উপর মাত্রা বসাতে হতো, সব শেষে তাকে 'কান-মলা' দিতে হতো। তবেই মূর্ত হতো 'ক্ত'। 'ত্ত' আর তার 'কান-মলা'র মধ্যে একটু ফাঁক থেকে যেতো তবু।

৪ নাৎসিবাদকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত জার্মানদের একটা দায়বদ্ধতা আছে। শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথের সূত্র অবলম্বন ক'রে নাৎসি জার্মানি থেকে একদা-পলাতক বয়োজ্যেষ্ঠ আরনসনকে মার্টিন যে-বন্ধুত্ব উপহার দিতে পেরেছিলেন তার মধ্যে সেই দায়বদ্ধতার একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিলো হয়তো।

৫ এর মধ্যে কিছু মজাদার ব্যাপারও আছে। কিছু লোক আছেন যাঁদের তথ্যটা বললেও

তাঁরা বিশ্বাস করতে চান না যে আমি অধ্যাপকীয় চাকরি করি না। তাঁরা আমাকে 'প্রোফেসর ডাইসন' সম্বোধনে চিঠি দিয়ে থাকেন। একবার এক কনফারেন্সে কেউ ওভাবে আমার পরিচিতি দেবার পর বলতে বাধ্য হই যে আমি যা নই আমাকে তা বানালে আমার অস্বস্তি হয়। উদ্যোক্তারা অবাক—'সে কী, আপনি প্রোফেসর নন?' 'নই, আমার কোনো বইয়ের জ্যাকেটে কি ওরকম কোনো দাবি দেখেছেন?' আসলে সে-সব তথ্য কি কেউ খুঁটিয়ে পড়ে? মানুষ প্রতিমাশাসিত। আমার একটি অধ্যাপকীয় প্রতিমা তাঁদের মাথায় প্রতিষ্ঠিত। 'আমি অধ্যাপক নই, শুধু সাহিত্যিক এবং গবেষক। এ কথা আগে জানলে কি আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন না?' 'না, না, অবশ্যই করতাম!' কিন্তু নিঃসন্দেহে আরেক-দল লোক আছেন যাঁরা আমি অধ্যাপক নই ব'লেই আমাকে তাঁদের সভায় ডাকেন না।

৬ ভিক্তোরিয়া ১৯২৯ সালে কাইজারলিঙের জন্য বুয়েনোস আইরেসের দুটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতামালার আয়োজন করেছিলেন এবং সুবিখ্যাত প্লাসা হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কাইজারলিং ওখান থেকে কিছু দিনের জন্য চিলিতে (স্প্যানিশ উচ্চারণে 'চিলে'!) গিয়েছিলেন, সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ফের কয়েক দিনের জন্য বুয়েনোস আইরেস ছুঁয়ে তার পর ব্রাজিলে বক্তৃতা দিতে চ'লে যান। কিন্তু চিলি অথবা ব্রাজিলের বক্তৃতাগুলি ওকাম্পো-আয়োজিত বা তাঁর দ্বারা 'স্পন্সর্ড' ছিলো না। যতদূর বুঝতে পারছি ওগুলি কাইজারলিঙের নিজস্ব নেটওয়ার্কিঙের ফসল। বস্তুতঃ, ঐ সময়ে, সুর পত্রিকার প্রতিষ্ঠার আগে, ওকাম্পোর কোনো সারা-দক্ষিণ-আমেরিকা-জোড়া প্রতিপত্তি ছিলো না, তাঁর পক্ষে চিলিতে বা বা ব্রাজিলে কাইজারলিঙের জন্য লেকচার ট্যুরের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া সে-সময়ে তিনি কাইজারলিঙের উপর তিতিবিরক্ত। চিলি যাবার আগে কাইজারলিং ওকাম্পোকে অনুরোধ করেছিলেন, প্লাসা হোটেলে তাঁর ঘর-দুটি যেন ভাড়া দিয়ে ধ'রে রাখা হয়। ওকাম্পো সে-অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন, কেননা প্লাসা হোটেল বুয়েনোস আইরেসের সব থেকে দামী হোটেল, সেখানে অতিথির অনুপস্থিতিতে ভাড়া দিয়ে ঘর ধ'রে রাখার কোনো মানে হয় না। কাইজারলিং ফিরে এলে আবার নতুন ক'রে ভাড়া নেওয়া যেতো। কাইজারলিঙের ভয় ছিলো, ফিরে এসে যদি ফাঁকা ঘর না পান? ওকাম্পো তাঁর মনস্তত্ত্ব বুঝেছিলেন, আবার বিরক্তও হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীর ষষ্ঠ খণ্ডে সে-কথা কবুল করেছেন। তাই চিলিতে বা ব্রাজিলে কাইজারলিঙের বক্তৃতামালা ওকাম্পোর আমন্ত্রণে বা আর্থিক অনুদানে আয়োজিত হয়েছিলো এমন দাবি করা যায় না।

৭ এই অবকাশে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে নিয়ে সেই-সব বই প্রকাশের জন্য একটি প্রাঙ্গণ তৈরি হয়ে উঠেছে ভারতেরই ভিতরে, তৈরি হয়ে উঠেছে একটি অভ্যন্তরীণ বাজার। তবে ভারতের বাইরে এই বইগুলির বিতরণ যথেষ্ট নয়, তাদের চাইতে ভারতীয়দের লেখা ইংরেজী বইয়ের পদমর্যাদা বেশী।

৮ এখানে নথিবদ্ধ করা দরকার যে বেশ ভালোই বাংলা বলেন মার্টিন !

৯ একটু তর্ক ক'রে এ ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে উস্‌কে দিতে পেরেছিলাম কি ? তা হলে খুশীই হবো !

১০ পরবর্তী কালে খেয়াল করেছি যে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের একজন বিদগ্ধ কর্মীও 'এখানের', 'ওখানের' লেখেন। তিনি অধুনা প্রয়াত। কোন্ জেলার মানুষ ছিলেন তা জানি না।

১১ ক্লাসরুমের বাংলা হিসেবে কেউ কেউ আজকাল 'শ্রেণীকক্ষ' লেখেন দেখতে পাই, কিন্তু সেটিকে জুতসই মনে হয় না। প্রথম পরিচয়ে শব্দটিকে ক্লাসরুমের প্রতিশব্দ ব'লে চিনতেই পারি নি। আমরা যদিও 'প্রথম শ্রেণী', 'দ্বিতীয় শ্রেণী' ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহার করি, তবু 'শ্রেণীসংগ্রাম' যেমন স্বচ্ছ—শুনলেই মনে হয় প্রোলেতারীয়রা বুর্জোয়াদের উপর ডাণ্ডা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—'শ্রেণীকক্ষ' তেমন স্বভাবস্বচ্ছ নয়। শব্দটা দেখলে বা শুনলে মনশ্চক্ষে সারিবদ্ধ ঘরের ছবি ফুটে ওঠে, কিন্তু সেই-সব সারি-সারি ঘরে যে পড়াশোনাব কাজ হয় সেই ব্যাপারটা আভাসিত হয় না। সেগুলো প্লাসা হোটেলের সারি-সারি দামী ঘরও হতে পারে। 'ক্লাস'-এর মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া আছে অনেকে মিলে একসঙ্গে পড়াশোনা করার ব্যাপারটা। 'সে আজকে ক্লাসে আসে নি', 'রোজ দেরি ক'রে ক্লাসে আসে', 'আমাদের টীচার তখনও ক্লাসে ঢোকেন নি', 'ক'টায় ক্লাস তোর ?', 'আমাকে বেলা দুটোয় অঙ্কের ক্লাস নিতে হবে'—এবংবিধ বাক্যে আমরা 'শ্রেণী' শব্দটা ব্যবহার করি না। এই একত্র পড়াশোনা করার অনুষঙ্গে 'ক্লাস' এখন সম্পূর্ণ বাংলা শব্দ। যেখানে সে-কাজ করা হয় তাকে ক্লাসঘর বললে ক্ষতি কী? প্রতিতুলনায় 'শ্রেণীকক্ষ'কে যান্ত্রিকভাবে নির্মিত প্রতিশব্দের মতো লাগে।

[*বাংলা জর্নাল*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৪০৬ (ডিসেম্বর ১৯৯৯)।]

বাঙালী মেয়ে—যুগান্তরে

আগামী দিনের বাঙালী মেয়েরা কেমনধারা হবেন তা চট্ ক'রে বলার কোনো উপায় নেই। নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি বা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, যে-কোনো সামাজিক বীক্ষায় সুদূর ভবিষ্যতের চেহারাকে কল্পনায় ধরা খুবই কঠিন, কেননা সে-কাজ করতে গেলে এত রকমের পরস্পরসংলগ্ন, পরস্পরসংশ্লিষ্ট, পরস্পরনির্ভর, পরস্পরক্রিয়াশীল পরিবর্তনরাজিকে হিসাবের মধ্যে নিতে হয়, যা বস্তুতঃ একটি সুবৃহৎ জটিল ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে দৃষ্টি চলে না, পরিপ্রেক্ষিত এবং ফোকস্ যায় হারিয়ে। যেমন ব্যক্তির উপরে তেমনি সমাজদেহে একসঙ্গে নানা ঘটনাবলীর অভিঘাত ঘটে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, জড়াজড়ি অবস্থায় ; ঘটনা 'ক' এবং ঘটনা 'খ' বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের উপর ক্রিয়াশীল হলে যেমন ফল হয়, তারা যুগপৎ ক্রিয়াশীল হলে তেমন হয় না, হয় অন্যরকম ; তা ছাড়া কার্যতঃ দেখা যাবে যে ঘটনা 'ক' ট্রিগার করেছে ঘটনা 'গ'কে, 'খ' ট্রিগার করেছে 'ঘ'কে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে ক-খ-গ-ঘ-র সম্মিলিত তথা মিথস্ক্রিয় তাণ্ডব, যার পরিণামে জন্ম নিচ্ছে ঙ-চ-ছ, বিলম্বিত সন্তান 'জ' ইত্যাদি। তা ছাড়াও ভাবী কালে ঘটবে এমন সব ঘটনা, যাদের আমরা এ মুহূর্তে কল্পনাবৃত্তের পরিধির ধার ঘেঁষেও প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, আবছাভাবেও না, প্রান্তিকভাবেও না। বাঙালীর আত্মপরিচয় যে দুই রাষ্ট্রিক সত্তায় বিভক্ত হবে, অথবা বহুসংখ্যক বাঙালী দেশান্তরিত হওয়ার ফলে পৃথিবীময় ছড়ানো একটি বিকীর্ণ বাঙালী আত্মপরিচয় গ'ড়ে উঠবে, এমন ধরণের সম্ভাবনাকে কি আজি হতে শতবর্ষ আগেকার বাঙালীরা তাঁদের ভবিষ্যৎ-কল্পনার মধ্যে স্থান দিতে পেরেছিলেন? অথচ আধুনিক বাঙালীদের জীবনচর্যায়, আধুনিক বাঙালী মেয়েদের জীবনেও, এই-সব ঘটনা কত তাৎপর্যপূর্ণ, কত প্রবল ও গভীর তাদের ধাক্কা! আসলে রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতাটিতে আজকের বাঙালীর কোনো চেহারাই ফুটে ওঠে নি ; তাকে পরিস্ফুট করার কোনো চেষ্টাই কবি করেন নি। তাঁর আসল বক্তব্য হচ্ছে এই যে তিনি ঐ অনাগত ১৪০০ সালের পাঠকপাঠিকাদের কাছে পৌঁছতে চান। চক্রাকারে আবর্তমান বসন্তঋতুর চিত্রকল্পের মাধ্যমে সেই আকুতিকেই তিনি বাঙ্ময় করেছেন, এবং আগামী কালের পাঠকপাঠিকাদেরই বরং অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর ১৩০২-এর বসন্তদিনের আবেগকে কল্পনা ক'রে নিতে।

অতএব ১৫০০ বঙ্গাব্দের বাঙালী মেয়েরা যে কিরকম হবেন সে-বিষয়ে

কোনো কাল্পনিক সামগ্রিক চিত্র অভিক্ষেপ করা যায় না, তাঁদের সম্ভবপর বিবর্তনের কয়েকটি সাধারণ সূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যায় মাত্র।

পরিবর্তন সর্বত্র একরকম হবে না, হতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে আর শহরে পরিবর্তন সমান দ্রুত হবে না, তবু নগর থেকে পল্লীতে পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়াবেই। ভারতরাষ্ট্রের ভিতরে, প্রতিবেশী বাংলাদেশে, বৃহত্তর পৃথিবীতে—তিন জমিতে পরিবর্তনের ধরণ এবং তালও ভিন্ন হতে বাধ্য ; তবে পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের প্লাবন থেকে বাঙালী মেয়েদের দূরস্থিত, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কোনো সম্ভাবনাই আজকে নেই। আসলে বাঙালীদের বাসস্থানটা কোনো কালেই একটা নিরালা এলাকা ছিলো না ; ঐতিহ্যের দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বকে মেনে নেওয়ার বদলে নতুন নতুন অভিঘাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করার দিকেই বাঙালী জাতির ঝোঁক বেশী—অন্ততঃ ইতিহাস তা-ই বলে। আর নিরালায় থাকার দিন এখন চিরতরেই বিদায় নিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমার যা বলবার তা একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বলবো। যেহেতু যুগান্তরের কথা ভাবতে বসেছি তাই যারা সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক সেই শিক্ষিতদের উপরেই ফোকস্‌টা বেশী পড়বে।

আপাতগৌণ অথচ তেমন-গৌণ-নয় একটি প্রসঙ্গ মনে জাগছে। আমার ছেলেবেলায় বা কলকাতার স্কুলকলেজ-জীবনে শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়েদের নথ পরতে দেখি নি। কেবল যে আমার প্রজন্মের মেয়েরা নথ পরতেন না তা-ই নয়, আমার মায়ের প্রজন্মের শিক্ষিতা বাঙালী হিন্দু মহিলারাও নাসালংকার বর্জন করেছিলেন। সেই ঘটনা ব্রাহ্ম অথবা খৃষ্টান প্রভাবে ঘটেছিলো কিনা বলতে পারি না, তবে যতদূর বুঝেছি, সেটা ছিলো তাঁদের পক্ষে একটা 'স্টেটমেন্ট', একটা প্রতিবাদ ; তাঁরা কে, কী হতে চান—সে-সম্পর্কে একটা বক্তব্য, তাঁদের আধুনিকতার স্বাক্ষর। নাসাভরণ তখন তাঁদের কাছে একটা 'গ্রাম্য' বাহুল্য, যার চিহ্ন তাঁরা তাঁদের মুখমণ্ডলে ধারণ করতে চান নি। সর্দি হলে অল্প বয়সের মেয়েরা নথসহ নাক রগড়ে নাকের ফুটো পাকিয়ে ফেলবে, সেটা স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নয় ; সে-তুলনায় কানের লতি আমাদের অঙ্গের একটা বাহ্য অংশ, সেখানে ফুটো ক'রে দুল পরলে তেমন কোনো ঝামেলা নেই—এ ধরণের কথা প্রায়ই শুনেছি। তার পর একটা সময় এসেছে (আমি নিজে ততদিনে দেশান্তরিত) যখন নাসাভরণের পুনর্বাসন ঘটেছে। হয়তো এই পরিবর্তনের মধ্যে কিছু সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চিন্তা প্রচ্ছন্ন ছিলো। 'ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষিত মেয়েরা যদি নথ পরতে পারেন, তা হলে আমরাই বা পারবো না কেন ?' ব্রাহ্মপ্রভাবিত আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে এক ধরণের ভারতীয় সলিডারিটি বলা যাবে কি একে ? এই কেতার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বড় বয়সে নাক বিঁধিয়ে সেই ফুটোকে পাকিয়ে সেপ্‌টিক ক'রে ফোলা নাকমুখ নিয়ে ব'সে থাকতে দেখেছি কলকাতার একজন

পেশাদার মেয়েকে ; সেটা বোধ হয় ১৯৮১ সাল। আরেকজন মেয়েকে জানি, যিনি কলকাতায় কলেজে আমার সহপাঠিনী ছিলেন এবং সেকালে নথ পরতেন না, কিন্তু পরবর্তী কালে ইয়োরোপপ্রবাসী অবস্থাতেই দুর বাংলার ফ্যাশনের নিয়ম মেনে নিজের এবং নিজের কন্যাব নাক বিঁধিয়ে নিয়েছেন। আজকাল তো পাশ্চাত্য মেয়েদের মধ্যেও নথধারিণীদের দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি ছেলেদের মধ্যেও নথধারীদের দেখেছি। আমার প্রাক্তন সহপাঠিনীর আচরণও এক ধরণের বক্তব্য ও প্রতিবাদ : 'আমার যা ইচ্ছা তা-ই করবো, নাকে গয়না পরবো কি পরবো না—সেটা আমার খুশি, আমার স্বাধীনতার প্রকাশ।' অর্থাৎ নথ পবা এবং না পরা, দুটো সিদ্ধান্তই আমার প্রজন্মের একজন শিক্ষিত বাঙালী মেয়ের পক্ষে আধুনিকতার এবং স্বাধীন আত্মপ্রকাশের অভিজ্ঞান হতে পারে। এখানে নথটাই ইশ্যু নয়, আচরণের তাৎপর্যটাই ইশ্যু। আবার তারও পরে এমন মেয়েরাও বড় হয়ে উঠেছে যাদের প্রজন্মে নথ পরা অথবা না পরার কোনো বিশেষ আচরণগত তাৎপর্যই নেই। ওটা কেবলই একটা ফ্যাশন—একটা স্টাইল, যা বরাবরই ছিলো, মাঝখানে 'আন্‌ফ্যাশনেব্‌ল্‌' হয়েছিলো, তার পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে সর্বভারতীয় সজ্জার অন্তর্গত একটি আইটেম হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বাইরের দুনিয়ার প্রান্তিক সজ্জাশৈলীতেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। পরলে দোষ নেই, না পরলেও চলে, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মনে পড়ছে নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিভাবে *দেশ* পত্রিকার পাতায় হিন্দু মেয়েদের মুসলমানী পরিচ্ছদ অর্থাৎ সালওয়ার-কামিজ পরার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। সেটা ষাটের দশক। অল্পবয়সী ছিলাম ; রক্তও ছিলো গরম : দিলাম ঠুকে তীব্র এক প্রতিবাদ। বক্তব্য সংক্ষিপ্তই : আমরা মেয়েরা আমাদের যা খুশি তা-ই পরবো। পরবর্তী কালে বাঙালী মেয়েরা প্রয়োজনবোধে এবং তাঁদের অভিরুচি অনুযায়ী ম্যাক্সি, কাফ্‌তান, ট্রাউজ়ার, লুঙ্গি, রাতের নাইটি, দিনের হাউসকোট—সবই তাঁদের শ্রী-অঙ্গে ধারণ করেছেন। এবং করবেন না কেন ? এ দিকে বৃহত্তর পৃথিবীর ফ্যাশন-জগতে ভারতীয় সালওয়ার-কামিজের এবং ঢোলা পাজামারও কিছু কম প্রভাব পড়ে নি। রাস্তায় বেরোলেই তো তার পরিচয় পাই। অর্থাৎ, একটু আগে যা বলছিলাম, গোটা পৃথিবীটাই এখন একটা পল্লী : বহুসাংস্কৃতিক এবং বড় মাপের পল্লী, কিন্তু এখানে পরস্পরের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে গা ঢাকা দিয়ে নিরালায় ব'সে থাকার জায়গা আর নেই। এটা বিদ্যুৎগতি কম্যুনিকেশন দ্বারা শাসিত গণমাধ্যমদের যুগ। যেখানেই থাকি না কেন, দূরে যা ঘটছে তার ধাক্কাও আজ না হোক কাল আমাদের সৈকতে আছড়ে পড়বে।

সাজপোশাকের খুঁটিনাটি থেকে শুরু ক'রে জীবনচর্যার আরও সিরিয়াস সমস্যাগুলি পর্যন্ত নানা ব্যাপারকে ঘিরে আধুনিক মেয়েদের আত্মপরিচয়গত নানা প্রশ্ন আলোড়িত হবে, তার পর কোনো-একটা উত্তরে পৌঁছে থিতিয়ে যাবে, এটাই

প্রত্যাশিত। এই সেদিনও ভিন্ন জাতে অথবা নিজেদের নির্বাচনমতো বিয়ে করা নিয়ে মেয়েদের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে দেখেছি, দেখেছি আমার নিজের প্রজন্মের মেয়েদেরই উদ্বেগ প্রকাশ করতে। কলেজশিক্ষিত বাঙালী মেয়েরা কি আজকাল এ নিয়ে বেশী বিব্রত হবেন ? অথচ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এগুলো হয়তো এখনও সমস্যাত্মক। মেয়েদের চাকরি করার জন্য ঘরের বাইরে বেরোনো নিয়ে কি এখন *মহানগর*-এর মতো কোনো সিনেমা তৈরি করার কথা ভাববেন কলকাতার কোনো চিত্রপরিচালক ? সেটা কি শিক্ষিত বাঙালী সমাজে কোনো জ্বলন্ত ইশ্যু ? বরং আজকাল কোনো মেয়ে অর্থোপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বেরোতে দ্বিধা প্রকাশ করলেই তাঁর পক্ষে সমালোচনাভাজন, এমন কি পরিহাসভাজন, হওয়ার সম্ভাবনা ঢের বেশী। শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য অর্জন, উর্বরতানিয়ন্ত্রণ, অর্থোপার্জন—এ-সমস্তর অধিকার যে মেয়েদের থাকা উচিত, থাকা উচিত গতিবিধির তথা চিন্তার স্বাধীনতা : এ নিয়ে কোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে তর্কের আর অবকাশ আছে ব'লে মনে করি না, তা সে সমগ্র নারীসমাজের পক্ষে লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছতে যত দেরিই হোক না কেন। কে না জানেন যে এ-সমস্ত ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে অসমানভাবে—একদল মেয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে গেছেন, পিছনে প'ড়ে আছেন অনেকেই। আবার বাংলাদেশের মেয়েরা ভুগছেন কিছু বিশেষ, অতিরিক্ত, শোচনীয় দুরবস্থা থেকে।

তবে তর্ক চলছে এবং ঘনীভূত হবে এই-সমস্ত অধিকার অর্জনের ফলাফল নিয়ে। বিয়ে এবং পরিবার, এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। 'বর্তমান' কথাটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রতিষ্ঠান-দুটির চেহারা নিকট অতীতেই কতটা ভিন্ন ছিলো তা যেন ভুলে না যাই। হিন্দু সমাজে এক দিকে পুরুষের বহুবিবাহ, অন্য দিকে নারীর বাধ্যতামূলক একগামিতা, বাল্যবিবাহ, বালিকাগমন, বালিকাদের জননী হওয়া, বিধবাদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য, কুলীনদের কাণ্ডকারখানা—এ-সব নিয়ে আমরা ছুঁতে-পারা-যায় এমন অতীতেই ঘর করেছি। তার আগের পর্বের সতীদাহের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে পেশ করতে গিয়ে ভূমিকার এক জায়গায় আমি নির্মলকুমারী মহলানবিশের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের কথা উল্লেখ করেছি দেখে দু'-একজন বাঙালী বিব্রত বোধ করেছেন। হায়, তাঁদের যদি বোঝানো যেতো, নির্মলকুমারী অথবা ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের সংবাদে পাশ্চাত্য পাঠকের ভ্রূ কিঞ্চিন্মাত্রও কুঞ্চিত হয় না, যে-খবরটিতে তাঁদের চোখ রীতিমতো বিস্ফারিত হয়ে যায় সেটি হলো তাঁর বালিকাকে বিয়ে ক'রে বালিকাগর্ভে সন্তান উৎপাদন করার খবর। এখন কী করা। এই কীর্তিগুলো তো আমাদের মহাকবির 'এসেন্‌শ্যাল বায়োডেটা'র অন্তর্গত—দিতেই হবে, লুকোবার কোনো উপায়ই নেই। আমি নাচার।

আজকের দিনের একজন বাঙালী যুবক কবির পক্ষে দশ বছরের বালিকাকে বিয়ে করা যেমন অভাবনীয়, তেমনি আমাদের এখনকার কিছু কিছু প্রথাও ভাবী কালে অচল হয়ে যাবে না কি ? বাঙালীদের পারিবারিক জীবনের চেহারায় অনেক অদলবদল ঘটেছে, ঘটছে, এবং ঘটবে। কিছু কিছু পরিবর্তন বহু-আলোচিত। কত বড় বড় একান্নবর্তী পরিবারকে—যেগুলিকে আমার কিশোরী-বয়সেও দাপট-সহকারে বিরাজ করতে দেখেছি—টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম। স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের কোষ-পরিবার এবং স্ত্রীর রোজগার দম্পতির মধ্যে সাম্য আনতে সাহায্য করে, পূর্ববর্তী প্রজন্মের শাসন এবং দৈনন্দিন তদারক থেকে দম্পতিকে মুক্ত ক'রে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যকেই বিকশিত হবার সুযোগ দেয়।

আবার এমন কিছু পরিবর্তন ঘটছে যেগুলিকে নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয় না। যেমন, উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কোনো-কোনো বিবাহিত মেয়ে কেবল বাড়ির বাইরে কাজ করছেন না, স্বামীর বাড়ি থেকে রীতিমতো দূরে কাজ করছেন ; কর্মস্থলের কাছে আলাদা একার সংসার চালিয়ে সপ্তাহান্তে পতিগৃহে ফিরছেন। দূরতর পাল্লার 'কমিউটিং' দম্পতিও দেখেছি। তাঁদের আরও কম দেখাসাক্ষাৎ হয়। অবিবাহিতা পেশাদার মেয়েরাও কখনও কখনও যে-যার বাসস্থলে একাই থাকছেন, এবং তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে। ডিভোর্স্‌ড্‌ মেয়েরাও একা থেকে সন্তান মানুষ করা আরম্ভ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই-সব ঘটনার পরিণাম সুদূরপ্রসারী। যে-মেয়েরা এ ধরণের জীবন যাপন করছেন তাঁরা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ('হাই-স্টেটাস') কাজে নিযুক্ত। এঁরা এঁদের প্রাত্যহিক জীবনে পুরুষের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত এমন এক শৈলীর স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, যা কিছু দিন আগে পর্যন্তও অকল্পনীয় ছিলো। এই উচ্চশিক্ষিতা স্বাধীনারা সংখ্যায় বেশী না হলেও সামাজিক তাৎপর্যে গুরু: এঁরা সেই প্রান্তবর্তী সৃষ্টিশীল সাবগ্রুপ, যাঁরা মেয়েদের জীবনচর্যার নতুন নতুন ধারাকে চালু করেন, ধাক্কা মেরে সমাজে ঢুকিয়ে দেন, গ্রহণীয় করেন। এঁরা নারীসমাজের উদ্ভাবনকৌশলের ধারাল অসিধার।

বিয়ে না ক'রে 'একসঙ্গে থাকা' যে জীবনচর্যার একটি গ্রাহ্য উপায় হতে পারে, এই ধারণাটা উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমার প্রজন্মের যৌবনকালে এই স্বীকৃতি তাত্ত্বিক স্তরেও অচিন্তনীয় ছিলো। সে-যুগে এমন কি বিলেতেও 'লিভিং টুগেদার' ব্যাপারটাকে 'লিভিং ইন সিন্‌' বলা হতো—আজ আর সেই পাপবোধের শিহরণটুকু পর্যন্ত নেই।

যা আরও চমৎকারী : যৌন-স্বত্ব-ভিত্তিক বিবাহকে চ্যালেঞ্জ ক'রে তর্ক পর্যন্ত বাঙালীরা শুনতে প্রস্তুত। আমি নিজে এ বিষয়ে লিখেছি, উপন্যাসের অন্তর্গত তর্কের আকারে, প্রবন্ধাকারে—*আনন্দবাজার*-এ এবং *জিজ্ঞাসা*-য় [সেগুলি বর্তমানে আমার *চলন্ত নির্মাণ*-এ সংকলিত] ; আলোচনা-সভাতেও অংশগ্রহণ করেছি ; অন্ততঃ কিছু

লোক মন দিয়েই শুনেছেন ব'লে জানি। বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমিকে প্রশ্নাধীন ক'রে এই-সব তর্ক কিছু লোক যে আদৌ শুনছেন, এই তথ্যটা ফ্যালনা নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে নূতনের প্রতি একটা মানসিক উন্মুক্ততা আজও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্গত, যার ফলাফল আগামী দিনের মেয়েদের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ হতে বাধ্য। উন্নততর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, দীর্ঘীকৃত আয়ুষ্কাল, ক্ষুদ্রতর পারিবারিক সাইজ, কর্মক্ষেত্রে নারীপুরুষের বর্ধমান মেলামেশা, ব্যক্তিগত বৃদ্ধিতে বন্ধুত্বের ভূমিকা এবং সেই বৃদ্ধির প্রতি আমাদের ক্রমবর্ধমান অঙ্গীকার: এই-সব ঘটনা নারীপুরুষের মিথস্ক্রিয়ায় এমন এক দ্যোতনা এবং নতুন জটিলতা যোগ করছে, যার মোকাবিলায় নারীপুরুষের সম্পর্কের দিকে মানুষ নতুন চোখে তাকাতে বাধ্য হচ্ছে এবং হবে। তথ্য এই যে ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুদের সান্নিধ্যে আমাদের বহুমুখ স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত, উদ্ভাসিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে—যার চরিত্র যত বেশী নানা-দিক-সমন্বিত এ ব্যাপারে তার প্রয়োজন তত বেশী—এবং পুনরাবৃত্ত প্রজননের দায়ভার থেকে মুক্ত আধুনিক মানুষের দীর্ঘ জীবনে সাহচর্যের বৈচিত্র্যের জন্য জায়গা না ক'রে উপায় নেই, উপায় থাকবে না। এই প্রয়োজন মেয়েরা-সুদ্ধ অনেক আধুনিক মানুষ এখনই অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন ব'লেই তাঁরা এই নূতন আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন, অথবা তা মন দিয়ে শুনছেন; কেউ কেউ নতুনভাবে বাঁচবার চেষ্টাও করছেন। মানুষের নিহিত স্বভাবই এমন যে এখনকার চাইতে আরেকটু আলোকিত, উন্নততর উপায়ে বাঁচবার কোনো পথ যদি সে আদৌ দেখতে পায়, তবে সেই নতুন রাস্তাটাকে একটা ট্রায়াল না দিয়ে সে থাকতে পারে না। নয়তো আমরা আজও আমাদের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের গুহাতেই ব'সে থাকতাম।

তা ছাড়া এই আগ্রহ বা প্রয়াস আজকের নয়; নারীপুরুষের সম্পর্ককে স্বত্বের ভিত্তি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বন্ধুত্বের কাঠামোর মধ্যে ফেলার নানান চেষ্টা বিভিন্ন দেশের মৌলিক চিন্তাজীবীরা, সৃজনশীল শিল্পী-ভাবুকরা অন্ততঃ দুশো বছর ধ'রে করছেন। আগেকার আর এখনকার পরিস্থিতির মধ্যে তফাৎ এই যে জন্মহারকে কঠোরভাবে কমানোর প্রয়োজন এখন খোলাখুলিভাবে স্বীকৃত, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের নানান কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে। নারীপুরুষের যৌন সম্পর্কে প্রজননই এখন আর কেন্দ্রিক 'কনসার্ন' নয়। অনেক শতাব্দী ধ'রে ঐতিহ্যিক ধর্মগুলি আমাদের বুঝিয়েছে যে প্রজননই স্ত্রীপুরুষের মিলনের একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ভিত্তি। সেই ভিত্তি যখন ট'লে গেছে তখন নারী আর পুরুষের সম্পর্কে যে যুগান্তর আসবে তা আর বিচিত্র কী। সত্য এই যে আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষণে বাস করছি। অনেকে হয়তো ব্যাপারটা এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের অমোঘ ন্যায় যে আমাদের যুগান্তরে পৌঁছে দিচ্ছে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই যুগান্তর সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন স্বল্পসংখ্যক যে-কয়েকজন বাঙালী, তাঁদের মধ্যে অশোক রুদ্র একটি উজ্জ্বল নাম। আমাদের এই সহভাবুক এই সেদিনও আমাদের মধ্যে ছিলেন, ছাপার অক্ষরে বিতর্কে অংশ নিচ্ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আগামী দশকের বাঙালী মেয়েরা তাঁদের একজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী সুহৃদকে হারিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য লক্ষ্য করবার মতো—নারীমুক্তি-আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে বাঙালী সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে সেরকম কোনো তিক্ত দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ দেখা দেয় নি, যেমন দিয়েছে প্রতীচীর কোনো কোনো সমাজে। বাঙালী নারীর মুক্তিপ্রয়াসে পুরুষ অনেক সময়ই সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে। এর কারণ নিহিত আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যেই, এবং এটা আমাদের লাভ ও সৌভাগ্য। শেষ বিচারে পুরুষের মুক্তিকে বাদ দিয়ে তো নারীর মুক্তি নেই ; পুরুষও যদি নতুন চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখবার সাহস অর্জন না করে, তা হলে নারী তার একার মুক্তি নিয়ে কী করবে ? আগামী দিনের বাঙালী মেয়েরা যদি পুরুষদের সহযোগিতা পান, তা হলে অনেক শক্তিক্ষয়কারী অপ্রয়োজনীয় লড়াই এড়ানো যেতে পারে। তাতে সমাজেরই মঙ্গল।

ভাবী কালের পথ-চলাকে সফল ক'রে তুলতে হলে বিশেষ যে-ক্ষেত্রটিতে নারী ও পুরুষের ক্রমবর্ধমান, যত্নশীল, বিচক্ষণ, সুচিন্তিত, পরিশীলিত সাহায্য লাগবে সেটি সন্তানপালন। নারী আর পুরুষের আদানপ্রদানে প্রজনন তার কেন্দ্রিক ভূমিকা থেকে স'রে এলেও প্রজাতির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে সন্তানের উৎপাদন ও লালন কখনো তার গুরুত্ব হারাতে পারে না। বরং ছোট পরিবারের দিনে সন্তানের কল্যাণ অন্য এক মাত্রা অর্জন করেছে। আগেকার দিনে আমরা অন্যান্য পশুদের মতো ফেলে-ছড়িয়ে বাচ্চা বিয়োতাম। দশ-বারোটা বাচ্চাকে পৃথিবীতে আনতে পারলে দু'-তিনজন সাবালক হয়ে উঠতে পারে—এই ছিলো আমাদের কাজের রীতি। আজ যখন আমরা একটি-দুটির দায়িত্ব নিচ্ছি তখন ঐ দু' একটিকেই যথাসম্ভব সুস্থ দেহে ও মনে সাবালকত্বে পৌঁছে দেওয়ার এবং এই জটিল আধুনিক মানবসমাজের নাগরিক ক'রে তোলার সুমহৎ দায়িত্ব আমাদের উপর অর্সেছে। অনেকেই খেয়াল করেছেন যে আমাদের মুক্তির অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে এই লক্ষ্যটাকে সুষ্ঠুভাবে মেলাতে পারছে না 'প্রগতিশীল' প্রতীচীর অনেক সমাজই। সমস্যার উপরিভাগের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে হ্যাঁ, পুরুষরা অনেক ঘরের কাজ করছেন, রান্না নামাচ্ছেন, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখান থেকে ফেরত আনছেন ইত্যাদি। নারীমুক্তিকামীদের মনে হতেই পারে যে নরনারীসাম্যের অভিযানে একটা বিরাট পথ অতিক্রম করা হয়েছে। কিন্তু গভীরে তাকালে বুঝবেন যে বিচ্ছিন্ন দম্পতিদের নাবালক সন্তানদের কল্যাণকর লালন কিভাবে হতে পারে সেই সমস্যাটার সুষ্ঠু সমাধান পাশ্চাত্য সমাজগুলি সাধারণভাবে

করতে পারে নি, এবং বিবাহবিচ্ছেদ যেহেতু সমানে বাড়ছে সেহেতু সমস্যাটা এ-সব সমাজে প্রান্তিক নয়, কেন্দ্রিক।

মুশকিল হলো এই, নারী আর পুরুষের লেনদেন সন্তান উৎপাদনের শাসন থেকে সর্বাধিক স'রে এসেছে পশ্চিমেই, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে সেই লেনদেনকে সমস্যাবর্জিত উপায়ে রূপ দেওয়া যাচ্ছে না পুরোনো খৃষ্টীয় মডেলের একগামী দাম্পত্যের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের ফলে। এর ফলে বিবাহবিচ্ছেদ, তার পর পুনর্বিবাহ, তার পর আবার বিচ্ছেদ, আবার বিবাহ ইত্যাদি একটা সমস্যাসঙ্কুল জীবন-নকশায় দাঁড়িয়ে গেছে। যেখানে কাগজে-কলমে বিয়ে বা ডিভোর্স হচ্ছে না, কেবল 'একসঙ্গে থাকা' ও তার পর ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, সেখানেও সঙ্গী-বদলের প্যাটার্নটা ঐরকমই। যেখানে সন্তান নেই সেখানে সন্তানের ক্ষতির প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু যেখানে সন্তান আছে সেখানে এই প্যাটার্ন থেকে তার শারীরিক পুষ্টি অব্যাহত থাকলেও সুস্থ মানসিক বৃদ্ধি যে প্রায়ই বিঘ্নিত হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। এটা অবশ্যই একটা সামাজিক সমস্যা। এ বিষয়ে বাঙালীদেরও ভাবতে হবে এই কারণেই যে আমরাও এক দিকে প্রজননশাসিত দাম্পত্য থেকে দূরে স'রে যাচ্ছি, আবার অন্য দিকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সূত্রে আমরাও কাগজে-কলমে প্রটেস্টান্ট খৃষ্টীয় মডেলের ক্রম-মানা একগামিতাকেই গ্রহণ ক'রে ব'সে আছি। ঐ অপসরণ আর ঐ মডেল—দুটো জিনিস মানবেতিহাসের দুটো আলাদা পর্যায়ের জাতক; গোঁজামিল দিয়ে যদিও আমরা এদের পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করছি, তবু এদের মধ্যে আজ না হোক কাল সংঘাত বাধবেই। ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে প্রজননকেন্দ্রিক দাম্পত্যে ফিরে যাবার উপায় নেই; তার চেষ্টা করলে তা হবে যুগের অনুপযোগী, প্রতিক্রিয়াশীল একটা বদ্-অ্যাডভেঞ্চার। বরং দেখতে হবে প্রটেস্টান্ট খৃষ্টীয় মডেলের ক্রম-মানা একগামিতা আজকের দিনে সত্যি কতটা প্রাসঙ্গিক। এক দিকে আধুনিক নরনারীদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির দুর্মর চাহিদা, অন্য দিকে একটি-দুটি সন্তানের সুষ্ঠু লালন, এ দুটোকে মেলানোর দায়িত্ব যুগান্তরের মেয়েপুরুষদের ঘাড়ে অবশ্যই এসে পড়বে, তা তাঁরা চান বা না চান। ভাবী কাল তাঁদের কাছ থেকে একটা উচ্চ মানের সামাজিক সৃজনশীলতা দাবি করবে।

আগামী দিনের বাঙালী মেয়েরা তাই নিজেদেরকে চিন্তাশীল, সৃজনশীল এবং আত্মপ্রকাশক্ষম ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব থেকে ছুটি পাবেন না। এবং মুক্তি পাবেন না সবাক্ হবার আনুষঙ্গিক সমস্ত দায়িত্ব থেকেও। অবশ্যই মধ্যে মধ্যে তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে প্রতিক্রিয়াধর্মী 'ব্যাক্‌ল্যাশ্'-এর সঙ্গে—ঘরে এবং বাইরে। তার সঙ্গে লড়বার জন্য ধৈর্য, ক্ষমতা এবং কৌশল লাগবে। কিন্তু উপায় কী। আমাদের জীবনসংগ্রাম তো আমাদেরই লড়তে হবে, গ্রহান্তর থেকে এসে অন্য কোনো দল তো ল'ড়ে দেবে না।

[*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩]

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মান্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা

'ডেমোক্রেসি', 'সেক্যুলারিজ্‌ম্', 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্'—তিনটি ধারণাই যেহেতু ভারতে পৌঁছেছে ইংরেজী শব্দদের সূত্রে, তাই এদের উৎস ও অনুষঙ্গগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয়কে ঝালিয়ে নেওয়া যাক। শব্দত্রয়ের মধ্যে প্রথমটির অর্থ নিয়ে সম্ভবতঃ সব থেকে কম বিতণ্ডা হবে। 'ডেমোক্রেসি'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'গণতন্ত্র' এখন বাংলায় সর্বজনব্যবহৃত চালু শব্দ, যদিও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কিভাবে গ্রাহ্যতর, ব্যাপকতর, উন্নততর, পরিশীলিততর করা যেতে পারে তা নিয়ে আনুপুঙ্খিক তর্কের অবকাশ রয়েছে। 'ডেমোক্রেসি' শব্দটি আদতে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার তথা ভাষার উত্তরাধিকার হলেও আজকাল আমরা একে আগেকার চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক সংজ্ঞা দিতে অভ্যস্ত। আজকাল সেই ব্যবস্থাকেই বলা হয় গণতন্ত্র, যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সাধারণভাবে জনগণের উপরে অর্সেছে, যেখানে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় আত্মশাসন ক'রে থাকেন। বর্ণধর্মশ্রেণীলিঙ্গনির্বিশেষে সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে দেখা খুবই হাল আমলের ঘটনা। যাঁরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা জানেন কিভাবে বিবর্তনের নানা ধাপ অতিক্রম ক'রে কতরকমের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্রের আধুনিক ধারণাটিতে পৌঁছেছি। মেয়েরা তো মাত্র এই সে-দিন এর বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেন। মনে রাখতে হবে, বহুজনগ্রাহ্য হলেও ধারণাটি এখনও পৃথিবীর নিরিখে সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি মোটেই।

ইংরেজী 'সেক্যুলার' বিশেষণপদটি খুব পুরোনো, খৃষ্টীয় লাতিন ঐতিহ্যের এবং ভাষার জাতক। যা চার্চের নয়, যা খৃষ্টীয় অর্থে 'নিত্য' নয়, যা ইহকালের, ইহলোকের, তাকেই বলা হয় সেক্যুলার। সেক্যুলারিজ্‌মের ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিক খৃষ্টধর্মের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই ক'রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তত্ত্ব হিসাবে 'সেক্যুলারিজ্‌ম্' বিশেষ্যপদটির প্রচলন অভিধানের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, এবং প্রধানতঃ এই অর্থে—ইহলোকে মানুষের পক্ষে যা কল্যাণকর তারই ভিত্তিতে মনুষ্যসমাজের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত, ঈশ্বরে বা পরলোকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। এই তত্ত্বেরই জাতক হিসাবে চ'লে এসেছে শব্দটির দ্বিতীয় প্রয়োগ—জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা 'সেক্যুলার' হওয়া উচিত এই মতবাদ। 'সেক্যুলার' এবং 'সেক্যুলারিজ্‌ম্'-এর ধারণা ভারতীয়রা ইংরেজী থেকে আহরণ ক'রে থাকলেও ধারণা-দুটি খোদ

ইংরেজদের দেশেও পূর্ণতম মর্যাদায় পৌঁছয় নি। সংকটের সময়ে আমাদের মধ্যে দুর্গবন্দী মানসতা দেখা দেয়, এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও হয়তো কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেন যে সমস্যাগুলো একান্তভাবে তাঁদের অঞ্চলেরই। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করলে ধরা পড়তে পারে যে একই বা তুলনীয় সমস্যা অন্যত্রও দেখা দিচ্ছে। তাতে ক'রে মাত্রাতিরিক্ত আতঙ্ক বা অপরাধবোধ যেমন এড়ানো যেতে পারে, তেমনি করণীয় বিষয়ে নূতন বিকল্পের হদিস পাওয়াও অসম্ভব হয় না। এইজন্য বৃটিশ যুক্তরাজ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছি।

উচ্চশিক্ষা এখানে সেক্যুলার হলেও স্কুলশিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলারিজ়ম্-তত্ত্ব এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেননা তত্ত্বের দিক দিয়ে এই রাষ্ট্র এখনও পুরোপুরি সেক্যুলার নয়, চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার একটা ঈষৎ অস্বস্তিকর যুগলবন্ধন এখনও চলছে, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় নি। যুক্তরাজ্যের রাজা অথবা রানী যেমন রাষ্ট্রের প্রধান তেমনি চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডেরও প্রধান, এবং সকলের জন্য প্রাপণীয় সরকারী স্কুলব্যবস্থার মূল স্রোতে 'ধর্মীয় শিক্ষা' আবশ্যিক পাঠক্রমের অন্তর্গত, যদিও তাতে পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এই 'ধর্মীয় শিক্ষা'কে সাধারণতঃ খৃষ্টান পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা হয়ে থাকে, তবে 'মেইনল্যাণ্ড' বৃটেনে এ কাজ করা হয় খানিকটা ঢিলেঢালাভাবে। তার কারণ এই অঞ্চলে খৃষ্টানদের কাছে তাদের ধর্মটা এই সময়ে কোনো বড় ইশ্যু নয়। যুক্তরাজ্য সরকারীভাবে 'খৃষ্টান রাষ্ট্র' হলেও কার্যতঃ 'মেইনল্যাণ্ড' বৃটেনে শিক্ষকসম্প্রদায়-সমেত অধিকাংশ লোকের ধর্মবিশ্বাস খুবই শিথিল। যারা পাকা অর্থে ধর্মবিশ্বাসী, গির্জায় যেতে অভ্যস্ত খৃষ্টান, তারা এখন সংখ্যালঘু। ফলে সরকারী স্কুলগুলির আবশ্যিক ধর্মশিক্ষা কার্যতঃ পরিণত হয় বাইবেল থেকে গল্প শোনার হালকা চালের ক্লাসে আর উৎসবের সময়ে যীশুজাতকের উপভোগ্য অভিনয়ে। যে-সব অঞ্চলে এশিয়া থেকে আগত বহুসংখ্যক লোক বসবাস করছে, অতএব মুসলমান-শিখ-হিন্দু ছেলেমেয়েদের বড় বড় দল স্কুলে পড়ে, সে-সব এলাকায় শিক্ষকরা বিষয়টিকে 'বহুসাংস্কৃতিক' পরিপ্রেক্ষিতে পড়াবার চেষ্টা ক'রে থাকেন ব'লে জানি। তা ছাড়া রোম্যান ক্যাথলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত কিছু আলাদা প্রতিষ্ঠানও স্কুল-নেটওয়ার্কের অন্তর্গত এবং সরকারী সাহায্যের প্রাপক। সে-সব স্কুলে ক্যাথলিক বা ইহুদী ছেলেমেয়েরা অন্যান্য 'সেক্যুলার' পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশেষিত ধর্মশিক্ষাও পেতে পারে। ক্যাথলিকরা এবং ইহুদীরা নিজেদের জন্য এই যে-সুবিধাটি আদায় ক'রে রেখেছে, এটি বর্তমান সময়ে দুই ধরণের অশান্তির উৎস। প্রথম অশান্তি উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে। সেই জমিতে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টের আলাদা স্কুল দুই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিপার্থক্যকে জীইয়ে রাখার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ইন্ধন যোগায়। এটা অনেকেরই অভিমত যে ওখানে ক্যাথলিক আর

প্রটেস্টান্ট যতদিন আলাদা স্কুলে যাবে ততদিন ওখানকার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। দ্বিতীয় সমস্যা মেইনল্যাণ্ড বৃটেনের রক্ষণশীল মুসলমানদের এ ব্যাপারে সমানাধিকার দাবির মধ্যে। তারা বলে, 'আমরাও সরকারী খরচে আলাদা স্কুল চাই'। এই দাবিও অবশ্যই রাজনৈতিক। মেইনল্যাণ্ড বৃটেনের ক্যাথলিকরা বা ইহুদীরা পৃথক স্কুল চালালেও সেই-সব স্কুলের মাধ্যমে তারা সামাজিক আচারব্যবহারের বা সংস্কৃতির তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে প্রয়াসী নয় যার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা যখন আলাদা স্কুল দাবি করে তখন তা অবশ্যই সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা তারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাধারণ স্রোতের থেকে নিজেদের পৃথক রাখতে চায়। যেমন, তারা সহশিক্ষার বিরুদ্ধে, মেয়েদের মাথা খোলা রেখে স্কুলে আসার বিরুদ্ধে, ছেলেদের আর মেয়েদের মেলামেশার বিরুদ্ধে ইত্যাদি। এই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষের চূড়ান্ত লক্ষ্য যে কোনো-এক ভবিষ্যতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিতে পৌঁছনো, তার আভাসও পাওয়া যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় এখানকার কোনো কোনো চরমপন্থী দল মধ্যে মধ্যে জেগে উঠে বহিরাগত সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে ওঠে, অর্থনৈতিক মন্দার এবং ব্যাপক বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে ফ্যাশিবাদী বর্ণবাদী ঊনজনবিদ্বেষকে উস্‌কে দেয়। অর্থাৎ সেক্যুলারিজ্‌ম্‌কে জীবনচর্যার আরও নানা ক্ষেত্রে—যথা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াতে, আইন-আদালতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকারখানায়, চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে—স্বীকার ক'রে নেওয়া সত্ত্বেও স্কুলশিক্ষার প্রাঙ্গণে তাকে সম্পূর্ণ অর্থে স্বীকার ক'রে নেওয়ার ব্যাপারে যে-অবহেলাটুকু রয়ে গেছে তা এই সমাজের পক্ষে বর্মের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছে।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার সময়ে 'সেক্যুলারিজ্‌ম্‌'-এর মূলগত অর্থ কতজন মনে রাখেন জানি না। পরলোকমুখী ঈশ্বরাভিমুখী চার্চকেন্দ্রিক মানসতার বিরুদ্ধে ঘনীভূত হয়ে গ'ড়ে ওঠা এই মতবাদের বাংলা করতে গেলে তাকে দিতে হয় 'ইহলোকবাদ' বা ঐরকম কোনো নাম। ভাবনার ইতিহাসে সেক্যুলারিজ্‌ম্‌ প্রকৃতপক্ষে হিউম্যানিজ্‌ম্‌ এবং এবং কম্যুনিজ্‌মের সহযাত্রী। মানবতন্ত্র এবং সাম্যবাদের সঙ্গে তার সহপথিকত্বের কারণেই বিলেতের মতো দেশ তাকে পুরোপুরি হজম করতে পারে নি। এই-সব 'ইজ্‌ম্‌' একই অ্যাডভেঞ্চারের নানা অঙ্গ হিসাবে জীবন আরম্ভ করলেও তাদের পথ আলাদা-আলাদা হয়ে যায়, তারা কোনো সম্মিলিত মহাযাত্রার রূপ নিতে পারে নি। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের পদযাত্রা যখন আরম্ভ হয়েছিলো তখন সেক্যুলারিজ্‌ম্‌ বলতে তার নেতারা কী বুঝেছিলেন জানি না, আমরা বুঝেছিলাম রাষ্ট্রযন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতাকে। সরকারী স্কুলকলেজ থেকে ধর্মীয় শিক্ষার বর্জন আমাদের কাছে এই ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিলো। এবং দেশবিভাগ একে একটা প্রতীকী চেহারাও দিয়েছিলো। 'যারা ধর্ম আর রাষ্ট্রের গোলমেলে সম্পর্কে বিশ্বাস করে তারা ওদিকে গেলো, আর আমরা যারা

সেক্যুলার রাষ্ট্রে বিশ্বাস করি তারা এদিকে রইলাম'—এইরকমই ভাবতাম আমরা। সাধারণভাবে বলা যায়, গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা এই আদর্শ-দুটিকে আমাদের প্রজন্ম সাগ্রহে মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু এদের তাত্ত্বিকভাবে মেনে নিলেও এদের বাস্তবে রূপ দেবার ব্যাপারটা যে স্বাধীন ভারতে পরীক্ষানিরীক্ষাসাপেক্ষই থেকে যাবে তা-ও প্রত্যাশিতই।

'ফাণ্ডামেন্ট', 'ফাণ্ডামেন্টাল' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজতে বেরোলে যদিও লাতিনে ফিরে যেতে হয়, তবু মনে রাখা দরকার যে গণমাধ্যমগুলিতে 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্' বিশেষ্যপদটির ব্যাপক ব্যবহার অত্যন্ত সাম্প্রতিক ঘটনা। খৃষ্টীয় পশ্চাদ্ভূমি থেকেই বেরিয়েছে এই শব্দটি, এবং বেশী দিন আগে নয়, এই শতাব্দীরই বিশের দশকে। খৃষ্টীয় শাস্ত্রের ভিত্তিগত ('ফাণ্ডামেন্টাল') বিশ্বাসগুলিতে অত্যন্ত গোঁড়াভাবে, আক্ষরিক অর্থে আস্থা স্থাপন করাকে বলা হয় 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্'। তারই সম্প্রসারণে হাল আমলে ইসলামী বা হিন্দু ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌মের কথা বলা হয়ে থাকে। ইংরেজী 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্' শব্দটা যেভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা আমি নিজে পছন্দ করি না, তার বাংলা হিসাবে 'মৌলবাদ' শব্দটাও পছন্দ করি না, এবং পারতপক্ষে নিজে ব্যবহারও করি না।[১] জরুরী বিশেষণপদ 'ফাণ্ডামেন্টাল'-এর অর্থাবনতি একটি আক্ষেপের বিষয়। তেমনি 'মূল' থেকে উৎপন্ন 'মৌল' একটি অপরিহার্য বিশেষণপদ। এই সেদিনও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ্‌মের অনুবাদ হিসাবে 'মৌল মানবতন্ত্র' ব্যবহৃত হতে শুনেছি। আর এরই মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে 'মৌলবাদ' একটা দূষণীয় মনোভাবের ডাকনাম হয়ে গেছে। শব্দার্থের এই ডিগবাজি চিন্তার স্বচ্ছতার পরিপন্থী, কেননা ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্ বা মৌলবাদ যে কেন খারাপ হবে তার কোনো সূত্র তাদের গায়ে ধরিয়ে দেওয়া নেই। আমি 'মৌল' শব্দটিকে 'মূলগত' বা 'র‍্যাডিক্যাল'-এর সমার্থক রাখার পক্ষপাতী। বলতে চাই, 'অমুক একজন মৌল ভাবুক' (প্রশংসার্থে), বা 'এই মৌল সমস্যাটির সমাধানে আমাদের মৌল পন্থা অবলম্বন করতে হবে' ('মূলগত' অর্থে)। এই বিশেষণপদটিকে আমাদের সদর্থক রাখা দরকার। সদর্থক শব্দদের দুমড়ে মুচড়ে নঞর্থক শব্দে পরিণত করা একধরণের কুটিলতা, যা যৌক্তিক চিন্তার অন্তরায়। বামপন্থী মহলে 'লিবরাল' শব্দটির অর্থনাশ এইরকম একটি প্রতিবন্ধক। শিকড় ঘেঁষে, মৌলভাবে চিন্তা করতে পারাকে যদি আমরা একটি প্রশংসনীয় ক্ষমতা মনে করি, আমাদের 'roots' সম্বন্ধে আমরা যদি গর্ব অনুভব করি, লজ্জিত না হই, ফাণ্ডামেন্টাল সায়েন্স বা রিসার্চ যদি বিজ্ঞানীদের কাম্য হয়, তা হলে কোনো নিন্দনীয় মনোভাবকে 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্' বা 'মৌলবাদ' নাম দেওয়া অযৌক্তিক, অনান্দনিক, একধরণের বৌদ্ধিক বদহজম। পাশ্চাত্য গণমাধ্যমগুলি ও কাজ করছে ব'লেই ভারতীয় ভাষাগুলিতেও সেই বদহজমকে অবিকল অনুকরণ করতে হবে—এটা একরকমের

দাসমনোবৃত্তি। যে-কোনো ইংরেজী শব্দ গণমাধ্যমে কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠে, তার ঐতিহাসিক উৎস না বুঝে তারই হুবহু নকল ক'রে ভারতীয় প্রসঙ্গে প্রয়োগের চেষ্টা আমাদের ঠিক ক'রে ভাবতে দেয় না, কেবল কুয়াশাই সৃষ্টি করে। 'ফাণ্ডামেন্টালিজ্‌ম্' কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট 'ফাণ্ডামেন্টাল' বিশ্বাসনিচয়ের ভিত্তিভূমি আছে, যাকে আশ্রয় ক'রে সুতীব্র রক্ষণশীলতা আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে তা নেই, সেখানে এই শব্দের প্রয়োগ নিছক বাগাড়ম্বর। যাঁরা কেবল যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসের একটা উগ্র আক্রমণাত্মক রূপের নিন্দা করতে চান তাঁদের স্পষ্ট ক'রে ব্যবহার করা দরকার 'ধর্মান্ধতা', 'ধর্মোন্মত্ততা' বা ঐরকম কোনো সর্বজনবোধ্য শব্দ, যেখানে নঞর্থকতাটা শব্দের গায়েই সুপরিস্ফুট।[২]

§

ডেমোক্রেসি ও সেক্যুলারিজ্‌ম্‌কে টিঁকিয়ে রাখা, তাদের প্রক্রিয়াকে ব্যাপকতর এবং উন্নততর করা, ধর্মান্ধতাকে সর্বান্তঃকরণে বর্জন করা—এগুলি যে ভারতের পক্ষে অপরিহার্য এ কথা অনুমান করি পত্রিকার এই সংখ্যায়[৩] প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে উচ্চারিত হবে। এবং কেবল ভারতের পক্ষেই অপরিহার্য নয় এগুলি; আমাদের অনেকের বিচারেই আজকের পৃথিবীতে কোনো মানবগোষ্ঠী যদি 'সভ্য'-নামে পরিচিত হতে চায় তা হলে তাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকারী হতে হবে এবং ধর্মান্ধতা বর্জন করতে হবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতাকে আজকাল আমাদের আধুনিক গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য শর্ত ব'লেই মনে হয়, কেননা প্রায় প্রতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই কোনো-না-কোনো সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় থাকবে, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে আধুনিক কোনো রাষ্ট্র যদি খুব বেশী সমসত্ত্ব ('হোমোজিনিয়াস') হয়, তা হলে মনে সন্দেহই জাগে—কী ক'রে হলো এরকম, সংখ্যালঘুদের উৎখাত ক'রে নয় তো? পৃথিবী এখন খুব ছোট হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে পরস্পরের গা ঘেঁষে বাঁচতে হচ্ছে। নানা জায়গা থেকে লোক দলে দলে অন্য দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। কেউ গেছে ছিন্নমূল হয়ে, কেউ নেহাৎ জীবিকার তাগিদে, উন্নততর জীবনের অন্বেষণে। বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশান্তরিত হয়েছে। এই অবস্থায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলি যদি সহাবস্থানের ও সহযোগিতার আর্ট আয়ত্ত করতে না শেখে, তা হলে অশান্তি কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। শিখতে হবে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্রের শিল্পকলা—একেকটি রাষ্ট্রের ভিতরে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর-আদানপ্রদানে। দৃঢ়তর করতে হবে আন্তর্জাতিক

সহযোগিতাকে ; সার্বভৌম ক্ষমতার নাম ক'রে কোনো রাষ্ট্র আপন সীমানার মধ্যে নরবলি চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র কোনোমতেই পেতে পারে না।

ধর্মসংক্রান্ত উন্মত্ততাকে নিয়ে আলোচনা করাই অনুমান করি পত্রিকার এই সংখ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং সন্দেহ নেই ধর্মের ভেদ তথা একই ধর্মের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেদ গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদের একটি মূল সূত্র। ধর্মের নামে যে-সব কাণ্ড করা হয়ে থাকে সে-সমস্ত দেখে যুক্তিবাদী মন অনেক সময়ে আপনা থেকেই ব'লে ওঠে—চুলোয় যাক ধর্ম নামে জিনিসটা, তাকে দিয়ে আমাদের আদৌ কোনো দরকার নেই। অথচ অস্বীকার করা যাবে না, যা-কিছু তুচ্ছ, বাহ্য, আপতিক, তাদের ঝেড়ে বাদ দিলেও ধর্মের উৎসে এমন একটা আকুতি রয়েছে যা মানবচিত্তের পক্ষে মৌল—এই রহস্যময় বিশ্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করার তাগিদ। আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেনই বা এলাম, কী এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য—এই-সব ভাবনা মানুষকে তাড়না করবেই, এবং এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়েই মানুষ নানা ধরণের ধর্মবিশ্বাসকে গ'ড়ে তুলেছে, হয়ে উঠেছে homo religiosus। কেউ কেউ বলবেন, সে তো মানুষের দার্শনিক জিজ্ঞাসা। তা-ই, আবার ধর্মের উৎপত্তিও ওখান থেকেই। একই কোষ-জিজ্ঞাসা থেকে দুটো চর্চা উদ্ভূত হয়েছে, এবং দুটোর ওভারল্যাপ বা পরস্পরপ্রাবরণের এলাকাটা নেহাৎ ছোট নয়। তাই ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষে মানুষে যে-বিভেদ তাকে তর্কের আঙিনায় নেমে প্রথমেই এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; এটা একধরণের ইডিওলজিকাল দ্বন্দ্ব। ইংরেজী ইডিয়ম অবলম্বনে বলা যায়, ষাঁড়টাকে পাকড়াও করতে হবে তার শিঙদুটোকে শক্ত ক'রে ধ'রে তবেই।

বুদ্ধিজীবীরা এ কাজে সহায়তা করতে পারেন যদি তাঁরা যুক্তিবাদী, ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তুলনামূলক ধর্মের ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যাগুলির চর্চায় আরও এগিয়ে আসেন। দেশে দেশে স্কুলকলেজে মানববিদ্যাগুলি আজ অন্যায়ভাবে অবহেলিত। তার জন্য একটা দাম আমাদের দিতে হচ্ছে বৈকি। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বোঝাবুঝির পথে এই শতাব্দীতে মূল্যবান যে-অগ্রগতিটুকু হয়েছিলো আজ তা যেন ত্যক্ত : নেই তার জন্য উদ্যম, প্রেরণা, যথোচিত আত্মবিশ্বাস। পণ্ডিতগণ জ্ঞানের প্রসারণের পরিবর্তে আত্মপোষণে অধিক অভিনিবিষ্ট। এক দিকে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান, অন্য দিকে বাজারের ওঠানামার ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকির দিকে কান পেতে অর্থার্জনের চেষ্টা, মাঝখানে যা অনাগত তার সম্পর্কে কিছু আঁধার ভবিষ্যদ্বাণী : প্রায়শঃ এই পুঁজিকে নিয়েই এক দিন থেকে আরেক দিনে এগিয়ে চলেছে মানুষ। এর মধ্যে কে-ই বা শোনে মহামানবদের বাণী, কে-ই বা পড়ে মহৎ কবিতা, কারই বা আগ্রহ আছে কালজয়ী রূপ সৃষ্টি করার দিকে. ধৈর্য আছে শুভবুদ্ধিময় কথা অনুধাবন করবার, সময় আছে অতীতকে তলিয়ে দেখবার, বর্তমানকে খতিয়ে দেখবার। পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে সংলাপে

অনেককেই আজকাল এত বীতস্পৃহ বা হতোদ্যম দেখি যে আমরা যারা একটা আদর্শবাদী যুগে বড় হয়েছি তাদের ভয় লাগে মনে। অথচ তরুণতরদের কোনো আশার কথা যদি না শোনাতে পারি, তাদের জন্য না রেখে যেতে পারি শুভ অভীপ্সার কোনো বাসযোগ্য ভিটে, তা হলে বৃথাই আমাদের বৈদগ্ধ্যের বড়াই, বৃথা সভাসম্মেলন-সেমিনার।

ধর্মের ভেদই যে মানুষে মানুষে লড়াইয়ের একমাত্র অথবা প্রধান কারণ নয় সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমসত্ত্ব ধর্ম যদি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতো তা হলে পাকিস্তান ভেঙে যেতো না, খৃষ্টানে খৃষ্টানে অখৃষ্টান কলহ বাধতো না, কুরুক্ষেত্র রচিত হতো না হিন্দুদের অহংকারের প্রাচীন ভারতবর্ষে। ধর্মের নাম নিয়ে যে-সব ঝগড়া হয় তাদের মধ্যে আর কী কী কলকব্জা কাজ করছে সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে সমস্ত বিবাদগুলোকে একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে না পারলে কোনো সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা নেই। পূর্বব্যবহৃত ভাষার জের টেনে বলি, ষাঁড়টার শিঙদুটো শক্ত ক'রে ধরলে মালুম হয় কিভাবে ইডিওলজির দ্বন্দ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থের স্থূল অথবা সূক্ষ্ম সংঘাত—যে-স্বার্থের সংঘাতে দেশ ভাগ হয়, শহরগ্রাম শ্মশান হয়, একেকটা গোটা প্রজন্ম উচ্ছিন্ন হয় অথবা তাদের চিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ যদি পৃথিবীর তাবৎ লোককেই একই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের তপ্ত তাওয়ায় সেঁকে তোলা যেতো, তা হলেও দেখা যেতো যে দু' দিন শান্তশিষ্ট হয়ে থাকার পর তৃতীয় দিন ভোরবেলা থেকেই ফের রুটিতে রুটিতে সংঘর্ষ বেধেছে—স্বার্থের দুর্মর সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষগুলোকে কিভাবে ন্যূনতম ক'রে আনা যায়, কিভাবে নির্বিষ করা যায়—সেটাই আমাদের এই জনসংখ্যায় ফুলে-ফেঁপে ওঠা আধুনিক মানবসমাজের সামনে এক কঠিন পরীক্ষা, এক দুরূহ দায়িত্ব। আজকাল 'conflict studies' ব'লে যে-চর্চা শুরু হয়েছে সেরকম কোনো কাঠামোর মধ্যেই দেখতে হবে ধর্মের লড়াইগুলোকেও, এটাই আমার অভিমত। ভাষা, বর্ণ, জাত এ-সব নিয়ে যে-দ্বন্দ্বগুলো বাধে তাদের থেকে খুব একটা আলাদা নয় ধর্মের লড়াই। এমন কি স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার নিয়ে যে-দ্বন্দ্ব তা-ও এই কাঠামোর ভিতরেই সংঘটিত হচ্ছে, তাই তা থেকে এত তাত বেরোয়।

স্বার্থের প্রশ্ন আছে ব'লেই কেবল আদর্শবাদী আক্ষেপের প্রকাশ দ্বারা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ঘোচানো যায় না, বিবাদী পক্ষদের মধ্যে সালিসি করবার মতো সূক্ষ্ম দক্ষতা অর্জন করতে হয় সমাজের কিছু কিছু লোককে, লাগে বুঝদার নেতৃত্ব। একটা সমাজের সেক্যুলারিজ্‌মের তাঁরাই প্রকৃত জামিনদার। সেই মীমাংসাদক্ষ, প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের অভাবে যে-ফাঁক তৈরি হয় সেটাই বিপজ্জনক। সুযোগ পেয়ে সেখানে অনেক কাঁটাগাছ বেড়ে ওঠে। এটা হলো একটা সমাজের ভিতরের কথা।

এদিকে কোনো দেশই তো একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। মানচিত্রে সীমানা এঁকে দিয়ে কোনো দেশকে নিরাপদ করা যাবে এই প্রত্যাশা যে কতদূর অলীক তা বর্তমান শতাব্দীতে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেছে। 'যারা ধর্ম আর রাষ্ট্রের গোলমেলে সম্পর্ক চায় সেই-সব গুণ্ডারা ওদিকে থাকলো, আর আমরা সেক্যুলারিজ্‌ম্‌কে নিয়ে সুবোধ বালকবৃন্দের ন্যায় এদিকে থাকলাম'—এ ব্যবস্থা স্বল্প মেয়াদে চলতে পারে, দীর্ঘ মেয়াদে কখনো সফল হতে পারে না। কেননা স্বার্থের জাল এবং ক্ষমতার লড়াই পৃথিবীব্যাপী। পাকিস্তানে বাংলাদেশে ইরানে ধর্মের রাজনীতি চলবে আর ভারতে সেক্যুলারিজ্‌ম্‌-তত্ত্ব থালায় সাজানো রসগোল্লার মতো বিরাজ করবে, এটা কি কখনো সম্ভব ? সেক্যুলারিজ্‌ম্‌কে নিরাপদ করতে হলে সমগ্র উপমহাদেশকেই সেক্যুলার ক'রে তুলতে হবে, এবং উপমহাদেশকে সেক্যুলার করতে হলে আখেরে সারা দুনিয়াকেই সেক্যুলার ক'রে তুলতে হবে। কমসে কম পৃথিবীই আমাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। নয়তো আপনার কলকব্জায় আপনি যতই তেল দিন না কেন, কেউ না কেউ তাতে কাঠি দেবেই। শেষ বিচারে দেখা যাবে করিতকর্মা পাশ্চাত্য জাতিগুলির মুখোমুখি ইসলামধর্মী সভ্যতাগুলি যত দিন না আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে এবং জাগতিক সাফল্য অর্জন করছে তত দিন ভারতরাষ্ট্রের 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা'র যথার্থ সমাধান অসম্ভব। ইতিহাসের একেকটা মোচড় তার স্বরূপ উন্মোচনে দীর্ঘ সময় নেয়। নিউ ইয়র্ক মহানগরে যখন ইংরেজীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কানে ভেসে আসে স্প্যানিশ সংলাপ, তখন হঠাৎ মনে হয়, আর্মাডার পরাজয়ের গ্লানি কি অবশেষে এত দিনে ধুয়ে দিচ্ছে স্প্যানিশভাষীরা ? তেমনি ইহুদী আর আরবের সংগ্রাম স্পষ্টতঃ এখনও শেষ হয় নি, খৃষ্টান আর মুসলমানও ইয়োরোপের মাটিতেই এখনও লড়ছে। এক অর্থে ক্রুসেডের আগুন এখনও নেভে নি। তার বিপুলসংখ্যক মুসলমান নাগরিকবৃন্দ নিয়ে ভারতরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী সাম্প্রদায়িক শান্তির সম্ভাবনাও যে সেখানে বাঁধা প'ড়ে থাকবে তা খুব একটা বিস্ময়জনক নয়। পৃথিবীজোড়া 'প্যান্‌-ইসলামিজ্‌ম্‌'-এর কোনো অভিঘাত ভারতে হবে না এটা কি সম্ভব ? বলা বাহুল্য কোনো নির্বোধ ধ্বংসকাণ্ডের সমর্থনে এ কথা বলা হচ্ছে না, সমকালীন ঘটনাবলীর নিরীক্ষায় আমাদের বিশ্লেষণকে রিয়ালিস্টিক হতে হবে সেই বিশ্বাসেই বলা হচ্ছে।

গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্বের বিচারবিশ্লেষণে আমাদের আরও নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে নিঃসন্দেহে। ঔপনিবেশিক প্রভুদের ঔদ্ধত্য সহজেই আমাদের সমালোচনাভাজন হয় ; তাকে সনাক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তার সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে দর্শকদের কাছ থেকে হাততালিও সহজেই মেলে। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি বা দীর্ঘায়িত হীনম্মন্যতাবোধ থেকে একটা জাতির মধ্যে যে-চিত্তদৈন্য দানা বাঁধে, যা ঘনীভূত হয় প্রতিহিংসাস্পৃহায়, বিদ্বেষপরায়ণতায়, ফ্যাশিবাদে, তাকে আত্মপক্ষের মধ্যে স্বীকার করা বা প্রতিপক্ষের

মধ্যে সনাক্ত করা, তার পর তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা, তার গতি রোধ করা—সে-সমস্তই ঢের বেশী কঠিন এবং ইংরেজীতে যাকে বলে messy কাজ। সংঘবদ্ধভাবে অত সব করতে আমাদের স্পৃহা হয় না ব'লে আখেরে মোটা খেসারত দিতে হয়। আগুন যখন সত্যিই লাগে, ধর্মান্ধতা বা উগ্র জাতীয়তাবাদ যখন চরমপন্থা অবলম্বন করে, সন্ত্রাসবাদ হয়ে ফেটে পড়ে, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা তার শিকার হয়।

এই পত্রিকার ১৪ : ১ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সম্পাদক উপমহাদেশে হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক অজ্ঞতা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ঐ অজ্ঞতার দূরীকরণে অবশ্যই সচেষ্ট হওয়া উচিত, কারণ কেবল উপমহাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই আমরা এখন একটি বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করছি, এবং পরস্পরের সংস্কৃতিকে না জানলে নিজেদেরই দীন ক'রে রাখা হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে কেবল তেমন মানুষরাই তো গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কার্যকর সেতু বাঁধতে পারবেন। বিবাদে মধ্যস্থতা করতে পারেন এমন নেতারা তো তাঁদের মধ্য থেকেই উঠে আসবেন। তবু এই বিষয়টির সূত্র ধ'রে সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশ্লেষণকে বাস্তবধর্মী করার তাগিদে আরও কয়েকটি কথা এখানে বলি।

পারস্পরিক অজ্ঞতা সক্রিয় সৌহার্দ্য গ'ড়ে ওঠার অন্তরায় হতে পারে, কিন্তু তা হিংসার কারণ হতে যাবে কেন? আমরা প্রত্যেকেই কিছুটা যূথচারী, কিছুটা আত্মসীমানারক্ষাকারী। একটা আধুনিক শহরে মানুষ প্রায়ই তার প্রতিবেশীকে ঠিক ক'রে চেনে না। মুখটা চেনে, নামটা জানে, দেখা হলে একটা সম্ভাষণ করে, কিন্তু প্রতিবেশীর হাঁড়ির খবর রাখে না। আমার প্রতিবেশী আমার হাঁড়ির খবর না রাখলেও আমি অবশ্যই প্রত্যাশা করি যে বিপদের মুহূর্তে তার কাছে ছুটে গেলে সে আমাকে সাহায্য করবে, এবং আমার বাড়িতে সে কখনোই আগুন দেবে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার গা-মাখামাখি না থাক, তার বাড়িতে আগুন দেবার কোনো অধিকার আমার নেই। তাই অজ্ঞতা যখন হিংস্রতা হয়ে দেখা দেয় তখন বুঝতে হবে যে অন্য কোনো কলকাঠি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেনই বা অত অজ্ঞতা? পবস্পরের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে আজকের দিনে তো আর তেমন গ্রন্থকীট হবার দরকার নেই। সারা ভারত এখন পরস্পরের কাছে চ'লে আসছে গণমাধ্যমগুলির, বিশেষতঃ দূরদর্শনের, কল্যাণে। বোম্বাইয়ের ছবিগুলির জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। সারা ভারত থেকে লোক আসে ট্যুরিস্টদের দর্শনীয় সৌধগুলি দেখতে। তাদের মধ্যে মন্দির-মসজিদ দুইই আছে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কীর্তি আছে, শিল্পকলার মিলিত ধারা আছে। যাঁদের গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ তাঁদের মধ্যেও

দুই সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই বর্তমান। এমন অবস্থায় অজ্ঞতার কোনো অজুহাত আদৌ খাটে না। আসলে কোনো অবস্থাতেই খাটে না। অন্য ধর্মের মানুষদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও আমরা এটুকু ভালোভাবেই জানি যে তারাও আমাদের মতোই মানুষ, তাদেরও দুটো হাত, দুটো পা ইত্যাদি আছে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাদের কাছে তো এটা আরোই স্পষ্ট হওয়া উচিত যে একই ঈশ্বর সবাইকেই সৃষ্টি করেছেন। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ব'লে আদৌ কোনো জিনিসই থাকার কথা নয়। তবু তো আছে। এইখানেই কূটাভাস। সেই অসহিষ্ণুতার মাপকাঠিতে কেউ বা 'হীদেন', কেউ বা 'ম্লেচ্ছ', কেউ বা 'কাফের'। শেষ বিচারে এই ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করার পথ অন্যদের সম্বন্ধে বিশেষিত জ্ঞান নয়, তাদের আর আমাদের সাধারণ মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি। হিউম্যানিজ্‌ম্‌ই কি নয় ধর্মান্ধতার শ্রেষ্ঠ দাওয়াই ?

হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিতজন পারস্পরিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরস্পরের দিকে আরও এগিয়ে আসবেন এটা সব অবস্থাতেই কাম্য, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পারস্পরিক জ্ঞান তার নিজের জোরে পারস্পরিক হিংসা এড়াতে সক্ষম নয়। আত্মীয় যখন আত্মীয়ের সর্বনাশ করে তখন সাধারণতঃ পরস্পরের নাড়ীনক্ষত্র জেনেই সে-কাজ করে। একটা গৃহের অভ্যন্তরে, একটা পরিবারের ভিতরে পরস্পরকে ভালোভাবে জেনেই নির্মমতম দমন ও উৎত্রাসনের কাজগুলি করা হয়ে থাকে। তাই সাম্প্রদায়িক অগ্নিকাণ্ডগুলি এড়াতে হলে যূথচারী হিংসার কলকাঠি কিভাবে নড়ে সেই ব্যাপারগুলি আরও পরিষ্কার ক'রে বোঝা দরকার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা দুটিকে একসঙ্গে সামাল দিতে না শিখলে তরী ডোবে। স্বৈরতন্ত্র একটা সহজ প্রক্রিয়া ; 'তুমি চলবে কেন, চলবে নিয়ম' এই কথা ঘোষণা ক'রে দিয়ে মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ বা সৈন্য মোতায়েন ক'রে নির্ঝঞ্ঝাটে 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখা যায়। কিন্তু গণতন্ত্র একটা জটিল, এলোমেলো প্রক্রিয়া : অনেকরকমের মতামতের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে, অনেকের মন রেখে, অনেকরকমের আপস ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ কেটে তাকে চলতে হয়। নির্বাচনে জয়লাভের জন্যে এক সম্প্রদায়ের পিছনে আরেক সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দেওয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদেরকে খেলানো, সংখ্যালঘুদের সঙ্গে দর কষা : দলীয় রাজনীতির এ-সমস্ত কৌশলই সেক্যুলারিজ্‌ম্‌কে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারে। তখন পার্টিভিত্তিক রাজনীতির প্রক্রিয়াটাই সেক্যুলারিজ্‌মের (এবং খাঁটি গণতন্ত্রের) শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সেই আমরা ফিরে যাই ক্ষমতার লড়াই আর স্বার্থের সংঘাতে। তেমন সময়ে দুই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান থাকলেও জনসাধারণ বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারের শিকার হতে পারে।

শিবনারায়ণ দুঃখ প্রকাশ করেছেন এজন্যে যে পশ্চিমবঙ্গের বিদগ্ধ হিন্দুদের

মধ্যে আরবী-ফার্সীর চর্চা নেই, যে-দক্ষতা রামমোহন রায়ের ছিলো ; বা বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যকৃতি নিয়েও অভিনিবিষ্ট চর্চা নেই, যদিও বাংলাদেশে অনেক মুসলমান পাঠকই হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখা যত্ন ক'রে পড়েন। তাঁর এই ক্ষোভ নিশ্চয়ই আন্তরিক তথা ন্যায্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে 'আনরিয়ালিস্টিক'ই বলতে হয় তাকে। রামমোহন যেমন একটা নতুন যুগের প্রবর্তক, তেমনি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা যুগের শেষে, যে-যুগে মুসলমান শাসনের সূত্রে ফার্সী ছিলো দরবারী ভাষা, আরবী ছিলো শাসকবর্গের শাস্ত্রীয় ভাষা। সেই যুগ শেষ হয়ে গেলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আভিমুখ্যটা গিয়ে পড়লো নতুন রাজভাষা ইংরেজীর দিকে, তার মাধ্যমে জীবিকার্জনের তথা পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে পরিচয়লাভের দিকে। সেই নতুন যুগের এলিটের কাছ থেকে আরবী-ফার্সীর প্রতি পুরোনো আনুগত্য আদৌ প্রত্যাশা করা যায় না। কালক্রমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আত্মঘোষণার প্রয়োজনে বাঙালী মাতৃভাষার গৌরববিধানেও তৎপর হলো, কিন্তু ইংরেজীর প্রয়োজন তার ঘুচলো না। এবং তা ঘুচবার কোনো সম্ভাবনাও দেখি না। বর্তমানে ইংরেজী সর্বভারতীয় এলিটগোষ্ঠীর মহা আদরের ভাষা, সুয়োরানীর আসনে অধিষ্ঠিত। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলি দুয়োরানীর দীন-হীন অবস্থায়।[৪] ইংরেজী যেখানে 'সর্বভারতীয়', অন্যান্য ভাষাগুলি সেখানে নেহাৎ 'আঞ্চলিক'। ইংরেজরা চ'লে গেছে, তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় জাহির করবার তেমন কোনো তাগিদও আর নেই। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাপটের কারণে ইংরেজী এখন বিশ্বজোড়া যে-আধিপত্যের শিখরে পৌঁছেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নেও সেখানে পৌঁছয় নি। ইংরেজী এখন পৃথিবীর এক-নম্বর বিশ্বভাষা, ইলেক্‌ট্রনিক সংযোগ দ্বারা শাসিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, হাটবাজার, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকৌশলের ভাষা। সর্বভারতীয় এলিট শ্রেণী স্বভাবতঃই ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করতে চায়, কেননা এর সাহায্যে দেশে বিদেশে অনেক সুযোগসুবিধা আদায় করা যেতে পারে, অনেক মই চড়া যেতে পারে। ভারতের উচ্চবিত্তরা এখন ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষাই শেখাচ্ছে না, আরবী-ফার্সী তো দূরের কথা। হঠাৎ যদি একদিন দেখা যায় যে ইংরেজীর এখন যা ভূমিকা আরবী বা ফার্সীই তা পালন করছে, সেদিন দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতার ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আরবী-ফার্সী শিখবে বৈকি। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে সর্বভারতীয় এলিট গোষ্ঠীর যে-ক্রমবর্ধমান অবহেলা তা অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতাকে সাহায্য করছে। এলিট শ্রেণী আছেন তাঁদের ইংরেজীমাধ্যমিক কাল্‌চার নিয়ে। সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের কাছে হয়তো অবান্তর। নিম্নবিত্তদের সাম্প্রদায়িকতাকে উস্‌কে দেওয়া হচ্ছে মাতৃভাষার গন্‌গনে উনুনে। দুটো কাল্‌চার পরস্পরের ভাষা বোঝে না।

ঠিক যে-কারণে নব্যবঙ্গের এলিট একদিন মাতৃভাষার উন্নয়নে উঠে প'ড়ে লেগেছিলো তার সদৃশ কারণেই—প্রথমে পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিচয়কে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবার জন্যে, তার পর জাতীয় আত্মঘোষণার তাগিদে—পুব বাংলার মানুষ বাংলার দিকে মুখ ফেরায়। তার আপন সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ঠিক ক'রে আত্মস্থ করার জন্যে 'চর্যাপদ থেকে জীবনানন্দ দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বুদ্ধদেব বসু' (শিবনারায়ণের ভাষায়) যত্ন ক'রে পড়ে। কিন্তু এটা ঠিক হিন্দুদের বুঝবার তাগিদেই হয়েছে কি? আমার তো মনে হয় এ ঘটনা ঘটেছে প্রবল আত্মানুসন্ধানের তাগিদে। ওখানে এক নতুন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় হয়েছে। আজকের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা এক নূতন জাতীয়তাবাদের ভাবস্রোতে ভেসে বাংলার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ভাষাকে নিয়ে তাই সেখানে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। হিন্দু লেখকদের লেখা বই পড়া সেই কর্মসূচীর অন্তর্গত। কিন্তু জাতীয়তাবাদ জিনিসটা দ্ব্যর্থক, উভবল, উদ্বেল। তা থেকে যেমন লাভ আছে তেমনি তার মধ্যে অবশ্যই নিহিত বিপদও আছে। আধুনিক ভারতের ভাষা-সংস্কৃতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রতিটি অঞ্চলেরই যদি লাগে একটি ক'রে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌম রাষ্ট্র, পতাকা, জাতীয় সংগীত ও সেনাবাহিনী, তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সে-ক্ষেত্রে উপমহাদেশের বুকে একাধিক বস্‌নিয়া দেখা দেবে। হতভাগ্য বস্‌নিয়া—ইয়োরোপ মহাদেশের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা যার পক্ষে কার্যকর হয় নি। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় ন্যাশনালিজ্‌ম্‌কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক বক্তৃতামালা, সার্বভৌম-রাষ্ট্র-ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর এই দৃষ্টিই দূরদর্শী। আমাদের ভুললে চলবে না, জাতীয়তাবাদের আতিশয্যে নয়, আন্তর্জাতিক চেতনায় উত্তরণের মধ্যেই ভবিষ্যতের প্রজন্মের মুক্তি। কোনো-না-কোনো নকশার যৌথ উদ্যমের মধ্যেই যেমন ইয়োরোপ মহাদেশের তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশেরও বৈচিত্র্যের-মধ্যে-ঐক্যের সাধনা স্ফূর্তি লাভ করতে পারে।

বাংলাভাষাকে নিয়ে বাংলাদেশে যে-নতুন আত্মসচেতনতা দেখা দিয়েছে তা তো অবশ্যই ওখানকার নতুন অবস্থার জাতক। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অন্যরকম। তার সমস্যাগুলি আলাদা। দুই বাংলার সিনারিও এক নয়, অবস্থান এক নয়। পত্রিকার একই সংখ্যায় (১৪ : ১) তাঁর জার্নালে শিবনারায়ণ বলেন যে 'দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ হয়েছে'। 'সর্বনাশ হয়েছে' কিনা তা নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে, তার জন্য এখানে জায়গা নেই। তবে দুই বাংলার তুলনামূলক আলোচনায় পশ্চিম বাংলা সম্বন্ধে অতটা নৈরাশ্য প্রকাশকে আমার ঠিক বিষয়নিষ্ঠ ব'লে মনে হয় না, মন্ময় ও আবেগতাড়িত ব'লে মনে হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অগণিত ছিন্নমূল মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে আশ্রয় দিয়েছে এবং নতুন ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে

তা কি সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় ? দেশবিভাগের পর পশ্চিম বাংলার অনেকটা শক্তিই গেছে নবাগত মানুষগুলিকে নিয়ে কোমর শক্ত ক'রে আবার উঠে দাঁড়াতে। প্রচণ্ড চোট লাগলেও সে চুরমার হয়ে যায় নি। বা নকশাল আন্দোলনের ঘূর্ণিজলের মধ্যে তলিয়ে যায় নি। যদি তলিয়ে যেতো, তা হলে আজ কি আমরা এই বিষয় নিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি কাগজে সম্পূর্ণ খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারতাম ? এই বাক্‌স্বাধীনতা কি কোনো কৃতিত্ব নয় ? আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কলকাতা এবং পশ্চিম বাংলার কাছে কৃতজ্ঞ—দেশান্তরিত অবস্থাতেও বাংলাভাষার লেখিকা হিসাবে দূর থেকে আমাকে লালন করার জন্য। নৃবিজ্ঞানীরা আমাদের মতো লেখকদের বলেন diaspora writers। আমি মেয়ে ব'লেই এই ঘটনা সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আরেকটু তাৎপর্যবহ। আমি যখন দেশান্তরিত লেখিকা হিসাবে লিখতে আরম্ভ করেছি পরবর্তী কালের নারী-আন্দোলন তখনও দানা বাঁধে নি। সেই অবস্থায় আমার সাহিত্যিক সত্তাকে মদত দেওয়ার জন্য, একজন diaspora female writer হিসাবে আমাকে গ'ড়ে তুলবার জন্য বাংলার পশ্চিম দিকের কাছেই আমি ঋণী। যাঁরা আমাকে সে-মদত দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই পুরুষ বুদ্ধিজীবী, তাই তাঁদের দিক থেকে একটা প্রগতিশীল প্রতিন্যাস ছাড়া সে-ঘটনা সম্ভব হতো না। কোনো পিছিয়ে-পড়া প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ এ কাজ করতে পারে না। তাই আমার 'নারীবাদ' আর তসলিমা নাসরিনের মতো একজন লেখিকার 'নারীবাদ' কিছু আলাদা, আমাদের যাত্রার স্থচনাবিন্দু ভিন্ন।

পত্রিকার ১৩ : ৪ সংখ্যায় শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুবের 'কোন্ বাংলা ? কে বাঙালী ?' প্রবন্ধের বিশ্লেষণকে আমার খুবই প্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে বাঙালীত্ব এবং ভারতীয়ত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, এবং যোগ করবো—বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের সঙ্গেও তার কোনা বিরোধ নেই। তিনি ঠিকই বলেন, পশ্চিম বাংলার মানুষ বাঙালী কিনা, ভারতের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী হয়ে তাদের বাঙালীত্বকে তারা রক্ষা করতে পারবে কিনা, সে-সব তারাই বুঝবে, তারাই ঠিক করবে, এ বিষয়ে তারা অন্য কারও পাঁতি মানবে কেন। '... অস্মিতার প্রসারণ ও সংকোচন দুটোই সম্ভব, প্রসারণটাই সভ্যতার লক্ষণ, সংকোচনটা বর্বরতার।' এও ঠিক, বাংলাদেশ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আপেক্ষিক উদাসীনতা 'অতিসচেতনতার ... চেয়ে ভালো', এবং দুই বাংলার মধ্যে সম্পর্ক সুস্থতর হওয়ার আগে 'পুরানো কিছু বদ্ধমূল ধারণা কিছু বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস ভুলে যাওয়ার মতো' সময়ের দরকার ছিলো। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, পশ্চিম বাংলার নূতনতর প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের সাহিত্যসংস্কৃতি নিয়ে ঠিকই একদিন গবেষণা করবে। তার সময় আসবে। তার আগে একটা প্রজন্ম যদি সে-ধরণের চর্চাকে মুলতুবি

রেখে থাকে তা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। একটা প্রচণ্ড আঘাতের পর নিজেকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাদেরও কিছু কালগত ব্যবধানের প্রয়োজন ছিলো।

এবং এখানে বলি, দুই বাংলার সম্পর্ক আবার সুস্থ হবার জন্যে দুই দিকেই গভীরতর সত্যভাষণের একটা প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে অন্যত্র লিখেছি, কিন্তু সে-লেখা এখনও প্রকাশিত হয় নি,[৫] তাই এখানে বলা যেতে পারে। দেশবিভাগের জন্য আমাদের যে-শোক, যে-অপূরণীয় ক্ষতিবোধ, তা একধরণের মৃত্যুশোক, কিন্তু তা আমাদের আজ পর্যন্ত ঠিক ক'রে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নি। আমার নিজের জন্ম কলকাতায় হলেও আমাদের পারিবারিক শিকড়বাকড় পূর্ববঙ্গে প্রোথিত। আমাদের নিকট এবং দূর সম্পর্কের বহু আত্মীয় ছিন্নমূল হয়েছিলেন। আমার বয়স তখন সাত। সেই মর্মান্তিক ঘটনা আমার মনে গভীর দাগ কেটে যায়। একটা গোটা প্রজন্মকে দেখেছি সমস্ত শোককে শুকনো চোখে অবদমন ক'রে যাকে বলে to burn their boats তা-ই করতে। তাঁরা জানতেন তাঁরা আর ফিরে যাবেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন যেন একটা বৃহৎ অস্ত্রোপচারের পর সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে, দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা ভুলে যেতে। কিছু পলায়ন তার মধ্যে ছিলো নিশ্চয়ই। কিন্তু ট্র্যাজেডিও ছিলো—সব স্তবে। নিজের জন্মের ও লালনের ভূমিতে বিদেশী হয়ে যাওয়া যে কী গভীর বেদনার অভিজ্ঞতা তা যাঁরা সে-অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যান নি তাঁরা জানেন না। এই অবস্থায় বিস্মৃতির কিছু প্রয়োজন ছিলো। নদী দিয়ে কিছু জল বয়ে না গেলে দু' দিকের সামীপ্য সম্ভব ছিলো না।

এই ধরণের বোঝাপড়ার প্রয়োজন উপমহাদেশের আরও কিছু গোষ্ঠীরও। যেমন পাঞ্জাবীদের, বা কাশ্মীরীদের। তিনরকমের ধর্মীয় শিবিরে ত্রিধাবিভক্ত হয়েছে উপমহাদেশেব পাঞ্জাবীদের আত্মপরিচয়। তাদের মধ্যে কি পরস্পরকে বোঝার জন্য কোনো তুলনীয় প্রয়াস ঘটছে? জানতে ইচ্ছা করে। কাশ্মীরী মুসলমানদের দুঃখের কথা পৃথিবীর কাগজে যদি বা ওঠে, কাশ্মীরী হিন্দুরা কাহিনী থেকে মুছে গেছে—যেন তারা কখনোই ছিলো না। ঐ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংলাপের সম্ভাবনা আজ কতটুকু? তার জন্যে অনুকূল আবহ কি কোথাও আছে? সেটাও আমার জানতে ইচ্ছা করে। এই-সব দুঃখময় ইশ্যুকে ধামাচাপা দিয়ে তো উপমহাদেশে কোনো স্থায়ী সাম্প্রদায়িক শান্তি সম্ভব নয়। এ-সব নিয়ে কারা ভাবছে? পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের কথা সেখানকারই কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হতে আমি নিজে প্রথম শুনি নিউ ইয়র্কের বাংলা পত্রিকা *পরিচয়*-এর মাধ্যমে। কণ্ঠস্বরটি সাহসী লেখিকা পূরবী বসুর। তার পর এই সম্প্রতি এই পত্রিকায় শুনতে পেলাম আলি আনোয়ারের কণ্ঠস্বর। হিন্দু-মুসলমানের সামীপ্যের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে কাজ ক'রে যাচ্ছেন আমাদের পরিচিত কেউ কেউ। তাঁরা এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আমাদের বন্ধুজন। ক্রমে ক্রমে এই ধরণের

সাহসী উদ্যম সম্মিলিত হলে অনেক চিত্তশুদ্ধি ও আত্মগঠনের পর তবেই উপমহাদেশে ধর্মান্ধতা উৎসাদিত হয়ে সত্যিকারের সাম্প্রদায়িক সততার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তবে 'ক্ষমতার রাজনীতি'র নিহিত বিষকে কিভাবে 'নিউট্রাল' করা যায় তার কৌশল আয়ত্ত করতে না পারলে কেবল শুভ ইচ্ছা ও শুভ বাণীর মাধ্যমে কোনো সুদিন আসবে না। এবং যেহেতু আশা না রাখলে কোনো কাজ ঠিক ক'রে করা যায় না, তাই আমি আশাবাদী। শুভবুদ্ধি ও শুভকর্মের সমন্বয়ে গঠিত কাঙ্ক্ষিত সুদিন আসতে দেরি হলেও আসবে এমন ভরসা আমি রাখি।

১ যদি করি, তা হলে তা উদ্ধৃতিচিহ্ন-সহকারে। উদ্ধৃতিচিহ্নটা দৃশ্য না হলেও আমার ভাষাব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে সেটা আমার চেতনার ভিতরে আছে। ঠিক যেমন আমরা ব্যবহার করি 'তথাকথিত' বিশেষণপদটিকে।

২ বর্তমান সময়ে 'radical', 'radicalize' ইত্যাদি শব্দের লক্ষণীয় অর্থাবনতি ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা অমুক শিবিরে বা ক্যাম্পাসে 'radicalized' হয়েছে। সেই 'র্যাডিক্যালাইজ়েশন' মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ়্মের থেকে শত যোজন দূরে। অধুনা 'neo-liberalism' শব্দটিও আমাকে দিশাহারা করে।

৩ *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার ১৪ : ৩ সংখ্যা, যেখানে এই লেখাটি প্রথম বেরোয়। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পটভূমিকায় সেক্যুলারিজ়্ম্, ধর্মোন্মত্ত রাজনীতি ও গণতন্ত্রের উপরে বিশেষ সংখ্যা-রূপে পরিকল্পিত হয়েছিলো সেটি। বর্তমান প্রবন্ধে 'এই পত্রিকা' বলতে *জিজ্ঞাসা*-কেই বোঝাবে।

৪ এখন কিন্তু হিন্দীর যথেষ্ট দাপট, দীন-হীনদের কোঠায় তাকে আর ফেলা যায় না।

৫ আমার প্রথম নাটক *রাতের রোদ*-এর কথা বলছি এখানে। সেটা ১৯৯০ সালে লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও প্রকাশিত হয় নি—১৯৯৪ সালে প্রথম অভিনীত হয় এবং ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

[*জিজ্ঞাসা*, ১৪ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৪০০ (১৯৯৩)। এই প্রবন্ধটির একটি পরিবর্ধিত ইংরেজী রূপ বেরোয় *Bruised Memories: Communal Violence and the Writer*, ed. Tarun K. Saint, (Seagull, Calcutta, 2002) বইটিতে।]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুভাষিতগুচ্ছ

বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ক'রে পরিচয় দেবার দরকার নেই। কবিতায় সংবেদনের সঙ্গে বুদ্ধির মিশ্রণ আমাকে বিশেষভাবে টানে ; সেই সূত্রে আমার কাছে তাঁর কবিতার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। আমার ভালো লাগে তাঁর কবিতার বুদ্ধিমান ধার, ঋজুতা, প্রত্যক্ষতা, সরাসরি কথা বলার ভঙ্গিটা। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয় তাঁর গলার স্বরটা। অর্থাৎ অনুভব করি তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়তা, একটা সামীপ্য। এই অনুভবটা বোধ করি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পেয়েছিলো আমার উপন্যাস *নোটন নোটন পায়রাগুলি*-র একটা জায়গায়, যেখানে রোদে ঝক্‌ঝক্ করতে-থাকা লাল মঁব্রিশ্যা ফুলেদের সারির দিকে তাকিয়ে নোটনের মনে প'ড়ে যায় ছুরির মতো ধারাল সেই লাইন—'ফুলগুলো সরিয়ে নাও, আমার লাগছে', এবং তার ডায়েরিতে সে লেখে: 'মাপ করবেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাট্ আই নো হোয়াট্ ইউ মীন, ইউ সী—।'

১৩৬৩ থেকে ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছড়ানো সুভাষের নানা স্বাদের গদ্যরচনা দিয়ে তৈরি হয়েছে একটি বই।* কোনো লেখা প্রবন্ধধর্মী, কোনো লেখা স্মৃতিরোমন্থনমূলক, কোনোটা সাক্ষাৎকারে দেওয়া উত্তরের আকারে। অবশ্য যেগুলি প্রবন্ধধর্মী সেগুলি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা নয়, আরেকটু হালকা চালের, কিংবা বলা চলে কবিতারই মতো চিন্তা থেকে চিন্তায়, চিত্রকল্প থেকে চিত্রকল্পে উড়ে-যাওয়া, ফুল তুলে ফুলদানিতে সাজানোর বা মালা গাঁথার সমধর্মী, কখনও বা কোনো কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে গোছানো। কবিতাসংক্রান্ত নানা প্রশ্নই অধিকাংশ রচনার প্রধান উপজীব্য, তবে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু ভাবনাও ঠাঁই পেয়েছে।

পাতা উল্টাতে আরম্ভ করলেই এমন সব স্মরণীয় উক্তি নজরে পড়বে, যেগুলি কবিতার লাইনের মতোই মনের মধ্যে আটকে যায়, এবং মন ব'লে ওঠে: তাই তো, ঠিকই তো।

জীবনের ডালে কবি নাড়া বাঁধে। আকাঙ্ক্ষাগুলোকে উঁচুতে টাঙিয়ে গান

* সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *কবিতার বোঝাপড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, মূল্য ৩০.০০

গেয়ে গেয়ে দোল দেয়। ...

এক জায়গায় ঠায় থাকলে দেখা যায় না। ঠাঁইনাড়া হলে তবেই দেখা যায়। পাঁচটা জিনিসের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকলে বাঁধনটা খুলতে হয়। তুলে আনতে হয়। ছাড়াতে হয়। আল্‌গা ক'রে আলাদা ক'রে দেখতে হয়। ...

কবি তোলপাড় ক'রে দেখে। সব কিছুই তাকে নেড়েচেড়ে দেখতে হয়। ...

কবিতার ভেতর দিয়ে কবি পাঠককে বলেন আস্ত আখটা তুলে নিতে। আখটা ছাড়িয়ে নিতে হয়। ...

বস্তুর জগৎ থেকে বাসনার জগতে, বাসনার জগৎ থেকে বস্তুর জগতে— কবিকে বারেবারে চক্রাকারে ফেরাফেরি করতে হয়। কবিতা মনের মধ্যে উঠে বলে 'চলো চলো'। বাসনা থেকে বস্তুতে। বস্তু থেকে বাসনায়।

কবিতার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গেই বোঝাপড়া। বাসনার ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে বদ্‌লে বদ্‌লে নতুন করা। ...

সচিত্র সশব্দ বাসনা ছন্দে বাঁধা প'ড়ে কবিতা হয়।

এই টুকরোগুলি মূলতঃ কবিতাধর্মী, প্রায় গদ্যকবিতার মতো, কিংবা, বলা যেতে পারে, কবিতাবিষয়ক সুভাষিতগুচ্ছ। কবির নামের সঙ্গে শ্লেষটুকু আপনা থেকেই এসে গেলো— কোনো চেষ্টা না ক'রেই। এটা বোধ হয় একরকমের ভর করা। তাঁরই একটি কবিতার একটি চিত্রকল্পের জের টেনে বলা যায়, রেলিঙে বুক চেপে-ধরা আইবুড়ো মেয়ের মতো পুস্তকসমালোচনার ভাষায় হঠাৎ একটা লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতির অবতরণের সামিল। (আমি অবশ্য ঐ ভাষাকে 'কালোকুচ্ছিত' বলছি না, কেননা কাউকে 'কালোকুচ্ছিত' ব'লে গাল দেওয়া একেবারেই আমার স্বভাববিরুদ্ধ, অতএব চিত্রকল্পেও তা আমার পক্ষে বেখাপ হবে, তবে আইবুড়ো মেয়ের— অথবা ছেলের— সঙ্গে একটা তুলনা হয়তো চলতে পারে।)

এই ধরণের সংকলনের একটা মূল্য যেমন স্রেফ তার সুভাষিতসংগ্রহে— উক্তিগুলোকে মণিমুক্তার মতো আমাদের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার মধ্যে, যাতে আমরা পাই তাদের নেড়েচেড়ে আলোয় তুলে দেখার আনন্দ— তেমন আরেকটা মূল্য কবির এবং কবিতার হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ার উদ্ভাসনে। সুভাষ যদিও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বলেন, 'কোন্ কবিতার কে কী কেন কবে কোথায়— উৎসের এসব প্রশ্নে আমার আজ মন ওঠে না', অথবা নিজের প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেন জেরার সম্মুখীন হতে একটা বোধগম্য আপত্তি— 'হুলিয়া দিয়ে কবিদের ধ'রে এনে এখন সটান কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। তারপর জেরায় জেরায় জেরবার'— তবু স্বীকার্য যে অন্যদের জিজ্ঞাসা মাঝে-মধ্যে চাপসৃষ্টি না করলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এমন অনেক রহস্যই আড়ালে রয়ে যায়, যেগুলিকে

মধ্যে মধ্যে বেপর্দা করাই দরকার। সেটা দরকার কবিতা এবং অন্যান্য আর্টফর্ম সম্পর্কে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের সুশিক্ষিত ক'রে তোলার জন্যেই। সুভাষ নিজেই স্বীকার করেছেন যে লেখক আর পাঠকের সম্পর্ক দুটো ডানার মতো—'কোনো একটা ডানা কাটা গেলে কবিতার আর ওড়া হয় না', 'একের অন্যকে না হলে চলে না'। তাই পাঠকদের শিক্ষিত ক'রে তোলার ব্যাপারে কবিদের একটা দায়িত্ব অনস্বীকার্য। নয়তো আধুনিক কবিতা সম্পর্কে পাঠকদের ঐ-যে কাঁধ-ঝাঁকুনি-দেওয়া 'বুঝি না' বলার প্রবণতা, যেটার কথা সুভাষ এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই উল্লেখ করেছেন, সেটা ঘুচবে কী ক'রে? কিংবা 'যে দুনিয়ার মূল চালিকাশক্তি শুধুই ব্যক্তিগত লাভ', যেখানে তাঁরই মতে 'কবিতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই', সেখানে 'কবিতার পুনর্বাসন' হবে কী ক'রে, 'হতমান কবিতা মানুষের হৃৎকমলে আসীন হবে' কিভাবে? পাঠকের সঙ্গে তিনি একটা বোঝাপড়া করতে বসেছেন ব'লেই তো আমরা জানতে পারি যে কবিতায় তিনি কখনো 'নিজেকে সম্পূর্ণভাবে' দেন না। ওভাবে একবার দিলেই যে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে, আর কিছু দেবার থাকবে না। কিছু হাতে রেখেই তাই দিতে হয়। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে 'চাই আস্ত মানুষ, জীবনের সবটুকু'—এ ধরণের দাবির কোনো প্রকৃত বিরোধ নেই। দুটো উক্তি কবিতার দুটো দিকের উপরে আলো ফেলছে। ব্যক্তিগত নানা খুঁটিনাটি হাতে রেখেও জীবনের ও কবিব্যক্তিত্বের সমগ্রতাকে ধরিয়ে দিতে পারা কবিদের একটা আর্ট। এক ধরণের তরবারিখেলার সঙ্গে হয়তো তুলনা করা চলে সে-কুশলতার।

'সালেমনের মা' বা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'-এর মতো কবিতার জাতক-কাহিনী জেনে আমরা উপকৃতই হই। জীবন আর শিল্পের মধ্যবর্তী ব্যবধানটাকে মানতে ইচ্ছে করে না। খুব ইচ্ছে করে, ফিরে আসুক সালেমনের মা আর বাবা দুজনেই, বর জুটুক আইবুড়ো মেয়েটির! জানতে ইচ্ছে করে, দ্বিতীয় কবিতাটি বিষয়ে প্রশ্নকর্তাকে সুভাষ কেন বলেন যে ফুল বা বসন্তের মতো চিরাচরিত প্রতীকগুলো 'আমাদের দেশে ... খুব স্বাভাবিক'। এ ধরণের প্রতীক তো সব দেশেই খুব স্বাভাবিক, এবং সব ভাষার কবিতাতেই ঘুরে ফিরে আসে, তা-ই নয় কি? পাঠকদের ভালো লাগবে সুকান্ত ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্বন্ধে স্মৃতিচারণামূলক লেখাগুলি। এই-সব স্মৃতি এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য মন্তব্য থেকেও বিভিন্ন কবিদের ব্যক্তিত্বের কিছু মনে রাখবার মতো ছবি পাওয়া যায়।

সাহিত্যসংক্রান্ত মতামতের নানা অনুপুঙ্খেই সুভাষের সঙ্গে সায় দিতে পারি। যেমন, গদ্য আর পদ্যের মাঝখানে আজকাল আর কোনো 'জেলখানার উঁচু পাঁচিল' নেই। অথবা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার আধুনিক কবিতাতেই বর্তেছে, এবং এই 'পরম্পরায় খুব যে অস্বাভাবিক রকমের হোঁচট খেতে হয় তাও নয়'। ভালো লাগে

মুখের ভাষার সঙ্গে কবিতার ভাষার সম্পর্কের ফর্ম্যুলাটা—'নিকট দূরত্বে', এবং এই সদর্থক জেদ—'সব সময়ই কবিতা লেখার সময়'। আমি তাঁর সঙ্গে এ কথা মানি যে 'লিখে সত্যি কাজ হয়', আবার এও, যে জীবনের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে বারবার 'হাতেকলমে ঝালিয়ে নিতে হয়', কাজের জগৎ এবং লেখার জগতের মধ্যে বারবার আসা-যাওয়া ক'রে দুটোকেই সজীব রাখতে হয়, নয়তো 'শব্দগুলো নিছক আওয়াজ' হয়ে ওঠে।

একটি রচনায় সুভাষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানের নানান মজার ভেতরে ঢুকতে পারছেন না ব'লে, এবং প্রশ্ন করেছেন : 'এমন দিন কি কখনও আসবে না, যখন শিল্পসাহিত্য আর বিজ্ঞান জাদুঙ্গজ্ঞের মত একই মিলনক্ষেত্র খুঁজে পাবে ?' তিনি ঠিকই বলেছেন, বিজ্ঞানী সাহিত্যের পাড়ায় চ'লে আসতে পারলেও উল্টোটা অনেক বেশী কঠিন। তবে এ ব্যাপারে আশাবাদের কিছু অবকাশ আছে। কে কোন্ দিকে সেতু বাঁধতে পারবে তার অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষার খুঁটিনাটির উপরে। আমার নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেও বিজ্ঞানের এলাকায় একটা বড় ফাঁক ছিলো, অথচ স্বভাবের মধ্যে ছিলো বিজ্ঞানের প্রতি একটা আকর্ষণ। নানাভাবে ফাঁকটা ভরানোর চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি আজীবন। পাশ্চাত্য দেশে নানা পত্রপত্রিকা বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সুযোগ মেলে। একজন সাহিত্যিক পুরোদস্তুর বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে না পারলেও তাঁর মেজাজের মধ্যে যদি বিজ্ঞান থাকে, এবং স্কুলের শিক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতের একটা প্রাথমিক ভিত্তি যদি থাকে, তা হলে অন্ততঃ সেটুকু বিজ্ঞান বুঝে নেওয়া যায় যেটুকুকে সক্রিয়ভাবে সাহিত্যে কাজে লাগানো যায়। প্রবন্ধসাহিত্যে ও সমালোচনাসাহিত্যে তো বটেই, সৃজনধর্মী সাহিত্যেও খোঁজার, গোছানোর এবং পরিবেশনের নানা কাজেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্থা অবলম্বন করলে আখেরে লাভ হয়। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটের বা চিত্রকল্পের ব্যবহার কবিতাকে এক দুর্লভ স্বাদ দিতে পারে। ইংরেজীভাষী এমন দুজন কবির নাম মনে পড়ছে যাঁদের কবিতায় বৈজ্ঞানিক অনুপুঙ্খের সার্থক ব্যবহার আমার চোখে পড়েছে। দুজনেই নারী কবি—অ্যান স্টিভেনসন ও পলিন্ স্টেইনার।

জীবনের একটা বড় অংশে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন যিনি, রাজনীতির প্রসঙ্গ তাঁর লেখাতে এসে পড়বেই। 'লেনিনের চোখে সাহিত্য' বা 'অক্টোবরের হাওয়ায়' প'ড়ে অনেকের মনের মধ্যেই নানান তর্কের তরঙ্গ জেগে উঠবে। সাহিত্য বিষয়ে লেনিনের বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সুভাষিত আছে, গোর্কি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন—এ-সব মেনে নেবার পরও প্রশ্ন থেকেই যায়, লেনিনীয় বিপ্লবচিন্তার মধ্যে এমন কিছু একঝোঁকা প্রবণতা ছিলো কিনা, যেগুলি রাষ্ট্রনীতিতে রূপান্তরিত হবার পরে শিল্পসাহিত্যের বাধামুক্ত বিকাশের ঠিক অনুকূল হয় নি। নয়তো

বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের অনেক মহৎ সৃষ্টিরই কেন 'সমিজ্‌দাৎ' প্রকাশন লাগলো, কেন কারারুদ্ধ হলেন নাম-করা কবিরা, কেন দেশত্যাগী হলেন গুণী নৃত্যশিল্পীরা, সংগীতশিল্পীরা ? 'সোভিয়েত ভূমিতে দ্রুত তৈরি হয়ে চলেছে সাম্যবাদে উত্তরণের বাস্তব ভিত্তি'—এই আশা যে চুরমার হয়ে গেলো তার কারণ কী ? অবশ্য মানুষের স্বপ্ন থেকেই যায়। বাজার এবং খদ্দেরের মুখাপেক্ষার 'জোয়াল' থেকে শিল্পীদের মুক্তি দেবে যে-সমাজ, তার স্বপ্ন আরও অনেকের মতো আমিও দেখেছি, কিন্তু মরবার আগে তার বাস্তব চেহারা দেখে যেতে পারবো এমন ভরসা করি না।

আরেকটি ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়া জানানোর তাগিদ অনুভব করছি। সাহিত্যের এই চালচিত্রে মেয়েদের কোনো জায়গাই দেন নি সুভাষ। রুশ দুনিয়ার কথা যখন পেড়েছেন, তখন বলতেই হয়, আনা আখ্‌মাতোভা বা মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার মতো প্রথম সারির কবিদের বাদ দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে বিশ শতকের রুশ কবিতার সম্পর্কের কাহিনীটা সম্পূর্ণই হতে পারে না। বা 'সামনে কবিতার দিন'-এর মতো বাংলা কবিতার বর্তমান বা আগামী দিনের দিকে চোখ-মেলা সমীক্ষাতেও অনায়াসেই ঠাঁই পেতে পারতেন বাঙালী মেয়েরা। পাওয়া উচিতই ছিলো। কিন্তু কোথাও তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করলাম না, বা তাঁদের আসন্ন আগমনের বার্তা পেলাম না, এমন কি তাঁদের আসা বা না-আসা সম্পর্কে কোনো ভাবনা বা উদ্বেগ, কোনো আশা-নিরাশার কথাও শুনলাম না এই বইয়ে। বাংলা সাহিত্যের বোঝাপড়ার নাটে একটা লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত যেন থেকেই যাচ্ছে। আলোচনা-বিশ্ব থেকে লেখিকাদের প্রায়ই বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বর্গ রাখা হলে তার আওতায় তাঁদের কথা হয়তো সংক্ষেপে সারা হয়, কিন্তু লিঙ্গনিরপেক্ষ সাধারণ সমীক্ষায় মেয়েদের উল্লেখ আজও সহজে চোখে পড়ে না। অথচ আজকাল যথেষ্ট মেয়ে লিখছেন, তাঁদের লেখায় 'কোয়ালিটি'র অভাব নেই, এবং তাঁদের বাদ দিয়ে আঁকা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের কোনো মানচিত্রকেই আর যথার্থ বলা যায় না। এতে ক'রে হয় কি, মেয়েরা দ'মে যায়। একগণ্ডা পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকের সঙ্গে লড়াই ক'রে যাঁরা লিখছেন, এবং শুনতে পাচ্ছেন সত্তার 'আছি-আছি'র আনন্দকলরব, হঠাৎ আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেদের কোনো প্রতিবিম্ব দেখতে না পেলে তাঁদের খটকা লাগে—সে কী, তবে কি আমরা নেই, আমরা কি তবে মিথ্যে ? এবং তা হলে সুভাষের *কবিতার বোঝাপড়া*-র সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই বা আহূত হয়েছি কেন, সে-কাজ করতে বসেছি কেন ?

[আমার অনুমান এই সমালোচনাটি ১৯৯৩-এ বা তার পরে *আনন্দবাজার*-এর জন্য লিখেছিলাম, কিন্তু পত্রকর্তিকাটি হাতের কাছে না থাকায় নিঃসংশয় হতে পারছি না।]

একজন অভিবাসী কবির জীবন : কিছু 'ব্যক্তিগত' কথা

কোরক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্য আমার কাছে লেখা চেয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করলেন। কবিদের 'ব্যক্তিগত গদ্য' লিখতে অনুরোধ করা মানেই তাদের সাংঘাতিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া। ভাবতে ভালো লাগে, কবিদের এভাবে প্রশ্রয় দেবার মতো কাগজ কলকাতায় এখনও আছে। ব্যক্তিগত কথা বলার নির্দেশই যখন এসেছে, তখন আশা করা যায় সে-নির্দেশ পালন করলে নিজেকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হবে না।

লেখালেখির নানা শাখাতেই যদিও আনাগোনা ক'রে থাকি, তবু কবিতাই আমার প্রথম ভালোবাসা, যার চর্চা আমার জীবনে আজও অব্যাহত। কলকাতার পত্রিকায় আমার কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতে না দেখে কারও কারও ধারণা হয়েছে যে আমি বোধ হয় কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছি। ধারণাটা সর্বাংশে ভুল। বস্তুতঃ, কবিতাই সেই লেখা, যা আমি নিজের তাগিদে লিখি, সম্পাদকদের তাগাদার মুখাপেক্ষা না ক'রে। আমার বাংলা কবিতার শেষ বই (*কথা বলতে দাও*, আনন্দ পাবলিশার্স) বেরিয়েছে চার বছর আগে। যে-সব কবিতা এখনও পুস্তকাকারে বেরোয় নি, ফাইলে জ'মে উঠেছে, সেগুলো থেকে এখনই আরও দুটো বই বেরোতে পারে। আমার অপ্রকাশিত কবিতার 'ব্যাক্‌লগ্‌' যে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাছে পৌঁছয় না, তার কারণ নানা। দু'-একটা কথা হয়তো এখানে বলাই সমীচীন ; কথাগুলো আমার কবিজীবনের ফ্রাস্ট্রেশনের অন্তর্গত নিশ্চয়ই।

সব কারণের মূলে আছে আমাব অভিবাসী জীবন, যেটি আমার জীবনের একটি কেন্দ্রিক তথ্য, যা আমার সমস্ত হয়ে ওঠা এবং কাজ করার উপর অনিবার্যভাবে তার স্বাক্ষর রাখে। কবিতার জগতে পলিটিক্স আছে। এত দূর থেকে গোষ্ঠীভিত্তিক পলিটিক্সের হাওয়া বুঝে তদনুসারে কবিতা পাঠানো আমার দ্বারা হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে আছে আন্তর্জাতিক ডাকের সাম্প্রতিক অবস্থা। যাটের দশকে এখান থেকে একটা চিঠি ডাকে দিলে চতুর্থ দিনের মাথায় কলকাতায় পৌঁছে যেতো। সেকালে কলকাতার সঙ্গে সংযোগ রাখা অনেক সহজ ছিলো। এখন একটা উড়ো চিঠি পৌঁছতে এক মাস লেগে গেলেও কিছু বলার নেই, হারিয়ে গেলেও কিছু করার নেই। প্রত্যেকটি খাম রেজিস্ট্রি না ক'রে পাঠালে সেটি উধাও হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তা করলেও কখনও কখনও গণ্ডগোল বাধে। রেজিস্ট্রেশনের খরচ এ দেশে ভারী। লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে কবিতা

লিখে ভারতীয় মুদ্রাতেও এক পয়সা পাওয়া যায় না, ডাকের খরচটুকুও উঠে আসে না। আমি কোনো নিয়মিত বেতনের চাকরি করি না। আমার নিজস্ব আয় এত অল্প যে বছরের পর বছর অনুদানবর্জিত গবেষণাপ্রোজেক্টের খরচ মূলতঃ পারিবারিক তহবিল থেকেই সামলাতে হয়। তাতে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তার পর ব্যাংক থেকে টাকা তুলে এনে রেজিস্ট্রি ডাকে অযাচিতভাবে কলকাতায় কবিতা পাঠানোকে বিলাসিতা ব'লে মনে হয়। সম্পাদকের যদি পছন্দ না হয়, তার মানে অনেকগুলো টাকা জলে গেলো। তাই কবিতাগুলো লেখা হয়ে ফাইলে প'ড়ে থাকে। সম্পাদকরা না চাইলে আমি আজকাল কবিতা পাঠাই না। কদাচিৎ এমন হয়েছে যে তাঁরা প্রবন্ধ চেয়েছেন, কিন্তু আমার তা লেখার সময় নেই, তখন ইচ্ছে ক'রেই প্রবন্ধের বদলে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছি।

মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে কবিদের বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কবিরা দেবতাদের স্তব গেয়েছেন, ধর্মপ্রচারে সহায়তা করেছেন, রাজাদের বন্দনা করেছেন, যুদ্ধের ও সাম্রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রেমের মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেছেন। সব ভূমিকাকেই ইতিহাসবিদের, নৃতাত্ত্বিকের চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। আধুনিক কবিরা প্রাক্তন কবিদের উত্তরসূরি হলেও কবিদের ভূমিকাগুলি অবিকল একরকম থাকে নি, থাকতে পারে না। আমি নিজে কেন কবিতা লিখি এ প্রশ্নের সহজতম জবাব বোধ হয় এই যে কবিতার দাবির কাছে আমি অসহায়। কলকাতার সম্পাদকরা যদিও আমার কাছ থেকে প্রধানতঃ গদ্যই দাবি করেন,—এই লেখাটি লিখতে বসার পরেও আরেকটি গদ্যলিখনের জন্য আর্জি এসেছে,—তবু আমার ভিতর থেকে অধিকাংশ সময় যা বেরিয়ে আসতে চায় তা হলো কবিতা। কবিতা আমার কাছে জগৎকে দেখে বুঝে নির্মাণ ক'রে নেবার জন্য, একই সঙ্গে নিজেকেও নির্মাণ ক'রে নেবার জন্য একটা বিশেষিত মাধ্যম, জগৎ বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়াকে অন্যদের কাছে ধরিয়ে দেবার জন্য একটা বিশেষ জাতের ভাষা, যা একই সঙ্গে বিশ্লেষণমূলক ও সংশ্লেষণমূলক। কবি হিসেবে আমার হয়ে ওঠা সম্বন্ধে *দেশ*-এর আমন্ত্রণে একবার গুছিয়ে লিখেছিলাম তাঁদের একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য। সেই লেখাটি, 'আমার কবিজীবন প্রসঙ্গে', পরে আমার প্রবন্ধসংগ্রহ *ভাবনার ভাস্কর্য*-এর (দে'জ, ১৯৮৮) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শৈশব থেকেই কবিতার ব্যাপারে আমার প্রচুর 'এক্সপোজ়্যর' ঘটেছে ; ফলতঃ একেবারে অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখছি আমি। অন্য যে-কোনো ভাষা, কুশলতা বা কারিগরির মতো কবিতার ভাষাকে আয়ত্ত করতে হলেও নিশ্চয়ই কিছুটা 'এক্সপোজ়্যর' লাগে। সেটা যত অল্প বয়সে হয়, এবং পরিমাণের দিক দিয়ে যত বেশী হয়, পরবর্তী কালে ভাষাটাও বোধ হয় তত সহজে আসে। একটা কাল্‌চারের ভিতরে কবিতার ভোজের জন্য ভালোরকমের ব্যবস্থা থাকলে সেই কাল্‌চার

থেকে অনেক 'সক্রিয়' কবি বেরোবেন, কবিতার এমন অনেক নিবেদিত পাঠকও বেরোবেন, যাঁরা নিজেরা হাতে-কলমে কবিতা না লিখলেও কবিতার রসগ্রাহী, যাঁদের মনের তারে কবিতার ভাষা বেজে ওঠে, অনুরণিত হয়। শেষোক্তদের বলা যায় একধরণের 'নিষ্ক্রিয়' কবি, যাঁদের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা 'সক্রিয়' কবিদের জীবনে খুবই মূল্যবান। কবিদের দিক থেকে দেখলে, সেই-সব সমাজ, সময় ও সংস্কৃতি ভাগ্যবান, যেগুলি ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধির সময়ে কবিতাকে জগৎ-নির্মাণের তথা আত্মনির্মাণের অনুমোদিত ও সম্মানিত মাধ্যম হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। আমি নিজে সেইরকমই একটা আবহ থেকে বেরিয়েছিলাম। এখনকার পশ্চিমবঙ্গে সেই পরিবেশ এখনও আছে কিনা, বা কতটা বজায় আছে, তা আপনারাই ভালো জানবেন।

জীবনাভিজ্ঞতার ত্রিমাত্রিক সমগ্রতা থেকেই কবিতারা বেরোয়। একজন সিরিয়াস কবির কাজের মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবন প্রবেশ করে—মেঠো পথে পাওয়া একটা ছোট্ট বুনো ফুলের গন্ধ বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে শুরু ক'রে খবরে শোনা বা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা মানুষের দুনিয়ার বুক-কাঁপানো বীভৎসতম ঘটনাবলী পর্যন্ত কবিতার মধ্যে কী না ঢুকে যায়! এখানে পরিসংখ্যানগত একটা ব্যাপার আছে। একজন কবির একটা, দুটো, কি তিনটে কবিতার মধ্যে তাঁর সমস্ত জীবন হয়তো নেই, কিন্তু তাঁর পঞ্চাশটা বা একশোটা কবিতা নিয়ে বসুন, তখন দেখবেন যে ঐ আয়নায় তাঁর জীবনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতার একটা ছবি ফুটে উঠছে। তখন দেখবেন যে তাঁর কাজকে ঠিক ক'রে বুঝতে হলে অনেক কিছুকেই হিসেবের মধ্যে নিতে হচ্ছে। তাঁর কাজ একটু মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করতে গেলে টের পাবেন যে তাঁর সম্পর্কে স্থানকালগত, সামাজিক-শ্রেণী-গত, লিঙ্গগত, জীবনযাত্রাগত, শিক্ষাদীক্ষাগত কোনো ডিটেলই ঠিক তুচ্ছ নয়। লিঙ্গও একধরণের শ্রেণীই, যার কিছুটা জৈব, বাকিটা সামাজিক। দুনিয়াটা যেভাবে পুরুষদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয় আর যেভাবে মেয়েদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়, এই দুইয়ের মধ্যে অনিবার্যভাবেই নানা ফারাক থাকে, আর সেই পার্থক্যগুলো কবিতায় স্বাক্ষর রাখে। আমি যে মেয়ে সেটা নিশ্চয়ই আমার আত্মপরিচয়ের, জীবনের তথা কবিতার একটা গুরুত্বপূর্ণ সুতো। ঐ সূত্রটাকে বাদ দিলে আমার কবিতা বোঝা যাবে না।

নিবাসগত বিচারে কয়েক দশক ধ'রে আমি একজন অভিবাসী বাঙালী। এই 'অভিবাসী' শব্দটার ব্যবহার আগে বেশী দেখতাম না, নিজেও ব্যবহার করতাম না। আজকাল এ শব্দ ব্যবহার না ক'রে উপায় নেই। আধুনিক সমালোচকদের বর্গীকরণ অনুযায়ী আমি দক্ষিণ এশিয়ার লেখককুলের 'ডায়াস্পোরা' অর্থাৎ পৃথিবীময় ছাড়িয়ে-পড়া ধারাগুলির অন্তর্গত একজন লেখিকা। ভাষাব্যবহারের ব্যাপারে এশীয়

'ডায়াস্পোরা'র লেখকদের সাধারণ নিয়মের নিরিখে আমি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী, কেননা বহুকাল পাশ্চাত্য জগতে বসবাস করা সত্ত্বেও আমি এশীয় ভাষায় লেখা ছাড়ি নি। আমি দুটো ভাষাতে কবিতা লিখি! বাংলাতেই বেশী লিখি, তবে ইংরেজীতেও অল্পস্বল্প লিখি। ইংরেজীতে লেখার সূত্রে এখানকার কবিদের সঙ্গে কিছু কিছু আদানপ্রদান হয়, একসঙ্গে ওয়ার্কশপ করি, বা 'পাবলিক রীডিং'-এ অংশগ্রহণ করি। এগুলি আমার কাছে খুবই মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে কবি হিসেবে আমি অনেক কিছু শিক্ষা লাভ ক'রে থাকি। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কবিতার কারুশিল্পের অনুশীলন, 'পাবলিক রীডিং'-এর মাধ্যমে কবিতার জন্য 'অডিয়েন্স' তৈরি করা, অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতার সৃজনশীল কাব্যানুবাদ : এই ব্যাপারগুলিতে এখানকার কবিরা খুবই যত্নশীল। এই-সব কাজের জন্য কিছু কিছু সরকারী সাহায্যও পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন বর্তমানে বিলেতে কবিতার একটা 'রিভাইভাল' চলছে; এবং 'মাল্টিকাল্চারালিজ্‌ম্' বা 'বহুসাংস্কৃতিকতা'র প্রতিও একটা নূতন উন্মুক্ততা দেখা দিয়েছে।[১] অন্যান্য সংস্কৃতির কবিতা সম্পর্কে অনেকের মনে নূতন ক'রে আগ্রহ জন্মেছে। কবিতার এবং কৌতূহলের এই পুনরুজ্জীবনের অবকাশে রবীন্দ্রনাথকেও অনুবাদের মাধ্যমে অনেক নূতন শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে। কবিতার সৃজনশীল অনুবাদ আমার কাছে কবিতা লেখারই সম্প্রসারণ।

একটি মজার খবর হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই ধরণের খবর আমি না দিলে আপনাদের কানে পৌঁছনোর কোনো চান্স নেই। আপনারা ইন্টারনেটের কথা নিশ্চয় শুনেছেন। ইন্টারনেটে 'পোয়েট্রি ম্যাপ' নামে একটি প্রোজেক্টের অঙ্গ হিসেবে 'Maps From My Perspective' শিরোনামে আমার একটি দীর্ঘ ইংরেজী কবিতা রয়েছে। ১৯৯৫ সালে আমাদের আর্ট্‌স্ কাউন্সিলের আঞ্চলিক শাখা সাদার্ন আর্ট্‌স্ ও লণ্ডনের পোয়েট্রি সোসাইটির যুগ্ম নিমন্ত্রণে কবিতাটি রচনা করি। মানচিত্রের চালচিত্র অবলম্বনে কবিতাটি মূলতঃ আত্মপরিচয়বিষয়ক। যদি কেউ কৌতূহলী হন তো খুঁজে দেখতে পারেন। ইন্টারনেটে কবিতাটির বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে :[২]
http://www.othervoicespoetry.org/vol10/dyson/maps.html

অভিবাসনের দরুন আমার জীবনের নকশায় যে-জটিলতা, সেটা নিশ্চয়ই আমার লেখায় প্রতিফলিত হয়। বাংলা কবিতায় অভিবাসীদের লেখার একটি ধারা আছে—অমিয় চক্রবর্তী, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ইত্যাদি। আমার কবিতার তাঁতে নারীত্ব ও অভিবাসনের সহাবস্থান কিছু ভিন্ন টানাপড়েন রচনা করে। অভিবাসী নারী ও অভিবাসী পুরুষের জীবনের নকশায় পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অভিবাসী মেয়ে, বাংলায় সিরিয়াসভাবে কবিতা লেখেন, এমন খুব বেশী মানুষকে চিনি

না।[৩] সেদিক দিয়ে অবশ্যই একটু একলা লাগে। কবিতারচনাকে নারী হিসেবে আত্মসম্মান অর্জনের এবং নারীবাদী সক্রিয়তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার ক'রে যাঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন তেমন একটি দল বিলেতের শেফীল্ড শহরে আছেন। নারী-কবিদের একটি জমায়েতে তাঁদের সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিলো। যতদূর মনে পড়ে, তাঁরা বেশীর ভাগই বাংলাদেশ থেকে আগত মেয়ে। মার্কিন দেশে অভিবাসী লেখিকা দিলারা হাশেম যখন সম্প্রতি বিলেতে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। তিনি তাঁর কয়েকটি বই আমাকে পড়তে দেন। তাঁর *কাকতালীয়* বা *আমলকীর মৌ* তো খুবই শক্তিশালী উপন্যাস। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা থেকে জানি যে তিনি কবিতাও লেখেন, কিন্তু তাঁর কোনো কবিতার বই দেখার সৌভাগ্য এ যাবৎ আমার হয় নি। ইয়োরোপপ্রবাসী হয়ে তসলিমা নাসরিন যদি বাংলাভাষার কবি হিসেবে টিঁকে থাকতে পারেন, তা হলে হয়তো ভবিষ্যতে আরেকজনকে দলে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে শিকড়, কিন্তু ভারতের বাইরে অনেক দিন থাকার পর এখনও মধ্যে মধ্যে বাংলায় কবিতা লেখেন, এমন একজন মেয়ে হলেন মিষ্টুনী বেভিন্স। একবার তাঁর বার্কশায়ারের গৃহে মিলিত হয়ে আমরা পরস্পরকে স্বরচিত কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছিলাম। অনাবিল আনন্দে কেটেছিলো সেই দিনটা।[৪]

এ দেশের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের চালচিত্র, এখানকার ভূদৃশ্যের, গাছপালার, ঋতুবদলের শারীরিক খুঁটিনাটি তথা তারা মানুষের মধ্যে যে-সব mood সৃষ্টি করে সে-সমস্তই আমার কবিতায় প্রবেশ করে। কেবল প্রবেশই করে না, আমার অন্যান্য স্মৃতির সঙ্গে, ভারতীয়-উত্তরাধিকার-জাত অন্যান্য উল্লেখের সঙ্গে সহাবস্থিত হয়ে নূতন নকশা সৃষ্টি করে। এই নূতন নকশাগুলি যখন বাংলাতে লিখি তখন একরকম হয়, যখন ইংরেজীতে লিখি তখন আবার একটু ভিন্ন হয়। কেননা প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই একটা গোটা সংস্কৃতির ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের চালচিত্র থাকে। চালচিত্রগুলো নিত্য কিছু নয় ; সেগুলোও সর্বদাই একটু একটু ক'রে বদলে যাচ্ছে ; তবু যে-কোনো সময়ে দুটো ভাষার চালচিত্রে কিছু তফাৎ থাকবেই। যখন বাংলায় কবিতা লিখি তখন বাংলাভাষার মধ্যে যে-চালচিত্রটা নিহিত সেটা এসে যোগ দেয়। বাংলাভাষার গায়ে যে-সব ভাবানুষঙ্গ, উপমারূপক, দার্শনিক ব্যঞ্জনা জড়িয়ে আছে সেগুলো আমার অব্যবহিত পরিপার্শ্ব থেকে পাওয়া খুঁটিনাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নূতন কোলাজ সৃষ্টি করে। তেমনি যখন ইংরেজীতে লিখি তখন তার মধ্যে মেশে এখানকার জীবন, ইংরেজীভাষার চালচিত্র, অপিচ ভারতীয় স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-উত্তরাধিকার।

যখন ইংরেজীতে কবিতা লিখি তখন এ দেশের ঋতুচক্রের বিশেষিত উল্লেখ দরকার হলে একেবারে এ দেশের কবিদের রীতিতেই সরাসরি আমার ভাষায় প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু যখন সে-জিনিস বাংলা কবিতার মধ্যে ঢোকে তখন একটা

অ্যাডজাস্টমেন্ট ক'রে নিতে হয়—অচেতনভাবে অথবা সচেতনভাবে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ঘ'টে যায়। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিই। এই সেদিন ইংরেজীতে একটা কবিতা লিখলাম, যার মধ্যে আছে এই লাইনটা : 'while the June sun lies like a lover's wand on the land'। জুনের সূর্যটা প্রেমিকের জাদুকাঠির মতো, সোনার কাঠির মতো কিভাবে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে দেয় তা এই অঞ্চলের মানুষদের জানা। সে-বিষয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, 'জুনের সূর্য' বলামাত্র শ্রোতা বুঝে নেবে। কিন্তু বাংলায় 'জুন' নামটার নিজস্ব, দিশি অনুষঙ্গ নেই। বাংলা হিসেব অনুযায়ী জুনের কিছুটা ভরা জ্যৈষ্ঠের গরম, তার পর আষাঢ়ের বর্ষাসমাগম। চালচিত্রটা একেবারে আলাদা। তাই আমি যখন বিলেতের জুনের রমণীয় লম্বা দিনের কথা বাংলাতে বলতে চাই, আমাকে অন্য এক ধরণের চেষ্টা করতে হয়। ষাটের দশকের একটি কবিতায় লিখেছিলাম : 'নম্র জুনের অমর্ত্য গোধূলিতে', তার কয়েক লাইন পরে : 'আহা কি রম্য আলোকদীর্ঘ দিন !' এই জুন যে আমাদের পরিচিত রুদ্র জুন নয়, নম্র জুন, তা জানাতে হলো ; আবার এই নম্রতা যে জলভরা মেঘের নয়, দীর্ঘায়িত গোধূলির আলোর, তারও আভাস দিতে হলো। অনেক পরে লেখা একটি কবিতায় দেখতে পাচ্ছি লিখেছি 'জুনের ভরা বিকেলে'—এখানেও সেই আলোয় ভরা দীর্ঘস্থায়ী বিকেলের কথা বলা হচ্ছে, যা গ্রীষ্মমণ্ডলে অপ্রাপণীয়।

একজন লেখকের লেখায় বিদেশপর্যটনলব্ধ খুঁটিনাটি আর অভিবাসনলব্ধ খুঁটিনাটি যেভাবে প্রবেশ করে তাদের রীতি আলাদা। পর্যটন আমাদেব অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা উপহার দেয়, কিন্তু অভিবাসন আমাদের অন্য একটা দেশের জলমাটির মধ্যে নূতন ক'রে শিকড় ছড়াতে সাহায্য করে, অন্য একটা সমাজের জীবনের গভীরে প্রবেশ করায়—বিশেষতঃ যদি আমরা সেই সমাজের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবন যাপন করি। আমি আমার বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে ইংরেজদের পারিবারিক জীবনের ভিতরে প্রবেশ করেছি। ইংরেজদের বাইরে থেকে দেখার থেকে এ জানা আলাদা। একজন কবির পক্ষে জানার গভীরতার কোনো বিকল্প নেই।

যত বয়স এগোয়, ততই পিছনে তাকালে জীবনের ধাপগুলো সিঁড়ির ধাপের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আমার অল্প বয়সের কবিতা লেখার ভাষার প্রথম প্রকৃত প্রেরণা-উৎস। তার পর পঞ্চাশের দশকের আদর্শবাদী কলকাতায় সাবালিকা হলাম। তখন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের স্টাডি ক'রে শিখলাম কিভাবে আধুনিক কবিতা লিখতে হয়। সেই মাটিটাতে আমার কবিসত্তার প্রাথমিক শিকড়বাকড়। সেকালে কষ্ট ক'রে সংস্কৃতটা শিখেছিলাম ব'লে দেশান্তরিত অবস্থাতেও বাংলা লেখার ভিত্তিটা শক্ত রাখতে পেরেছি। ভাগ্যিস শিখেছিলাম। বাংলায় লেখা বিষয়ে আমার দায়বন্ধনে কোনো ফাঁকি নেই।

পাশ্চাত্য জগৎটার সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় হলো তার ষাটের দশকে। তার পর সত্তরের দশকের নারী-আন্দোলনের প্রবল ধাক্কা, আশির দশকে স্প্যানিশ শেখা আর ওকাম্পোকে আবিষ্কার ...। একেকটা যুগ আমাদের সত্তার উপর তার অনপনেয় ছাপ রেখে যায়।

এখন তো বুঝতে পারি আমার মধ্যে পঞ্চাশের দশকের কলকাতার বা ষাট-সত্তরের দশকের পাশ্চাত্য ত্বনিয়ার উত্তরাধিকার কতটা বিনিশ্চায়ক। এ সম্বন্ধে আগে আমার নিজের ধারণাও খুব স্বচ্ছ ছিলো না। সেকালে আমরা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো কথায় কথায় নিজেদের বিশ্লেষণ করতে বসতাম না; বাঁচার আনন্দে, জীবনটাকে জানারই আনন্দে মশগুল থাকতাম। ষাটের দশকে পাশ্চাত্য ত্বনিয়ার সঙ্গে আমার 'আলাপ' হয়েছে। প্রথমে এসেছি ছাত্রী-অবস্থায়, অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছি, তার পর চ'লে গেছি। তখন আমি এখানে 'বাইরের লোক', এ জগতের সঙ্গে অন্তরের কোনো প্রকৃত গভীর 'আইডেন্টিফিকেশন' ঘটে নি। কিন্তু ষাটের সেই আদিপর্বেই *দেশ*-এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে 'উদীয়মান কবি' হিসেবে আমার একটা পরিচিতি জুটলো। বিয়ের পর ১৯৬৪-র হেমন্তকালে আবার যখন এলাম, তখন নিজেকে বিবেচনা করতাম 'আগন্তুক'। 'প্রবাসী বাঙালী' হিসেবে সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করলাম। আসলে মা না হওয়া পর্যন্ত পাশ্চাত্য ত্বনিয়ার সঙ্গে আমার 'অন্তরের আইডেন্টিফিকেশন' গ'ড়ে ওঠে নি। ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে যখন পাশ্চাত্য সমাজের ভিতরে অবস্থান ক'রে সন্তানদের মানুষ করলাম, আমার চার পাশের তরুণী মায়েদের সুখত্বঃখের অংশীদার হলাম, অনুভব করলাম যে তারা আমারই মতো মেয়ে, ঠিক ক'বে বুঝতে পারলাম যে সদৃশ আমাদের আনন্দ ও বেদনা, আমাদের অভীপ্সা ও হতাশা, এক আমাদের সংগ্রাম, যখন পাশ্চাত্য নারীত্বের সঙ্গে সত্তার এক গভীর জায়গায় সংযোগ এবং বিনিময় ঘটলো, তখনই যথার্থ অর্থে 'অভিবাসী' হয়ে উঠলাম।

আমার মধ্যে ষাটের পশ্চিমের যে-উত্তরাধিকার, সে-সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা আগে মোটেই পরিষ্কার ছিলো না। বামপন্থী মার্কিন অধ্যাপক মার্শাল বার্ম্যান, যিনি ষাটের আদিপর্বে অক্সফোর্ডে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, মধ্যে মধ্যে যখন মনে করিয়ে দিয়েছেন—'We are sixties kids, *enfants terribles*, remember?'—তখন মনে মনে ভেবেছি, সত্যিই? আমি কলকাতার পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের প্রবাসী কবি হতে পারি, কিন্তু আমি কি প্রতীচ্য ষাটের উত্তাল তরঙ্গেরও ত্বরন্ত অবাধ্য শিশু? মার্শাল বলতেন, সংবেদনশীল যে-মানুষ তার জীবনের বিশের ঘরের দিনগুলি ষাটের পশ্চিমে কাটিয়েছে, সে তার দ্বারা চিহ্নিত না হয়েই যায় না, ছাপ থাকতেই হবে।

আমার উপরে ষাটের প্রভাব আমাকে চিনিয়ে দেয় আমারই সন্তানেরা, যাদের

জন্ম ঐ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাঃ, যে জোন বায়েজের গানের ভক্ত, তাকে তো ষাটের মানুষ হতেই হবে—'Of course you are a sixties kid, a fan of Joan Baez, and a contemporary of the Beatles!' সম্প্রতি তাদের বাবা (আমারই সমবয়সী) দাবি ক'রে বসে যে অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় সে নাকি কখনো বীট্‌ল্‌দের নাম অথবা তাদের গান শোনে নি। তার এই দাবি বাড়িতে কেউ স্বীকার করে না। আমিও করি না। বাঃ, 'Help' গানটা শোনে নি সে সেই সময়ে, এ কি হতে পারে? গানটা তখন রীতিমতো হিট্। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অক্সফোর্ডের বাস স্টপে ছেলেমেয়েরা জোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রানজিস্টরে ঐ গানটা শুনতো! আমি যে বাইরে থেকে এসেছিলাম, তাই নাকি মনে আছে আমার। নেটিভদের মনের মাটিতে 'Beatle phenomenon' নাকি তখনও গেড়ে বসে নি। আমি বলি, 'আসলে তুমি স্নব, কেবল ক্লাসিকাল শুনতে, পপ্-এর জন্য তোমার সময় ছিলো না।' সে বলে, 'আসলে তোমার মনে আছে এইজন্যে যে তোমার লিভারপুলের বান্ধবী ছিলো, আর বীট্‌ল্‌রা লিভারপুলের ছেলে। হয়তো বা আমি তোমারই মুখে শুনেছি ওদের কথা। কিন্তু শুধু কথা শুনেছি, গান শুনি নি। গান শুনেছি অনেক পরে।' বলা বাহুল্য এই ঝগড়ার কোনো মীমাংসা হয় নি। তবে যদি বিলেতের একজন নেটিভ ছেলে বীট্‌ল্‌দের কথা প্রথম শুনে থাকে কলকাতা থেকে আসা একটি মেয়ের কাছে, তা হলে আমাকে কোনো-এক অর্থে 'ষাটের বাচ্চা' হতেই হয়। আমার বর্তমান জীবনের কোনো কোনো পশ্চিমবঙ্গীয় 'কনফ্রন্টেশন'-এ, কোনো কোনো মুখোমুখি হওয়ায়, যখন দেখি লোকে আমাকে একটা বিশেষ কোণ থেকে দেখে ত্রুটিযুক্ত, বেয়াড়া মনে করছে, আমার মধ্যে কিছু-একটা পেয়ে সেটাকে বেআদবি মনে ক'রে তার বিরোধিতা করছে, তখন চকিতে মনে হয়, সেটা কি এইজন্যেই যে আমার মধ্যে কাজ ক'রে চলেছে সেই ষাটের বিদ্রোহী বাচ্চাদের উত্তরাধিকার, এবং সেই জিনিসটাই ওদের কাছে অসহ্য? তাই কি ওরা রি-অ্যাক্ট করছে, তাই কি ওদের অ্যালার্জি হচ্ছে? ফরাসী 'আঁফাঁ তেরিব্‌ল্' কথাটার আক্ষরিক অর্থ 'সাংঘাতিক বাচ্চা'। বড়রা যে-সব কথা ধামাচাপা দিতে চায়, 'সাংঘাতিক বাচ্চা'রা তা ফাঁস ক'রে দিয়ে বড়দের অপ্রস্তুত ক'রে দেয়। হ্যাঁ, হয়তো আছে আমার মধ্যে ষাটের দশকের পশ্চিমের 'সাংঘাতিক বাচ্চা'দের কিছু দুর্মূল্য উত্তরাধিকার, পশ্চিমবঙ্গের সমালোচকরা যাকে ঠিক চিনতে পারেন না, কেননা তাকে সনাক্ত করতে হলে দ্রষ্টাদেরও সীমানা-অতিক্রমী চোখ থাকা চাই।

যে-সমাজে বাস করি তা দুরন্ত বেগে পরিবর্তনশীল। ১৯৬০-এ যে-বিলেতে এসেছিলাম, সেই দেশ আর এখনকার বিলেত এক দেশ নয়। পশ্চিমবঙ্গেও বিগত দশকগুলিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে পাশ্চাত্য সমাজের পরিবর্তনের লয় অবশ্যই দ্রুততর। আমার সব অভিজ্ঞতাই আমার কবিসত্তার মাধ্যমে ফিল্টার্ড হয়ে

'সূক্ষ্মদেহে' আমার কবিতায় ঢুকছে। কিন্তু আমি যে-চলমান পাশ্চাত্য সমাজের অভ্যন্তর থেকে, তার সঙ্গে নিয়ত 'ইন্টার-অ্যাক্ট' ক'রে বাংলায় কবিতা লিখছি, দূরের পাঠকরা সেই সমাজের সঙ্গে পরিচিত নন ব'লে তাঁরা সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বরের কিছু-কিছু পর্দা ধরতে পারেন না। এটা আমাকে মেনে নিতেই হয়। আমার যা দেবার তা আমাকে দিয়ে যেতেই হবে, লোকে তার সব আলোছায়া বুঝুক বা না বুঝুক। আমার বাঁচা তো আমাকেই বাঁচতে হবে, অন্য কেউ এসে বেঁচে দিয়ে যাবে না। এটা আমি বুঝি, তবু আমার পুরো স্বরগ্রাম কারও কারও কানে পৌঁছুক সেই ইচ্ছাটা থেকে যায়, এবং সেটা একজন কবির থাকবেই। বিলেতে অভিবাসী বাঙালীদের মধ্যে আধুনিক বাংলা কবিতার কোনো প্রকৃত চর্চা আছে ব'লে মনে হয় না। থাকলে এত দিনে নিশ্চয় খবর পেতাম, বা সেই-সব লোকেদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেতো।[৫] তেমন কাউকে কমই পাওয়া যায়, যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা সম্বন্ধে গভীর স্তরের ভাববিনিময় করা যায়। রবীন্দ্রসংগীত শুনতে অনেকেই ভিড় করেন, কিন্তু আধুনিক কবিতার মধ্যে যে-মনন থাকে তার জন্য তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি নেই। কবিতায় মনন আর অনুভবের মিশাল আমাকে বরাবর আকর্ষণ করে। আমি নিজেও আমার কবিতায় সেই মিশালের স্বাদ ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। বিজ্ঞান, পরিবেশচেতনা, নারীচেতনা—নানা বিষয়ে আমার যে-জিজ্ঞাসা আছে তার দাগ আমার কবিতায় থাকে। আমার বৌদ্ধিকতাকে আমি কোনোদিনই গোপন করার চেষ্টা করি নি।

আমার শৈশবের একটা বিশেষ সময় অতিবাহিত হয় গ্রামবাংলায়। সেই থেকে আমি প্রকৃতির প্রেমিক। আমি থাকি কিডলিংটন নামে অক্সফোর্ডের এক শহরতলিতে। আমাদের বাড়ির অনতিদূরে মাঠ আর চাযের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, খালের পাশ ধ'রে বেশ সুন্দর সুন্দর হাঁটবার পথ আছে। একেক ঋতুতে তাদের একেক শোভা। এই-সব বিচরণ আমার কবিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। যখন আমি আপন মনে এই-সব পথে হেঁটে বেড়াই, তখন সেই ছেলেবেলাকার গ্রামবাংলা আর এই একালের বিলেতী গ্রাম পরস্পরের বেশ কাছে এসে পড়ে। আমার মাধ্যমে তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। কদাচিৎ হয়তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত এমন কোনো বন্ধুকে হাতের কাছে পেয়ে যাই, যাকে জোর ক'রেই এই-সব পথে হাঁটতে নিয়ে যাওয়া যায়,—আমার বিচরণক্ষেত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। হয়তো নিরুপায় সেই বন্ধুটিকে পরে আমার কিছু কবিতাও বাধ্য হয়েই শুনতে হয়। তেমন বন্ধুরা হয়তো বা নীরবেই পাগলের পাগলামি সহ্য করেন। তাঁরা জানেন না তাঁদের সেই সহিষ্ণুতার জন্য কবি হিসেবে আমি তাঁদের কাছে কতটা ঋণী।

পুরুষ কবিরা অনেক পাগলামি ক'রে পার পেয়ে যান। মেয়ে কবিদের অত সহজে নিস্তার নেই। মেয়েছেলেদের পাগলামিকে কেউ ক্ষমা করে না। 'সংসারকে

ধ'রে রাখা'র দায় যে তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর পাই, কলকাতায় অনুভবের কেতাদুরস্ত নাম হচ্ছে 'সেন্টি', অধিকতর অবজ্ঞার্থে 'সেন্টু'। মেয়েরাই নিশ্চয় এই তুচ্ছ মালের আড়তদার হিসেবে বিবেচিত হয়? জিনিসটা আবার কবিতার একটি মৌল মূলধন। সেখানেই গ্যাঁড়াকল। কবিদের কিছু ফীডব্যাক লাগে অবশ্যই—সে-ও প্রেরণারই অংশ। পুরুষ কবিরা নিজেদের চার দিকে গোষ্ঠী তৈরি ক'রে built-in feedback-এর ব্যবস্থা ক'রে রাখেন এইজন্যই। একই কারণে এ দেশে নারী কবিরা আজকাল গ্রুপ আইডেন্টিটি খোঁজেন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। আমি সম্প্রতি কবিদের যে-দলটির কর্মশালায় যাতায়াত করছি সেখানে পুরুষ কবি আপাততঃ একজনই মাত্র। তিনি এত 'ভদ্র' যে 'সাম্মানিক নারী' হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। অবশ্যই বিলেতের কবিতার জগতেও পলিটিক্স আছে। মানুষ কবিতা করলেও তার সমস্ত পাপপুণ্য নিয়ে মানুষই থাকে।

আমার এ দেশের কবি-বান্ধবীদের কাছে সেই-সব পলিটিক্সের কথা শুনতে পাই। দেখতে পাই, পুরুষ কবিদের সম্বন্ধে তাঁদের অনেক অভিযোগ আছে। গোষ্ঠীবদ্ধ পুরুষ কবিরা (পত্রিকা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা যাঁদের হাতে) করুণা বিতরণ করেন নির্বাচিত সৌভাগ্যবতীদেরকে। অন্যরা কোণঠাসা হয়ে থাকেন। বয়সটা কম হলে সৌভাগ্যবতী হওয়া সহজতর হয়। মধ্যবয়সিনীরা বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা করছেন।

§

যে-কথাগুলো এড়িয়ে যেতে চাই সেগুলোই বারবার এসে পড়ে। জীবনসংগ্রামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরস্পরসংলগ্ন এলাকায় আমার অক্ষমতা নিকট বন্ধুদের কাছে সুবিদিত। একটি হলো অর্থনীতি, অপরটি রাজনীতি। এই অক্ষমতার ফল আমার কবিজীবনের উপর এসে পড়ে, বেদনার ছাপছোপ রাখে। কলকাতার এক আধুনিক গীতকারের ভাষায়, 'টাকার কথা/ টাকার কথা/ কথার কথা/ মোটেও নয়।' (হ্যালো সুমন, আপনি কেমন আছেন? আমাদের আলাপ হয় নি অবশ্য,[৬] কিন্তু কয়েক মাস হলো আমি আপনার গান আবিষ্কার করেছি। কঠিন সময়ে আপনার গান আমাকে বাঁচতে সাহায্য করছে। আপনি একজন কবি। অবশ্য সুর আর যন্ত্রধ্বনি আপনার কথাগুলোকে আরও দূরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সে তো গান জ্যঁরটারই ঈর্ষণীয় ক্ষমতা। ইচ্ছে করে আপনার মতো সুরে কথায় মিলিয়ে গান বাঁধি, কিন্তু ও লাইনে ট্রেনিং নেই। যা হবে না তা নিয়ে আর ক্ষোভ ক'রে কী হবে। জোন বায়েজ় হওয়া এ জন্মে আর হলো না। সে যা হোক, আপনার লিরিকগুলো চমৎকার কবিতা। আপনার বুদ্ধি, কৌতুকবোধ, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সততা—এগুলো আমি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করি। কলকাতার

লোকেরা করে তো ? আপনার 'জীবনদর্শন'-এর সঙ্গে আমার 'জীবনদর্শন'-এর অনেক মিল দেখতে পাই। আপনাকে গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়ার ঠিকানায় 'ফ্যান্ মেইল' পাঠাবো কিনা তা-ও দু'-একবার ভেবেছি। দু'-একজন সে-উদ্যোগ থেকে আমাকে নিরস্ত ক'রে কথা দিয়েছেন কলকাতায় গেলে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।) যা বলছিলাম, অর্থনীতিতে অক্ষমতার পরিণাম প্রিয়জনের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে। দ্য পার্সনাল ইজ় পোলিটিকাল, যা-কিছু ব্যক্তিগত তা-ই আবার রাজনৈতিকও। আমার জীবনের কেন্দ্রগত সংগ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে আলাদা ক'রে কোনো 'কবি হওয়া' নেই। তাদের কথা বাদ দিয়ে শৌখিন শুচিতার মলাট পরিয়ে আলাদা ক'রে কোনো 'কবি হওয়ার কথা' বলতেও পারি না। যেটুকু রাজনীতি এ যাবৎ আয়ত্ত করতে পেরেছি সে হলো গিয়ে সেই ষাটের দশকের 'পলিটিক্স অফ অথেন্টিসিটি', খাঁটি হওয়ার রাজনীতি। ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না, আর 'বীটিং অ্যাবাউট দ্য বুশ্' আমার অনায়ত্ত। এটা একটা তথ্য যে সাহিত্যিক এবং গবেষক হিসেবে আমার জীবন বৃহদংশে আমার স্বামীর দ্বারা 'সাব্‌সিডাইজ়্ড্' অবস্থাতেই চলছে। আমার মধ্যে কবির স্বভাব আর গবেষকের স্বভাব দুটোই আছে। কোনো-একটা প্রোজেক্ট আরম্ভ করলে সেটা সমস্ত শক্তি দিয়ে যথাসম্ভব ভালো ক'রে শেষ করতে চেষ্টা করি। হাওয়া খেয়ে কবিতা যদি বা লেখা যায়, বড় মাপের গবেষণা করা যায় না। আশির দশকে আমি যখন বিশ্বভারতীর নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ এবং ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর উপর কাজ করছিলাম তখন আমার স্বামীর উপরে দেনার দায় প্রচণ্ড। দুটো মাস অফিশ্যাল ফেলোশিপে শান্তিনিকেতনে কাজ ক'রে এসেছি, ব্যস্, তার পরের বছরগুলিতে সেই রিসার্চ কী ক'রে সমাপ্ত করেছি, কিভাবে আর্জেন্টিনায় গিয়ে কাজ করেছি, কী অবস্থায় বইটা লিখেছি—সে-সব খবর কাছের লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানেন না। সে এক ইতিহাস। এটা একটা তথ্য যে ঐ গবেষণার সময়ে বিলেতের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে বিফলমনোরথ হয়েছিলাম। প্রতিষ্ঠিত যে-সব ব্যক্তিরা সে-সময়ে সাহায্য করতে পারতেন, তাঁরা সাহায্য করেন নি। সেই সংগ্রাম বিদ্যাজগতের অধ্যাপকীয় পলিটিক্স সম্বন্ধে আমার চেতনাকে তীক্ষ্ণ করেছে, আমার কবিতার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নিশ্চয় প্রবেশ করেছে। কেবল যে সাদা লোকেরা কালোদের ঠেকিয়ে রাখেন সুযোগসুবিধা থেকে, করেন বর্ণবাদী রাজনীতি, তা তো নয়। পলিটিক্স একটা ব্যাপক প্রক্রিয়া, যা চলে সর্বস্তরে। এর চেহারা আমি সর্বত্র দেখেছি, যে-ক'টা জায়গা আমার চেনা সব ক'টাতেই। মেয়েরাও যথেষ্টই পলিটিক্স ক'রে থাকেন—তাঁদের আঙ্গিকটা একটু আলাদা এই যা।

হালে আমার উপরে রাজনীতির প্রকোপ বেড়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি, আমার দুর্গতি বেড়ে গিয়েছে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর থেকে। রবীন্দ্রনাথ

আজকাল একটি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক মূর্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে আমার প্রত্যেকটি রবীন্দ্রবিষয়ক কাজের পরই আমি কোনো-না-কোনো চেহারার আক্রমণের শিকার হচ্ছি।

মনে পড়ছে *কোরক* পত্রিকা আমার কাছে একবার একটি দীর্ঘকবিতা চেয়েছিলেন। এমন আমন্ত্রণ আমি সাধারণতঃ উপেক্ষা করি না। চিঠিটি সযত্নে টেবিলে রেখেছিলাম। কিন্তু তার পরই কলকাতায় আরম্ভ হয়ে গেলো তাণ্ডব। গণমাধ্যমের কোনো কোনো অংশ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে আমি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অফিসারদের ঘুষ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির ভিডিও অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করেছি। সেই তাণ্ডবের সঙ্গে লড়তে গিয়ে শক্তি, সময়, অর্থ—সব-কিছুরই অপচয় হলো। *কোরক*-এর সম্পাদকের কাছে লম্বা কবিতা পাঠানো আর হলো না। যত্নে রাখা চিঠিটা চাপা প'ড়ে গেলো অন্য কাগজের স্তূপের নীচে। তার পর বেরোতে হলো গবেষণাসংক্রান্ত কয়েকটি সফরে। যখন ফিরে এলাম তখন অ্যাপলজি পাঠাবার পক্ষেও বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও *কোরক* যে আমার কাছে আবার লেখা চেয়েছেন, এই সহৃদয়তা আমাকে অভিভূত করেছে। ঐ সময়ে একই কারণে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কাছেও প্রতিশ্রুত কবিতা পাঠিয়ে উঠতে পারি নি। সেজন্যেও আমি লজ্জিত।

রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে আমার বই-দুটির সূত্রে আমাকে যে-বিরোধিতা পেতে হয়েছিলো সেটা ক্রমে থিতিয়ে এসেছিলো। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদকে উপলক্ষ্য ক'রে যে-আক্রমণ আসছে তা আমাকে যথার্থই বিস্মিত করেছে। এটাকে তো আর স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে শুচিবায়ু ব'লে পাশে সরিয়ে রাখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ইংরেজীভাষী কবিতাপাঠকদের কাছে সসম্মানে পৌঁছে দিতে পেরেছি, সেই অনুবাদকে তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা করেছেন, ঠিক সেই অপরাধেই কি মারটা খেতে হচ্ছে? না, এটা ঠিক ঠাট্টা নয়। আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। আমি আক্রমণকারীদের মনস্তত্ত্বটা একটু বোঝার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথ যতদিন তাঁর আর্য, ঔপনিষদ, 'untranslatable' মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন ততদিন তিনি কেবল বাঙালীদের সম্পত্তি। যে-মুহূর্তে তিনি অন্যদের কাছে 'accessible' হন, সেই মুহূর্তে তিনি বাঙালীদের একচেটিয়া দখল থেকে বেরিয়ে যান, হাতছাড়া হয়ে যান। মধ্যযুগে এই ধরণেরই কারণে আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষায় লাতিন বাইবেলের অনুবাদ নিষিদ্ধ ছিলো। অনূদিত হলে বাইবেল-নামক বইটার ভিতরে যে কী আছে তা যে লাতিন-না-জানা, অশিক্ষিত, চার্চের বাইরের লোকেরাও জেনে ফেলবে!

আমার গায়ে রাজনীতির যে-সব ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তাদের মধ্যে

'রাজনৈতিক' রাজনীতি, সাংস্কৃতিক রাজনীতি, লিঙ্গগত রাজনীতি ('জেণ্ডার পলিটিক্স'), লণ্ডন-কলকাতা-শান্তিনিকেতন-মফস্বলের রাজনীতি—সবই জড়িয়ে আছে। ধারাগুলি সনাক্ত করতে পারছি। কিন্তু রাজনীতির জবাবে পাল্টা রাজনীতি করা—সেইটাই আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। রাজনীতির হালচালগুলো বুঝতে অনেকটা সাহায্য হয়েছে গত কয়েক বছরে অক্সফোর্ডের নারীবিষয়ক গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে। এটাও আমার একটা সাম্মানিক দায়িত্ব। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু একজন কর্মসহায়িকা বাদে এই কেন্দ্রের কোনো কর্মীই পারিশ্রমিক পান না। পরিশ্রমটা আমাদের বিনা মূল্যে দিতে হয়—লিট্‌ল্ ম্যাগাজ়িনের জন্য কাজ করার মতো। তবে শিখি অনেক। নারী হিসাবে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। স্পষ্ট কথা বলতে কোনোদিনই তেমন ভয় পেতাম না, তবে এখন আরও কম ভয় পাই।

কেউ কেউ বলেন, 'আক্রমণে কিছু আসে যায় না, তুমি ভালোবেসে নিজের কাজ ক'রে যাও।' সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও এই সান্ত্বনাবাক্যকে আমার অন্তঃস্থিত 'ষাটের শিশু' পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না। পুনরাবৃত্ত প্রতিকূলতা স্থূলভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে একজন লেখকের জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে বৈকি। তার কিছু অর্থনৈতিক পরিণামও থাকে। সেই-সব সমস্যাদের সঙ্গে ফের সেই আমাকেই লড়তে হয়, হিতাকাঙ্ক্ষী সান্ত্বনাদাতাদের নয়। কাজ তো ভালোবেসেই করবো, কিন্তু *কোরক*-এর উদ্দেশে এই লেখাটি ডাকে দেবার খরচ তো আমাকেই ব্যাংক থেকে তুলে আনতে হবে, তাই না? কলকাতা-শান্তিনিকেতনের লোকের সঙ্গে কথা হলেই তাঁদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে: 'কবে আসছেন?' যেন এ দেশ থেকে ও দেশ যাওয়া একটা ট্রেন ধরার মতো, এবং ট্রেনভাড়াটাও তেমন কিছু নয়। লণ্ডনের কোনো লেখক যদি তাঁর রবীন্দ্রবিষয়ক বইয়ে আমার কোনো প্রকাশিত বই থেকে ঋণ নেন, কিন্তু সেটা স্বীকার না করেন, বরং সেই বইয়ে আমার কাজকে অদৃশ্য ক'রে রাখার চেষ্টা করেন, তা হলে আজকের দিনের বইয়ের বাজারে, আজকের দিনের আর্থিক সংকটে, অনুদান যোগাড়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আখড়ায় অবশ্যই বাদামী ত্বকের মেয়ে আমার কিছুটা ক্ষতি করা হয়। অনেক অসুবিধার মধ্যে, অনেক দাম দিয়ে, অনেক পরিশ্রম ক'রে, বিনা অনুদানে রবীন্দ্রনাথের উপরে গবেষণার কাজ করছি। কেন জেনেশুনে নিজেকে অন্যের জুতোর নীচে পাপোশ হতে দেবো? যা ঘটেছে তাকে এ দেশের অনুবাদকেরা একবাক্যে বলেছেন অন্যায়, অগ্রহণীয়। মুখ তাই আমাকে খুলতেই হয়েছে। স্পষ্টভাষিণীদের 'লক্ষ্মী মেয়ে' হওয়ার সুনাম থাকে না। না থাক, ও অনেক আগেই গেছে। পুরুষরা তর্ক করলে তাকে বলে পোলেমিক্স। মেয়েরা তর্ক করলে সেটা হয় 'মেছুনীর মতো ঝগড়া করা'।

কেউ কেউ আমাকে রাগ প্রকাশ করতে বারণ করেন। আমার ধারণা, কোনো

ফোরমে আমি অভদ্র ভাষায় কথা বলি না। যা লিখি তা একটা সেমিনারে উঠে দাঁড়িয়েও বলতে পারি। কিন্তু আমার কোনো কোনো কথা শুনে অন্যদের রাগ হয়। অবশ্য রাগকে আমি বরবাদ ক'রে দিচ্ছি না। রাগ—anger—চিরকালই সিরিয়াস সমাজসচেতন শিল্পসাহিত্যের অন্যতম জ্বালানি। আর ওটা কেবল যুবক কবিদের বা 'রাগী ছোকরা'দের একচেটিয়া নয়। সুমনকে বোধ হয় আর ছোকরা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর গানে সৃজনশীল রাগ কি কিছু কম আছে? অবস্থাগতিকে আমি অধুনা একজন angry middle-aged woman, একজন রাগী মধ্যবয়সিনী। উপায়ান্তর নেই। ওকাম্পোরও একই হাল হয়েছিলো। কয়েকটি কেস স্টাডি ক'রে এও বুঝেছি, রাগী মেয়েটি যদি যুবতী হন, দাদাদের পাবলিক সমর্থন পেয়ে যেতেও পারেন। মহিলাটি মাঝবয়সী হলে তার চান্স অনেক কম। আর্টস্ দুনিয়ার এইটেই নির্মম realpolitik। কিন্তু কারোই যৌবন অক্ষয় হতে পারে না—দাদাদেরও না, দিদিদেরও না। আর রাগটাও আমাদের কারোই একমাত্র পরিচিতি হতে পারে না।

আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। আজকাল তাদের মুখেও প্রাসঙ্গিক সদুপদেশ শুনতে হয়। আমার বড় ছেলে সেদিন বললে, 'তুমি বৃথা ভালো বই লেখার চেষ্টা করছো। ও-সবে টাকা নেই। পর্নো লেখো। সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্সকে বইয়ে না ঢোকালে টাকা আসে না, জানো না সে-কথা? তুমি এত clever, চেষ্টা করলেই পারবে। Why don't you just give it a try?'

আমার সহিষ্ণু ভর্তাটি সেদিন কথাপ্রসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, আমার বর্তমান রিসার্চ প্রোজেক্টটি আরম্ভ হবার পর থেকে—যার গ্রন্থাকার রূপ শীঘ্রই প্রেসে যাবে—আমাদের বছরে গড়ে কী আয়তনের টেলিফোন বিল হচ্ছে। আমি বললাম, তুমি কি কথা শোনাচ্ছো? সে বললে, মোটেই না, শুধু তথ্যটা জানাচ্ছি। বলা দরকার, সে এবং আরও দু'-একজন এই প্রোজেক্টের জন্য বেগার খাটছে। এই কাজের জন্য কারোই কোনো পারিশ্রমিক বা অর্থমদত নেই। কিন্তু তারা অন্ততঃ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি থেকে নিয়মিত বেতন পায়। প্রোজেক্টের নেত্রী আমার সে-গুড়ে বালি। যে-ধরণের কাজ লোকে ফাণ্ডিং-এর ব্যবস্থা ক'রে, অফিশ্যাল রিসার্চ অ্যাসিস্টান্ট সঙ্গে নিয়ে ক'রে থাকে, সেটা রান্নাঘর থেকে বন্ধু আর বাড়ির লোকেদের সাহায্য নিয়ে করার চেষ্টা শিল্পীর পাগলামিরই লক্ষণ বোধ হয়। শুনেছি সত্যজিৎ রায় খানিকটা ওভাবেই *পথের পাঁচালী*-র শুটিং আরম্ভ করেছিলেন। পাগলামিতে টিঁকে থাকতে পারলে অনেক সময় দু'-একটা ভালো কাজ ক'রে ওঠাও যে যায়—সেটাই সান্ত্বনা।

ঐ ফোন বিলের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার, নয়তো দূরের পাঠকরা আবার ভুল বুঝবেন। বলা বাহুল্য, বিলগুলোর একটা বৃহদংশই টেলিফোন কোম্পানিগুলোর স্ফীত মুনাফা। রেটগুলো আরও অনেক সস্তা হতে পারে। সে যা

হোক, আপনারা যে-কেউ এখানে এসে এমন একটা প্রোজেক্ট ক'রে দেখুন, যেখানে কলকাতা বা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করতে হয় এবং ইনফর্মেশন বিনিময় করতে হয়। বিশেষতঃ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। দেখবেন, আপনাদেরও একই দশা হবে। চিঠি যাতায়াতের মহা অসুবিধাকে বাইপাস্ করতে গিয়ে ফোনের শরণাপন্ন হতে হবে। লাইন পেতে সাতান্নবার ডায়াল করতে হবে। হয়তো দু' দিন ধ'রে একটি ক্লান্ত নারীকণ্ঠে সেই একই টেপ শুনতে হবে : এই রুটের সব লাইন বিজি, অনুগ্রহ ক'রে আরেকটু বাদে ডায়াল করুন। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে ঐ বাণী শোনার পর অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোকেরও মাথায় রক্ত চ'ড়ে যাবে, কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে, হয়তো 'সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-মেশানো বই লিখে ফেলার অনুপ্রেরণাও পেয়ে যাবেন কেউ কেউ। ফ্যাক্স বা ই-মেইলের সহায়তায় টেলিফোনের বিল অনেক কমিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু বীরভূমের ক্যাম্পাসে ঐ জিনিসগুলোর ব্যবস্থা থাকলেও তাদের সেরকম নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে দেখি না। আমার ছোট ছেলেটা যখন লণ্ডনে পি-এইচ-ডি-র কাজ করতো, তার একজন রিসার্চ গাইড টোকিওতে ব'সে থাকতেন। কুছ পরোয়া নেই, ফ্যাক্সে ই-মেইলে সমস্ত বিনিময় চলতো। তাড়া তাড়া কাগজপত্র আর রাশীকৃত খবর ওভাবেই আসতো যেতো, যেন লণ্ডন আর টোকিওর মধ্যে কোনো দূরত্বই নেই। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কাজে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ঐ ভিত্তিকাঠামো আশা করা যায় না। অগত্যা এদিককার ফোন বিলটা উপরের দিকে চড়তে থাকে। তাতে কী ? বিলেত দেশটার ফুটপাথগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো, জানেন না ? আমরা রাস্তায় গিয়ে একেকটা টালি খুলে আনি, আর বিক্রি করি। ওভাবেই আমাদের সংসার চলে। রোজগার করতে এ দেশে তো খাটতে হয় না। একটা সোনার টালি খুলে আনি তো ওভারনাইট আরেকটা গজিয়ে যায়। ময়দানবের পুরী, বুঝলেন না ? অ্যাঁ, কী বললেন ? নেক্সট্ কবে কলকাতায় আসছি ? দাঁড়ান, দাঁড়ান, আরেকটা রাত সময় দিন। বাড়ির সামনেকার গোটা ফুটপাথের আস্তরণ খরচ হয়ে গেছে। টালিগুলো গজাক আবার।

§

অন্যায় আক্রমণ সম্বন্ধে একজন কবির জীবনে সব থেকে বড় কথা এই, উৎকৃষ্ট কবিতা লিখতে হলে শত 'এক্সপিরিয়েন্স'-এর মধ্যেও মনের গহনে যে-'ইনোসেন্স'টাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও অহেতুক আক্রমণের 'ভায়োলেন্স'-এর মুখোমুখি অন্তরের সেই হাসিমুখ সারল্যটুকুকে তাজা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এইটে একটা 'আধ্যাত্মিক' সমস্যা। আক্রমণকে উপেক্ষা করতে হলে চামড়াকে পুরু ক'রে ফেলতে হয়। চামড়া

পুরু হয়ে গেলে কবির সংবেদনশীলতা উবে যায়, কবিতা আর লেখা যায় না। কবিতা লেখা ভালোবাসার মতো। প্রশ্রয় পেলে লতার মতো পল্লবিত হয়ে ওঠে। অপমানের প্রহারে চিত্তের তাগিদ মলিন হয়ে যায়। এবং যা অত্যন্ত অশ্লীল—দুঃখবোধ, অপমানবোধের কথা বলতে গেলে আরও বেশী ক'রেই অপমানিত হতে হয়। এই বোধগুলিকে চেপে রেখে কিন্তু কবি হওয়া যায় না। জগতের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ঝংকারকে সততার সঙ্গে প্রকাশ করাই কবিদের আর্ট। যাঁরা অপমান করেন তাঁরা নিজেরা বোধ হয় কবিতা লেখেন না।

এভাবে আক্রান্ত হওয়ার অবস্থা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক, কেননা আমার বাংলায় কবিতা লেখার ক্ষমতাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। বাংলায় কবিতা লিখে আমি যে-আনন্দ পাই, তা হচ্ছে খুব গরমের দিনে চুল ভিজিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করার মতো এক প্রগাঢ় আনন্দ, যা সমস্ত সত্তাকে চাঙ্গা করে। এই ক্রিয়া শৈশবের সঙ্গে, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সঙ্গে, জন্মভূমির জলমাটির সঙ্গে আমার যোগকে অটুট রাখে। একজন অভিবাসী শিল্পীর পক্ষে এই যোগটি অক্ষত রাখা জরুরী। এটি সেই নাড়ীর যোগ, যা অন্তরকে রসদ সরবরাহ করে, পরিবেশের সঙ্গে যাবতীয় আদানপ্রদানে প্রতিক্রিয়াগুলিকে টানটান রাখে। জীবনের অন্য নানা সংগ্রামে যখন বিশুষ্ক হতে হয় তখন এই যোগ জলভরা ক্যাক্টাসের মতো মরুবিজয়ের কেতন ওড়ায়। ধর্ষণের বোধ দ্বারা এই যোগটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাক, তা আমি চাই না।

যে-মানুষ অনেক দিন জন্মভূমির বাইরে আছে তার জীবনে একটি অবিচল কেন্দ্রের মতো কাজ করে বাবা-মায়ের গৃহ। সেই কেন্দ্রে যায় তার খবরাখবর, তার নিজের ও তার নূতন পরিবারের। সাধারণ সব খবর, কিন্তু সেই সুদূর গৃহে তাদের মূল্য বিশেষ। ওদিককার সব খবরও নানা জায়গা থেকে জড়ো হয়ে একই কেন্দ্র মারফৎ তার কাছে আসে। এও একরকমের ইন্টারনেট। আমার বাবা, যাঁর মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ইত্যাদি কবিদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, যাঁর জেদে ছেলেবেলায় আমাকে পড়তে হয়েছে *কবিতা* পত্রিকার বাঁধানো খণ্ড থেকে ফরাসী-জার্মান কবিতা পর্যন্ত, মারা গেছেন দশ বছর হলো। বাবা ছিলেন কবিতার বিদগ্ধ পাঠক। শেষ জীবনে খুব মন দিয়ে বারে বারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তেন। বাবার মৃত্যুর পর অনেক দিন মা কোনো ফাঁক বুঝতে দেন নি, পারিবারিক ও কলকাতার বন্ধুদের খবর সরবরাহ করা থেকে শুরু ক'রে প্রয়োজনমতো প্রকাশক মহাশয়দের টেলিফোন করা পর্যন্ত সংযোগসাধক ভূমিকাগুলি সবই সাধ্যমতো পালন ক'রে গেছেন। তার পর তাঁর শক্তি ক'মে আসে। ১৯৯৩ সালে তিনিও চ'লে গেলেন। একটা কেন্দ্রের অবসান, হঠাৎ একটা অঞ্চল থেকে প্রধান শহরটা উধাও হয়ে যাবার মতো, আকাশ থেকে একটা নক্ষত্রপুঞ্জ মিলিয়ে যাবার মতো। আমার আত্মপ্রকাশের দিক থেকে আমার জীবনে এই অবসান একটা বিশেষ অবসান।

ছেলেবেলা থেকে কবিতা লেখায় আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন এই দুই ব্যক্তি। কোনো দিন, একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁরা আমাকে মনে করতে দেন নি যে কবিতা লেখাটা একটা ফালতু কাজ, সময়ের অপব্যয়। বরাবর জানতে দিয়েছেন যে এটা একটা উচ্চমানের কাজ, সম্মানার্হ কাজ, যার জন্য গর্ব বোধ করতে পারা যায়। অপিচ তাঁরা কোনো দিন আমাকে মনে করতে দেন নি যে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, অথবা কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করাটা একজন মেয়ের পক্ষে কোনোভাবে অশোভন। তাঁদের মেয়ে কবি, ছবিও আঁকে, এ নিয়ে তাঁদের আনন্দ ছিলো, গর্ব ছিলো। আমার সৃজনশীলতায় ছিলো তাঁদের অফুরন্ত আনন্দ। শেখালে মেয়েরা সবই করতে পারে—এই ছিলো তাঁদের মত। সেকালে বুঝি নি এই দৃষ্টিভঙ্গি কত বড় প্রাপ্তি। বাবা-মায়ের দান আমরা সহজে নিই, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে বসি না। আমি ভাবতাম সব বাবা-মা-ই বুঝি এমন উদার, এমন লিবরল, ছবি আর কবিতার এমন সমঝদার। অল্প বয়সে কবিতা লিখেই তাঁদের দেখাতাম। তাঁরা তারিফ না করা পর্যন্ত শান্তি হতো না। পরবর্তী কালে ছাপা কবিতার খবরাখবর তাঁরাই আমাকে দিতেন—এটা বেরিয়েছে, ওটা বেরিয়েছে, অনেকে প্রশংসা করছে, আমাদের চমৎকার লেগেছে, আরও লিখে যাও—এমন সব কথা। এই সেই অমূল্য ফীডব্যাক, যা একজন নির্মীয়মাণ কবির আত্মবিশ্বাসকে লালন করে। একজন নারী শিল্পীর পক্ষে এর মূল্য কী, তা বুঝেছি অনেক অনেক পরে—যখন জেনেছি কত বাবা-মা তাঁদের কন্যাদের আত্মপ্রকাশের ও সৃজনের আকুতিকে কতটা নির্মমভাবে নিষ্পেষণ ক'রে থাকেন। নারীবাদের বিশ্লেষণ বলে, বাবা-মায়ের তৈরি-ক'রে-দেওয়া আত্মমর্যাদার বনিয়াদের সঙ্গে মেয়েদের সাংস্কৃতিক কৃতির একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকে। শিল্পে সাহিত্যে 'high achiever' হয়ে উঠতে হলে একটি মেয়ের চাই পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া গুণগ্রাহিতার মজবুত ভিত্তি, যা বাকি জীবন তাকে সাহায্য করবে, অবজ্ঞায়-নাক-সিঁটকানো নিষ্ঠুর দুনিয়ার সঙ্গে লড়বার শক্তি দেবে তাকে। আমি যদি এ যাবৎ কিছু করতে পেরে থাক, তা হলে সেই ভিত্তিগঠনের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

মনে পড়ে ১৯৯২ সালে *কথা বলতে দাও* বইটি হাতে পেয়ে মায়ের আনন্দ। ছেলেমানুষের মতো আনন্দ। বারে বারে বলেছেন, আমি যে মূলতঃ কবিই, যেন না ভুলি সে-কথা, শেষ পর্যন্ত যেন কবিতা লিখে যাই। 'দিদিমা, স্নানের পরে' নামে একটা কবিতা আছে ঐ বইটাতে। 'ওটা আমাকে নিয়ে নাকি রে?' ঠিকই ধরেছিলেন! 'খেয়া' কবিতাটাতে আছে এক মেয়ে মাঝির কথা, যার নৌকো থেকে কিছু যাত্রী নেমে যায় পারানি না দিয়েই, ঠকায় তাকে। প'ড়েই মা আন্দাজ করেছিলেন ঐ রূপকের উৎস—'তোর কোন্ লেখার জন্য কে টাকা দেয় নি বল্ তো?' আমার লেখকস্বার্থের মা ছিলেন সদাজাগ্রত প্রহরী, এবং শিখিয়েছিলেন নিজের শ্রমের মূল্য এবং মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত

হতে। শিখিয়েছিলেন যে পারিশ্রমিক চেয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনো অমর্যাদা নেই, অমর্যাদা আছে লোকে আমাকে ঠকাচ্ছে জেনেও চুপ ক'রে থাকার মধ্যে, অমর্যাদা আছে প'ড়ে মার খাওয়ায়, অন্যায়কে মেনে নেওয়ায়, অন্যের জুতোর নীচে পাপোশবৃত্তিতে। আমার অনিশ্চিত আয়ের অভিবাসী লেখকজীবনের জন্য একটা উদ্বেগ ছিলো তাঁর, কিন্তু এ বিষয়ে একদিন কেউ কোনো প্রশ্ন তোলায় উনি একটি বাক্যে সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছিলেন। 'ও যে মাতৃভাষাকে ভালোবাসে।' ব্যস্, এর পর আর কথা নেই। আমার কবিজীবনে মায়ের মৃত্যু একটা অধ্যায়ের শেষ।

সংবেদনকে সম্বল ক'রে কবিদের কাজ। একটু শক্ত না হলে দুনিয়ায় টেঁকা যাবে না, আবার বেশী শক্ত হয়ে গেলে কলম দিয়ে এক লাইন কবিতা বেরোবে না। পাতলা চামড়াটা কখন যে কেটে যায়! কখন যে কার স্নায়ু ছিঁড়ে যায়! কবিতার স্বর্ণযুগ তাই বিশেষ বিশেষ স্থানকালে স্ফুরিত হয়ে ওঠে, যখন কবিতা-নামক উৎসবটার জন্য একটু জায়গা, একটু অবকাশ পাওয়া যায়, যখন আমাদের নরম দিকটা প্রকাশিত হয়ে গেলেও নেকড়েরা এসে আমাদের খেয়ে ফেলে না। রুশ কবি মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার একাধিক বায়গ্রাফি পড়েছি। তিনি যে কী যন্ত্রণায় গলায় দড়ি দিয়েছিলেন তা বেশ বুঝতে পারি। আমি প্রায়ই তাঁর কথা ভাবি, তাঁকে মনে রাখি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তাঁর ঐ মৃত্যু। ঐ দুই কবির জীবনের শেষ বছর আর আমার জীবনের প্রথম বছর এই পৃথিবীতে সমকালীন হয়েছিলো, এ কথা ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলি।

যে-রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য ক'রে এত মার খেতে হয় আমাকে, সেই কবির কবিতার আমি অত্যন্ত অনুরাগী, এবং তদ্দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তাঁর কাছ থেকে আমি এখনও প্রেরণা পাই। কেবলই কবিতা নয়, বিভিন্ন জ্যাঁরে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই আমাকে আকর্ষণ করে। আমার অনুবাদের বইটির ভূমিকায় তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের একটা আন্দাজ দেবার চেষ্টা করেছিলাম, এবং সেই ভূমিকাটি বিলেতের এবং মার্কিন দুনিয়ার পাঠকদের কাছে বিশেষভাবেই স্বাগত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখার মধ্যে যে-অদম্য বুদ্ধিদীপ্তি আছে, বাঙালীদের কাছ থেকে তা আজও যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় নি, কেননা তারা তাঁকে পুজো দিতে ব্যস্ত। মনে পড়ছে, শঙ্খ ঘোষকে একবার একটি চিঠিতে আমি বোধ হয় লিখেছিলাম, আমরা বাঙালীরা এখনও রবীন্দ্রনাথকে ডিজার্ভ করি নি। তাঁকে আমাদের কবি হিসেবে পাওয়া যে-সম্মান, সেই সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নি। শঙ্খ সায় দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গত কয়েক বছরে যে-কাজ করেছি তাতে তাঁর সৃষ্টির সান্নিধ্য আমাকে অনেক আনন্দ, অনেক নূতন প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের—*পুনশ্চ* ও তৎপরবর্তী বইগুলির—ইনফর্মাল গদ্যভঙ্গিতে লেখা কবিতাগুলি

আমার বিশেষ প্রিয়। কোনো তাড়া নেই, আঁট-জামাকাপড়-পরা মঞ্চসচেতন অভিনেতার হাঁসফাঁস নেই, সময় নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে সহজভাবে কথা বলা, একটা গল্প বলা। বিশেষ থেকে আরম্ভ ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে যাওয়া সাধারণের দিকে। ছোট কোনো-একটা ঘটনাকে, ছোট কোনো-একটা আবিষ্কার বা অনুভবকে টেনে নিয়ে যাওয়া বিরাট অনন্তের অভিমুখে। এই ভঙ্গি, এই গতি আমাকে বিশেষভাবে টানে। আমি নিজেও এ ধরণের কবিতা লিখতে ভালোবাসি।

এইভাবেই দিন কাটে। যখন একলা লাগে, বা মন খারাপ হয়, ক্লান্ত-আক্রান্ত-বিধ্বস্ত বোধ করি, তখন আমাদের বাড়ির অনতিদূরে অবস্থিত পূর্বোল্লিখিত মাঠক্ষেতের ভিতর দিয়ে বা খালের ধারে হাঁটতে বেরোই, হয়তো বা বুনো ফুল আর বীজওয়ালা বাহারে ঘাস জড়ো করি। প্রকৃতির ছোট ছোট জিনিস আর ঘটনা আমাকে বেশ অনুপ্রেরণা দেয়। হয়তো সেটা একটা বৃষ্টিতে ভেজা ফুলের পাপড়ি, হয়তো মাঠের চোরকাঁটা বা বিছুটিপাতা, হয়তো একটা বিড়াল, যে শিকার ক'রে খেয়ে জিভ চাটছে আর হাই তুলছে—যা খুবই সাধারণ, অথচ এক আশ্চর্য অনন্যতায় মণ্ডিত। এ ধরণের কোনো-কিছুকেই আমার তুচ্ছ ব'লে মনে হয় না, মনে হয় তারা আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দুঃখময় অভিজ্ঞতাগুলির ক্ষেত্রে দেখেছি যে একটি মানুষের বা একটি ছোট গ্রুপের অভিজ্ঞতার উপর আমার হৃদয়ের দৃষ্টিকে ফোকস্ ক'রে তা থেকে কবিতা বার ক'রে আনা আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ব্যাপক হিংস্রতা আর গণহত্যার খবরগুলি আমাকে এমন স্তব্ধ ক'রে দেয় যে সেই স্তব্ধতার ভিতর থেকে কোনো সংলাপের ধ্বনি আমি অন্ততঃ টেনে বার ক'রে আনতে পারি না। হয়তো অন্যরা পারেন। ঐ ধরণের খবর আমার মধ্যে বৈজ্ঞানিক গোত্রের জিজ্ঞাসাকে জাগরিত করে, কিন্তু আর্টকে প্রতিহত করে। ওরকম আচরণের শারীরিক-মানসিক-জেনেটিক ভিত্তি কী হতে পারে তা বুঝে নিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ঐ উপাদান থেকে কবিতা গড়তে প্রবৃত্তি হয় না। আমার পক্ষে অমন খবর কেবল বুদ্ধি (ইন্টেলেক্ট) দিয়ে বোঝা সম্ভব, ইমোশনের সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়। অবশ্য ঐরকমের কোনো ঘটনার পটভূমিকায় কাব্যনাট্যের সংলাপ কল্পনা করতে পারি। যে-মাপের রাগদুঃখ, অভিমান বা যন্ত্রণার অনুরণন আমার মধ্যে সম্ভব সে-সব আমার কবিতায় নিশ্চয় থাকে, কিন্তু মূলতঃ আমি একটা আনন্দপিয়াসী মেয়ে—আমি ভীষণভাবে বাঁচতে চাই, বাঁচার জন্য আকুতিকে আমার কাজের মধ্যে ধরিয়ে দিতে চাই, আনন্দের কথা আর ভালোবাসার কথা বলতে চাই।

কাছের এবং দূরের বন্ধুদের উত্তাপ আমাকে বাঁচতে সাহায্য করে। কখনও একটা ভালো চিঠি আসে। কখনও জানতে পারি আমার কবিতা কারও ভালো লাগে। কদাচিৎ এমন কোনো অভিবাসী সংস্থা কবিতা চেয়ে পাঠান, পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা যাঁদের আছে। রোজগার? বেশ, তা হলে তো অবশ্যই পাঠাবো। আমেরিকার

বঙ্গসম্মেলনের সুভনিরের কাছ থেকে গেলোবার দুটো কবিতা বাবদ বেশ ভালো দক্ষিণা পেয়েছিলাম—একেবারে পাউণ্ডে। এবারে পেলাম তার চাইতে কম, এবং পাউণ্ডের বদলে ডলার। ডলারের চেকটা ব্যাংকে জমা দিতে চার পাউণ্ড চার্জ কেটে নিলে নিষ্ঠুরভাবে। ব্যাংক বললে, অন্যায়, এই চার্জটা প্রেরকদেরই absorb করা উচিত ছিলো, ওদের জানিয়ে দিন। হায় রে, চেকটা এসেছিলো সাদা একটা কাগজে মোড়া—সঙ্গে সৌজন্যসূচক একটি কার্ডও ছিলো না। খামের উপর প্রেরকের নাম ছিলো শুধু। কথা হচ্ছে, সুভনিরের সম্পাদিকার আমার কবিতা পছন্দ। ষাটের দশকের পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কবিতার লাইন তাঁর এখনও মুখস্থ। কিন্তুর টাকার ব্যবস্থাপক-প্রেরক আলাদা ব্যক্তি। তা ছাড়া, সম্পাদিকার কলকাতা-ঘুরে-আসা মূল চিঠিটা দেরিতে পাওয়ার দরুন তাঁকে আমার ফোন করতে হয়েছিলো, এবং কবিতা-দুটো Swiftair-এ (আপনারা যাকে বলেন Speedpost) পাঠাতে হয়েছিলো। অর্থাৎ মার্কিন বঙ্গসম্মেলনের চেকটা থেকে আসলে আরও অনেকটাই কাটা গেছে। সে যা-ই হোক, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা মেনে ব্যাংকের বক্তব্যটা সম্পাদিকাকে অন্ততঃ জানিয়ে দিয়েছি। আঃ, বেশ মজা লেগেছিলো ইন্টারনেটের কবিতাটার জন্য পুরো একশো পাউণ্ড পেয়ে। একটা কবিতার জন্য এত টাকা জীবনে কখনো পাই নি!

থাক গে টাকার কথা। টাকা মাটি, মাটি টাকা। যেখানে এত লোক 'জীবনের বলি', সেই দুনিয়ায় যারই দৌলতে হোক খেতে যে পাই, ছাদের নীচে যে শুই, সে-ই ঢের। কখনও পেয়ে যাই একটি অলৌকিক উপহার—নামহীন চিঠিতে একজন জানিয়েছেন, আমার উপন্যাস *নোটন নোটন পায়রাগুলি* তাঁকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। হ্যাঁ, এমন আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে। কে তিনি জানি না। বাঙালী। মনে হয় মহিলা।[৭] তাঁর কাছ থেকে দুটো চিঠি পেয়েছি। কেন নাম দেন না কে জানে। আমার কিছু কবিতাও পড়েছেন নিশ্চয়, কেননা 'ড্যান্‌ডেলায়ন' নামে *সবীজ পৃথিবী-*র একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। নাম-ঠিকানা জানালে সাড়া দিতাম। কিংবা দূর ব্রাজিল থেকে চিঠি আসে এক বিদেশিনীর, যাঁর সঙ্গে বহু দিন আগে আলাপ হয়েছে, একবার মাত্র দেখা হয়েছে, কিন্তু যিনি আমার ইংরেজীতে লেখা কয়েকটি বই প'ড়ে ফেলেছেন। কিংবা বারো বছর অপেক্ষার পর শান্তিনিকেতনের বান্ধবীর দেওয়া দোলনচাঁপায় ফুল ফোটে হয়তো বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর দৌলতে। সেই ফুল ফোটার মধ্যে কবিজনোচিত অভ্যাসে সংকেত খুঁজি। আরে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো কী। সে নিয়ে তোরা ভেবে মর্। আমার বাড়িতে যে সেই সুযোগে ক্রিসমাসের দিনেও ট্রপিকাল ফুল ফুটেছে, সেটা কি প্রাপ্তি নয়? যে-কোনো প্রাণের পক্ষে এখনকার এই মুহূর্তটিতে পৌঁছতে আদিতম পূর্বসূরি থেকে নবতম উত্তরসূরি পর্যন্ত প্রাণের যে-ধারাবাহিকতা, যে-নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হয়েছে, আমার কাছে সেটাই একটা মিরাক্‌ল্। আমার মনে হয় কবিতাও

ঐরকম একটা প্রাণ, সময়ের গলি বেয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এগিয়ে-চলা একটা জীবন্ত শিকড়, যেটাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্বপালনে এই পৃথিবীটাকে কেন আমরা কবিতার পক্ষে আরেকটু বাসযোগ্য, আরেকটু 'রম্য' ও 'আলোকদীর্ঘ' ক'রে তুলি না ?

১ এ কথা যখন লিখেছিলাম তখন ১৯৯৬ সাল। এখন, ২০১০ সালে, লিখতে বসলে এতটা আশাবাদী ভঙ্গিতে কথা বলতাম কিনা সন্দেহ! কয়েক বছরের ব্যবধানে একেকটা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট যে কিভাবে বদলে যায়! এখন অনেকে বলবেন যে কবিতার পুনরুজ্জীবন কোনো-একটা চরে আটকে গেছে—এই সেদিন একজন কবি আমাকে বললেন: 'এই দেশে কবিতা কেবল তিক্ততার সৃষ্টি করে।' আর ধর্মসংলগ্ন সন্ত্রাসবাদের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের ফলে অধুনা 'বহুসাংস্কৃতিকতা'র চর্চাও নানাভাবে ব্যাহত ও বিপন্ন।

২ কবিতাটি পরে আমার *Memories of Argentina and Other Poems* (Virgilio Libro, 1999) কবিতাসংকলনের অন্তর্গত হয়েছে।

৩ এখন আরও দু'-একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাঁরা বাংলাদেশী।

৪ মিষ্টুনী বেভিঙ্গের অকালমৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত আমার একটি দীর্ঘকবিতা *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় বেরোয়।

৫ এখন সেরকম আরও কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশীরা সংখ্যায় অধিক, তবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষও আছেন।

৬ পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আমি আজও তাঁর গানের ভক্ত। তাঁর সাম্প্রতিকতম অ্যালবাম *ছত্রধরের গান*-ও শোনা হয়ে গেছে। অসাধারণ!

৭ পরবর্তী কালে তাঁব সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিনি একজন নরম মনের পুরুষ!

[*কোরক*, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৩ (১৯৯৬)।]

বাঙালী মেয়ের রূপান্তর

'স্বপ্ন' নামে একটি কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথের, *শ্যামলী* বইটিতে, যেখানে অন্ধকার এক বাদলা রাতে কবি কল্পনা করার চেষ্টা করছেন তাঁর থেকে তিনশো বছর আগেকার বাঙালী মেয়েরা কেমন ছিলো। বৈষ্ণব কবিদের চোখেব সামনে কবিতার রাধার মডেল হিসেবে জীবনে ছিলো যে-মেয়েরা, কেমন ছিলো তাদের ভাবনা, ভাষা, চোখের চাহনি ? স্পষ্ট ক'রে দেখতে পান না রবীন্দ্রনাথ। তবে এইটুকু বোঝেন, তাঁর সমসাময়িক মেয়েরা যেমন ক'রে শাড়ির আঁচল বাঁধে কাঁধের উপরে, যেমন ক'রে পিছনে নেমে-পড়া কায়দায় ঘুরিয়ে পাকায় খোঁপা, অন্যের মুখের দিকে যেভাবে স্পষ্ট ভঙ্গিতে তাকায়, তেমন ছবিটি ছিলো না সেই-সব কবিদের সামনে।

অতীতের কোনো-একটা পর্বে মানুষরা ঠিক কেমন ছিলো, সেই নিয়ে কল্পনার পাখাকে একটু মেলে দেওয়া—এই জিনিসটা এককালে আমাকেও আবিষ্ট করতো। ছেলেবেলায় আমার বিশেষ জিজ্ঞাসা ছিলো রামায়ণের মানুষদের নিয়ে। কেমন ছিলেন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ? তাঁরা কি ছিলেন না আমার পরিচিত বিহারী বা উত্তর প্রদেশের লোকেদের মতো ? রামলক্ষ্মণের নিশ্চয়ই ঠোঁটের উপরে গোঁফ আর কানে কুণ্ডল ছিলো ? সীতা নিশ্চয় সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরতেন ? তিনি নিশ্চয় ছিলেন রোগা, চোখ-নামানো, লাজুক চেহারার দেহাতী মেয়ে ? নথ-টিকলির ভারে তিনি কি ছিলেন না ভারাক্রান্ত ? তাঁরা কি খুব চাটনি-আচার খেতেন ? দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বালিকা বধূ সীতা তাঁর জায়েদের সঙ্গে অন্তঃপুরে করতেনটা কী, কিভাবে সময় কাটাতেন ? বনবাসে যাবার সময়ে তিনি নিশ্চয় একেবারে আলতা-পরা আংটি-পরা খালি পায়েই বেরিয়ে পড়েন নি (এ রাম, সে হবে যাচ্ছেতাই), আশা করা যায় কোনোরকমের প্রাচীন স্টাইলের চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে নিয়েছিলেন ... ?

আমার নিজের পূর্বনারীরা কেমন ছিলেন সেই প্রশ্নটাকে ঘিরেও লতিয়ে উঠতো আমার মস্তিষ্কের সজীব জল্পনাকল্পনা। আমার মায়ের দিকের বাঙাল বদ্যি পূর্বনারীগণ কি আমার বাবার দিকের বাঙাল ব্রাহ্মণী পূর্বসূরিদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন না ? মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে বদ্যিরা নাকি বামুনদের থেকে অগ্রসরতর ছিলেন। সে-ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষার সেই ঐতিহ্যটা শুরু হয়েছে ঠিক কবে থেকে ? আমার নিরক্ষর ব্রাহ্মণী জাত্যভিমানিনী পূর্বনারীগুলি কি আবার ঢঙ ক'রে জ্যান্ত অবস্থায় চিতায় চড়তেন নাকি ?

রবীন্দ্রনাথের 'সমসাময়িক' বলতেও তো বোঝায় বিরাট একটা সময়ের ব্যাপ্তিকে। যখন জীবন শুরু করেছেন, তখন সাত-আট-ন' বছরের মেয়েরা বিয়ে ক'রে শ্বশুরবাড়িতে আসছে, তাঁর দিদিদের মতো কলকাতার অভিজাত ঘরের দু'-চারজন মেয়ে পাল্কি ক'রে স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করেছে। সেই যুগের মেয়েদের কল্পনা করতে আমাদের এখন রীতিমতো বেগ পেতে হয়। কিন্তু জীবন যখন শেষ করলেন তিনি, তখন তাঁর চারপাশে ছিলেন যে-মহিলারা, তাঁদের ছুঁতে পারা আমাদের অনেকের পক্ষেই ততটা কঠিন নয়, কেননা আমাদের মা-মাসীদের মধ্যে আমরা পেয়েছি তাঁদের পরিচয়। আর তখন জন্ম নিচ্ছে আমাদের প্রজন্মটা। ঐ মহিলারা গঠন করলেন আমাদের।

মানুষের সমাজ ক্রমাগত বদলাচ্ছে, এর চেয়ে বড় সামাজিক সত্য আর কী হতে পারে। মানবিক ল্যাণ্ডস্কেপের এই অসাধারণ বিবর্তনক্ষমতাই তো আমাদের প্রজাতির টিঁকে থাকার হাতিয়ার। আর আমরা বাস করছি এমন একটা বিশেষ সময়ে, যখন পরিবর্তনগুলি একই সঙ্গে অতিত্বরিত এবং পৃথিবীজোড়া। মনে হয় এই তো সেদিন প্রথম বিলেতে এলাম পড়াশোনা করতে, কিন্তু সেই ষাটের দশকের চিপা-স্কার্ট-পরা মেয়েদের বিলেত আর এই নব্বইয়ের দশকের জীন্‌স্‌ধারিণীদের বিলেতও তো দুটো আলাদা দেশ। মেয়েদের তথা পুরুষদের ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার ধরণ, খাওয়াদাওয়ার স্টাইল, পোশাক-আশাক, ধ্যানধারণা—সমস্ত কিছুতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘ'টে গেছে।

বাঙালী মেয়েদের আমার নিজের অল্প বয়সে যেমন দেখেছি, দেশবিভাগের পঞ্চাশ বছর পরে এখন যেমন দেখছি—এই ধরণের কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে বসলে সর্বাগ্রে যে-কথাটা মাথার মধ্যে রাখতে হয় সেটা হলো মানুষের বৈচিত্র্যের কথা। কাল্‌চার জিনিসটা গোষ্ঠীজাত ঠিকই, তবে একটা বড় দল বা গ্রুপের মধ্যে ছোট দল বা সাবগ্রুপ থাকে, এবং উপদলীয় খুঁটিনাটিরও গুরুত্ব কম নয়। তাই কেবল 'বাঙালী মেয়ে' বললেই বর্গীকরণ সমাপ্ত হয় না, ভাবতে হবে কোন্ শ্রেণীর মেয়ে, কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, কোন্ জাতের, শহরের না গাঁয়ের, ধনী না গরীব, নিরক্ষর না সাক্ষর, শিক্ষা পেয়ে থাকলে সেটা কতদূর পর্যন্ত ইত্যাদি। তার উপর আছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। কোনো কোনো মানুষের এমন জোরালো ব্যক্তিত্ব থাকে যে তাঁদের যূথগত পরিচয় ছাপিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটাই প্রবলতর রূপে আমাদের চোখে ধরা দেয়। তাঁরা কোনো স্টিরিওটাইপের মধ্যে পড়েন না। সামান্যীকরণের সূত্র দিয়ে তাঁদের বোঝা যায় না। আবার কোনো মানুষেরই গোষ্ঠীবদ্ধ শিকড়বাকড়ের সক্রিয়তা, তাৎপর্য, অবদান কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায় না।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের মেয়েদের বিবর্তন কোন্ পথে এগোচ্ছে তা নিয়ে

পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন তেমন কোনো জিজ্ঞাসা ছিলো না। হঠাৎ তসলিমা নাসরিনের কলামগুলো প'ড়ে সবাই যেন ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠে বসলেন। কেউ কেউ এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন দুই বাংলার মধ্যে তসলিমাই প্রথম ফেমিনিস্ট লেখিকা, তার আগে কারও কোনো নারীচেতনা প্রকাশ পায় নি। স্বনামধন্য পূর্বসূরি লেখিকাদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, তসলিমার আর্বিভাবের মাত্র কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের আর ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর নারীভাবনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য, তাঁদের কাহিনীর সঙ্গে আধুনিক জীবনের একটি প্রেমের কাহিনীকে মিশিয়ে দিযে একটি বই লেখার জন্য আমাকে যথেষ্ট সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে, এবং আমার প্রথম উপন্যাসও নারীচেতনায় নিষিক্ত রচনা। মেয়েদের বিষয়ে প্রবন্ধও লিখেছি অনেক। মুসলিম সমাজের সমকালীন কনটেক্সটেও তসলিমা পূর্বসূরিবর্জিত নন। আমেরিকায় অভিবাসী পূর্ববঙ্গীয় লেখিকা দিলারা হাশেম তসলিমার আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই লিখছেন, এবং তাঁর লেখায় নারীচেতনা প্রখর।

আমার অল্প বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক যে-নারীদের দেখেছি তাঁরাই কি সব এক ছাঁচের ছিলেন ? তাঁদের মধ্যে একটা বিভাজনরেখা ছিলো—যাঁরা বাড়ির ভিতরেই শিক্ষালাভ করেছেন, আর যাঁরা বাড়ির বাইরে 'ফর্মাল স্কুলিং' লাভ করেছেন, এই দুই দলের মধ্যে। যাঁরা স্কুলে গিয়েছেন কিন্তু কলেজে যান নি, আর যাঁরা কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন, এই দুটো দলের মধ্যেও কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিলো। যাঁরা বাড়ির বাইরে চাকরিবাকরি করতেন তাঁরা তখন সংখ্যায় কম—কিন্তু তাঁরা এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন যেগুলি দ্বারা তাঁদেরকে কেবলমাত্র গৃহিণীদের থেকে আলাদা ক'রে চেনা যেতো। সেদিনের সেই-সব ব্রাহ্ম বা খৃষ্টীয় স্টাইলের শিক্ষিকারা, অধ্যাপিকারা বা 'লেডি ডাক্তার'রা আজ বিরল

আজকাল যখন ভারতে যাই, কলকাতা আর তার চারপাশের মেয়েদের মধ্যে পরিবর্তনের অনেক চিহ্নই দেখতে পাই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, গত কুড়ি বছরে ঐ অঞ্চলের মেয়েদের স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস এবং স্বনির্ভরতা যে বেড়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শ্রেণীভেদে আত্মমর্যাদাবোধের কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়। কর্মরত মেয়েদের কিছু কিছু হাবভাব বাইরে থেকে এলে বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। যেমন স্টেট ব্যাংক বা পোস্ট অফিসের মেয়ে কর্মচারীরা, যাঁরা কাউন্টাবে বসেন, তাঁরা অত্যন্ত বিরস বদনে, গোমড়া মুখ ক'রে কাজ করেন, যেন দুনিয়াসুদ্ধ লোক তাঁদের কাছে অপরাধী। এটা তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের মধ্যেও কমবেশী লক্ষণীয়, কিন্তু ব্যবহারের নীরসতাটা মেয়েদের মধ্যে দেখা গেলে আমরা বোধ হয় আরেকটু নোটিস করি সেটা। কাউন্টারের ওদিকের পুরুষদের সঙ্গে দু'-চারটা কথা ব'লে যদি বা তাঁদের মন ভেজানো যায়, তাঁদের আননের কঠিন রেখাগুলিকে কিছুটা মোলায়েম ক'রে ফেলা যায়, হয়তো

খানিকটা হাসিও বার ক'রে আনা যায়, মহিলাদের অপ্রসন্ন গাম্ভীর্যকে টলানো কিন্তু অনেক বেশী শক্ত। পাশ্চাত্য দেশে আমরা যে-'সার্ভিস উইথ আ স্মাইল' প্রত্যাশা করি, বাইরে থেকে এলে সেই জিনিসটার অভাব খুবই চোখে লাগে। এখানে একটা 'ক্লাস ফ্যাক্টর' কাজ করছে। পাশ্চাত্য দেশে যে-সব মেয়েরা কাউন্টারে ব'সে কাজ করেন তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশী; তাই তাঁদের হাসতে অসুবিধে নেই। কিন্তু তুলনীয় কাজে রত বাঙালী মেয়েরা নিজেদের স্টেটাস সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিত নন। তাঁরা মুখের কাঠিন্যকে আঁকড়ে থাকেন, যেন হেসে দিলে পাবলিকের চোখে তাঁরা 'সস্তা মেয়ে' হয়ে যেতে পারেন। যে-সব মেয়েদের তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্টেটাস নিয়ে মনের মধ্যে কোনো সংকোচ নেই, তাঁদের হাসতেও কোনো মানা নেই। যে-দুজন সাংবাদিক মেয়ে সম্প্রতি আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাস্যময়তার কোনো ঘাটতি দেখলাম না। বা দমদম বিমানবন্দরে যে-মেয়েটি আমার চেকিং-ইন করলেন তাঁর মুখ থেকেও একটু হাসি বার ক'রে নিতে তেমন অসুবিধে হলো না। যে-সব মেয়েরা একেবারে মেহনতী লাইনে, তাঁদেরও স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বেশী, তাই তাঁদের সঙ্গেও হাসিঠাট্টা করা চলে। মুশকিল মাঝের দলের নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়েদের নিয়ে, যাঁরা বেশী রক্ষণশীল, যাঁরা ঘরে বাইরে হ্যাপা পোয়ান অথচ চারপাশের লোকদের কাছ থেকে মর্যাদার তেমন নির্ভর পান না।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কাছে যা সব থেকে আনন্দদায়ক ও আশাপ্রদ তা হলো শ্রমজীবী মেয়েদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উপার্জনক্ষমতা ও তজ্জনিত আত্মবিশ্বাস। কলকাতা শহরে যাঁরা এ বাড়ি ও বাড়ি খেটে রুজিরোজগার করেন, তাঁদের মধ্যে এই ধরণের সদর্থক পরিবর্তন খুবই চোখে পড়ে। টেলিভিশনের কল্যাণে তাঁদের চেতনার মধ্যে নানা নূতন ধারণা এবং তাঁদের মুখে বিদেশী শব্দসমেত নূতন ভাষা প্রবেশ করেছে। তাঁদের মধ্যে সাক্ষরতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং সন্তানদের স্কুলে পাঠানো সম্বন্ধে আগ্রহও বেড়েছে। আমার পরিচিত শান্তিনিকেতনবাসী এক বন্ধুদম্পতি বলেন, কাঁথা স্টিচের কাজ ক'রে শান্তিনিকেতনের চার পাশের গ্রামের মুসলমান মেয়েরা স্বাবলম্বিতায় এগিয়ে গেছেন, নিজেদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে ফেলেছেন। আনন্দ লাগে যখন দেখি সেই মেয়েরা সকালে উঠে অন্যের বাড়ি বাসন মাজতে না বেরিয়ে বরং সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজ বুঝে নিতে এসেছেন।

কিন্তু অবাক হই এটা দেখে, স্বাধীনতালাভের অর্ধশতাব্দী পরেও গণতান্ত্রিক সরকার আবশ্যিক স্কুলশিক্ষার দেশজোড়া দৃঢ় নেটওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজনীয় মনে করলেন না। শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা—দুইই দৃষ্টিকটু রকমের শ্রেণীবিভাজিত স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে। এক-এক শ্রেণীর জন্য এক-একরকমেব ব্যবস্থা। শিক্ষা বা চিকিৎসা নিয়ে মধ্যবিত্তদের মধ্যে কোনো কথা উঠলে তাঁরা বারে বারে ঘুরে ফিরে তাঁদের

নিজেদের শ্রেণীর জন্য যে-ব্যবস্থাটা প্রাপণীয় কেবল তার ত্রুটিবিচ্যুতির কথাই আলোচনা করতে থাকেন। অন্যদের প্রসঙ্গ তাঁরা উত্থাপনও করেন না। অথচ কেবল সর্বসাধারণের জন্য লভ্য ব্যবস্থাই একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশের প্রকৃত উন্নতির ভিত্তি হতে পারে। দেশব্যাপী নারীসমাজের প্রকৃত জাগরণের জন্য চাই ১০০% দেশব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি বালিকাই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, সমাজের কোনো অংশই শিক্ষার জাল থেকে বাদ পড়ছে না। নারীকল্যাণের জন্য এবং সমগ্র দেশের আধুনিকীকরণের জন্য সেটাই ন্যূনতম শর্ত। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে এ বিষয়ে চেতনার, সক্রিয়তার এবং দায়বদ্ধতার অভাব, তার বদলে নিজেদের ভাগ্যমন্ত সন্তানদের পরীক্ষা পাশ ও উত্তরোত্তর ঐহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য শেষহীন অবসেশন আমার কাছে অশ্লীল ঠেকে।

তৃতীয় দুনিয়ার নাগরিক জীবনের নির্মম প্রতিযোগিতা, যেখানে একে অন্যের গায়ে ধাক্কাধাক্কি ক'রে সুযোগসুবিধা কেড়ে নিতে হয়, প্রশ্রয় দেয় এক ক্ষান্তিহীন স্বার্থান্বেষণকে। সেই ধান্দায় শহরের মেয়েদের ব্যবহারের শ্রী ও সৌজন্য অনেকটা ক্ষ'য়ে গেছে সন্দেহ নেই। কিছু দিন আগে 'শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস'-নামক ট্রেনে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে যেতে হয়েছিলো। আমার ভগ্নী ব'লে দিয়েছিলেন, 'ট্রেনের লেজেই লেডিজ় কম্পার্টমেন্টটা পেয়ে যাবি, সেখানেই উঠে পড়িস।' একদল মহিলা উক্ত কামরাটিকে যেভাবে আক্রমণ করলেন, যেভাবে একদল ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ক'রে প্রতিটি আসন দখল ক'রে নিলেন, তা দেখে আমি হতবাক্ হয়ে গেলাম! এ হেন নারীবাহিনী আমি আমার বাল্যে কৈশোরে যৌবনে কদাপি দেখি নি। ভিডিও ক'রে নিয়ে ডকুমেন্টারি হিসেবে দেখালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা তাজ্জব ব'নে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারলেন না! বলা বাহুল্য আমি সে-কামরায় উঠতে পারি নি।

আধুনিক সমাজের অনিবার্য পরিবর্তনের গতিবেগে নারীজীবনের ফোকস্ জন্মদান ও সন্তানপালন থেকে স'রে গিয়ে কর্মজীবন এবং আপন স্বাতন্ত্র্য গ'ড়ে তোলার দিকে যত নিবদ্ধ হচ্ছে, সমাজের নানা অংশে পারিবারিক জীবনে তত অদলবদল আসছে। এটা অবশ্যম্ভাবী। এবং এটা কেবলই মেয়েদের ব্যাপার নয়, মেয়েপুরুষের সম্পর্কের পরিবর্তনশীল ডাইনামিক্সের ব্যাপার। অপিচ বলা দরকার, দেশবিভাগের পঞ্চাশ বছর পরে পুরুষরা কিভাবে এবং কতটা বদলেছেন, মেয়েদের চোখে সেই-সব পরিবর্তন কেমন দেখায়, সেটাও সমান কৌতূহলজনক এবং অন্বীক্ষার যোগ্য বিষয়।

[*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ক্রোড়পত্র, বৈশাখ ১৪০৪ (এপ্রিল ১৯৯৭)।]

গর্ভনিরোধ : একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা

নারীমুক্তি বলতে আজকের দিনে আমরা যা-ই বুঝি না কেন, সেই জিনিসটি একান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক গর্ভনিরোধপ্রযুক্তির ভিত্তিভূমির উপর। নারী তার গর্ভধারণের ক্ষমতাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপন সিদ্ধান্ত দ্বারা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারছে, ততক্ষণ সে অন্যান্য প্রাণীদের মতো প্রকৃতির প্রজননচক্রান্তে বন্দী, মানবিক অর্থে মুক্ত হয়ে ওঠে নি। নারী অথবা পুরুষ যে-কোনো ব্যক্তি যৌন সংসর্গকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ক'রে আপন উর্বরতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। এই উপায়টিকে গান্ধী তাঁর নৈতিক সমর্থন প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বোধ করি পৃথিবীর কোনো সমাজেই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক পদ্ধতিরূপে গৃহীত হবে না। এটি যারা অবলম্বন করবেন তাঁরা সব সমাজেই ঊনজন হবেন। ক্ষুৎপিপাসার মতো যৌনতা মানুষের একটি মৌল প্রবৃত্তি। অধিকাংশ মানুষই জন্মনিয়ন্ত্রণের এমন কোনো পথ খুঁজবেন, যা মানুষের সেই প্রবল প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিতে পেরেছে।

বিগত কয়েক বছর ধ'রে আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীবিষয়ক গবেষণাসংস্থা 'সেন্টার ফর ক্রস্-কাল্চারাল রিসার্চ অন উইমেন'-এর সদস্য। সেই সূত্রে ১৯৯৬-এর ১২-১৪ সেপ্টেম্বরে উত্তর ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টক্‌টন-অন-টীজ্ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দেবার সুযোগ পাই, যার বিষয়বস্তু ছিলো গর্ভনিরোধ। কনফারেন্সের ব্যবস্থাপক ছিলেন ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অ্যাণ্ড্রু রাসেল ও এলিসা সোবো, এবং আহ্বায়কবৃন্দ ছিলেন ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত দুটি ইউনিট, আমাদের গবেষণাসংস্থাটি, এবং নর্দার্ন প্রাইমারি কেয়ার রিসার্চ নেটওয়ার্ক। আহ্বায়কদের মধ্যে আমাদের সংস্থাটিও ছিলো ব'লেই ওখানে যাবার সুযোগ আমার হাতে আসে।

নৃবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ছিলেন চিকিৎসাজগৎ ও ডাক্তারী গবেষণাজগতের প্রতিনিধিরা। বিলেতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা এসেছিলেন আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে অবস্থিত নানা প্রতিষ্ঠান থেকে। এঁরা এঁদের জ্ঞান, বিশেষজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এনেছিলেন পৃথিবীর আরও অনেকগুলি দেশের মাত্রা। আন্তর্জাতিকতার পাশাপাশি মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্ক্ষিত সহাবস্থান এই আলোচনাসভাকে দেয় এক চমৎকার বৌদ্ধিক ব্যাপ্তি তথা গভীরতা, এক চঞ্চল প্রবাহ,

যে-স্বাদটি আমি বিশেষভাবেই উপভোগ করি। কেবল একই গণ্ডীর এবং চর্চার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকলে মানুষ যে কী-আন্দাজ কূপমণ্ডূক হয়ে পড়ে, অপরপক্ষে বিভিন্ন দেশের ও বিদ্যার মানুষদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার পথ সুগম হলে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আহরণের গতিবেগ যে কতটা বেড়ে যায়, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য নূতন নূতন দরজা যে কিভাবে খুলে যেতে থাকে—সে-সবই হৃদয়ঙ্গম করা যায় এমন ধরণের একটি সম্মেলনে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হতে পারলে। এই সম্মেলনে আলোচনার যে-ধারাগুলি আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা ঔৎসুক্য-উদ্রেককর ব'লে মনে হয়েছে, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। আমার নিজের কিছু ভাবনাও যোগ করছি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সকলেই জানেন, রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষের 'কৃত্রিম'-গর্ভনিরোধ-বিরোধিতা ক্যাথলিক-ধর্মাবলম্বী গরীব দেশগুলির পরিবার-পরিকল্পনায় কী-আন্দাজ সমস্যা সৃষ্টি করে। শুনেছি স্বাধীনতাপরবর্তী কালে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্যাথলিক-ধর্মাবলম্বিনী ছিলেন ব'লে পরিবারপরিকল্পনার উদ্যোগ অনেক বছর পিছিয়ে ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ, 'প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে' যে-গর্ভরোধ, তাতে চার্চের আপত্তি নেই। গান্ধী ভেবেছিলেন পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা। ক্যাথলিক চার্চ মানুষের ইহলৌকিক প্রবণতা সম্বন্ধে সচেতনতর হয়ে, আরেকটু বাস্তবপন্থী হয়ে 'নিরাপদ সময়ে' যৌন সংসর্গের পরামর্শ দেন—যে-সময়ে মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নিঃসৃত হচ্ছে না। সেই 'নিরাপদ সময়' খুঁজতে গিয়ে অবশ্য প্রচুর মেয়ের পেটে বাচ্চা এসে যায়। একবার বাচ্চা পেটে এসে গেলে আবার ক্যাথলিকরা গর্ভনাশের বিরোধী। এইভাবে একটা দুষ্টচক্র তৈরি হয়ে যায়।

নিরাপদ-সময়-অন্বেষীদের জন্য একটি ভালো খবর একটি নূতন প্রযুক্তি, যার দ্বারা মেয়েরা যে-যার 'বিপজ্জনক' ও 'নিরাপদ' সময়কে ব্যবহারিকভাবে সুনির্দিষ্ট করতে পারবেন। 'ইউরিন্ টেস্ট স্টিক' ও হস্তধৃত ইলেকট্রনিক মনিটর-সহ এই প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে বিলেতের এক্সিটর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন স্টাডিজে। এই উদ্যোগের পিছনে ওয়ার্ল্ড হেল্থ্ অর্গানাইজেশনের মদত বিদ্যমান। আপনার সরবরাহ-করা তথ্য-অনুযায়ী মনিটর আপনাকে 'বিপজ্জনক' সময়ে লাল ও 'নিরাপদ' সময়ে সবুজ আলোর সংকেত দেবে; যন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করার দায়িত্বটুকু আপনাকে নিতে হবে। প্রয়োজনমতো কতগুলি দিন ভোরে উঠে স্টিক-সহযোগে 'ইউরিন স্যাম্প্ল্' নিয়ে সে-নমুনা যন্ত্রকে দিতে হবে, তদনুসারে আপনার হর্মোনের মাপজোক ক'রে যন্ত্র আপনাকে সংকেত দেবে। এই প্রযুক্তিকে বিপুলসংখ্যক নারী স্বাগত করবেন সন্দেহ নেই, কেননা এটা মেয়েদের শারীরিক কোনো প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে না, শরীরের মধ্যে কোনো বড়ি অথবা গ্যাজেট ঢোকায় না। তবে একে

ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারিণীর একটা ন্যূনতম শিক্ষাগত ভিত্তি চাই। স্যাম্প্‌ল্‌ নেওয়া, যন্ত্রকে সে-খবর দেওয়া, তার জবাবে যন্ত্রেব কাছ থেকে ফীডব্যাক পাওয়া— এ-সবই শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। তা ছাড়া যন্ত্রটার জন্য একটা প্রাথমিক খরচও আছে। সে আপনি নিজে কিনুন বা কোনো হেল্‌থ্‌ সার্ভিস মারফৎ পান, খরচটা কাউকে না কাউকে প্রথমে বহন করতে হবে। বর্তমান সময়ে এর জন্য খরচ ত্রিশ পাউণ্ডের মতো। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মেয়েরাই এই প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকবেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের ক্যাথলিক মেয়েরা এই প্রযুক্তি গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন ব'লে মনে হয়। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ বা লাতিন আমেরিকার মধ্যবিত্ত মেয়েরাও আগ্রহী হবেন। গরীব ক্যাথলিক দেশের মেহনতী মেয়েদের মধ্যে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচার হয়তো এই মুহূর্তেই প্রত্যাশা করা যায় না, তবে এর একটা ভবিষ্যৎ আছে। এই পদ্ধতি ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের শর্ত পূরণ করে। স্বয়ং পোপ বা মাদার টেরেসাও এর সমালোচনা করতে পারবেন না। অতএব ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ্‌ অর্গানাইজেশনের ধাক্কাধাক্কিতে কোনো-কোনো গরীব ক্যাথলিক দেশের সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ যদি এই প্রযুক্তির জন্য কমবেশী অর্থনিয়োগ করতে সম্মত হয়ে যায়, তবে সেই-সব দেশে এই পদ্ধতি হঠাৎ গ্রহণীয় হয়ে উঠতেও পারে। আশা এই যে সুপরিকল্পিত রাজনীতি বিঘ্ন সৃষ্টি না করলে ভবিষ্যতে কোনো-একদিন সর্বত্রই মেয়েদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটবে। শিক্ষা ও আর্থিক স্বাবলম্বিতা থেকে তাঁরা চিরকাল বঞ্চিত থাকবেন না। সেই সুদিনে 'প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগী' (অর্থাৎ কিনা যা কার্যতঃ প্রযুক্তির সঙ্গে সহযোগী) সেইরকম নির্ভরযোগ্য গর্ভনিরোধপদ্ধতি সমাজের সর্বস্তরেই সুস্বাগত হয়ে উঠবে, কেবলই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে নয়। আপাততঃ এই মুহূর্তে আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে এর প্রসার প্রত্যাশা করতে পারি।

গরীব মেয়েদেব জন্য পরিকল্পনাকারীরা পছন্দ করেন এমন কোনো প্রযুক্তি যা সেই-সব মেয়েদের সক্রিয় সহযোগিতার উপরে ততটা নির্ভর করে না, যা 'উপর থেকে' তাঁদের হাতে নামিয়ে দেওয়া যায় (কেউ কেউ যাকে বলবেন 'চাপিয়ে দেওয়া')— কোনো-একটা গর্ভনিরোধক গ্যাজেট বা হর্মোন ইনজেকশন, যা একবার দিয়ে দেওয়া হলে অনেকদিন কাজ দেবে, যার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে পুনরাবৃত্ত ক্লিনিকাল ফলো-আপ লাগবে না, যা প্রশিক্ষিত মেডিকাল কর্মীদের তত্ত্বাবধানে সযত্ন মনিটরিং দাবি করবে না। এইটে অবশ্য দুরাশা, অথবা বলা উচিত, এক অলীক প্রত্যাশা। এই-সব গ্যাজেট বা ইনজেক্‌শন থেকে কারও কারও কিছু-কিছু সাইড-এফেক্ট হবেই, এবং ব্যবহারকারিণীরা দরিদ্র বা নিরক্ষর হলেও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন এবং প্রতিকার দাবি করবেন। তার সঙ্গে উপযুক্ত মেডিকাল পদ্ধতিতে মোকাবিলা করতে না পারলে গোটা উদ্যোগেরই বদনাম হয়ে যাবে, যেমন (যতদূব জানি) ভারতে হয়েছিলো জরায়ুন্যস্ত আই-ইউ-ডি-র

(IUD), তার প্রথম প্রচলনের সময়ে, এবং সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে বদনাম হয়েছে নর্‌প্লান্ট (Norplant) ইম্‌প্লান্টের। অনেক পরিকল্পনাকারীর দৃষ্টিতে নর্‌প্লান্ট এক আদর্শ প্রযুক্তি। একজন প্রশিক্ষিত মেডিকাল কর্মী, ডাক্তার বা নার্স, একটি মেয়ের বাহুর ত্বকের নীচে ইম্‌প্লান্ট বসিয়ে দেবেন, তার পর পাঁচ বছর কোনো ঝামেলা নেই—গরীব মেয়েদের পক্ষে আদর্শ ব্যবস্থা। কিন্তু সেটা তত্ত্ব। কার্যতঃ দেখা গেছে এক ভিন্ন চিত্র। হয়তো যিনি ইম্‌প্লান্ট বসিয়েছেন তিনি যথেষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন না, ফলে পরে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। বা কারও কারও এমন সাইড-এফেক্ট হয়েছে—মাথা ঘুরেছে, যন্ত্রণা হয়েছে, দৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে ইত্যাদি—যে তাঁরা ক্লিনিকে এসে কান্নাকাটি করেছেন, ওটা বার ক'রে দেওয়া হোক। পাঁচ বছর বাদে তো বটেই, ব্যবহারকারিণীর কোনো শারীরিক কষ্ট হলে তার আগেই—তাঁরা চাইলেই—ইম্‌প্লান্ট সরিয়ে দিতে হবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু কার্যতঃ এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেছে। কিছু কিছু মেয়ে নাকি ইম্‌প্লান্ট রিমুভাল চেয়ে পান নি। তাঁদের নাকি রূঢ় কথাও শুনতে হয়েছে। বি-বি-সি টেলিভিশন এই বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন, যাতে মেয়েদের প্রতিবাদ করতে দেখা যায় এবং প্রতিবাদে রীতিমতো মুখর হতে দেখা যায় নারীকল্যাণকর্মী মহিলাদের। ছবিটি আমার আগেই দেখা ছিলো। এই দলিলচিত্রটিকে ঘিরে কনফারেন্সে উত্তপ্ত তর্কের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ দাবি করেন যে বাংলাদেশে নর্‌প্লান্ট উদ্যোগের মার্কিন ব্যবস্থাপকরা দরিদ্র দেশের মেয়েদের উপর সুবিধাবাদী ডাক্তারী পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিছু মার্কিন প্রতিনিধি এই অবস্থানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং তাঁদের তরফ থেকে অন্যান্য তথ্য আমাদের কাছে পেশ করেন। তাঁদের প্রদত্ত তথ্যাবলী অনুসারে নর্‌প্লান্টের প্রসার WHO-সংস্থার অনুমোদন লাভ করে ১৯৮৪ সালে। বাংলাদেশে নর্‌প্লান্টের ট্রায়াল আরম্ভ হয় ১৯৮৫ সালে। তার আগে দু' দশক ধ'রে ঐ প্রযুক্তির নিরাপত্তা ও কর্মক্ষমতার 'প্রাক্‌-ক্লিনিকাল' পরীক্ষা চলেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ডেনমার্কে, সুইডেনে এবং ফিনল্যাণ্ডে। শেষ দুটি দেশে তা পূর্ণ অনুমোদন এবং লাইসেন্স পেয়েও গেছিলো। মার্কিন দেশে অনুমোদন মেলে ১৯৯০ সালে। এই তথ্যাবলীর মুখোমুখি নিছক সুবিধাবাদী পরীক্ষানিরীক্ষার অভিযোগ বজায় রাখা যায় না। তবে বাংলাদেশে কিছু বিশৃঙ্খলা যে ঘটেছিলো তা-ও অনস্বীকার্য। ইম্‌প্লান্ট বসানো এবং বার করা দুটো কাজই যে-আন্দাজ প্রশিক্ষিত স্টাফ দাবি করে তার যথেষ্ট যোগান ছিলো না। তা ছাড়া স্থানীয় কর্মীরা কখনও কখনও অবজ্ঞাভরে নিরক্ষর মহিলাদের বক্তব্য শুনতে চান নি, ইম্‌প্লান্ট বের ক'রে দেবার অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছেন, উল্টে তাঁদের গালাগালও দিয়েছেন। প্রযুক্তির জটিলতার সঙ্গে সার্ভিস স্টাফের প্রশিক্ষণ যদি না মেলে, তবে গ্রাহকদের নঞর্থক অভিজ্ঞতা হবেই।

আবার অন্য আলোচনা থেকে এটাও বোঝা গেলো, গর্ভনিরোধগত কোনো

উদ্যোগের অসফলতা কেবলই ঐ ধরণের অসমান ব্যবস্থার জাতক নয়। বিলেতে প্রশিক্ষিত স্টাফের অভাব নেই, কিন্তু পরিবারপরিকল্পনার কাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত এক মহিলা ডাক্তার বললেন, কখনও কখনও বিঘ্ন সৃষ্টি করে আধুনিক গণমাধ্যমগুলির উত্তেজনাপন্থী সংবাদপরিবেশন-নীতি। সেই উৎপাতের ফলে ডাক্তারদের ন্যায্য কাজ ব্যাহত হয়। হয়তো অত্যধিক পাবলিসিটির ফলে মেয়েরা ঝুঁকে পড়েন বাজারে ছাড়া হয়েছে এমন কোনো নতুন প্রোডাক্টের দিকে, যার যোগান ডাক্তাররা দিতে পারেন না, অথবা তাব উল্টো দিকে ভ্রান্ত প্রচারের ফলে কোনো সম্ভাবনাময় প্রযুক্তির দিক থেকে মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে নেন, তার ক্লিনিকাল মনিটরিং অকস্মাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় বা অসময়ে স্থগিত রাখতে হয়। এও এক মেডিকাল সমস্যা। আর্জেন্টিনা থেকে আগত এক প্রতিনিধি বললেন, সেই দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চল থেকে রাজধানীতে আসা গরীব চাষী আর আদিবাসী মেয়েরা হাসপাতালের ডাক্তারদের উপর তেমন আস্থা রাখেন না, অতএব সেই-সব মেয়েদের ক্ষেত্রে শহরের ডাক্তারী দক্ষতা ফেলা যায়, কাজে লাগে না—সাংস্কৃতিক কারণে। একাধিক প্রতিনিধির বক্তব্য থেকে বোঝা গেলো, আফ্রিকার নানা অঞ্চলেই আধুনিক ডাক্তারদের উপর ভরসার অভাব গর্ভনিরোধক উদ্যোগের বৃহৎ অন্তরায়। এ ছাড়া ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং স্বামীদের শাসনও কেনিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে আধুনিক গর্ভনিরোধক প্রযুক্তির পথে বিপুল বাধা রচনা করে।

যে-কোনো দেশেই গর্ভনিরোধক উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে হলে কেবল প্রযুক্তি আর প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী এগিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, দৃষ্টি দেওয়া দরকার সমাজের সমগ্র সাংস্কৃতিক চালচিত্রের দিকে, বৃহৎ সমাজ যে-ছোট-ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত তাদের প্রত্যেকটির ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের কাঠামোর দিকে। গর্ভনিরোধের প্রয়োজনীয়তা উঠছে মানুষের যৌন প্রয়োজনের উৎস থেকে, আর সেই এলাকাটা অসংখ্য টাবু, মিথ, ভ্রান্ত ধারণা, আধখানা জ্ঞান, ভিত্তিহীন বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অমীমাংসিত অন্তর্বিরোধের জলাভূমি। গর্ভনিরোধের প্রয়োজনেব সঙ্গে বর্তমানে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে এইড্‌স্-নিরোধের জরুরৎ। প্রায় সর্বত্রই এ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা ভাসা-ভাসা, অর্ধসত্যে গঠিত। সেই যথার্থ ধারণার অভাবের জন্য মেয়েদের দিতে হয় চড়া দাম, কেননা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের দুঃসহ পরিণাম মেয়েদের ঘাড়ে ভয়ংকরভাবেই এসে পড়ে,—সর্বত্রই শিশুদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আখেরে মেয়েদের,—তা ছাড়া এইড্‌স্-সংক্রামিত জননীব পক্ষে সংক্রামিত সন্তানের জন্ম দেওয়ার সমধিক সম্ভাবনা থাকে।

সন্তান সৃষ্টি করতে যদিও জনক এবং জননী দুইই লাগে, তবু এক আশ্চর্য কূটাভাসে বৃহৎসংখ্যক মানুষ গর্ভনিরোধকে মেয়েদেব দায়িত্ব হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত,

এমন কি গর্ভনিরোধ বিষয়বস্তুটাই মেয়েলী ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, যেন নারীদেহে গর্ভসঞ্চারে পুরুষদের ভূমিকা নেই। এমন কি, এই কনফারেন্সেও পুরুষ প্রতিনিধি বেশী আসেন নি, মেয়েরাই বেশী এসেছিলেন, যদিও এ লাইনে ডাক্তারী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পুরুষদের কোনো অভাব নেই।

বিভিন্ন দেশের প্রত্যক্ষদর্শী বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের প্রতিবেদন থেকে এক উদ্বেগজনক চালচিত্র ফুটে উঠতে থাকে। মেক্সিকোর এক সমাজবিজ্ঞানী প্রতিনিধি বললেন, তাঁর দেশে কেবল শ্রমজীবী মেয়েদের মধ্যে নয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও যৌনতা ও এইড্‌স্ বিষয়ে জ্ঞান খুবই কম, উল্টোপাল্টা ধারণাই অত্যধিক, অপর পক্ষে পুরুষদের মধ্যে 'machismo' অর্থাৎ 'মর্দানি'র আদর্শ দৃঢ়প্রোথিত। এই দুইয়ের মিশ্রণে নারীপুরুষের বিভিন্ন বিশ্বাসধারার এমন এক বিচিত্র কক্‌টেল তৈরি হয়ে ওঠে যা বিপজ্জনক, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। নিজেদের স্বাস্থ্যকে মেয়েরা মোটেই যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেন না। তাঁদের উদ্বেগ, পরিশ্রম, আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃহদংশ আন্দোলিত হয় পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে ঘিরে ; পুরুষদের ধ'রে রাখা, খুশী রাখা—এগুলোই তাঁদের উৎকণ্ঠা ও উদ্যমের মুখ্য ফোকস্। প্রসঙ্গতঃ একটি মজার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এক সন্ধ্যায় ডিনারে আমি দৈবাৎ এই মহিলাটির কাছাকাছি বসেছিলাম। তাঁকে বললাম, 'আপনাদের দেশের বিখ্যাত কবি অক্তাভিও পাস্-এর সঙ্গে বুয়েনোস আইরেসে আমার আলাপ হয়েছিলো।' তিনি ব'লে উঠলেন, 'বিখ্যাত কবি ! বাদ দিন ! হোন তিনি বিখ্যাত, কিন্তু তিনি নারীবিদ্বেষী !'

মেক্সিকো থেকে আগত আরেক মহিলা প্রতিনিধি, পেশায় ডাক্তার, একটি ডকুমেন্টারি দেখালেন, যার বিষয়বস্তু দূরাঞ্চলের কৃষকরমণীদের মধ্যে লাইগেশন অপারেশন চালু করার একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা। ছবিটি দেখে মনে হলো, সত্তরের দশকের ভারতের কাছ থেকে এঁরা হয়তো কিছু শিখেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এভাবে ভ্যাসেক্টমির জন্য চেষ্টা করা হয়েছিলো কি?' তিনি বললেন, 'আহ্বান জানানো হয়েছিলো, কিন্তু অপারেশন করানোর জন্য এগিয়ে এলেন মোটে দুজন পুরুষ। দুজনের উপরে অস্ত্রোপচারকে গণ-ভ্যাসেক্টমি বলা যায় না !' কেন এই উৎসাহের অভাব ? তার জবাব পরিষ্কার। 'ভ্যাসেক্টমি অপারেশন মেক্সিকোর পুরুষদের আত্মপ্রতিমার সঙ্গে খাপ খায় না।'

উত্তর নাইজেরিয়ার একটি শহরে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন এমন এক সমাজবিজ্ঞানী জানালেন, ইসলামী ঐতিহ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের মধ্যে আধুনিক গর্ভনিরোধক প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার একটা প্রবণতা রয়েছে। তাঁরা এই প্রযুক্তি সম্পর্কে নানা ভয় পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা, এই প্রযুক্তি বিপজ্জনক, এর দ্বারা তাঁদের জরায়ুর ক্ষতি হবে, হয়তো তাঁরা বন্ধ্যা হয়ে যাবেন, হয়তো তাঁদের

বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মাবে। তা ছাড়া তাঁদের প্ররোচিত করা হয় এই প্রযুক্তিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ হিসেবে দেখতে, এবং উৎসাহ দেওয়া হয় শাস্ত্রবচনের মধ্য থেকে গর্ভনিরোধের উপযুক্ত পদ্ধতিকে উদ্ধার ক'রে নিতে। ইসলামী শিক্ষায় সমর্থন জানানো হয় একটি পদ্ধতিকে : রেতঃপাতের পূর্বে পুরুষকর্তৃক নারীদেহ থেকে নির্গমন, 'তবে নারীটি যদি নিছক দাসী না হয়ে বিবাহিতা পত্নী হন তা হলে এই ক্রিয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া বিধেয়'। জনৈক ধর্মশিক্ষকের মতে, জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্ত্রীসহবাসবর্জন ঈশ্বরের অনুমোদিত নয় (গান্ধীর বিপরীত কোণে অবস্থিত অভিমত), কেননা দম্পতিকে সন্তান দেওয়া বা না দেওয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত, কিন্তু রেতঃপাতের পূর্বমুহূর্তে পত্নীর শরীরাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে রেতঃপাত চলতে পারে—তাতে দোষ নেই, তা শাস্ত্রসম্মত। (পুরুষের আপন সুখের জন্য ব্যবস্থাটি লক্ষণীয়ভাবে পরিপাটি। এই ন্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিটি পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মঞ্জুলিকার বাবার সেই বিখ্যাত উক্তিতে : 'কিন্তু গৃহধর্ম/ স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়/ মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।') নাইজেরিয়ার সেই একই শহরে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-পাওয়া মেয়েরা শাস্ত্রকে বিচার করতে আরম্ভ করেছেন অন্যভাবে ; তাঁরা বলেন, 'যে-সব উপায় সেকালে ছিলো না তাদের উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে কী ক'রে থাকবে ?'

'টাবু' শব্দটি এসেছে পৃথিবীর যে-অঞ্চল থেকে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে অবস্থিত সেই টংগা রাজ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন ডার্‌হাম বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্র। যৌন বিষয়ে টাবুতে ভর্তি সেই সমাজে একদিকে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা, আবার অন্যদিকে সম্প্রতি প্রবেশ করেছে এইড্‌স্। ঐ সমাজে গর্ভনিরোধক প্রযুক্তিকে, বিশেষতঃ বড়ি ও কণ্ডমকে, কিভাবে বাজারে ছাড়া যায়, জনসাধারণগ্রাহ্য করা যায়, কিভাবে চলতে পারে তাদের প্রচার-বিজ্ঞাপন-বিতরণ, সেই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই যুবক। তাঁদের কাজের লক্ষ্য ছিলো স্থানীয় সংস্কৃতির ভাবনার বুনটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সংবেদনশীল পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন।

গর্ভনিরোধের ব্যাপারে অধিকাংশ সমাজে পুরুষদের যে-অনীহা দৃশ্যমান, তার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের খবর দিলেন ডার্‌হাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নৃবিদ, যিনি পশ্চিম অ্যামাজ়নিয়ার আইরো-পাই 'ইণ্ডিয়ান'দের মধ্যে ফীল্ডওয়ার্ক করেছেন। তিনি জানালেন, সেই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে 'সুন্দর বা উত্তম জীবন' যাপনের আঙ্গিক, তাঁদের সামাজিক জীবনচর্যার কেন্দ্রে অবস্থিত। সন্তানদের জন্মের মধ্যে সময়গত ব্যবধান রাখা তাঁরা কর্তব্য ব'লে মনে করেন—কেবলই সন্তানদের দেহগত পালনের সুবিধার জন্যে নয়, তাদের নৈতিক

লালনের সৌকর্যের জন্যেও। স্ত্রীপুরুষ উভয় দলই জন্মনিয়ন্ত্রণে তৎপর, এবং সে-উদ্দেশ্যে ওষধির ব্যবহার থেকে আরম্ভ ক'রে ওঝার সহায়তা নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের নানা কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকেন।

গ্রীসে ফীল্ডওয়ার্ক করেছেন এমন এক নৃবিদ আলোকপাত করলেন সেই সমাজের কিছু বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। সরকারী পরিবার-পরিকল্পনা যে-ধরণের যুক্তিবাদী দৃষ্টি ব্যবহার করতে আগ্রহী তা বাধা পায় গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। গ্রীক সমাজে ভ্রূণনাশের হার খুব উঁচু। কেন এমন অবস্থা? কেউ কেউ মনে করেন, গ্রীক সমাজে মাতৃত্ব যেহেতু অতীব সম্মানজনক, তাই পূর্বচিন্তিত পরিকল্পিত গর্ভনিরোধের চাইতে পেটে বাচ্চা এসে গেলে গর্ভনাশ করাই হয়তো কারও কারও কাছে কাম্যতর ব'লে প্রতিভাত হয়। এতে ক'রে পরিবারও ছোট রাখা যায়, আবার একই সঙ্গে জানান দেওয়া যায়, 'আমি অনুর্বর নই'। কেউ কেউ বলেন, এই ধরণের মেয়েরা ইচ্ছে ক'রেই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি-নির্ভর গর্ভনিরোধকে প্রতিহত করছেন। কিন্তু রিসার্চ করলে, মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বোঝা যায়, ঠিক তা নয়, এই মেয়েরা প্রজননকে দেখেন মুখ্যতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে বা প্রাকৃতিক ঘটনারূপে। গ্রীক দৃষ্টি অনুযায়ী মানুষের যৌনতা তাদের 'খ্যাপামি'র দিক, তা কোনো যুক্তি মানে না, তাকে খুব বেশী নিয়ন্ত্রণাধীন করা অসম্ভব। আগে থাকতে নাকি অত ভাবা যায় না। বাচ্চা যখন পেটে আসবে তখন ব্যবস্থা করা যাবে। অ্যাবর্শন সেই 'ব্যবস্থা'। গ্রীক ডাক্তাররা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মদত দেন, কেননা তাতে ক'রে 'খাতা-বহির্ভূত' অতিরিক্ত আয় করা যায়। কিন্তু ডাক্তারী ব্যবস্থা উচ্চমানের হলেও অ্যাবর্শনে অল্প একটু স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তো থাকেই। অবাক লাগে এ কথা জেনে যে কোনো-কোনো শিক্ষিত মেয়ে আগে থাকতে নিরাপদ গর্ভনিরোধ অবলম্বন না ক'রে বরং গর্ভনাশের ঝুঁকিটুকুকে মেনে নিতে রাজি, এবং নিজশরীরে আহিত প্রাণের বিনাশসাধনকে স্বীকার করতেও প্রস্তুত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে ভ্রূণনাশ যেখানে জনপ্রিয় এমন আরও দুটি সমাজের কথা আমরা শুনলাম। দুটি উদাহরণই সাংস্কৃতিক-কূটাভাস-বিজড়িত। একটি দেশ জাপান। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিত একজন জাপানী মহিলা নৃবিদ জাপান সম্বন্ধে যে-পেপারটি পড়লেন তার শিরোনামই আমাদের অনেক কিছু বলতে চায়: 'In Accordance with Nature: The impossibility of Family Planning in Japan'। নারীদেহের স্বধর্ম বলতে কী বোঝায় সে-সম্পর্কে জাপানী মেয়েদের স্বতন্ত্র ধারণা বর্তমান। সেই ধর্মে হস্তক্ষেপ করে এমন কোনো প্রযুক্তি তাঁদের পছন্দ নয়। এই কারণে বড়িসমেত যে-কোনো হর্মোনভিত্তিক গর্ভনিরোধপদ্ধতি তথা আই-ইউ-ডি এবং লাইগেশন তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক এবং অগ্রহণীয়। তাঁরা গর্ভনিরোধক বড়িকে

আইনসম্মত করার বিরোধী। তাঁরা পছন্দ করেন 'নিরাপদ' সময়ের অন্বেষণ, প্রয়োজনে কণ্ডম, স্ত্রীশরীরের বাইরে এসে রেতঃপাত, বাচ্চা পেটে এসে গেলে অ্যাবর্শন। তাঁদের ঐ নিরাপদ সময়ের অন্বেষণ প্রায়ই অসফল হয়, কেননা তাঁদের ফোকস্ পড়ে ভুল জায়গায়—ডিম্বনিঃসরণের যথাযথ লগ্ন নির্ণয়ের বদলে ঋতুকালভিত্তিক সহজ গণনাপদ্ধতির উপরে। ডিম্বনিঃসরণের সময়টিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সনাক্ত করার (এবং এড়িয়ে যাবার) চেষ্টা না ক'রে তাঁরা 'পরবর্তী ঋতুকালের বারো দিন আগেকার' দিনটি কবে হতে পারে সেটার সাদামাঠা গণনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এক্সিটর বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত ডিম্বনিঃসরণ-মনিটরটি তাঁদের কাছে গ্রাহ্য হবে কি ? যা লক্ষ্য করবার মতো তা এই : নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে জাপানের মেয়েদের 'বিশেষ ধারণা' থাকা সত্ত্বেও, যেহেতু সেই ঐতিহ্যিক ধারণাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে তাঁদের তেমন আগ্রহ নেই, তাই এই সমাজের ভিতর থেকে সেরকম কোনো রিসার্চ বেরোলো না, যা থেকে ঐ জাতের মনিটর তৈরি হতে পারতো। জাপানীরা প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর, ইলেক্ট্রনিক্সে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সেই কুশলতাকে একটা সমাজ কিভাবে কাজে লাগাবে তা নির্ভর করছে তার সংস্কৃতির নিজস্ব মানচিত্রের উপর। নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা থাকা সত্ত্বেও নারীদেহ-নামক যন্ত্রটা ঠিক কিভাবে কাজ করে, সেই প্রক্রিয়া বুঝে নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায় কিনা, সেই-সমস্ত বিষয়ে এঁদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জ্ব'লে ওঠে নি। নৃবিদ ব্যাখ্যা করলেন, নিজদেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমার আমিত্বের যে-ধারণা দরকার তা নাকি জাপানী মেয়েদের মধ্যে এখনও ভালো ক'রে গ'ড়ে ওঠে নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় : জাপানী সমাজের পিতৃতান্ত্রিক ধাঁচ তো সুবিদিত, সে-ক্ষেত্রে নিদেনপক্ষে নারীর উপর কর্তৃত্ব করার জন্য, অর্থাৎ নারীদেহের হালচাল সম্পূর্ণ বুঝে নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মতলব নিয়ে জাপানী পুরুষরাই বা গর্ভনিরোধক গবেষণায় এগিয়ে আসেন নি কেন ? নিশ্চয়ই তাঁদের ধ্যানধারণার সঙ্গেও এই নিষ্ক্রিয়তার কোনো গূঢ় যোগ রয়েছে? মেয়েদের তথাকথিত স্বধর্মে প্রথমে হস্তক্ষেপ না ক'রে তার পর দরকার হলে তাঁদেরকে অ্যাবর্শনের দ্বারস্থ করানোর মধ্যেই কি প্রযুক্তিনিপুণ জাপানী পুরুষরা প্রভুত্বের স্বাদ খুঁজে পান ?

প্রসঙ্গতঃ খেয়াল করা যেতে পারে, একটা দেশে কোনো নতুন প্রযুক্তি যেখান থেকেই আসুক না কেন, দেশের ভিতরে গ'ড়ে-ওঠা হোক অথবা বাইরে থেকে আমদানি করা হোক, সেটার ব্যবহার বা বিশেষিত নিয়োগ নির্ভর করবে সেই সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবসেশনের উপর। অ্যাম্‌নিওসেন্টেসিস্ উদ্ভাবিত হয়েছিলো গর্ভস্থ ভ্রূণের কোনো নিহিত ত্রুটি আছে কিনা তা নির্ণয় করতে। কিন্তু ভারতীয়রা তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগালেন স্ত্রীভ্রূণদের সনাক্ত ক'রে নিয়ে সুস্থ হলেও তাদের খতম করতে। তাই সংস্কৃতির বিশেষত্বকে বাদ দিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বোঝা যায় না।

গর্ভনিরোধের উপায় হিসেবে ভ্রূণনাশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় রাশিয়াতেও, জানালেন মস্কো থেকে আগত প্রতিনিধি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নূতন সামাজিক অবস্থার চাপে সোভিয়েট-উত্তর আধুনিক রাশিয়ায় মানুষের প্রজনন- ও গর্ভনিরোধ-সংক্রান্ত আচরণ চাঞ্চল্য দ্বারা চিহ্নিত। রাশিয়ার সমাজে যৌন স্বাধীনতা আগেকার চাইতে অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। মেয়েরা আগেকার চাইতে দেরিতে মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। গর্ভনিরোধের ব্যাপারে প্রাপণীয় বিকল্পের সংখ্যা বেড়েছে, এবং মেয়েরা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে খবরাখবর রাখেন। বড়ি তেমন জনপ্রিয় নয়। অবিশ্বাস্য হলেও এ কথা সত্য যে রাশিয়ার মতো দেশে গর্ভনিরোধক বড়ি এখনও উৎপাদিত হয় না। সে-জিনিস তাঁরা ইয়োরোপীয় কন্টিনেন্ট থেকে আমদানি করেন। রাশিয়াতে উৎপাদিত কণ্ডম চাহিদার ৬০% সরবরাহ করতে পারে, বাকিটা বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমান রাশিয়াতে সর্বাধিক জনপ্রিয় গর্ভনিরোধপ্রযুক্তি হচ্ছে আই-ইউ-ডি। এ জিনিস দেশের ভিতরে তৈরি হয়, কিন্তু তার মান উঁচু নয়। বিভিন্ন পদ্ধতির অসফলতার হারও উঁচু। ফলে ভ্রূণনাশের হারও উঁচু। 'রাশিয়ার সমাজ এখনও মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক,' জানালেন এই মহিলা। 'কেন্দ্রীয় নীতিগুলোর প্রবণতা হচ্ছে পুরুষদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে। সুচিন্তিত গর্ভনিরোধের পরিবর্তে মেয়েদের দিকে অ্যাবর্শন বা স্টেরিলাইজেশন এগিয়ে দেওয়া সহজতর। রাশিয়ার মানুষ ডাক্তারদের উপর খুব ভরসা রাখেন, কিন্তু আমাদের ডাক্তাররা ইয়োরোপীয় ডাক্তারদের থেকে এক দশক পিছিয়ে আছেন। মানুষের যৌনতাকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে কিভাবে গর্ভনিরোধের ব্যবস্থা করা যায়, লোকজনকে কী পদ্ধতিতে পরামর্শ দেওয়া উচিত, কিভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা উচিত—এ-সব বিষয়ে আমাদের ডাক্তারদের যথাযোগ্য ট্রেনিং দেওয়া হয় না। এদিকে অর্থডক্স চার্চ ও অ্যাবর্শনবিরোধী লবিগুলির দাপটও বেড়ে গেছে। এঁরা টেলিভিশনে নিজেদের মত প্রচার করার সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে আমরা এক বিরাট রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি।'

অপর এক প্রতিনিধির কাছ থেকে খবর পাওয়া গেলো উজবেকিস্তানের। এই অঞ্চলেও অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে অনেক অদলবদল ঘটেছে। ১৯৯১ সাল থেকে সরকারী নীতির ঝোঁক পড়েছে 'সুস্থ প্রজন্ম' গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর। 'প্রজননগত স্বাস্থ্য'কে রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের অন্তর্গত হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে 'পরিবারপরিকল্পনা'র ধারণাকে। এর কারণ 'পরিকল্পনা' বললে নাকি মনে হয় উপর থেকে কোনো ব্যবস্থা যেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং 'পরিবারপরিকল্পনা' ডেকে আনে ১৯৮৮ সালে আরব্ধ সোভিয়েট নীতিকে, যার মধ্যে উজবেকরা দেখতে পেয়েছিলেন এক বিশেষ উদ্যোগ—রুশদের জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা। ঐ উদ্যোগের

পাশাপাশি পুরোনো সেই আদর্শও স্পষ্ট ক'রে বর্জিত হয় নি, যে-আদর্শ অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়নের মেয়েরা গৌরবান্বিত হতেন শ্রমিকদের এবং সৈনিকদের জন্মদাত্রীরূপে—পাঁচটির বেশী সন্তানের জন্ম দিলে 'ছোট মাপের নায়িকা' এবং দশ বা ততোধিক সন্তানের জন্মদানের পর 'বড় মাপের নায়িকা' ব'লে গণ্য হতেন। ভিন্নমুখী ঐ দুই প্রবণতার অস্বস্তিকর সহাবস্থানের পর নতুন উজ়বেক রাষ্ট্র তাঁদের নীতিকে চালিত করতে চাইছেন নতুন পথে, যদিও এবারেও ঝোঁকটা পড়েছে কর্তব্যের ধারণার উপর। গর্ভধারণের কর্তব্যের বদলে তুলে ধরা হচ্ছে গর্ভনিরোধের কর্তব্যের আদর্শ—'সুস্থ প্রজন্ম' গঠনের লক্ষ্যে। এই আদর্শে গর্ভনিরোধ নাগরিকদের স্বেচ্ছানির্বাচনজাত ক্রিয়া নয়, তাঁদের নাগরিক কর্তব্য। একই সঙ্গে ইসলামী প্রভাবের নবজাগরণের ফলে গর্ভনিরোধের প্রসঙ্গে যৌন আচরণের আলোচনাকে এড়িয়ে যাওয়াও একটি নূতন প্রবণতারূপে দেখা দিয়েছে। এই জটিলতার ফলে স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা পড়েছেন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে—নতুন প্রযুক্তিগুলির সুযোগসুবিধা কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে নাগরিকদের কিভাবে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, তা নির্ণয় করা তাঁদের পক্ষে সহজ হচ্ছে না।

টাবু জিনিসটা যে কেবল কিছু 'গোঁড়া' বা 'সেকেলে' সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং নানা রূপে নানা সমাজে—আধুনিকতাচিহ্নিত সমাজেও—বর্তমান, তা খুবই স্পষ্ট হলো এই আলোচনাসভায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঋতুস্রাব সম্পর্কে আধুনিক স্কটল্যাণ্ডের মেয়েদের মধ্যেও কিছু কিছু টাবু-ধারণা বর্তমান, দেখালেন একজন। টাবু-ধারণা-সমেত এ বিষয়ে মেয়েদের বিভিন্ন দৃঢ়মূল বিশ্বাসগুলিকে গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে হিসেবের মধ্যে নেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে—যেহেতু হর্মোনশাসিত একাধিক গর্ভনিরোধপদ্ধতির গ্রহণীয়তা অনেকাংশে নির্ভর করে তজ্জনিত রক্তপাতের প্যাটার্নের উপর। গর্ভনিরোধক বড়ি সেবন করলে প্রতি মাসে যে-রক্তপাত হয় তা প্রকৃত ডাক্তারী বিচারে 'স্বাভাবিক ঋতুস্রাব' নয়, হর্মোনশাসিত সংক্ষিপ্ততর 'withdrawal bleeding'। কিন্তু মেয়েরা সেটাকে স্বাভাবিক ঋতুস্রাব হিসেবেই দেখতে চান, কোনো তফাৎ করতে চান না, কেননা সারা পৃথিবীতেই মেয়েদের কাছে নিয়মিত ঋতুস্রাব হচ্ছে তাঁদের নারীত্বের অভিজ্ঞান, সে-অভিজ্ঞতা ঝঞ্ঝাটের হলেও। তাই মেয়েদের কাছে হর্মোননির্ভর গর্ভনিরোধপদ্ধতিকে গ্রহণীয় ক'রে তুলতে হলে এই তথ্যটাকে হিসেবের বাইরে রাখলে চলবে না।

অবাঞ্ছিত গর্ভ ও গর্ভনাশের প্রেক্ষাপটটি যে আধুনিক বৃটেনের মতো সমাজেও কতদূর জটিল ও অন্তর্বিরোধচিহ্নিত হতে পারে তারই ছবি ফুটে উঠলো একটি ঔৎসুক্যজনক পেপারে। এই সমাজে যৌন সম্পর্ককে এবং স্বতঃস্ফূর্তিকে মূল্য দেওয়া হয়, আবার একই সঙ্গে বলা হয় যে দায়িত্বশীল হতে হবে, গর্ভনিরোধ ব্যবহার

করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা হয় না, নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসাম্যের ফলে স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্পর্ক প্রায়শঃ অসাম্যচিহ্নিত। অসম সম্পর্ক দায়িত্বশীল গর্ভনিরোধকে উৎসাহ দেয় না। পরস্পরবিরোধী সংকেতের মুখোমুখি মেয়েরা বরং ঝুঁকি নেন, গর্ভনিরোধ ব্যবহার করেন না। অনেক মেয়েই তাঁদের প্রেমিকদের কাছে হিসেবী, অ-স্বতঃস্ফূর্ত মনোবৃত্তির নারীরূপে প্রতীয়মান হতে নারাজ। তাঁরা প্যাশনের মুহূর্তে কণ্ডমের কথা তুলতে চান না, দেখাতে চান যে প্রেমিকদের উপর তাঁদের আস্থা আছে, বিশ্বাস সমর্পিত আছে। তাঁরা মনে করেন, প্রেমিকদের কাছে দয়িতা নারী হবার এইটিই উপায়, পুরুষদের 'ধ'রে রাখা'র এইটিই পথ। দরকার হলে পুরুষরা নিশ্চয়ই তাঁদের 'দেখে রাখবেন', পিতৃত্বের দায়িত্ব নেবেন। বিশেষজ্ঞ বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে: ইংরেজী সাহিত্যের নজির মেনে এই মনোবৃত্তির নাম দেওয়া যায় 'Tess of the D'Urbervilles syndrome'। বিলেতে এর দাপট এখনও প্রবল, যার অনিবার্য পরিণাম অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও তজ্জনিত সামাজিক সমস্যা।

অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের মুখোমুখি এই মেয়েদের দুটি ভিন্ন জিনিসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। তাঁরা একদিকে দেখতে পান সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত মাতৃত্বের উচ্চবন্দিত আদর্শকে। এই আদর্শ অনুযায়ী শিশুর জন্য জনকজননী উভয়েরই স্নেহে অভিষিক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ পারিবারিক নীড় রচনা করা মেয়েদের কর্তব্য। কিন্তু রূঢ় বাস্তবে এই আদর্শ অনুসরণ করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। নীড়রচনায় প্রায়শঃ প্রেমিকদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না, অগত্যা প্রাণধারণের তাগিদে বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকরি না করলে মেয়েদের চলে না, এবং সে-ক্ষেত্রে শিশুকেই বা দেখে রাখবে কে? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এই দেশে ক্রেশের ব্যবস্থা কোনোদিন গ'ড়ে ওঠে নি, এবং কেবল উচ্চবিত্ত মহিলারাই 'ন্যানি'র খরচ সামলাতে সমর্থ। শ্রমজীবী মেয়েদের বেতন থেকে বাচ্চা দেখে রাখার সাহায্যকারিণীকে মাইনে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এই ধরণের পরিস্থিতিতে মেহনতী ঘরের তরুণীদের কাছে অ্যাবর্শন দেখা দেয় একমাত্র পথরূপে, যার বিকল্প নেই।

অথচ ভ্রূণনাশ সমাজের চোখে একটি খারাপ কাজ, অন্যায় কাজ। যাঁরা বাধ্য হয়ে এ পথে যান তাঁরা অপরাধবোধ এবং লজ্জাবোধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন না। ফলে অবাঞ্ছিত গর্ভের মুখোমুখি মেয়েদের কোনোভাবেই জয়ী হবার চান্স নেই। সমাজ তাঁদের সে-সুযোগ দেয় না। যদি তাঁরা অ্যাবর্শনের পথে যান, তা হলে সমালোচনাভাজন হন। যদি 'একলা চলো' মাতৃত্বের দায় মেনে নেন, তা হলেও সমালোচনা থেকে রেহাই পান না। কার্যতঃ এই তথাকথিত আধুনিক ও প্রাগ্রসর দেশেও, এবং বিশ শতকের শেষেও, মেয়েরা নারীজন্মের ক্রুশ বহন ক'রে চলেছেন।

মেয়েদের অভিজ্ঞতার এই ধরণের মৌল দিক নিয়ে আরও আলোচনা শুনতে

পেলে ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও লাভবতী হতাম, কিন্তু তার জন্যে অন্যান্য চর্চার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি লাগতো। এই কনফারেন্সের প্রধান দুটি মাত্রা ছিলো নৃবিদ্যাগত ও চিকিৎসাবিদ্যাগত। সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ক্লিনিকাল অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন তাই সর্বাধিক জায়গা জুড়েছে। তবে আগেই যেমন বলেছি, গর্ভনিরোধের প্রয়োজনীয়তা উঠছে মানুষের যৌন প্রয়োজনের জলাভূমি থেকে—যেখানে 'দুজনে মুখোমুখি'। 'প্রজননগত স্বাস্থ্য', 'সুস্থ প্রজন্ম' গঠন করার দায়িত্ব, সুস্থ সুখী ছোট পরিবার গঠনের দায়িত্বে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—এ-সমস্তই নিঃসন্দেহে আলোচ্য বিষয়টার অপরিহার্য মাত্রা। তবু আধুনিক সমাজে গর্ভনিরোধের আলোচনা করতে গেলে আমাদের নামতে হয় আরও গভীরে—স্ত্রীপুরুষের দ্রুতপরিবর্তনশীল সম্পর্কের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের কিছু ভাবনা সূত্রাকারে পেশ করা যেতে পারে।

নবনারীসাম্যের দিকে আমরা যত এগোচ্ছি, স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্পর্কের তাৎপর্যও তত রূপান্তরিত হচ্ছে। এককালে যা ছিলো মোটের উপর আদিম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায়, আধুনিক কালে তার চেহারার উপর পড়েছে আরও নানাবিধ প্রলেপ। এখানে ঘটনাদের একটা চক্রাকার গতি আছে: দুটি ঘটনা পরস্পরকে পুষ্ট করছে। আগেই বলেছি, আধুনিক নারীমুক্তি দাঁড়িয়ে আছে গর্ভনিরোধপ্রযুক্তির ভিত্তির উপর। আবার সেই মুক্তির পরিণামসূত্রে গর্ভনিরোধের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে। 'আধুনিক' মানুষ কোনো দেশেই আজ অধিক সন্তান চাইছেন না। যৌন সম্পর্ক তাঁদের কাছে মূলতঃ 'পুত্রার্থে' নয়, মূলতঃ রমণার্থেই, যার উপরে ক্রমাগত গ'ড়ে উঠছে সাংস্কৃতিক নির্মাণের এক বিশাল সৌধ। আজকের নাগরিক সভ্যতায় মানুষ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন, অপরের থেকে বিশ্লিষ্ট, নানা চাপে পিষ্ট সংগ্রামী একা—এক-একজন এক-একটি অণু। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আধুনিক মানুষ সন্দিহান। বিশাল বিশ্বে সেও আরেকরকমের একাকিত্ব। কিন্তু কিছু সুগভীর অন্তরঙ্গতার স্বাদ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী বুভুক্ষু একাকিত্বের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা মানুষের পক্ষে অবশ্যই জরুরী। হয়তো তাই একদিকে আমরা দেখছি 'a sense of belonging'-এর অন্বেষণে গোষ্ঠীবদ্ধ আত্মপরিচয়দানের নবজাগরণ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির উত্থান, অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি যে 'a sense of intimacy'-র সন্ধানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যৌন নৈকট্য ও বিনিময়কে ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরছে হাতের কাছে প্রাপণীয় একমাত্র নির্ভররূপে। হয়তো এই বিবর্তন প্রজাতি হিসেবে আমাদের সামগ্রিক বিবর্তনের অন্তর্গত একটি 'adaptive behaviour', যেখানে একটি আদিম, প্রবল, আমাদের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত প্রবৃত্তি নতুন ক'রে অভিযোজিত হচ্ছে, নতুন ক'রে নির্দেশিত হচ্ছে আমাদের টিঁকে থাকারই লক্ষ্যে। প্রাথমিক গর্ভাধান

এখন কাচপাত্রেও হতে পারে। আর যৌন সম্পর্ককে আজ বিচিত্রিত ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। সে কেবল প্রজননের স্তরে ব'সে নেই, হয়ে উঠছে দুটি মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতার আঙ্গিক, বেঁচে থাকার আঙ্গিক, 'অর্থহীন' অস্তিত্বকে অর্থমণ্ডিত ও মূল্যান্বিত করার অন্যতম আঙ্গিক— যার মাত্রা নিছক দেহগত নয়, গভীরতম অর্থে আত্মিকও বটে। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে অধিকাংশ যৌন মিলন সন্তানলাভের জন্যে নয়, পরস্পরের কাছে আসারই জন্যে। এই প্রেক্ষাপটে অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার এড়ানোর গুরুত্ব চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলেছে। গর্ভনিরোধ আজ কেবল 'রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ্‌'-এর একটি ইশ্যু নয়, মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের জন্যেই একটি দরকারী খিলান।

দুঃখের বিষয়, এই কনফারেন্সে ভারত ও চীন থেকে কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। অবশ্য ভারত সম্পর্কে তথ্যাদি মোটের উপব দুর্লভ নয়, কিন্তু চীন থেকে নির্ভরযোগ্য খবর আমাদের কাছে কমই পৌঁছয়। চীন সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন না পেয়ে আমি খানিকটা নিরাশ হয়েছি। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, একটি ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতা না পেলে উত্তর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনে আমি অংশগ্রহণ করতে পারতাম না। আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী শার্লি আর্ডনার ও বর্তমান নেত্রী ডঃ হেলেন ক্যালাওয়ে দুজনেই আলোচ্য সভায় অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসাংস্কৃতিক মাত্রার দাবি মেনে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহের কারণে ঐ সভায় আমার উপস্থিতিকে তাঁরা মনোনীত করেছিলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন। নয়তো আমার যাওয়া হতো না। সেই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের কাছে আমি ঋণী। পরিশেষে জানাই, এই কনফারেন্স থেকে প্রবন্ধসংগ্রহ জড়ো হয়ে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা আছে। সে-ক্ষেত্রে সে-বই আমাদের অক্সফোর্ডের গবেষণাসংস্থার চলতি সিরিজ় 'ক্রস্‌-কাল্‌চারাল পার্সপেক্টিভ্‌স্‌ অন উইমেন'-এর অন্তর্গত হয়ে বার্গ প্রকাশভবন থেকে বেরোবে। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, এই সিরিজ়ে একটি বই আছে (*Bilingual Women: Anthropological Approaches to Second-Language Use*), আমি যার সহসম্পাদিকা।

টীকা : কনফারেন্সের পেপারগুলি সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে : Andrew Russell, Elisa Sobo & Mary Thompson, *Contraception Across Cultures: Technologies, Choices, Constraints* (Berg, 2000)। অক্সফোর্ডের গবেষণাসংস্থাটি বর্তমানে সেখানকার ইন্টারন্যাশনাল জেণ্ডার স্টাডিজ় সেন্টারের অন্তর্ভূত ; আমি তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আর জড়িত নই। হেলেন ক্যালাওয়ে আর বেঁচে নেই।

[*জিজ্ঞাসা* ১৮ : ১, ১৪০৪ (১৯৯৭)। পরে *জিজ্ঞাসার দিগ্‌দিগন্ত*-এ সংকলিত।]

কবিতা-ভাবনা

সাহিত্যের নানা চারণভূমিতেই যদিও বিচরণ ক'রে থাকি, তবু আমার মন বলে যে আমি মূলতঃ কবি, সেটাই আমার প্রাথমিক এবং গভীরতম পরিচয়। আমার জীবনের কেন্দ্রে কার্যকর একজন কবির দৃষ্টি। জগৎটাকে আমি একজন কবির চোখ দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি। কবিতার সাহায্যে জগৎটাকে বুঝি, জীবনের জট ছাড়াই, নিজেকে (এবং জগৎকে) নির্মাণ করি। যখন গদ্য লিখি, বা গবেষণা করি, তখনও একরকমের সম্প্রসারিত কবিদৃষ্টি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার নিজস্ব আঙ্গিকে আমাকে ফোকস্ করতে শেখায়।

কবিতা পড়ছি এবং লিখছি এক্কেবারে কাঁচা বয়স থেকে, যখন নাকের উপরে চশমা আদৌ ওঠে নি, ছিটের ফ্রক প'রে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াই। মেহেরপুর নামে নদীয়া জেলার একটা ছোট্ট জায়গায় আমার কবিতা লেখার আরম্ভ ; জায়গাটা এখন বাংলাদেশে। বাবা সেখানে ছিলেন মহকুমা-প্রশাসক। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আকাশে মধ্যে মধ্যে শোনা যায় বিমানের গোঙানি। হাত দিয়ে রোদ আড়াল ক'রে ভয়ে ভয়ে মুখ উঁচু ক'রে আমরা তাকাই প্লেনগুলোর দিকে। কিন্তু কোনোদিন কোনো প্লেন 'বোমা'-নামক কোনো ভয়ংকর পদার্থ মেহেরপুরবাসী আমাদের মাথার ওপর ফেলে দিয়ে গর্জন করতে করতে পালিয়ে যায় নি। মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে তেতাল্লিশের মন্বন্তরের একটা আবছা স্মৃতি, চোখের সামনে কাউকে মরতে দেখি নি যদিও ; গাঁয়ের মানুষরা দলে দলে খাবারের আশায় শহরে চ'লে যায়। দিগন্তে দেখা যায় তাদের সারি। আমাদের চার দিকে ধানক্ষেত আর আলপথ, বাড়ির কাছেই ভৈরবী নামে একটা নদী, তার পাড়ে কাশবন। রাত্রে নদীর ধার থেকে শিয়ালেরা ফেউ ডাকে। বাঘও নাকি আসতো এককালে কুয়োতলায়। বাঘরা নাকি বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে মানুষের গন্ধ পায়, বারান্দায় উঠে এসে আমাদের শুঁকে শুঁকে যায়। তবে বোমাব মতো বাঘবাবাজীকেও চোখে দেখি নি কখনো। আমার ধারণা আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যই আমাদের শিবু-ঝি রাত্রে আমার কানের কাছে ঐ ভয়াবহ বাঘের গল্পগুলো বলতো। ফল হতো বিপরীত। ঘুম মারতো দৌড়। মশারির নীচে একটা বিরাট বিছানার প্রান্তে লেপের নীচে শুয়ে আমি শীতে আর ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতাম, অন্য এক প্রান্তে অঘোরে ঘুমোতো আমার পরের বোনটি।

ছোট বাংলোবাড়িটার পিছনের বারান্দা থেকে দেখা যেতো আমকাঁঠাল,

উঠোনে চরতো মুরগী, সবজির বাগানে ঝুলতো বেগুন আর কাঁচা লঙ্কা, আর সামনের বারান্দা থেকে দেখা যেতো মাঠ পেরিয়ে কাছারিবাড়িটা, বাবা যেখানে আপিস করতে যেতেন। দুটো বাড়ির মাঝামাঝি ছিলো একটা শিশুগাছ, রাত্রে সেখান থেকে ডাকতো পেঁচা। উঠোনে ঝাউগাছও ছিলো একটা। সন্ধ্যাবেলা ঝাউতলায় বেতের টেবিল পেতে চালানো হতো 'কলের গান', অর্থাৎ সেকালের গ্রামোফোন। যতদূর মনে পড়ে, খুব বড় বড় চাঁদ উঠতো সেকালে, আর রূপালী মেঘেদের মধ্যে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ানোর পরই আটকে যেতো ঝাউয়ের ডালে। সেই ঝাউয়ের ডালে আটকে-যাওয়া চাঁদগুলোর উদ্দেশে আমার মা রবীন্দ্রনাথের গান নিবেদন করতেন। ফালি-চাঁদও উঠতো মধ্যে মধ্যে। তখনও চোখ মায়পিক হয় নি: গোল হোক বা ফালিই হোক, চাঁদগুলোর দেহরেখা স্পষ্ট দেখতে পেতাম, আউটলাইনে কোনো অস্পষ্টতা আসে নি তখনও।

আবার শ্রাবণমাসে বৃষ্টিও পড়তো বেদম। ওদের সকলের সঙ্গে (চাঁদ, মেঘ, ঝাউগাছ, বৃষ্টি) আমার খুব ভাব ছিলো। তা ছাড়া বেশ ভাব ছিলো *শিশু* আর *কথা ও কাহিনী* নামের ছেঁড়াখোঁড়া দুটো বইয়ের সঙ্গে। আমার পড়াশোনার তদারক করতেন আমার মা। সব পড়াশোনা হতো বারান্দায় একটা চৌকিতে ব'সে। আমাদের বাড়িটার অনতিদূরে ছিলো মিশনারিদের একটা আখড়া। সেখানে হতো ধর্মসংগীত, আর সেখান থেকে এসেছিলেন এক মহিলা ডাক্তার আমার মায়ের প্রসবে মদত দিতে, যখন পরের বোনটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো।

আমার কবিজীবনের উৎসে হাতছানি দেয় এই জাদু-ল্যাণ্ডস্কেপ, একটা ব্যক্তিগত 'প্রাক্-পতন' ইডেন উদ্যানের মতো। তার পর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকাতা, অক্সফোর্ড, ভ্যানকুভর, কিডলিংটন, দুর্গাপুর, শান্তিনিকেতন ইত্যাদির চালচিত্র। প্রত্যেকটা প্রেক্ষাপটই আমার কবিতায় কিছু ছাপ রেখে গেছে। কিডলিংটন নামে অক্সফোর্ডের এক শহরতলিতে বাস করছি গত আটাশ বছর ধ'রে। ভারতীয় বিচারে এটাকে বলা চলে একটা মফস্বল শহর, স্থানীয় বিচারে এই জনপদ হচ্ছে 'পশ্চিম ইয়োরোপের বৃহত্তম গ্রাম'। আমার কাছে জায়গাটার বড় আকর্ষণ হলো চাষের ক্ষেত, মেঠো পথ, বুনো ফুল, বড় বড় গাছ, গেঁয়ো গির্জা, খালের ধার, সেখানে বাঁধা বোট— এই সমস্তর সান্নিধ্য। এদের মাধ্যমে আমি আমার প্রতন মেহেরপুরী ইডেন উদ্যানের সঙ্গে একটা সুড়ঙ্গপথ রক্ষা ক'রে চলি। আবার বাসে চ'ড়ে বসলেই আধ ঘণ্টার মধ্যে অক্সফোর্ড, পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগারদের মধ্যে কয়েকটি, বৃহত্তম বইয়ের দোকানগুলির মধ্যে একটি, থিয়েটার-মিউজিয়ম-গানবাজনা-অপেরা-ব্যালে ইত্যাদি নাগরিক বৈদগ্ধ্যের বিচিত্র আয়োজন লণ্ডনের মতো বিপুল আয়তনে না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপণীয়। বাংলাভাষার একজন লেখক হিসাবে এই পরিবেশ থেকেই আমাকে সুদূর একটা প্রকাশন-জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলতে হয়।

তাই গায়ে হাওয়াই ডাকের ছাপ আর বেশ ক'খানা টিকিট মেরে কয়েক হাজার মাইল দূরের অপরিচিত লিট্‌ল্ ম্যাগাজ়িন থেকে যখন আচমকা অনুরোধ আসে,—'পেতে চাই আপনার কবিতাভাবনা এবং তিনটি অপ্রকাশিত কবিতা,'—তখন মনের ভিতরকার একটা অন্তঃশীলা নদী হঠাৎ ছলাৎ ক'রে লাফিয়ে ব'লে ওঠে . আরে, তার মানে আমার কবিতা সম্বন্ধে ওরা কেয়ার করে? আমার এই খালের ধার, জংলী বাগান আর মেঠো পথগুলো থেকে যে-সব কবিতা জন্মায় তাদের কিছু মূল্য আছে তা হলে ওদের কাছে? *এবং মুশায়েরা* নামে একটি পত্রিকা—নাম শুনি নি আগে! সম্পাদকের নাম সুবল সামন্ত, তাঁকেও চিনি না। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অচেনা সম্পাদক যখন সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে লিখে পাঠান. 'কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যায় আপনাকে কবি হিসেবে আমরা পেতে চাই' (তাঁর মার্চ ১৯৯৭-এর চিঠি), তখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে তিনি আমাকে পৌঁছে দেন সেই অলৌকিক অভিজ্ঞান, যা প্রত্যেক কবিসত্তার কাছেই জরুরী, অভিবাসী আমার কাছে আরোই মূল্যান্বিত। কেননা, একাকী গায়কের নহে তো গান। এইরকম অনুরোধ উড়ে এলে বুঝতে পারি যে আমার আপন মনে গাওয়া 'গান' একেবারে ব্যর্থ হয় নি, কিছু তার অর্থ আছে অচেনা মুখের শ্রোতাদের কাছেও।

দুটি দুনিয়ার আমি বাসিন্দা—একটি 'বাপের বাড়ি'র, অন্যটি 'শ্বশুরবাড়ি'র। জীবনের পদযাত্রা যখন আরম্ভ করেছিলাম, তখন কি আর ভেবেছিলাম এমন এক স্থায়ী দ্বিত্ব দ্বারা আমার অস্তিত্ব চিহ্নিত হবে? ভাবি নি, কিন্তু সময়েব এক অ-স্থির সন্ধিক্ষণে জ'ন্মে, সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতিকেই নিজের উত্তরাধিকার ব'লে ভাবতে শিখে, সারা পৃথিবীকেই আমার স্বদেশ ব'লে চিনে নিয়ে অবশেষে পৌঁছলাম যাওয়া-আসার টানাপড়েনে বোনা এই ভাগ্যে। উপায় নেই, আমার বাঁচা তো আমাকেই বাঁচতে হবে, অন্য কেউ এসে বেঁচে দিয়ে যাবে না। একে আমি স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমার এই জটিল জীবনের জলাভূমি থেকেই রোদের ক্রিয়ায় বাষ্পের মতো উপরে ওঠে কবিতাগুলো। জীবনেব নানা জটিলতা সত্ত্বেও এক অর্থে আমি নিজেকে মনে করি ভাগ্যবতী, যখন মনে রাখি যে সাত সমুদ্র দ্বারা পৃথকীকৃত দুটি জগতের কবিতামহলে আমার কিছুটা গতায়াত আছে। এ কথা যদি সত্যি হয়—যে-কথাটা অনেকেই ব'লে থাকেন—যে একটা সংস্কৃতির লিট্‌ল্ ম্যাগাজ়িনের মধ্যে ধরা পড়ে তার কবিতার খাঁটি হৃৎস্পন্দন, তবে দুটি পৃথক্ কাল্‌চারের লিট্‌ল্ ম্যাগাজ়িনে দুটি আলাদা ভাষায় মৌলিক কবিতা প্রকাশ করতে পারা নিশ্চয়ই একটা বিশেষ জীবনাভিজ্ঞতা. একটা প্রিভিলেজ বা বিশেষাধিকার, জীবনে যা একটা বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। সুবল সামন্তর চিঠিখানা যখন পেলাম প্রায় সেইরকম সময়েই চিঠি পেয়েছি একজন ইংরেজ সম্পাদকের কাছ থেকেও। তাঁর নাম জেরেমি হিল্টন, থাকেন উর্স্টারশায়ারের ম্যালভার্ন শহরে, সেখান

থেকে সম্পাদনা করেন *Fire* নামে একটি কবিতাপত্রিকা, যার তৃতীয় সংখ্যা *Fire 3*-তে বেরিয়েছে আমার একটি ইংরেজী কবিতা, 'Mid-Winter Festival'। ঐ সংখ্যাটি পাঠিয়ে তিনি আমাকে লিখেছেন, যদি ভবিষ্যতে কবিতা ছাপাতে ইচ্ছুক হই তা হলে তাঁর পত্রিকাটিকে যেন মনে রাখি।[১] আমার জীবনের এই দিকটার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কখনও মনে হয় আমি যেন একটা জীবন্ত সেতু—দুটো কূল ছুঁয়ে আছি। এই অনুভবের একটা অনন্য স্বাদ আছে, আছে একটা বিরল আনন্দ—দূরত্বভঞ্জনের আনন্দ, দুটো ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে পারার আনন্দ।

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে আনন্দ ঝবে, মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়—আত্মীয়, স্বজন। (অরুণকুমার সরকার, 'রিখিয়ায়')

অবশ্য দূরত্বভঞ্জক জীবন্ত সেতু হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু যন্ত্রণাও আছে। কখনও এমন হয় যে এক কূল অন্য কূলের খবর শুনতে চায় না, রেগে বলে—উড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দাও যত নষ্টের গোড়া ঐ সাঁকোটাকে, ওর ভারী অহংকার হয়েছে। এই যন্ত্রণা বোধ করি বিশেষাধিকারের জন্য প্রদেয় মূল্য।

জানি আমি, পশ্চিমবঙ্গের লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন সংস্কৃতিকে নিয়ে কত গর্ব আপনাদের। তবে ভাববেন না যে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন কাল্‌চারটা কেবল আপনাদের ওখানেই বিকশিত। বিলেতের মাটিতেও ব্যাপকভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ছড়িয়ে আছে তার শিকড়বাকড়। পূর্বোক্ত সম্পাদক জেরেমি হিল্টন বিলেতের ঐ মফস্বল শহর ম্যালভার্ন থেকে তাঁর লিট্‌ল্-ম্যাগ-সমুচিত অহংকারকে প্রকাশ করেন এইভাবে:

FIRE is NOT concerned with what is currently fashionable in poetry nor with the best-known names, nor with the sort of 'safe' writing that many magazines seem to promote. ... I aim to publish primarily poetry which takes risks, which is unfashionable, which would not easily find a home elsewhere. Poems which are courageous and experimental not just in language and form, but also, perhaps more importantly, in subject matter, in emotional directness, in willingness to engage with the spiritual dimension. FIRE aims to publish both new poets and those already known who are working in different ways / against the mainstream. I believe that poetry which is genuinely experimental in the above ways can offer a new dimension to our lives.

বাংলা ক'রে নিলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক লিট্‌ল্ ম্যাগাজ়িনের বক্তব্যের সঙ্গে এই বক্তব্যের তেমন কোনো ফারাক থাকে না। কবিতা যেন এক ধরণের উদ্ভিদ, যাকে নানা দেশের প্রকৃতির বুকেই দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও তার স্বাস্থ্যটা বেশ ভালো—হৃষ্টপুষ্ট, ত্বক্ লাবণ্যময় ; কোথাও জলের অভাবে চেহারাটা একটু শুকনো, বা রোদের অভাবে পাতাগুলো হলদেটে হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া স্থানবিশেষে কিছু রকমফেরও আছে, কিন্তু প্রজাতিটা এক। মনোযোগ দিয়ে ফুলপাতার দিকে তাকালে বোঝা যায়, মোটের ওপর একই জাতের চারা। আর যাঁরা ভালোবেসে এর চাষবাস করেন, চারাটা তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে। কবিতাকে নিয়ে তাঁরা বাঁচেন, তার সাহায্যে জীবনের মানে করেন, বাঁচার অর্থ খুঁজে পান। কবিতা তাঁদের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার। আমার ধারণা কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ কবিদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বজায় রাখে। অন্যরা যে-অবস্থায় ভেঙে পড়েন, কবিরা সে-অবস্থায় কবিতা লিখে ফেলেন। এই নিয়তিরও কিছু আনুষঙ্গিক কষ্ট আছে, অসহায়তার কষ্ট। কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁদের যখন প্রবলভাবে নাড়া দেয়, কবিরা তখন কবিতা না লিখে পারেন না। কবিতার সেই দাবিদার আমন্ত্রণের কাছে তাঁরা অসহায়। আমন্ত্রণ না ব'লে আক্রমণও বলা যায় তাকে !

আপনারা জানেন, রবীন্দ্র-ওকাম্পো গবেষণার সূত্রে আমি আর্জেন্টিনা গিয়েছিলাম। সে-ও আমার জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা, এক বিশেষাধিকার। মিরাল্‌রিও নামে যে-বাড়িটাতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, যার দোতলার বারান্দা থেকে তিনি দেখতেন প্লাতা নদীর রূপালী জলে রঙের খেলা, সেই বাড়ির সেই বারান্দাতেই ব'সে প্লাতা নদীর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে একটা গোটা দুপুর কাটিয়ে দিতে পারা—এ অভিজ্ঞতা কখনো ভুলবার নয়। তারিখটা ছিলো ১৯ মে ১৯৮৫, দক্ষিণ গোলার্ধের একটি রৌদ্রপ্লাবিত হেমন্তদিন। রবীন্দ্রনাথ যখন ওখানে ছিলেন, তখন নদীটা ছিলো বাড়ির একেবারে কাছে। জল এখন স'রে গেছে বেশ খানিকটা, চর পড়েছে কিছুটা, কিন্তু একটু দূরে হলেও আজও সে এক গরীয়ান দৃশ্য। উজ্জ্বল সেই জলের বুকে ছিলো কিছু পালতোলা শখের নৌকো, দিগন্তে দৃশ্যমান উরুগুয়ের সৈকতের ক্ষীণ রেখা। অলিন্দ থেকে ঐ দৃশ্য দেখে তবেই না বুঝলাম, কেন ভিক্তোরিয়া বলেছিলেন, ঐ ছবিটাই ছিলো তাঁর পক্ষে কবিকে দেওয়ার মতো একমাত্র উপহার। অবশ্য তিনি একটু বিনয় করেছিলেন। কেবলই ঐ দৃশ্যটা নয়, অবশেষে তাঁব বন্ধুত্বও হয়ে উঠেছিলো কবির জীবনে এক মূল্যবান উপহার, যা তাঁর চৈতন্যে অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো কাজ করেছিলো। বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় নি, প্রেম আর প্রকৃতির যুগ্ম অনুপ্রেরণায় কবিতা দ্বারা কিভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ।

আমি বেচারীও আর্জেন্টিনা থেকে ফিরে আসার পর কবিতার আক্রমণের শিকার হয়ে লিখে ফেলেছিলাম কিছু কবিতা—ইংরেজীতে। যদিও কবিতাপাঠের

আসরে কয়েকটা পড়েছি, কোনোটিই আজও কোথাও ছাপতে দিই নি, কেননা ইচ্ছে আছে ওগুলোকে নিয়ে আবার বসি, আরও ঘষামাজা করি, একসঙ্গে তোড়ায় বেঁধে একগুচ্ছ কবিতা হিসাবে প্রকাশ করি তাদের। মধ্যে মধ্যে একটু ঘষামাজা করেছি, একটা কবিতা প্রায় নতুন ক'রে লিখেওছি, কিন্তু সেই ১৯৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একটা ফাইনাল রিভিশনের হেস্তনেস্তর জন্য সময়টুকু ক'রে উঠতে পারলাম না, অন্য কাজের চাপে এমনই বিড়ম্বিত আমি। কবিতাগুলো যে সম্ভাব্য পাঠকদেরকে আমার দেওয়া হলো না, সেটা ব্যথা হয়ে বাজতে থাকে।[২]

আমি যদিও সত্তরের দশক থেকেই দুটো ভাষাতে কবিতা লিখি, কার্যতঃ আজকাল ইংরেজী কবিতার খাতে সব থেকে কম সময় ব্যয় করতে পারি। বাংলা কবিতা লিখে এখানে কোনো ফীডব্যাক পাওয়া যায় না, কিন্তু সেগুলো অন্ততঃ লিখে ফেলে দেরাজবন্দী ক'রে রাখি, মনে এই আশা নিয়ে যে একদিন না একদিন তারা প্রকাশিত হবে। আমার শেষ প্রকাশিত বাংলা সংকলনটির পর দুটো কেন, প্রায় তিনটে নতুন সংকলনের মতো বাংলা কবিতা জমেছে। অনেক সময়ে ভাবি, হায়, আমার নব্বইয়ের দশকের এই উপচে-পড়া কবিতাগুলো কি একুশ শতকের আগে জড়ো হয়ে বেরোবে না?[৩] বাংলা কবিতার দাবির কাছে আমি সম্পূর্ণ অসহায়—একেবারে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া ও ব্যাপারে আমার একটা সচেতন দায়বদ্ধতাও আছে—একটা জীবননীতিগত কমিটমেন্টের মতো। ইংরেজীতে লেখার ব্যাপারটা সামান্য একটু আলাদা। যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করেছি তখন 'আক্রান্ত' হয়ে তোড়েই লিখেছি। আমার প্রথম ইংরেজী কবিতার বইটির মধ্যে সেই কবিতাগুলো আছে। তার পরের পর্বে আছে অক্সফোর্ডের কবিতা ওয়ার্কশপে যোগদানের ফসল। কিন্তু আজকাল অন্য কাজের তাড়নায় ইংরেজী লাইনের উঁকিঝুঁকিগুলোকে আমি প্রায়ই উপেক্ষা করি, মানে উপেক্ষা করতে বাধ্য হই। ইংরেজীতে লিখতে পারতাম এমন অনেক কবিতা ভ্রূণাবস্থাতেই মিস্ক্যারিড হয়ে অতলে তলিয়ে যায়, তাদের পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে জন্ম দেবার সময় পাই না। কিন্তু এ যাবৎ যা লিখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতেও বলা যায়, আমার বাংলা ইংরেজী দুই ভাষাতে লেখা কবিতাকেই হিসাবের মধ্যে না নিলে আমার পরিণত কবিব্যক্তিত্বের প্রোফাইল পাওয়া যায় না। জানি না সেরকম কোনো সামগ্রিক মূল্যায়ন কেউ কোনোদিন করবেন কিনা।

দুটো ভাষায় কবিতা লেখা দুটো বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো ব্যাপার। প্রথম যন্ত্রটা আশৈশব বাজাতে শিখে আত্মস্থ ক'রে 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' ক'রে ফেলার পর সেটা চেতনার অন্তঃস্থলে বাজতে থাকে একটা ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরে অর্গানের স্বরলহরীর মতো। ওখানে সারা জীবনের জন্য তার একটা জায়গা হয়ে যায়। একটু চর্চা রাখলে পরে জীবনই তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে। পরবর্তী কালে দ্বিতীয় যে-

যন্ত্রটা বাজাতে শেখা যায় তার চর্চার দিকে একটু বাড়তি মনোযোগ, একটু অতিরিক্ত সময় দিতে হয়। যেন সে 'পরকীয়' প্রেম, তাই আরেকটু উপচার দাবি করে, নয়তো তার গোসা হয়। আমি দিনের পর দিন একা থেকে বাংলায় কবিতা লিখে যেতে পারি, কিন্তু ইংরেজীতে নিয়মিতভাবে কবিতা লিখতে চাইলে অন্য যাঁরা সমানে ঐ ভাষাতেই কবিতা লিখছেন তাঁদের সঙ্গে আমাকে একটা যোগ রক্ষা করতে হয়, ইংরেজীতে নতুন কবিতা প'ড়ে যেতে হয়। কবিতা একটা বিশেষ ধরণের ভাষা, খবরের কাগজের, টেলিভিশনের, হাটবাজারের ভাষার থেকে আলাদা। সেই বিশেষ ভাষার টানটোন, তার নিজস্ব অ্যাক্সেন্ট ও সংগীতধর্মের সঙ্গে নিজের কানকে একটু যত্ন ক'রে 'টিউন্‌ড্‌' রাখার ব্যাপার এটা।

অন্য একটা তুলনা দিয়ে বলা যায়, কবিতা লেখা একরকমের অভিনয়। যখন বাংলায় লিখছি তখন আমার রোল্‌টা আর আমি একেবারে একাত্ম। ইংরেজীতে লিখতে চাইলে আরেকটু বেশী মহড়া লাগে, লাগে পেশীর সঞ্চালন, পায়ের নীচে মঞ্চের বোধ, দলের সবাইকার সঙ্গে থাকা, তাদের কাছ থেকে খানিকটা ফীডব্যাক পাওয়া— যে হ্যাঁ, ঠিকঠাক অ্যাক্টিং হচ্ছে। কবিতা-ওয়ার্কশপের সভ্য হওয়া এই মহড়ার দাবি মেটায়। এমনিতেও এই জিনিসটা এখানকার কাব্যচর্চার একটা অঙ্গ। কয়েকজন কবি নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে পরস্পরকে স্বরচিত কবিতা প'ড়ে শোনান, পরস্পরের কবিতার সমালোচনা করেন। এই পদ্ধতিতে তাঁদের নির্মাণকে, কবিতার কারুকর্মকে তাঁরা পরিশীলিত করেন। এই অনুশীলনের ফলে কবিতার বাক্‌শিল্পগত মান উঁচু তারে বাঁধা থাকে, শৈথিল্য বা গতানুগতিকতা প্রশ্রয় পায় না। এককালে অক্সফোর্ডের 'ওল্ড ফায়ার স্টেশন' পোয়েট্রি ওয়ার্কশপের সক্রিয় সভ্য ছিলাম। সপ্তাহে সপ্তাহে তার অধিবেশন হতো। দারুণ তার উত্তেজনা, তার মাদকতা; সংক্রামক সকলের উৎসাহ। তখন অনেক ইংরেজী কবিতা লিখেছি। তার পর দলটা ভেঙে গেলো। একেকজন চ'লে গেলেন একেকদিকে। আমিও আমার জীবনের অত্যন্ত দাবিদার রবীন্দ্রগবেষণাপর্বের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে গেলাম যে সেই জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি না কিছুতেই, পারি না সময় ক'রে উঠতে। কিন্তু সেই কবিতা-ওয়ার্কশপ করার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই আবার হঠাৎ একটা পদ্মদিঘির জলের মতো ভীষণভাবে কাজে লেগে গেলো যখন রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের আমন্ত্রণ পেলাম। ঐ 'অভিনয়' করার জন্য আগেকার ঐ 'মহড়া'র প্রয়োজন ছিলো বৈকি! বেশ কিছু দিন কোনো দলের সভ্য না থাকার পর সম্প্রতি আবার একটি কবিদের দলে যাতায়াত করছি। তাঁরাই টানাটানি ক'রে আমাকে সেখানে ঢুকিয়েছেন। কারণ তাঁদের ধারণা তাঁদের ঐ বাদ্যযন্ত্রটা আমি বেশ ভালোই বাজাই। উপরন্তু অন্য এক কাল্‌চারের স্বাদও এনে দিই। তাই অকৃত্রিম সহৃদয়তার সঙ্গে (খাঁটি জিনিসটা যখন পাওয়া যায় তখন

সেটা খাঁটি বটে) তাঁরা দাবি করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে থাকলে নাকি তাঁদেরই লাভ।

কবিতার অনুবাদের কথায় যখন এসে পড়েছি তখন ঐ বিষয়ে দু'-চার কথা ব'লে নেওয়া যাক। সাম্প্রতিক কালে শেক্সপীয়রের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ও তার ইংরেজী তর্জমার ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতার মিডিয়া-জগতে অকারণে জল ঘোলা করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আমাকে যে-নির্বুদ্ধি আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে তা জীবন্ত সেতু হওয়ার যন্ত্রণার অংশ। আমার কাছে সৃষ্টিশীল কাব্যানুবাদ কবিতারচনারই এক বিশেষ প্রকারের সম্প্রসারণ। বাংলায় এর শ্লাঘনীয় নজির রেখেছেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি অগ্রজ কবিরা। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এককালে আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি অ্যাংলোস্যাক্সন অর্থাৎ আদি-ইংরেজী কবিতা। কিছু নমুনা বেরোয় *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-য় এবং *হীনযান*-এ, তার পর একটি ছোট বইও বার করেছিলাম নাভানা থেকে, কিন্তু আমার অদৃষ্টবৈগুণ্যে প্রায় ঐরকম সময় থেকেই নাভানা বই বিক্রি করা ছেড়েই দিলেন একরকম। বইটার ঠিক ক'রে কোনো বিতরণই হলো না। পশ্চিমবঙ্গের বা পদ্মার ওপারের পাঠকরা দেখতেই পেলেন না তার চেহারা। পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তাঁদের মুগ্ধতাবোধের কথা অসংকোচে আমাকে জানিয়েছেন, কিন্তু পাঠকসাধারণের কাছে পৌঁছনোর জন্যই তো বই ছাপানো, শুধুই নিজস্ব বন্ধুচক্রের জন্য তো নয়। তাই আক্ষেপ থেকে যায়, যাঁদের জন্য বইটা তৈরি করেছিলাম তাঁদের হাতেই সেটা তুলে দিতে পারলাম না। কে জানে কোন্ গুদামে পচছে আমার আরও কয়েকটা টাইট্‌লের সঙ্গে *অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতা*-র সেই অবিক্রীত কপিগুলো। এও আমার জীবনের সেই জীবন্ত সেতু হওয়ার যন্ত্রণার অন্তর্গত।

বিলেতের কবিতাজগতে কবিতার সৃষ্টিশীল অনুবাদকরা একটি মর্যাদার আসনের অধিকারী। যাঁরা আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদের বইটি প্রকাশ করেছেন সেই প্রকাশভবনের ক্যাটালগটি যদি আপনাদের দেখাতে পারতাম তা হলে আপনারা কথাটার মর্ম বুঝতেন। ব্লাডঅ্যাক্স বুক্‌স্ বর্তমানে এখানকার সর্বাগ্রগণ্য কবিতাপ্রকাশক। মৌলিক কবিতা ছাড়াও এঁরা বার করেন উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদ, মৌলিক কবিতার তুল্য সম্মান দিয়ে। অধিকাংশ অনুবাদই বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে। মূল কবির সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদক কবিও সম্মান পেয়ে থাকেন। ক্যাটালগের নির্দেশিকায় বর্ণানুক্রম অনুযায়ী পৃথকভাবে উল্লিখিত হয় দুইজনারই নাম। কাব্যকলার এই মন-মাতানো আন্তর্জাতিক ভোজে আমাদের রবীন্দ্রনাথের নামটা যে আমি ঢোকাতে পেরেছি, তাঁর কবিতার একটি বড় মাপের থোককে যে মেনুর অন্তর্গত ক'রে দিতে পেরেছি, সেই ঘটনাকে আমি আমার কবিজীবনের একটি বিশেষ সৌভাগ্য, একটি বিশেষ আশীর্বাদ ব'লেই মনে করি। সেই সূত্রে অনুবাদক কবি হিসাবে অধম আমারও যে কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি

মিলেছে, এর ফলে কিছু লোকের অসূয়া জ'ন্মে গেলো। আজকের মেয়েরা, শুধু যাঁরা বঞ্চিত শোষিত তাঁরাই নন, যাঁরা আমাদের মতো উচ্চশিক্ষা ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা পেয়েছেন, তাঁরাও কেন যে নারীবাদী হয়ে যান তার জবাব পাবেন এই ঘটনাপরম্পরার মধ্যেই। একবার ভেবে দেখুন, বিদেশে রবীন্দ্রকবিতার প্রচারের জন্য আমি যে-কাজটা করলাম সেটা যদি এমন কোনো বাঙালী কবি করতেন যিনি কিনা পুরুষ, তর্কের খাতিরে ধরুন না কেন শক্তি বা সুনীল বা শঙ্খ বা জয়, তা হলে তাঁকে নিয়ে কেমন হৈচৈ প'ড়ে যেতো কলকাতার মিডিয়ায়! আমার অপরাধ এই যে আমি মেয়ে। এই কথাটা তো মানতে হবে যে বহুদিন এ দেশে আছি, আধুনিক ইংরেজী কবিতা পড়ি, ইংরেজীতে অল্পস্বল্প কবিতা লিখি, এবং এ দেশে কবিতা-ওয়ার্কশপ করেছি ব'লেই আধুনিক ইংরেজী কাব্যানুবাদে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে এ দেশের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম। কবিতার অনুবাদে সাফল্য লাভ করতে হলে এই ধরণের জীবনাভিজ্ঞতা ও অর্জিত কুশলতা হচ্ছে সেই প্রয়োজনীয় শর্ত যাকে পূরণ করতে হয়। একটা জীবন্ত ভাষার কবিতাশৈলীকে ভিতর থেকে না জেনে কেবল সেই ভাষার অ্যাকাডেমিক, বা সাংবাদিক, বা হাটবাজারী রূপকে জেনে কখনোই সফল কাব্যানুবাদক হওয়া যায় না।

জল ঘোলা করার এই জাতীয় ঘটনার পিছনে কবিতার জন্য কনসার্ন থাকে কম অথবা শূন্য, তার থেকে বেশী থাকে মিডিয়া-জগতের লোকেদের নিজেদের পেশাগত প্রয়োজন মেটানো, থাকে এক ধরণের রাজনৈতিক খেলা। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের নামটা শোচনীয়ভাবেই রাজনীতিকে আকর্ষণ করে। অথচ কবিতাজগতের একটা পজিটিভ, সদর্থক দিক আছে। আমরা কেন আরও বেশী ক'রে তার সদ্ব্যবহার করি না?

একটু আগেই আমার আর্জেন্টিনা-অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ওখানে গবেষণার কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, কবিপরিচয়টা অসম্ভব কাজ দিয়েছে। কবিপরিচিতির একটা আলাদা মর্যাদা আছে। ঝোলা থেকে সেই কাগজটা বার করতে পারলে অনেক বন্ধ দরজা খুলে যায়, আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের প্যাঁচ খোলানো যায়। 'আপনি কবি? ওঃ, আচ্ছা, তা হলে তো এ-সব ঝামেলা আপনার পোষাবে না। একটা ব্যবস্থা করতে হয়। দেখি, দাঁড়ান। আসুন, অমুকের সঙ্গে দেখা করুন।' এটা কেবলই আর্জেন্টিনার ব্যাপারও নয়। পশ্চিমবঙ্গেও এর দেখা পেয়েছি। 'আপনি সোজা অমুক তলায় এত নম্বর ঘরে চ'লে যান। ওখানে যিনি বসেন তিনিও কবি। তিনি এটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দেবেন।' এর দেখা পেয়েছি লণ্ডনেও। তখন ১৯৮৮ সালের শেষের দিক, রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের প্রোজেক্টে ১৯৮৯ সালে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে বিশ্বভারতীতে যাওয়ার জন্য আমার ভিসা দরকার। কাউন্টারে শুনলাম, তিন মাসের এক দিন বেশী সময় থাকতে গেলেও নাকি দিল্লী থেকে অতিরিক্ত

অনুমতি আনাতে হবে। কিন্তু আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটাই যদি তিন মাসের হয়, তা হলে তো অত আঁটসাঁট সময়ের ভিসাতে চলবে না। কোনো প্লেনই তো আমাকে সোজা শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবে না। আমাকে প্রথমে কলকাতায় পৌঁছতে হবে, সেখান থেকে ট্রেনে ক'রে শান্তিনিকেতনে যেতে হবে। ফেরার সময়ও 'ভায়া কলকাতা' ছাড়া গতি নেই। তা ছাড়া কলকাতায় আমার কিছু কাজও রয়েছে। মা-ও তখন বেঁচে। মায়ের কাছেও দুটো দিন কাটাতে হবে। আমাকে তো অন্ততঃ চার মাসের ভিসা দিয়ে দেওয়াই উচিত। বললাম, 'এটা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটি বিশ্বভারতীর নিজস্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দিল্লীর পার্মিশন আনিয়েই সমস্তটা করা হয়েছে, জানি আমি। নয়তো এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাই পেতাম না। এই চিঠির ভিত্তিতেই যা দেবার তা দিয়ে দিন না।' কাউন্টারের কর্মীরা নির্বিকার। রক্ত কিঞ্চিৎ উষ্ণ তো হলোই। আমার ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ভারতীয় হাই কমিশনের ভিতরে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার-রূপে বিরাজ করছিলেন 'ভারতীয় ইংরেজী' কবিতাধারার বিশিষ্ট কবি কেকি দারুওয়ালা, আমার ইংরেজী কবিতা পড়েছেন। লাঞ্চটাইমে ভিসা দেবার কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেলে এদিক ওদিক উঁকি মেরে হাই কমিশন-ভবনের ভিতরের দিকে সটকে পড়লাম। করিডরে একজন কর্মী ভ্যাকুয়ম ক্লীনার-সহযোগে মেঝে ঝাঁট দিচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিঃ দারুওয়ালার ঘরটা কোন্ দিকে ?' তিনি দেখিয়ে দিতেই সোজা চ'লে গেলাম সেই ঘরে। দারুওয়ালা প্রথমে বললেন, 'Ketaki, don't make me break any rules,' তার পর পুরোটা শুনে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের টেলিফোনে এক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে জানতে চাইলেন, কেন এই মহিলাকে হয়রান করা হচ্ছে ? তার পর দেখা গেলো, ভারতে তিন মাসের বেশী অবস্থানের জন্য দ্বিগুণ ভিসা ফী লাগবে। বলা বাহুল্য আমি আমার সঙ্গে অতটা নগদ টাকা নিয়ে আসি নি। আমার ব্যাগে অত টাকাও নেই, সঙ্গে চেকবইও নেই, কেবল আছে অক্সফোর্ডে ফেরত যাবার টিকিট। এ না হলে আর কবি হয়েছি কেন ? দারুওয়ালাকে কাতরভাবে বললাম, 'Please don't make me come to London again!' দারুওয়ালা নিজের পকেট থেকে বাকি টাকাটা বের ক'রে তাঁর সহকর্মীদের হাতে তুলে দিলেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার পাসপোর্টে ছাপ পড়লো। বলা বাহুল্য তাঁকে পরে একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ কবিতাজগতের লোকেদের সত্যিই একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে। পরস্পরকে আমরা বুঝি, এবং প্রয়োজন হলে পরস্পরকে মদত দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। আর্জেন্টিনায় অবস্থানকালে অসম্ভব অসুবিধার মধ্যে কবিতার সূত্রে আমি পেয়েছি মূল্যবান সাহায্য। ওকাম্পো-এস্টেটের মারিয়া রেনে কুরা আমাকে তুলেছিলেন পুলিশের কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত এক অতিথিশালায়। তাগড়া চেহারার জাঁদরেল সব পুলিশ অফিসার আর তাঁদের গিন্নীদের ভিড়ে আমি এক শাড়ি-পরা বিচিত্র বিদেশিনী

এক্ টেবিলে ব'সে স্প্যানিশ পোলাও 'পায়েলা' আর মিনারেল ওয়াটার খাচ্ছি, বিলগুলো সই করছি, আর ওগুলো শেষ পর্যন্ত কারা পে করবেন তা বুঝতে পারছি না। কেমন একটা সংকট বলুন তো। সেই অতিথিশালার দপ্তরে দৈবাৎ পেয়ে গেলাম এক কবিকে, যিনি স্প্যানিশে হাইকু লেখেন, ইংরেজীটাও বোঝেন। আমিও ইংরেজীতে হাইকু লিখেছি। তিনি আমাকে তাঁর একটি বই দিলেন, আমিও তাঁকে আমার একটি বই দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার কাজে লেগে গেলেন।

কবিপরিচয়ের সূত্রে আর্জেন্টিনায় হর্হে লুইস বর্হেস-এর অনুষ্ঠানে যেতে পেরেছি; এক লাঞ্চে আলাপ হয়েছে মেক্সিকোর কবি অক্তাভিও পাস্-এর সঙ্গে; আলাপ হয়েছে ভিক্তোরিয়ার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী কবি সিল্ভিনা ওকাম্পোর সঙ্গে; তিনি, তাঁর লেখক-স্বামী এবং আরেকজন আর্জেন্টাইন বুদ্ধিজীবী আমার ইংরেজী কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছেন; তাঁদের মনে হয়েছে যে বর্হেস-এর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে! আলাপ্ হয়েছে মার্ দেল প্লাতার কবি রাফায়েল ফেলিপে ওতেরিনিয়োর সঙ্গে; তিনি আমাকে দিয়েছেন তাঁর কবিতার বই, তাতে স্প্যানিশ ভাষায় লিখে দিয়েছেন, 'এই অনন্য সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, যা সম্ভব হয়েছে ভিক্তোরিয়া ও কবিতার জন্য'। উপরে উল্লিখিত পুলিশের কবি মানুয়েল আসোরেই-এর তৎপরতায় আমার একটি ইংরেজী কবিতা স্প্যানিশে অনূদিত হয়ে তাঁদের একটি লিট্ল্ ম্যাগাজিনে শোভা পেয়েছে—ইংরেজ কবি ফিলিপ লার্কিনের কবিতার পাশাপাশি। আমিও আসোরেই আর ওতেরিনিয়োর কবিতার বঙ্গানুবাদ ক'রে *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় চালান করেছি।

এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে আমার এই বোধ হয়েছে যে কবিতা একটা বিশেষ ধরণের সীমান্ত-অতিক্রমকারী মানবিক ভাষা। বাংলা-ইংরেজী-স্প্যানিশের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে তার চাবিটাকে একটু ধরতে এবং ঘোরাতে পারলে কিছু দরজা খোলানো যায়। সে নিজেই একরকমের পাসপোর্ট। যাঁরা কবিতা লেখেন, পড়েন, ছাপেন, প্রকাশ করেন, তাঁদের জীবনবৃত্তে কবিতা একটা কেন্দ্রবিন্দু। কবিতার মাধ্যমে পৃথিবীময় ছড়ানো একটা বিশেষ ধরণের মানবিক সংবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মানুষদের কাছে তাঁদের সেই বিশেষ সংবেদন একটা বাঁচবার উপায়, একটা আস্তিত্বিক হাতিয়ার। তাকে কাজে লাগে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর শোকে দুঃখে দুঃসময়ে। সরকারী অত্যাচারের নিষ্পেষণে বন্দীশিবিরে যুদ্ধের তাঁবুতে তার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সমাজে কবিতা একটা উদ্ব্যক্ত গুরুত্ব পায় যখন তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় কোনো বিশেষ ধরণের এজেণ্ডা, যেমন ধর্ম, দেশপ্রেম, বিপ্লব বা রাজনৈতিক সংগ্রাম, যখন তার উপর অর্সে একটা গোষ্ঠীর শাসকদের ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ'রে রাখার দায়িত্ব, বা শ্রমজীবীদের প্রতিবাদকে রূপ দেবার ভূমিকা। প্রাচীন কালে কবিরা ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক লোক যাঁরা যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী আর বংশপরিচিতিসহ

শাসকদের ইতিবৃত্তকে মৌখিক অথবা লিখিত রীতিতে ধ'রে রাখার ক্ষমতা রাখতেন, তাই রাজারাজড়াদের কাছ থেকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। সমাজের প্রান্তিক অন্তেবাসী ব্যক্তিদের দুঃখবোধ এবং ধর্মের মাধ্যমে সাব্লিমেটেড যন্ত্রণাও কবিতার কোনো কোনো ধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, যেমন ভারতের ভক্তি-ঐতিহ্যে। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জোরদার অথবা চাপা গলার প্রতিবাদ কবিতাকে গুরুত্ব দিয়েছে লাতিন আমেরিকায়, কম্যুনিস্ট আমলের রাশিয়ায় ও পূর্ব ইয়োরোপে। হয়তো সব সমাজেই কবিতা কোনো-না-কোনো যুগপ্রাসঙ্গিক আন্দোলনকে কমবেশী মদত দেবার ভূমিকায় অবতীর্ণ—হয়তো রূপ দিচ্ছে কালো মানুষের বা দলিতের বা নারীর প্রতিবাদকে, বা অনুপ্রেরণা দিচ্ছে শান্তি অথবা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে বা প্রকৃতিপ্রেমিক দূষণবিরোধীদের দলকে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে এই লড়াইগুলোর সঙ্গে জড়িয়েই কবিতা পায় তার একমাত্র পরিচয়। গোষ্ঠীগত সংগ্রামে কবিতাকে যেমন কাজে লাগানো হয়, তেমনি, আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই, প্রেমের প্লাবনে উৎসবের দিনেও সে পালন করে হ্লাদিনী ভূমিকা, অনায়াসেই আসর জমায় উদ্যানে অন্তরঙ্গ আসরে মদিরালয়ে মুশায়েরায়। কবিতা করার মধ্যে বিবর্তনের নিরিখে কিছু-একটা 'সারভাইভাল ভ্যাল্যু' নিশ্চয় আছে, নয়তো প্রবল যান্ত্রিকীকরণ, প্রবল বাণিজ্য, সুপারমার্কেট, টেলিভিশন আর কম্পিউটরের যুগেও, পশ্চিমের দেশগুলো থেকেও কবিতা মুছে যাচ্ছে না কেন? উপন্যাস-নামক সাহিত্যিক ফর্মটি গেছে এক প্রায়-অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে—লোভনীয় মোড়কে মুড়ে পৃথিবীজোড়া হাটে বেচে মোটা অঙ্কের মুনাফা করা যায় এমন এক পণ্যদ্রব্য সে আজ। আপনার যদি বরাত ভালো হয়, যদি এমন একটা উপন্যাস লিখে উঠতে পারেন যার মধ্যে পৃথিবীর হাটের পক্ষে নূতন ও চমকপ্রদ কিছু মশলাপাতি আছে, যদি তার বাণিজ্যায়নের জন্যে পেয়ে যান উপযুক্ত প্রোমোটর, তা হলে ঐ একটিমাত্র উপন্যাস লিখে রাতারাতি কপাল ফেরাতে পারেন আপনি। উপন্যাসের মতো কবিতার অশ্লীল গণবাণিজ্যায়ন এখনও পর্যন্ত হয় নি, যদিও বলা যায় না আন্তর্জাতিক প্রকাশনজগতের কোনো ডাকসাইটে সামন্ত এদিকে মনোযোগ দিলে ভবিষ্যতে কাব্যকলার কী হাল হতে পারে। আপাততঃ কবিতাসুন্দরীর পণ্যরূপটা গৌণ, নান্দনিক রূপটাই মুখ্য। সে যে আশ্রয়দাত্রী ও আনন্দদাত্রী তার সেই পরিচয়টা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করা যেতে পারে, কবিতার একটি বেশ পুরোনো ভূমিকা হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে। পেত্রার্ক, দান্তে, কীট্স্, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের আমরাও কবিতাকে এভাবে ব্যবহার ক'রে থাকি। আমাদের জীবনে কবিতার এই ভূমিকাটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কবিতা গোষ্ঠীগত কিছু কনসার্নকে যেমন আত্মসাৎ করতে পারে, তেমনি যা ব্যক্তিগত যন্ত্রণা বা আনন্দবোধ তার সঙ্গে মোকাবিলাতেও আমরা

কবিতার দিকে হাত বাড়াই, কবিতা আমাদের দিকে তাব হাতটা বাড়িয়ে দেয়। আধুনিক সমাজে ব্যক্তির জীবনে জটিলতা যত বাড়ছে, কবিতাও সমানুপাতে সেই-সব জটিলতার জালের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে ঢুকে যাচ্ছে। কবিতা পড়া বা লেখা হৃদয়ের অনুভব ও আবেগের ব্যাপারে আমাদের সাক্ষরতা দেয়, শিক্ষিত ক'রে তোলে। যন্ত্রশাসিত ভবিষ্যতে কবিতার এই ভূমিকাটির গুরুত্ব কমবে না, বরং বাড়বে। বর্তমানে বিলেতের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্গত একটি রীতি হচ্ছে পাব্-এ অথবা পাবলিক লাইব্রেরিতে অথবা অনুরূপ কোনো সর্বসাধারণের অধিগম্য স্থানে কবিদের দ্বারা স্বরচিত কবিতার পাঠ, যা কবিতাকে সাধারণ্যে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত একটা মনোরম পরিবেশ তৈরি ক'রে নিয়ে একটা সার্থকতা লাভ করে। যে-কেউ কবিতা শোনার জন্য এসে বসতে পারেন, অথচ সীমাবদ্ধ স্থানের দরুন পরিবেশটা থাকে অন্তরঙ্গ, অন্তঃসারশূন্য চটকদার গণবিনোদনের পরিবেশে পর্যবসিত হয় না। এই ধরণের আসরে নানা মেজাজের কবিতা পড়া হয়ে থাকে—প্রতিবাদ, সামাজিক স্যাটায়ার ইত্যাদি থেকে শুরু ক'রে কৌতুক, মননশীলতা বা মানুষের নরম অনুভূতিগুলোও বাদ যায় না, এবং পাবলিকের কাছ থেকে সর্বদাই একটা সাড়া পাওয়া যায়। কবিরা নিজেরা এসে কবিতা প'ড়ে শোনান ব'লে কবিতা যে কেবল ছাপাখানার ব্যাপার নয়, শ্রুতিভিত্তিক কলা, সেই বাস্তবতা নূতন ক'রে স্বীকৃতি পায়। কম্যুনিকেট করার দায় কবির উপরে পড়ে ব'লে যাঁদের কোনো সত্যিকারের বক্তব্য নেই, শ্রোতাদের কাছে কিছু পৌঁছে দেবাব নেই, শ্রোতাদের অভিমুখে প্রত্যুদ্গমন নেই, যাঁদের মধ্যে আন্তরিকতার চাইতে ভড়ং, স্বকাম, নিজেকে নিয়ে গদ্গদ ভাবটাই বেশী, তাঁরা আপনা থেকেই নিষ্কাশিত হয়ে যান। শ্রোতাদের কাছে সরাসরি পৌঁছবার গরজ না থাকলে কবিরা এমন আসরে অংশই নেবেন না। আবার শ্রোতাদের দিক থেকেও 'আমরা এরকম কবিতা শুনতে চাই না' ব'লে চেঁচিয়ে সভা ভেস্তা করার অবকাশ নেই, কেননা কেউ টিকিট কেটে শুনতে আসেন নি, কাউকে মাথার দিব্যি দিয়ে ডেকে আনা হয় নি। শুনতে ইচ্ছে না হলে উঠে যান। অসভ্যতা করলে গ্রন্থাগারিক বা মদিরালয়ের স্বত্বাধিকারী আপনাকে বার ক'রে দেবেন। বিনয়ী কবি এবং শিক্ষিত শ্রোতার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্দধান মধুর সমকক্ষ সম্পর্কের উপরেই এই-সব আসরের প্রতিষ্ঠা। একটি তথাকথিত 'ডেভলপ্ড্' সমাজের একেবারে ভিতরমহল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কবিতা এই সমাজের 'মেইনস্ট্রীম অ্যাক্টিভিটি' না হোক, প্রতিবাদী গণসংস্কৃতির অন্তর্গত না হোক, একটা অপরিহার্য 'মাইনরিটি কাল্চার' হিসাবে তার নিজস্ব জায়গা কিন্তু সে মোটেই হারাচ্ছে না, বরং তার আসনটিকে দৃঢ়তর করছে। প্রকাশনজগতেও তার একটি নিজস্ব আসন সংরক্ষিত।

হয়তো এখন থেকে এটাই হবে নকশা। মানুষদের তো অনেক রকমের নেশা থাকে। দেশে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনে এই বিশ শতকই প্রথম এনেছে একটু

প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য, একটু সত্যিকারের অবসর, জীবিকার আর প্রজননের ঘানি থেকে একটু মুক্তি। এখন তারা যে-যার নেশা নিয়ে একটু মাততে চায়। কেউ যদি বাগান করা বা দাবা খেলা বা ফুটবল বা পটারি করা নিয়েই মাততে চায়, কিছু বলার তো নেই। সমাজের গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী নানান নেশার ভিড়ে কবিতাকেও নিজের জন্য একটা জায়গা ক'রে নিতে হবে। তবে এটুকু বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন চর্চার জন্য যত জায়গা করা যায়, মানুষ তাদের তত ব্যবহার করতে শেখে। ছবি আঁকা, সংগীত, নৃত্য, বিজ্ঞান, নানারকমের কারিগরি আর হাতের কাজ—এ-সবই একেকটা ভাষা। যে-কোনো লাইনেই কিছুটা প্রাথমিক কুশলতা আয়ত্ত করতে পারলে তবেই তো তার বিদগ্ধ ব্যবহার সম্ভব। একটা সমাজের মধ্যে কবিতার চর্চাকে ব্যাপকভাবে চারিয়ে দিতে হলে, কবিতার জন্য নতুন লোক রেক্রুট করতে হলে—যারা কবিতা পড়বে, বুঝবে, ভালোবাসবে, নিজেরা লিখবে, অন্য ভাষা থেকে আপন ভাষায় কবিতা তর্জমা করবে—শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই তার জন্য একটা আসন সংরক্ষণ করা উচিত। আজকাল সব দেশেই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির দাপট এত বেড়েছে যে সিলেবাস থেকে কবিতাকে অনেকাংশেই পিছু হটতে হয়েছে। কলকাতায় গেলে যেমন শুনি, বাবা-মায়েরা রবীন্দ্ররচনাবলী দিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা তাদের পাতা উল্টায় না, এখানেও তেমনি দেখতে পাই, ছেলেমেয়েরা শেক্সপীয়র মিল্টন কীট্‌স্ কিছু না প'ড়েই স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে যায়। আমি যখন কলকাতায় স্কুলে পড়েছি তখন আমাদের স্কুলে (এবং বাড়িতেও) পেয়েছি এর ঠিক উল্টো অবস্থা। কবিতা পড়েছি যথেষ্ট, বিজ্ঞান প্রায় কিছুই শিখি নি। অথচ বিজ্ঞানের প্রতি, তার পদ্ধতির প্রতি আমার স্বভাবের একটা খাঁটি আকর্ষণ আছে। অনুকূল সুযোগের অভাবে প্রথম জীবনে তার বিকাশ হতে পারে নি। পরবর্তী জীবনে সেই আকর্ষণটাকে একটা রূপ দিতে চেয়েছি নিজের চেষ্টায়। পুরোদস্তুর বিজ্ঞানী আর কোনোদিন হতে পারবো না, ঠিক যেমন কোনোদিন ব্যালেরিনা বা বেহালাবাদকও হতে পারবো না, কিন্তু বিজ্ঞান বা ব্যালে বা বেহালার সংগীতকলার সমঝদার তো অন্ততঃ হতে পারি। তাই বলছিলাম, কবিতা প'ড়ে আনন্দ পাবার এবং তাকে অস্তিত্বের সাধনীরূপে ব্যবহার করবার ক্ষমতাটা সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত করতে হলে কবিতাকে প্রাইমারি স্কুল থেকে শিক্ষার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। সকলেই যে কবিতাকে জীবনবৃত্তের একেবারে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করবে তা নয়, কিন্তু সমাজে কাব্যরসিকগোষ্ঠী গ'ড়ে তোলারও দরকার আছে। কবিদের পাঠক লাগে। সেই রসিকজনেরাই তো কবিতাপাঠের আসরে আসবেন, পাব্-এ এসে বীয়র হাতে কবিতা শুনতে ব'সে যাবেন, বা বইমেলায় কবিতার বই কিনতে লাইন দেবেন। রুচিটা তৈরি হয়ে থাকলে প্রত্যেকের জীবনেই একদিন না একদিন এসে যাবে সেই লগ্ন, যখন

সংকটে কবিতা সহায়। সম্প্রতি আমার পরিচিত এক প্রযুক্তিবিদ, জন্মসূত্রে পাকিস্তানী, অকস্মাৎ কিছু দৃষ্টিগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে আশ্রয় খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদে, আমার কাছ থেকে আমার অনুবাদের বইটি কিনে নিয়ে গেলেন। উর্দু ও ইংরেজী কবিতার মাধ্যমে কবিতাবিষয়ক একটা সংবেদন তাঁর যদি তৈরি না থাকতো, তা হলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাহায্যে এভাবে জীবননির্ভর পাবার কথা ভাবতে পারতেন না তিনি।

আমি গভীরভাবেই অনুভব করি যে একটা পূর্ণ জীবনচর্যায় বিজ্ঞান আর কবিতা দুয়েরই প্রয়োজন আছে। দুটো পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের মধ্যে বিশ্বরহস্যের বাতায়ন উন্মোচনের যে-ব্যাপারটা আছে সেটা অনিবার্য নিয়মে থেকে থেকে হাট ক'রে খুলে দেয় কবিতার জানলাকেও, পুষ্ট করে একজন কবির বিশ্বচেতনাকে। তা ছাড়া বিজ্ঞানটা ভালো ক'রে জানা থাকলে কবিতার ডিটেলের কাজে—উপমারূপকপ্রয়োগে, প্রতিমানির্মাণে—প্রচণ্ড সাহায্য হয়। আমার সত্যিই আফসোস যে আরও বিজ্ঞান জানলাম না। আরেকটু জানার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি আজও।

আগে বলেছি, আমার ধারণা কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ কবিদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বজায় রাখে, অন্যরা যে-অবস্থায় ভেঙে পড়েন, কবিরা সে-অবস্থায় কবিতা লিখে ফেলেন। বিষাদের বৃত্তের ভিতর থেকে মানুষকে বের ক'রে আনার জন্য কবিতার ওয়ার্কশপকে থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করার একটা রীতি বিলেতে আছে দেখতে পাই। আমার পরিচিত কোনো কোনো কবি এ ধরণের ওয়ার্কশপ পরিচালনা ক'রে থাকেন জানি। স্কুলকলেজে যেমন, তেমন জেলখানায় এবং হাসপাতালেও কবিদের 'রাইটার-ইন-রেসিডেন্স' ক'রে ডেকে আনার একটা রীতি এ দেশে আছে। যোগ করা দরকার, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কিছু কিছু 'মুড ডিস্‌অর্ডার'-এর একটা সহাবস্থানের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। যখন উত্তেজিত তখন প্রচণ্ড উত্তেজিত, আছেন অনুপ্রেরণার এবং সৃষ্টির একেবারে তুঙ্গতম শিখরে, তার পর যখন বিষণ্ন তখন একেবারে নিম্নতম খাদে, জীবন সম্পর্কে প্রবল বৈরাগ্যের কৃষ্ণগহ্বরে—এই ধরণের উচ্চাবচ মেজাজ অনেক শিল্পীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্টাডি থেকে এটাও বোঝা যায়, এই মেজাজী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে কবিরা যথেষ্টই দলে ভারী। কবিদের মধ্যে একটা পাগলাটে স্বভাবের, একটা খ্যাপামির উপস্থিতি বিজ্ঞানীরাও যে সনাক্ত করতে আরম্ভ করেছেন, সে-বিষয়ে আমাদের অবহিত থাকাই উচিত বোধ হয়।

এই সূত্রে আরেকটা প্রসঙ্গে আসা যায়। ইদানীং গবেষক হিসাবে আমার একটা পরিচয় গ'ড়ে উঠেছে। সেই গবেষণা করার তাগিদগুলোরও একটা সম্পর্ক আছে আমার সেই স্বভাবের সঙ্গে, যেখানে কবির দৃষ্টি আর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল দুটো তারের

মতো জড়িয়ে আছে। আমার মনে হয়েছে, ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটা আরেকটু তলিয়ে দেখা দরকার, বা রবীন্দ্রনাথের ঐ বর্ণদৃষ্টির ব্যাপারটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার, তা হলে কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আরেকটু ভালো ক'রে বোঝা যাবে। তাই গবেষণায় নামা, তার শ্রম স্বীকার করা। জগৎ সম্বন্ধে কবিদের একটা জিজ্ঞাসা, একটা অনুসন্ধিৎসা থাকাই তো উচিত। যাদের মধ্যে জানার আর খোঁজার তাগিদ নেই, তাদের কবিতা কি বাড়বে, না একটাই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকবে? জ্ঞান সম্পর্কে আমার কোনো অ্যালার্জি নেই। আমার ধারণা, আত্মীকৃত জ্ঞান আর্টের কোনো বিরোধিতা করে না, বরং আর্টের বিকাশে সাহায্য করে, তাকে নানা দিকে শাখাপ্রশাখা ছড়াতে প্রশ্রয় দেয়। বিদ্যেবুদ্ধি বিষয়ে কিছু রটনা হয়ে গেলে পর কিন্তু একজন বাঙালী কবির পক্ষে আজকাল কিছু মুশকিল দেখা দেয়। আগে ঠিক এরকমটা ছিলো না। পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় কবিদের বৈদগ্ধ্য বেশ তারিফ পেতো। তখন যাঁরা কবিখ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা নিজেরা ছিলেন বিদগ্ধ মানুষ। অন্য কবিদের বৈদগ্ধ্যের গুণগ্রাহিতায় তাঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। আজকাল এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার মতো প্রবীণ কবিরা নেই। কিংবা থাকলেও রাজনৈতিক-শিবির-গত কারণে তাঁদের কণ্ঠ নীরব। বিগত তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা নানাভাবে বিপন্ন হয়ে টিঁকে থাকার নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। ১৯৬৪ সালে আমার বিয়ের পর যখন মোটের ওপর পাকাপাকিভাবে বিলেতে বাস আরম্ভ করলাম, তখন কে ভাবতে পেরেছিলো এগিয়ে আসছে নকশাল আন্দোলন এবং তার দমনের টালমাটাল সময়। অথচ তার বীজগুলো নিশ্চয়ই তখন বোনা হয়ে গেছে। তার পর দু' দিকের বঙ্গেই সমাজ অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে গেছে। আজকাল পশ্চিমবঙ্গে যাঁদের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে তাঁরা অনেক সময়েই চ'লে যান সম্পূর্ণ অন্য লাইনে, অর্থকরী কোনো বিদ্যার দিকে, সাহিত্যের লাইনে আসেনই না। কেউ কেউ সেট্‌ল্ করেন ভারতের অন্যত্র, যেখানে অর্থাগমের অবকাশ বেশী, বা বিদেশে সেট্‌ল্ ক'রে একেবারেই ওখানকার লোক হয়ে যান, বাংলাভিত্তিক সংস্কৃতিকে আর কিছু ফিরিয়ে দেন না। কলকাতাতেও নাগরিক এক প্রজন্ম গ'ড়ে উঠেছে, যারা নিজ ভূমে পরবাসী, বাংলা পড়েই না। সত্যি বলতে কি, আজকে আমরা যখন বাংলায় লিখি, ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ নাগরিক প্রজন্মের পৃষ্ঠপোষকত্ব আর তো আশাই করি না। আমাদের প্রত্যাশা বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গের তথা বাংলাদেশের কাছ থেকে—তথাকথিত মফস্বলের ক্রমনির্মীয়মাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত শ্রেণীর কাছ থেকে, যাঁরা অনবরত নিজেদের তৈরি ক'রে নিচ্ছেন। এই-সব জটিল অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণে বাংলা কবিতায় বৈদগ্ধ্যের স্বাদগন্ধ গ্রহণ করবার মতো রসিকগোষ্ঠী বোধ হয় কিছুটা শীর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের যে কিছু বিদ্যেবুদ্ধি আছে, আমরা যে তার চর্চা করি, এটা ধরা

প'ড়ে গেলে সমালোচকরা আমাদের কবিসত্তা ও কবিকৃতির ওপর আর ঠিক ক'রে ফোকস্ করতে পারেন না, কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অথচ একই দেবী সরস্বতী কিন্তু বিদ্যা এবং কাব্যকলা দুটোরই অধিষ্ঠাত্রী। অর্থাৎ এককালে আমাদের কল্পনায় বিদ্যা আর কবিতার অবস্থান কাছাকাছিই ছিলো।

কবি-অধ্যাপক-সম্পাদক-সমালোচক উত্তম দাশের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে একটা উদাহরণ দিই। উত্তম, আপনি আপনার এবং মৃত্যুঞ্জয় সেনের সম্পাদিত *আধুনিক প্রজন্মের কবিতা* সংকলনের ভূমিকায় ষাটের কবিতার একটি বর্গ করেছেন 'তত্ত্বপ্রধান কবিতা', সেখানে রেখেছেন সামসুল হককে, গীতা চট্টোপাধ্যায়কে, বিজয়া মুখোপাধ্যায়কে, এবং আমাকে। সামসুল আর বিজয়া সম্পর্কে আপনি বলেছেন, তাঁরা 'তাত্ত্বিক এ অর্থেই যে তাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সরাসরি তত্ত্বে। অর্থাৎ হৃদয়ের চেয়ে মেধাই বড় হয়ে উঠেছে তাঁদের কবিতায়।' আর বাকি দুজনের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য এই যে তাঁদের কবিতা 'বক্তব্যে ভারি বলেই তাত্ত্বিক'। আপনার এই তত্ত্বটির কোনো সম্প্রসারণ আপনি করেন নি। এর পর গীতার ওপরে গোটাতিনেক বাক্য লিখে আপনি চ'লে গেছেন অন্য দিকে। আমার সম্বন্ধে একটি লাইন লেখাও প্রযোজনীয় মনে করেন নি (*আধুনিক প্রজন্মের কবিতা,* মহাদিগন্ত, পৃঃ ৫৫)।

আপনার এই বর্গীকরণ এবং মূল্যায়নের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। সত্যি বলতে কি, আলোচনার কাজটা আপনি এখানে এড়িয়েই গেছেন। ঠিক ক'রে আপনার বর্গটির সংজ্ঞা আপনি দেন নি। 'তত্ত্বপ্রধান'-নামক একটা অস্পষ্ট কপোতবিবরের মধ্যে দায়সারাভাবে আমাদের ঠুসে দিয়ে আপনি অন্যত্র চ'লে গেছেন, যেন আমরা তেমন ইন্টারেস্টিং কবি নই। সামসুলের কবিতা আমি সেরকম ক'রে স্টাডি করি নি, কিন্তু গীতার আর বিজয়ার কবিতা সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি ধারণা আছে। অন্য অনেকের আলোচনায় আপনি যে-স্পেস দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে গীতা, বিজয়া আর আমি নিঃসন্দেহে আরেকটু স্পেস ডিজার্ভ করেছিলাম। আমরা অনেক দিন ধ'রেই লিখছি, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর আছে। আমাদের প্রত্যেকের ওপরেই এক-একটা প্যারা লেখা যেতো অনায়াসেই।

এর পরে এক জায়গায় আপনি বলেছেন, ষাটের কবিতায় প্রকৃতি কম, 'এত ক্ষীয়মাণ' যে ব্যতিক্রমধর্মী বিনোদ বেবার কবিতায় এলে 'মন ভালো হয়ে যায়, মনে হয় যেন কোন সবুজ দ্বীপে শুশ্রূষায় এসেছি' (পৃঃ ৬০)। কী আশ্চর্য, উত্তম, আমার কবিতায় আপনি প্রকৃতি পেলেন না? আমার কবিতায় তো প্রকৃতির ছড়াছড়ি। আমার মুদ্রিত কবিতায় তিন-তিনটি মহাদেশের নিসর্গের কথা আছে। এমন কি আমার অনেকগুলি বইয়ের শিরোনামে পর্যন্ত প্রকৃতির উপস্থিতি সুপ্রকট—*বল্কল, সবীজ পৃথিবী, জলের করিডর ধ'রে, Sap-Wood, Hibiscus in the North*! যতদূর মনে

পড়ে, 'ব্রাইটনে গ্রীষ্মশেষ' এবং অন্যান্য কবিতায় আমার প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলো ষাটের দশকে *দেশ*-এ প্রকাশকালীন যথেষ্টই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। আপনার মন্তব্যটা থেকে মনে হয় আমার কোনো বই আপনি খুলে দেখেন নি, পড়েন নি। বস্তুতঃ আমার কবিতায় দেশের এবং বিদেশের প্রকৃতি কিভাবে ধরা পড়েছে, ট্রপিকাল জলবায়ুর সন্তান বাংলাভাষার শরীরে আমি কিভাবে বিদেশী নিসর্গের বর্ণনাকে সঞ্চারিত করেছি, বাংলার মাধ্যমে অন্য জলবায়ুর প্রকৃতির বর্ণনা করতে গেলে যে-সব সমস্যা হয় আমি কিভাবে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেছি—এই বিষয়টা নিয়েই অনায়াসে একটা আলোচনা লেখা যায়।

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত খৃষ্টীয় ক্যালেণ্ডারের মাস-নামগুলির মধ্যে অন্য একটা জলবায়ুমণ্ডলের ভাবানুষঙ্গ খোদাই হয়ে আছে। ইংরেজীসমেত ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির কবিতায় মাসের নামগুলি একেবারে সংকেতের মতো কাজ করে। নাম বললেই আর কিছু বলতে হয় না। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, চিলে প্রভৃতি দক্ষিণ গোলার্ধের কবিদের তৈরি ক'রে নিতে হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এক ভাবমণ্ডল, যেখানে ডিসেম্বরের অর্থ গ্রীষ্ম আর জুনের অর্থ শীত। বাংলা কবিতা পুষ্ট হয়েছে বৈশাখজৈষ্ঠ ইত্যাদি নামের সাংকেতিকতা দ্বারা। সেখানে খৃষ্টীয ক্যালেণ্ডারের মাস-নামগুলো দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে ক্রমে ক্রমে ঢুকে পড়েছে, এবং ঢুকে প'ড়ে কবিতায় এক বিবাদী আধুনিক স্বর যোগ করেছে—'এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহংকারে ব্যাপ্ত করে দিক'। এপ্রিল মাস-নামটা আমরা ইংরেজীর কাছ থেকে পেয়েছি, কিন্তু 'এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া' বাঙালী কবির হাইব্রিড নির্মাণ—ইংরেজী ভাষার আপন মাটিতে কৃষ্ণচূড়া হয় না। ঐ হাইব্রিডিজ্‌মের জন্যেই সুনীলের লাইনটা এত ধাক্কা দেয়। আবার একজন বাঙালী কবি যদি বিলেতে ব'সে সেখানকার এপ্রিলকে তাঁর কবিতায় ঢোকান, সেখানে চ'লে আসবে অন্য এক অনুষঙ্গ। আমার একটি কবিতা আছে যেটির নাম 'এপ্রিলের গান'। ঐ কবিতাটির মধ্যে বসন্তবৃষ্টিসিক্ত যে-ঋতুর ছবি আছে তা কৃষ্ণচূড়াশোভিত ট্রপিকাল এপ্রিলের থেকে একেবারে আলাদা। আমার বিলেতে বা ক্যানাডায় লেখা বাংলা কবিতায় ফেব্রুয়ারি-মে-জুন-অক্টোবর-ডিসেম্বর ইত্যাদির সাংকেতিক তাৎপর্য দিশি রীতি থেকে অনিবার্যতঃ আলাদা। বাংলার মাটিজলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহ্যিক ভাবানুষঙ্গের উপরে নির্ভর করতে পারি নি, নিজস্ব নির্মাণ ক'রে নিতে হয়েছে।

বাংলা কবিতায় অভিবাসী তথা বিদেশভ্রমণে অভিজ্ঞ কবিদের একটি ধারা বেশ কিছু দিনই হলো তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের লেখা কবিতায় বিদেশের নিসর্গ ও ঋতুচক্র কিভাবে প্রবেশ করছে, বাংলাভাষার ঐতিহ্যিক কাঠামোর মধ্যে নূতন ভাবানুষঙ্গগুলিকে আমরা কিভাবে সংস্থাপিত করছি, তার ফলে কবিতার দ্যোতনার মধ্যে সাংগীতিক 'কাউন্টারপয়েন্ট' তৈরি হয়ে উঠছে কিনা, এ-সব নিয়ে কোথাও

আলোচনা দেখতে পাই না। এ-জাতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে সমালোচকদের মনের মধ্যে কোনো প্রশ্নও গ'ড়ে ওঠে নি। কোথাও কোনো-একটা জিজ্ঞাসার অভাব কাজ করছে।

হয়তো তুলনীয় কারণেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর বর্ণদৃষ্টির প্রভাব সম্পর্কে এর আগে কেউ তলিয়ে গবেষণা করেন নি। আমি যে ভাবতে গেলাম, তার একটা নিহিত কারণ বোধ হয় এই, বাংলায় বিদেশী প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন অভিবাসী কবিকে যে-ধরণের সমস্যাব সম্মুখীন হতে হয়, তার সঙ্গে বর্ণদৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী একজন কবির সমস্যার খানিকটা মিল আছে। ভাষার স্ট্রাক্‌চার একরকম বলছে, আমরা আরেকরকম বলতে চাইছি। বাংলায় মে মাসটা দারুণ গরম, দাহের ঋতু। আমার কবিতায় পা ফেলছে অন্য এক মে—মধুমাস। বাংলায় জুন মানে হয় জ্যৈষ্ঠের দাহ, নয়তো নামছে আষাঢ়। আমার পরিবেশে জুন মনোরম গ্রীষ্মঋতু। জুনের সন্ধ্যা মানে এক আলোকদীর্ঘ অবসর, যখন বিকেলবেলাটা আমাদের ছেড়ে যেতেই চায় না। মে-জুনের কথা বলতে গেলে আমাকে তাই করতে হয বিকল্প নির্মাণ। তুলনীয় এক প্রক্রিয়ায় লাল, সবুজ আর অন্য কয়েকটি রঙের বেলায় অধিকাংশ লোক দেখেন একরকম, আর রবীন্দ্রনাথের মতো একজন প্রোটানোপ দেখেন অন্যরকম। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একই বর্ণভাষা তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর রিয়ালিটিটা ছিলো আলাদা। আমরা ধ'রে নিয়েছি তিনি 'লাল' বলছেন ব'লে আমরা যা দেখি তিনিও তা-ই দেখেছেন। কিন্তু তিনি যদি গাঢ় লালকে দেখে থাকেন কালোর কাছাকাছি, গোলাপীকে আমাদের গ্রে-র মতো, সেই ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা কি তাঁর চিত্রকল্পে একটা ছায়া ফেলবে না, ভাষার নিহিত ন্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংঘর্ষ কি একটা টেনশন সৃষ্টি করবে না ? তাঁকেও কি একটা 'বিকল্প নির্মাণ' করতে হবে না ? ঠিক তা-ই আমি আবিষ্কার করলাম, যখন ডুবুরীর মতো নামলাম রবীন্দ্ররচনাব গভীরে তাঁর বর্ণভাষাকে বিশ্লেষণ করতে। দেখলাম এক বিশাল বিকল্প নির্মাণ। বুঝলাম, এই মহাকবিও একটা জায়গায় 'প্রবাসী'—গভীরতর অর্থেই, কেননা আমি যেখানে ভ্রমণের মাধ্যমে দু'-তিনরকমের মে-জুনের চেহারা সরজমিনে তদন্ত করতে পারি, তিনি সেখানে কতগুলো রঙের বেলায় 'চিরপ্রবাসী', কোনোদিন জানলেনই না অন্যদের চোখে সেগুলোকে কেমন দেখায়।

বাংলা কবিতা নিয়ে, বাঙালী কবিদের নিয়ে যেখানে কত কী কাজ করার আছে, যেখানে কবিদের নিজস্ব নেটওয়ার্কটাকে কাজে লাগিয়ে কবিতার ব্যাপকতর প্রসারের জন্য অনেক কর্মে ব্রতী হওয়া যায়, সেখানেও মনুষ্যসমাজের নিয়মে সংকীর্ণ পলিটিক্স আর গ্রুপিজ্‌ম্ সক্রিয় হয়ে ওঠে। দিগন্তদর্শী বুদ্ধির চর্চার অভাবে কবিরাও নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বুঝতে অপারগ যেন। আলোচনায় প্রায়ই দেখতে পাই সহিষ্ণুতার অভাব, রুচির অপ্রশস্ততা। 'এই টাইপের কবিতাই কবিতা, অন্যগুলো

কবিতা নয়'—শুনি এই ধরণের ডগমার উচ্চারণ। জীবনচর্যার গভীরে দলীয় রাজনীতির অত্যধিক অনুপ্রবেশের ফলেই কিনা জানি না, ডগমার ও একদেশদর্শিতার ব্যর্থতা এবং প্রায়োগিক প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে চেতনা যেন একটু ক'মেই গেছে। এইটে পীড়াদায়ক। সকলের রুচি কি কখনও এক হতে পারে? সবাই কি কখনও একই স্টাইলে লিখবেন? কবিরা তাঁদের নিজস্ব স্বভাব, সংবেদন ও জীবনাভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে-যার মতো ক'বে লিখবেন, সেটাই তো প্রত্যাশিত। কবিতা লেখা বিষয়ে আমার নিজের মনের মধ্যে খুব বেশী তাত্ত্বিক কচকচানি নেই। যা ছোটবেলা থেকেই করছি, জীবনের রসায়নে আপনা থেকেই বেরোচ্ছে, তা নিয়ে কত আর থিওরি করবো? আকাশের নীচে যা আমাকে মথিত করে তা-ই নিয়েই লিখে ফেলি, যা বলবো এবং যেভাবে বলবো দুটোকে একই প্রক্রিয়ায় পাই। কোনো বিষয় নিয়ে কৃত্রিমভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারি না। আমার মনে হয়, আমাদের কবিতাবিষয়ক আলোচনায় আরেকটু ঔদার্যের, বিশ্লেষক সূক্ষ্মতার, এবং বিভিন্ন মেজাজের কবিদের নানামুখী কাজের ব্যাপকতর কাভারেজের প্রয়োজন আছে। কে কিভাবে বাংলা কবিতায় নূতন মাত্রা যোগ করছেন তার কোনো ন্যায্য জরিপ হতে দেখি না। আপন আপন গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষণ হতে দেখি তার চেয়ে বেশী।

জানি না রাজনৈতিক কোনো এজেণ্ডাব কারণেই কিনা, কাউকে কাউকে নিয়ে অসম্ভব হৈচৈ করা আর কাউকে কাউকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা—এইটাই যেন আজকাল রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। কেউ হয়ে যান কাল্ট ফিগার, অনুমোদিত গুরু; তাঁর নাম শুনলেই ভক্তরা মূর্চ্ছা যেতে থাকেন। সমান উৎকর্ষের আরেকজন—যিনি তুল্য মনোযোগ দাবি করতে পারেন—তাঁকে নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই হয় না। জীবনানন্দ একজন বড় কবি, এবং আমার প্রিয় কবি। কিন্তু তাঁর কবিতা ভালোবাসি ব'লে কি তিরিশের দশকের অন্যান্য কবিদের খাটো করতে হবে, তাঁদের ভুলে যেতে হবে? তাঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই সিরিয়াস কবি, প্রত্যেকেই বাংলা কবিতাকে নিজস্ব কিছু দিয়েছেন। তাঁরা অনেকে মিলে দিয়েছেন ব'লেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেখানে একটি নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্যমান, সেখানে শুধু একটি তারাকে নিয়ে হৈচৈ করলে আমাদের নিজেদের সম্পদকেই ছোট ক'রে দেখা হয়। দৃশ্যটাকে আমি কিছুটা দূর থেকে এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখি ব'লে এই-সব একপেশে উত্তেজনা আমার কাছে নিরর্থক মনে হয়। তিরিশের কবিরা যে-কোনো আন্তর্জাতিক বিচারে একঝাঁক মর্যাদাবান কবি, যাঁদের নিয়ে আমাদের ন্যায্য গর্ব হতে পারে। কিন্তু এক জীবনানন্দ বাদে অন্যরা আজ অন্যায়ভাবে অবহেলিত। সাম্প্রতিক প্রবণতাটা হচ্ছে প্রতি দশক থেকে কেবল দু'-একজনকে বেছে নিয়ে তাঁদেরই কাঁধে তুলে ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ক'রে নৃত্য করা। তা ছাড়া যাঁরা কবিতা ছাড়া অন্য জ্যঁরেও লেখেন তাঁরা

আত্মপ্রকাশে কর্মে বৈচিত্র্যময় ব'লেই অন্যরা তাঁদের কবিপরিচয় ও কবিকৃতির উপর ফোকস্ করতে পারেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অন্যদেব এই দৃষ্টিবৈগুণ্যের শিকার। তাঁর কবিপরিচয়ের চাইতে তাঁর গুরুপরিচয় বেশী জোরদার।

মেয়েরা কবিতা লিখতে পারেন না এমন অশিক্ষিত ধারণা এখনও কারও আছে কিনা জানি না। কথাটা অ্যাবসার্ড, নিছক হাস্যকর। বিশ শতকের বহু প্রথম শ্রেণীর কবিই নারী। সর্বত্র মেয়েরা দাপটে লিখছেন। বাংলা কবিতার আসরে মেয়েরা একসময়ে সংখ্যায় খুবই কম ছিলেন, এখন অনেক নূতন নাম দেখি। তবু এখনও আমরা সংখ্যালঘু । আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো উপযুক্ত পরিভাষা বা প্ল্যাটফর্মও এখনও তৈরি হয়ে ওঠে নি। এই অবস্থার কোনো আশু পরিবর্তন আমি প্রত্যাশা করি না, কেননা আলোচনার ফোরমগুলিতে এখনও পর্যন্ত পুরুষদেরই দাপট বেশী। আমাকে যে-সব সম্পাদক ও প্রকাশকদেব সঙ্গে কাজ করতে হয় তাঁরা সকলেই তো পুরুষ। পুরুষরাও নিশ্চয় সুশিক্ষিত, সংবেদনশীল, অনুসন্ধিৎসু এবং উদারচেতা হলে সমালোচনার ভাষা তৈরি করতে এগিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু গরজ চাই, প্রস্তুতি চাই। হাল আমলের ডামাডোলে কারও কারও মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা শিকড় গেড়েছে যে উল্লেখযোগ্য নারী কবি হতে হলে চেঁচামেচি ক'রে পুরুষদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা দরকার। মোটেই তা নয়। আমি অক্সফোর্ডের একটি নারীবিষয়ক গবেষণাকেন্দ্রের সদস্য ; এ কথা সর্বান্তঃকরণে মানি যে দুই লিঙ্গেরই দৃষ্টিকোণ লিঙ্গপ্রভাবিত—জগতের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে পুরুষ ও নারীর অভিজ্ঞতায় ফারাক থাকে, অতএব দৃষ্টিকোণে কিছু তফাৎ হবেই, এবং ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর মতো আমি নিজেও লিখতে চাই একজন মেয়ের মতো ক'রে, পুরুষদের কাছ থেকে কণ্ঠস্বর ধার ক'রে নয়—কিন্তু বলতেই হয়, পুরুষশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই সব নারী কবির কবিতার একমাত্র এমন কি প্রধান থীম হতে পারে না। আমাদের জীবনে আরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে, আরও অনেক কনসার্ন আছে, বলার আরও অনেক কথা আছে আমাদের। আমরা আরও অনেক বিষয়ে লিখেছি, লিখছি, এবং লিখে যাবো। প্রকৃতি, প্রেম, ঈশ্বর, সমাজ, মনুষ্যনিয়তি, নক্ষত্রমণ্ডলী—সব বিষয়েই পুরুষদের মতো সমান স্বাধীনতায় আমাদের লেখার অধিকার আছে। যিনি কবিতার মাধ্যমে পুরুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইবেন তাঁরও নিশ্চয় সে-অধিকার আছে, যেমন আছে যে-কোনো সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপনের, কিন্তু সব নারী কবির প্রতিবাদ কখনোই এক ছাঁচে হতে পারে না। সেই প্রত্যাশা অসঙ্গত। কেউ কেউ চেঁচাতে চাইতেই পারেন, কিন্তু সবাই চেঁচাতে চান না। কেউ কেউ হয়তো সূক্ষ্ম ক'রে বলছেন, বা নীচু গলায় বলছেন, বা মেশাচ্ছেন কৌতুক বা আয়রনি। তা ছাড়া মেয়েরা তাঁদের কবিতায় (এবং অন্য সাহিত্যকর্মে) জীবনের এমন সব এলাকা থেকে উপাদান

আনছেন যাদের বিষয়ে পুরুষ শ্রোতাদের গ্রহিষ্ণুতা এখনও তৈরি হয় নি। আমাদের স্বরগ্রামের বৈচিত্র্য অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্য পাঠকদের এবং সমালোচকদের কান তৈরি হওয়া চাই। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রেও বৈদগ্ধ্যের কোনো বিকল্প নেই।

এই অনুষঙ্গে একটি ছোট চিন্তা দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। বাংলা সাহিত্যিক বাচনে, কি সৃজনশীল কি সমালোচনামূলক লেখায়, 'নারী' শব্দটাকে প্রায়ই 'যৌনতা'র শর্টহ্যাণ্ড অথবা broad-spectrum প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হতে দেখি। এই ব্যবহার অবশ্যই পুরুষদের দৃষ্টিকোণের অবদান। পুরুষদের কাছে যেহেতু বিপরীত লিঙ্গ হচ্ছে নারী, অতএব 'নারী' বললেই যেন তাদের দিক থেকে যৌনতা-নামক গোটা ব্যাপারটা কাভার্ড হয়ে যায়। বাঙালী পুরুষদের লেখা গদ্যে পদ্যে 'নারী' শব্দটার এই জাতের ব্যবহার ব্যাপক। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঐরকম একপেশেভাবে দেখলে বলতে হয় যৌনতা = 'পুরুষ'। কিন্তু যৌনতা নারীও নয়, পুরুষও নয়, একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কনসেপ্ট। সমলিঙ্গ সম্পর্ক অথবা আত্মরতিও তার অন্তর্গত। বিমূর্তের প্রতিনিধিত্ব করতে মূর্তের ব্যবহার ভাষার একটা পুরোনো কৌশল, যেমন শ্রম বোঝাতে আমরা বলি ঘাম, জীবিকা বোঝাতে রুটি, দাসত্ব বোঝাতে শৃঙ্খল, ভাগ্য বোঝাতে কপাল, অভিনন্দন বোঝাতে মাল্যদান ইত্যাদি। একই কৌশলে যৌনতার পুরো রেঞ্জ বোঝাতে যখন ফর্ম্যুলার মতো বলা হয় 'নারী', তখন আমার বেশ অস্বস্তি লাগে। যৌনতার পুরো দায় নারীকে কেন বহন করতে হবে? বাংলায় 'যৌনতা' শব্দটা যেহেতু 'যোনি' থেকে এসেছে তাই বোধ হয় বিভ্রান্তি বেড়ে গেছে। পুরুষদের যোনি নেই, কিন্তু যৌনতা তো আছে। একটু বিশ্লেষণ করলে কি বেরোবে যে বাংলা কবিতার সুপ্রচলিত সাংকেতিকতায় 'নারী' = 'ভোগ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্লান্তিতে আশ্রয়', কিন্তু 'পুরুষ'-এর বেলায় তেমন কোনো সমীকরণ অচল, বরং আধুনিক নারীবাদী কবিতার কোনো কোনো খাতে 'পুরুষ' = 'অত্যাচার'?

১ ইনি এখন অক্সফোর্ডশায়ারের ট্যাক্‌লি গ্রামে থাকেন। এঁর কাগজে আমার বেশ কয়েকটি কবিতা বেরিয়েছে।

২ কবিতাগুলি *Memories of Argentina and Other Poems*-এ (১৯৯৯) গ্রথিত।

৩ কবিতাগুলি পরে গ্রথিত হয়েছে *জাদুকর প্রেম, জাদুকর মৃত্যু* (১৯৯৯) এবং *দোলনচাঁপায় ফুল ফুটেছে* (২০০০) বই-দুটিতে।

[*এবং মুশায়েরা*, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৪ (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮)।]

বঙ্গনারী '৯৮

মনে করুন তার নাম আরাধনা, পশ্চিমবঙ্গের এক মেহনতী মেয়ে, ত্রিশের ঘরে বয়স। কৃষিনির্ভর ঘরের মেয়ে, বালিকাবয়সে অন্যান্য বোনেদের সঙ্গে সবজির ক্ষেতের কাজকর্মে বাবাকে সাহায্য করেছে, মাকেও সাহায্য করেছে হেঁশেলের কাজে। ঘরের কাজ, ক্ষেতখামারের কাজ—দুই দপ্তরেই অভিজ্ঞ। বর্তমানে কলকাতায় গৃহপরিচর্যা ক'রে খায়। এমন একটি মেয়ের কথা যদি পঞ্চাশের দশকে ভাবতে বসতাম, তা হলে যেমন একটা ছবি আঁকতাম, নব্বইয়ের দশকের শেষভাগেও কি অবিকল সেই ছবিটাই আঁকতে পারি ? পারি না। গত চল্লিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে-সব সামাজিক রূপান্তর ঘটেছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনে ঐরকম একটি মেয়ের প্রতিকৃতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিটেলেই তখনকার থেকে ভিন্ন হতে পারে। সেই-সব ভিন্নতার যোগফলে মেয়েটির ব্যক্তিত্বের স্বাদই অন্যরকম হয়ে যায়।

একটি বিশেষ মেয়ের কথাই ভাবছি। যার নাম দিলাম আরাধনা সে একটি বাস্তব মেয়ে, তাকে আমি জীবনে চিনি, সে নিছক আমার মানসদুহিতা নয়। আটানব্বইয়ের এই মেয়েটি বাড়ি বাড়ি খেটে খায় বটে, প্রচুর বাসন মাজে, প্রচুর কাপড় ধোলাই করে, ঘরদোর ঝাড়াপোঁছাও অবশ্যই তাকে করতে হয়, কিন্তু সেকালের একজন ঠিকে ঝির সঙ্গে তার প্রোফাইল ঠিক মিলবে না।

আরাধনা নিরক্ষর নয়, স্কুলের কয়েক ক্লাস পড়েছে। বাংলা কাগজে কখনও-সখনও চোখ বুলায়। ইংরেজী হরফের সঙ্গেও তার সামান্য পরিচয় আছে। বাসে উঠবার আগে 'এ বাস কত নম্বর, কোথায় যাবে ?'—এ ধরণের প্রশ্ন তাকে করতে হয় না। 'ঘড়িতে ক'টা বাজলো, দিদি ?'—এমন প্রশ্ন সে ভুলেও করে না। কারণ সে ঘড়ি দেখতে জানে। ইংরেজী সংখ্যাগুলো বিলক্ষণ চেনে। তার নিজের একটা হাতঘড়িও আছে। সে কেবল কাপড়চোপড় কাচে না, ভালো ক'রে ইস্তিরি করতেও পারে। সেলাই জানে, শাড়িতে ফল্ লাগাতে পারে। দরকষাকষি ক'রে হাটবাজার করতে তো পারেই, রান্নাবান্নায় সে ব্রাহ্মণী না হয়েও রীতিমতো নিপুণা। আগেকার আমলের বামুনদিদিরা যেমন রাঁধতেন, তার চাইতে কিছু খারাপ রাঁধে না আরাধনা। উপরন্তু তার রান্নায় আছে কিছু নূতনত্বও। বেশ অভিজাত কামুনেই রাঁধে। পেঁয়াজ-রসুন-ধনেপাতার হাত দরাজ। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে অনায়াসে কেটারিঙের লাইনে গিয়ে পেশাদার 'শেফ্' হতে পারতো। এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে। চীনে রান্না, মাড়োয়ারী

রান্না, শৌখিন জলখাবার, ট্রেতে দুধ-চিনি ঠিকঠাক সাজিয়ে চা বা কফি ক'রে অতিথিদের কাছে নিয়ে যাওয়া—এ-সমস্তই তার আসে। অতিথিদের সামনে বেরোতে তার কোনো অকারণ লজ্জা নেই। সাহেবমেম দেখলে মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দেবে না। মাথাতেই ঘোমটা দেয় না তো মুখের ওপর টানবে কী। আরাধনা বিবাহিত, কিন্তু কখনো মাথায় ঘোমটা দেয় না।

কয়েকটি বাড়িতে ঠিকে কাজ করলেও একটি বাড়িতে আরাধনা অপেক্ষাকৃত পূর্ণকালীন, সেখানে তার রাতের আশ্রয়। এই সংসারে সে যথার্থ অর্থে হাউসকীপার, সংসারটার হাল ধ'রে রাখে। পুরো বাড়ি তার হেফাজতে। এ বাড়িতে আরাধনা টেলিফোনে জরুরী মেসেজ নেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে সই ক'রে রেজিস্ট্রি বা কুরিয়রের চিঠি নেওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ সব রকমের কাজই করে।

অন্যান্য বাড়িতে ঠিকে কাজগুলো আরাধনাকে বাধ্য হয়েই করতে হয়, কেননা তার যথেষ্ট আয় দরকার। তার একমাত্র ছেলেটিকে সে 'ভালো স্কুলে' পড়াচ্ছে। 'ভালো' স্কুলের মানে আপনাদের নিশ্চয় বোঝাতে হবে না—যেখানে ইংরেজীটা জোরদার। আরাধনার নেপালী স্বামীর আলকোহলনির্ভরতার সমস্যা আছে। তার আয় অনিশ্চিত। ছেলের স্কুলের খরচ আরাধনাকেই মেটাতে হয়। ছেলেকে 'ভালো' স্কুলে পড়ানোর আনুষঙ্গিক দায়িত্ব হিসেবে দরকারমতো স্কুলের অফিসে ফোন করা, ছেলের রিপোর্ট দেখে অভিভাবিকা হিসেবে তাতে সই করা—সমস্তই তাকে করতে হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে আরাধনার সঙ্গে গল্প করা যায়। বেশ প্রখর তার স্বাভাবিক বুদ্ধি, এবং সুতীক্ষ্ণ তার জীবন-পর্যবেক্ষণ এবং কৌতূহল। চার পাশের মানুষদের মধ্যে আদানপ্রদানের স্রোতে ঠিক কী-কী ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে সত্যিকারের স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে আরাধনার সঙ্গে নিরিবিলিতে ব'সে কথা বলাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বলা বাহুল্য, সে যদি আপনাকে সত্যিই বিশ্বাস করে তবেই মুখ খুলবে। নয়তো খুলবে কেন ? কঠিন তার জীবনসংগ্রাম, গতর এবং মগজ দুইই খাটিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। আমি যে তার বিশ্বাস পেয়েছি সেটা আমার সৌভাগ্য, আমার বিশেষাধিকার। আমার কাছে তাকে কোনো মুখোশ প'রে থাকতে হয় না। জীবনের নানা দিক নিয়েই সে আমার সঙ্গে কথা বলে—সুযোগ পেলে। বিয়ে-ডিভোর্স, সন্তানপালন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, পরিচিত স্ত্রীপুরুষদের চরিত্র ...।

ভেবে দেখতে গেলে, তার এই-যে মুখোশহীন পরিচয় ভাগ্যক্রমে পেয়েছি, হয়তো এটাই আমার কাছে তার স্বভাবের সব থেকে বড় আকর্ষণ। সামাজিক পরিচয়ে যে যত উঁচুতলার তাকে কি তত বেশী মুখোশ প'রে থাকতে হয় ? সেইরকমই তো মনে হয় প্রায়শঃ। শিক্ষায় ও বিত্তে আরাধনার চেয়ে যারা অনেক উপরের কোঠায় তেমন বঙ্গরমণীদের সঙ্গেই তো আমার আদানপ্রদান ঘটে অধিকাংশ সময়। তবু তো 'বঙ্গনারী

'৯৮' এই প্রতিমাটির উপর মনের চোখকে ফোকস্ করতে গিয়ে যার শামলা মুখখানা সর্বাগ্রে ভেসে এলো সে আর কেউ নয়, পরিচিত এই কাজের মেয়েটি। সে যেন সেই মেয়ে, অতীতের বঙ্গনারী আর ভাবী কালের বঙ্গনারীদের মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ শতকের শেষ ধাপে, আর বলছে: 'আমাদের মতো মেয়েদের ভুলে যেও না দিদি, আমরাই না দেশের ভবিষ্যৎ?' তার মধ্যে এক দিকে সেই জাতের মেয়ে, যাদের চিনতেন অন্য প্রজন্মের কবি তাঁর নিজের অল্প বয়সে—'চেয়ে দেখি আর মনে হয়/ এ যেন আর কোনো-একটা দিনের আবছায়া:/ আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে/ দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।/ ... যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি/ সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না:/ কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,/ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।' অন্য দিকে তার মধ্যে সেই মেয়ে, যে টেলিভিশন দ্যাখে, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার খবর রাখে, ইংরেজী 'ডিভোর্স' শব্দটাও যার জানা। তার গ্রামীণ শিকড় সে হারায় নি, কিন্তু সেই ভিত্তির উপর যুক্ত হয়েছে তার অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু আধুনিক কায়দার নাগরিক নিপুণতা। আরাধনা জানে যে শিক্ষা মানুষের জীবনকে বদলে দেয়—মেয়েদের ক্ষেত্রেও। পরিপার্শ্ব থেকে তার নিজের মতো ক'রে কিছু শিক্ষা নিংড়ে নেবার চেষ্টা করে সে। ফলতঃ সব মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্ব পঞ্চাশের দশকের গৃহপরিচারিকাদের থেকে ভিন্ন মাত্রার। আমার অল্প বয়সে আরাধনার মতো দাসীদের দেখি নি।

একবার কলকাতায় কোনো-একটা সেমিনার দিয়ে ফিরেছি, আরাধনা আমার শাড়িটার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বললে, 'ঐভাবেই বক্তৃতা দিয়ে এলে বুঝি?' আমি ভাবলাম আরাধনা কেবল আমার মেলায় কেনা নতুন শাড়িটার প্রশংসা করছে, তাই বললাম, 'দারুণ না শাড়িটা? কী বিরাট আঁচল দেখেছিস?' আরাধনা জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, শাড়ি তো ভালোই, আর ব্লাউজপিস্‌টা কেটে না নিলে আঁচল তো প্রমাণ সাইজের হবেই।' এতক্ষণে টনক নড়লো আমার। শাড়িটা পরার সময়ে আমি কেবল ভেবেছি, আঁচলের কনট্রাস্ট কালারটা এত তাড়াতাড়ি স্টার্ট করছে কেন, একেবারে বুকের ওপরেই? সেটা কাঁধের ও পাশে ঝোলাতে গেলে আবার আঁচল মাটি ছোঁয়! আমি ধ'রে নিয়েছি এটাই নতুন কোনো কেতা, যার খবর দেশান্তরিতা আমি রাখি না, আর রঙের বৈপরীত্যকে ঐভাবে বুকে ধারণ ক'রেই বক্তৃতা দিয়ে এসেছি। 'তুমিই পারো, দিদি,' টিপ্পনী কাটে আরাধনা।

আরাধনার এক বোন ঠাঁই পেয়েছে লণ্ডনে। তার নাম দিলাম মালা। মালা বিধবা, দেশে তার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও পুত্রবধূ বর্তমান। সে লণ্ডনে এসেছে প্রকৃত অর্থেই হাউসকীপার হয়ে, আছে এমন এক মাড়োয়ারী পরিবারের আশ্রয়ে, যাদের কিছু শিকড় কলকাতায়। পরিবারটি ভালো, তাদের ব্যবহার ভদ্র। মালাকে উদয়াস্ত খাটতে হয়

ঠিকই, কিন্তু কাজের জীবনটা নিয়ে তার কোনো নালিশ নেই। বিলেতে চিরকাল থাকা তার উদ্দেশ্য নয়। টাকা জমিয়ে ফিরে যাবে, দেশে একটা ছোট পাকা বাড়ি তোলা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভালো হিন্দী বলতে পারে আজকাল, ইংরেজীও শিখেছে বেশ খানিকটা। তার ভয়, সে বাংলা ভুলে যাবে। মধ্যে মধ্যে বাংলা বলার জন্য প্রাণ কাঁদে তার। তখন সে আমায় ফোন করে। 'অ্যাটেনবরোর *গান্ধী* দেখলাম, দিদি। কী দারুণ একখানা ফিল্ম বলুন তো!' মনটা ভালো থাকলে খুব হাসতে পারে মালা। টেলিফোনে তার হাসির তরঙ্গ শুনতে পেলে আমার নিজেরও মন ভালো হয়ে যায়। এই মেয়েও আরেক বঙ্গনারী '৯৮, যে-মেয়ে পশ্চিম বাংলার পল্লী থেকে বেরিয়ে হাসিকান্নার বাঁকে বাঁকে অনেক দূর চ'লে এসেছে, অনেক নতুন বিদ্যে আয়ত্ত করেছে। হয়তো আমার নিজের ছেলেবেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় বাংলার গ্রামাঞ্চলে কেটেছে ব'লেই সামাজিক বিচারের শ্রেণীবৈষম্য সত্ত্বেও এই দুই নারীব সঙ্গে আমি এক গভীর ভগিনীত্ব অনুভব করি।

বিপরীত মেরুতে কল্পনা ক'রে নিন বাঙালী সমাজের উঁচুতলার একটি ব্যক্তিত্বশালিনী অবিবাহিতা তরুণীকে। ধরুন নাম তার মালিনী। কলকাতার একটি স্কুলে কিছু দূর পড়বার পর স্কুলশিক্ষা সমাপ্ত করেছে ভারতের কোনো অভিজাত প্রাইভেট বিদ্যালয়ে, এবং সেখান থেকে সোজা এসেছে বিদেশে পড়াশোনা করতে। পরনে তার নীল জীন্‌স্, অসাধারণ তার বাক্‌পটুতা, তবে সেই বাগ্মিতার বেশীর ভাগটাই প্রকাশিত হয় ইংরেজীর আশ্রয়ে। বাংলা তত সহজে আসে না। চিঠিপত্র লেখে ইলেক্‌ট্রনিক মেইলে। অবশ্য এখনও হাঁটু মুড়ে পা গুটিয়ে সোফায় বসতে ভালোবাসে, এবং হাত দিয়ে ডালভাত আচার সাবাড় করা এখনও তার রপ্ত। তার প্রাণ যা চায় তা-ই সে পেতে চায়, কোনো বাধাকে স্বীকার করে না। প্রেম নয়, বিবাহ নয়, সন্তান নয়, মনের মতো কর্মজীবনের গঠনই তার মনোযোগের ফোকস্। এই মেয়েও আরেক বঙ্গনারী '৯৮, যার বিবর্তনের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। কে বলতে পারে সুযোগসুবিধাঋদ্ধ আধুনিক জীবনের ত্বরিত গতি এর হয়ে-ওঠাকে পৌঁছে দেবে কোন্‌ বিন্দুতে?

আজকাল ভারতের বিত্তবান নগরবাসীদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী গ'ড়ে উঠেছে, যাদের তরুণতরদের মধ্যে মাতৃভাষার সঙ্গে যোগ এখনই খুব শিথিল হয়ে গেছে। তারা এক সর্বভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত, ভারতের 'আঞ্চলিক' চিহ্নগুলি যেখানে গৌণ, তথাকথিত 'গ্লোবাল' সংস্কৃতিব প্রভাবই সমধিক প্রধান। মাতৃভাষার সঙ্গে যোগসূত্রের শিথিল অবস্থায় এই গোষ্ঠীর বঙ্গনারীদের 'বাঙালিয়ানা' কতদূর বজায় থাকবে বলা যায় না। ভাষার ভিত্তিভূমি ছাড়া সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখা যায় না। ভাবী কাল তাই এই শ্রেণীর তথা দেশান্তরিত বাঙালীদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে

অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করবে।

তিনটি মেয়ের স্কেচ আঁকলাম—আজকের বঙ্গনারীদের বৈচিত্র্য বোঝাতে। তাদের বৈচিত্র্যের উপরই এ মুহূর্তে জোর দিতে চাই। সেই বৈচিত্র্যই আমাদের সম্পদ। মানবসমাজ ক্রমাগত বদলাচ্ছে, এর চেয়ে বড় সামাজিক সত্য নেই। রূপান্তর গ্রহণের এক অসাধারণ ক্ষমতাই আমাদের প্রজাতির টিঁকে থাকার হাতিয়ার। আর আমরা বাস করছি এমন একটা সময়ে, যখন পরিবর্তনগুলি একই সঙ্গে অতিত্বরিত এবং পৃথিবীজোড়া। মনে হয়, এই সেদিন প্রথম বিলেতে এলাম, কিন্তু ষাটের দশকের সেই চিপা-স্কার্ট-ধারিণী আর সরু-খুর-ওয়ালী মেয়েদের বিলেত আর এই নব্বইয়ের দশকের জীন্‌স্‌ধারিণীদের বিলেতও তো দুটো আলাদা দেশ। মেয়েদের তথা পুরুষদের ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার ধরণ, খাওয়াদাওয়ার স্টাইল, পোশাক-আশাক, ধ্যানধারণা, মুখের ভাষা—সমস্ত কিছুতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘ'টে গেছে। বাঙালীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আজকের মালিনীর দিকে আমরা হয়তো এক মুহূর্ত স্মিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সম্ভবতঃ তার চাইতে ঢের বেশী অবাক বিস্ময়েই পুরনারীরা অবলোকন ক'রে থাকবেন জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরকে, যখন তিনি সে-আমলের কায়দায় আধুনিকীকৃতা হয়ে পশ্চিম ভারত আর বিলেত সেরে কলকাতায় ফিরেছিলেন একদা।

আমার ছেলেবেলায় মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক যে-নারীদের দেখেছি তাঁরাই কি সব এক ছাঁচের ছিলেন ? ছিলেন না। একদল ছিলেন যাঁরা বাড়ির ভিতরেই শিক্ষালাভ করেছেন। আরেকদল স্কুলে গিয়েছেন, কিন্তু কলেজে যান নি। আরেকদল কলেজে পড়েছেন, কিন্তু বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকরি করেন নি—আমার নিজের মা ছিলেন এই দলের একজন। আবার আরেকদল ছিলেন যাঁরা কলেজের পাঠ সাঙ্গ ক'রে ঘরের বাইরেও কর্মরত—এঁদের কাছে আমরা স্কুলে কলেজে পাঠ নিয়েছি। প্রত্যেক দলেরই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রতিটি গ্রুপকে আলাদা ক'রে চেনা যেতো।

ভারতের ভিতরে আলোচনায় 'বঙ্গনারী'র তাৎপর্য সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে। বৃহত্তর বিবেচনায় এই শব্দের তাৎপর্য কিন্তু দুই বাংলা মিলিয়ে যে-অঞ্চলে মানুষ বাংলা বলে তারই চালচিত্রে। আমি অবিভক্ত বঙ্গে জন্মেছিলাম। সেই পুরো এলাকাটাকেই বাংলাদেশ বলা হতো। এখন পুব দিকের ওঁরা বাংলাদেশ নামটা নিজেদের জন্য নিয়ে নিয়েছেন। প্রকৃত বিচারে কিন্তু দুই বাংলার মেয়েরাই বঙ্গনারী—এক বিরাট বর্গের অন্তর্গত দুই উপবর্গ। আমরা যারা এখন জন্মভূমির বাইরে বসবাস করছি তাদের এই তথ্যটা বিশেষ ক'রেই মনে রাখা দরকার।

আজ এইমাত্র টেলিভিশনে সন্ধ্যার খবরে শুনলাম একটি মর্মান্তিক প্রতিবেদন। বাংলাদেশে তরুণীদের মুখের উপর সাল্‌ফ্যুরিক অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার কেস

লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যুবকের নিক্ষিপ্ত অ্যাসিডে মুখ ঝলসে গেছে, চোখ অন্ধ হয়ে গেছে—এমন সব মেয়েরা ভেসে উঠলো, সবাক্ হলো পর্দায়। এরাও বঙ্গনারী '৯৮। আর এই অপরাধ যারা করছে তারা বঙ্গপুরুষ '৯৮-এর একটি বিশেষ নমুনা। কেবল মানুষই মানুষের উপর এমন অভিশাপ হানে, এই ১৯৯৮ সালেও।

তবে আজকের দিনের এই হতভাগিনীরা কেবল প'ড়ে মার খেতে আর প্রস্তুত নয়। তারা লড়ছে। বাংলাদেশের দগ্ধানন মেয়েরাও একজোট হচ্ছে, পরস্পরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, বাঁচবার চেষ্টা করছে, এই অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করছে। আশা সেইখানেই।

[*বঙ্গনারী-৯৮*, ৩-৪-৫ জুলাই ১৯৯৮ তারিখে ক্যানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ উত্তর আমেরিকা বঙ্গসম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংকলন, সম্পাদনায় নীলাদ্রি চাকী, সহসম্পাদনায় জয়দেব বসু। বিষয়গত কারণে ১৯৯৭-এ লেখা 'বাঙালী মেয়ের রূপান্তর' প্রবন্ধটির সঙ্গে দুটি জায়গায় সামান্য ওভারল্যাপ আছে, কিন্তু বর্তমান লেখাটি এতজন পাঠকের ভালো লেগেছিলো যে কিছু কাটলাম না। এই সেদিনও একজন এটির কথা বলছিলেন। এটির স্বয়ংসম্পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকুক।]

দিলারা হাশেম

'সবাই ঘরমুখো, নয় পাব্‌মুখো। দিনশেষে সাবওয়ের আশপাশে একটা হাটভাঙা শিথিলতার পরিবেশ। সব্জির ঠেলাগুলোর চারপাশে বাঁধাকপির ছেঁড়া পাতা, পেঁয়াজের খোসা, পচা কমলা, বাসি হলদে স্প্রাউট গড়াগড়ি যাচ্ছে।' লণ্ডনের এই অনায়াস ছবি কার কলমের আঁচড়ে আঁকা? লেখিকার নাম দিলারা হাশেম। বইয়ের নাম *অমুক্ত পদাবলী* (১৯৮৮)।

দিলারা হাশেমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বছর-চারেক আগে। ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের কর্মী দিলারা ওয়াশিংটন ডি-সি থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন—আমার একটি সাক্ষাৎকার নেবার তাগিদে। সেই বছরই বিলেতে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয়। তাঁর দু'-একটি বই আমাকে তখনই পড়তে দিয়ে যান, পরে আরও কয়েকটি পাঠিয়ে দেন আমেরিকা থেকে। সেগুলি পড়ার পর থেকে অনেকবারই ভেবেছি, এমন পাকা যাঁর লেখার হাত, তাঁর নামের সঙ্গে আগে মুলাকাত হয় নি কেন? সে কি তিনি বহুদিন ধ'রে আমেরিকাপ্রবাসী ব'লেই? অথচ ঢাকায় তাঁর খ্যাতি তো সুপ্রতিষ্ঠিত।

দিলারা আর আমি মোটামুটি এক প্রজন্মের—তিনি আমার চাইতে সামান্য বড়। ঢাকার স্নাতক দিলারাও আমার মতো ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন। অল্পস্বল্প কবিতাও লেখেন; তাঁর একটি কবিতার বইও আমার কাছে আছে। তবে গল্প-উপন্যাস তাঁর প্রধান ক্ষেত্র, এবং আমার বিচারে তিনি একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। আমাদের সময়কার বাংলা কথাসাহিত্য সম্পর্কে ঠিক ক'রে আলোচনা করতে গেলে তাঁর কাজকে মানচিত্রের মধ্যে রাখতেই হবে। তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিকা বাংলাদেশসুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বৃটেনসুদ্ধ ইয়োরোপ এবং মার্কিন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি একাধারে গভীরভাবে বাঙালী এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক, আন্তঃসাংস্কৃতিক। যদিও আমাদের মধ্যে অতলান্তিক সাগরের ব্যবধানটা রয়েছে, তবু আমার অভিবাসী সাহিত্যিক জীবনে তাঁকে সহপথিক হিসেবে পেয়ে আমি আনন্দিত। গঙ্গার এপার-ওপারের দূরত্ব ঘুচিয়ে দুই বাংলা থেকে বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া বুদ্ধিজীবী মানুষদের মধ্যে নতুন যে-একটা সমঝোতা গ'ড়ে উঠতে চাইছে, সেই নির্মীয়মাণ পথে হঠাৎ ক'রেই তাঁর বন্ধুতা পেয়ে গেলাম।

দিলারা একজন জাত গল্প-বলিয়ে। এই ব্যাপারে তাঁর একটা সহজাত ক্ষমতা

আছে। আমার ধারণা, কেউ কেউ মূলতঃ কবি, কেউ কেউ মূলতঃ কাহিনীকার। সেই মূলগত অবস্থান থেকে আমরা নানা দিকে ডালপালা মেলতে পারি, কিন্তু মূলগত পরিচয়টা আমাদের কাজের উপরে একটা স্বাক্ষর রাখেই। দিলারার গল্প-উপন্যাসে কথকতার একটি সংযমী শৈলী আমাকে আকর্ষণ করে। তাঁর গল্পগুলির বাঁধুনি আশ্চর্যরকমের আঁটসাঁট। কাহিনীর একাধিক সূত্র তিনি একই সঙ্গে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—দক্ষতার সঙ্গে। এবং অল্প কয়েকটি রেখায় দেশবিদেশের মানুষের চরিত্র তথা পরিবেশের কোণকানাচকে একেবারে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেন। আজকাল বিশেষতঃ ভারতীয় ইংরেজী লিখনক্ষেত্রে 'ফ্যান্টাসি ফিক্‌শন'-এর যে-রীতি চালু হয়েছে, তার মধ্যে ভাষাশ্রয়ী কল্পনাবিলাসের, দেখানেপনার এবং অদ্ভুতরসের যে-ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তা পড়লে আমার অন্ততঃ অনেক সময় একটা মানসিক বদহজমের বোধ হয়। তার পাশাপাশি দিলারার গল্প-বলার সহজ, বাস্তবভিত্তিক অথচ সুশিক্ষিত, বুঝদার আঙ্গিকটি লেবুর রসের মতো স্বাদকে চাগিয়ে তোলে। তিনি সাধারণতঃ এমন মানুষদের নিয়ে লেখেন, যারা কোনো সুপার-হিরো বা সুপার-হিরোয়িন নয়, যাদের সঙ্গে আমরা নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারি, অথচ যারা আমাদের চোখের সামনেই বিশেষত্ব অর্জন করে।

সদর-অন্দর-এর মতো উপন্যাসে (১৯৯৮) একটু স্বতন্ত্র ধরণের চরিত্রও এঁকেছেন তিনি। ওয়াশিংটনে সেট-করা এই কাহিনীর আরম্ভই হয় আনসার আহমাদের মৃত্যু দিয়ে। গল্পের শুরুতেই তিনি মৃত, কিন্তু তিলে তিলে গ'ড়ে ওঠে তাঁর চেহারা। গল্পটা যখন শেষ হয় তখন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি আমাদের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

দিলারার সর্বপ্রথম উপন্যাস *ঘর মন জানালা* (১৯৬৫) বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটি যে অল্প বয়সের লেখা তা নানাভাবে বোঝা গেলেও যৌবনের এই রচনায় তাঁর ঔপন্যাসিক কলাকৌশল তারিফ করবার মতো। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *একদা এবং অনন্ত* (১৯৭৫), *স্তব্ধতার কানে কানে* (১৯৭৬), *আমলকীর মৌ* (১৯৭৭), *কাকতালীয়* (১৯৭৮) ইত্যাদি। *আমলকীর মৌ*-এ সারা একটি অবিস্মরণীয় আধুনিক নারীচরিত্র। কিছুটা আত্মজৈবনিক *কাকতালীয়*-তে ধরা পড়েছে অবিভক্ত বঙ্গে লেখিকার শৈশবের একটি অমূল্য চিত্র।

আমার বিশেষ প্রিয় পশ্চিম ভারতের আওরঙ্গাবাদে সেট-করা তাঁর টকমিষ্টি স্বাদের উপন্যাস *মিউর‍্যাল* (১৯৮৩), যেখানে অতীতের পশ্চিম পাকিস্তান উঁকি মেরে যায়, এবং লেখিকার উর্দুজ্ঞান অতিরিক্ত রসসঞ্চার করে। এমনই নিপুণ তাঁর চরিত্রচিত্রণ আর গল্প-বলা যে দেখলাম বইটা শেষ হবার পর ছেলেমানুষের মতো ভেবে চলেছি, নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে রুমানা রিয়াজকে চিঠি দেবে তো? দিলারার যে-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতেই হয় তা হলো নারীপুরুষনির্বিশেষে অসীম মমতা দিয়ে চরিত্র গড়তে

পারার ক্লাসিক ক্ষমতা। রিয়াজ তেমন একটি চরিত্র।

শঙ্খ-করাত-এ (১৯৮৫) মোবিন ঐরকম আরেকটি চরিত্র। আমাদের সহানুভূতি তার দিকে ধাবিত হয়। ইচ্ছে হয়, জীবনযুদ্ধে সে জিতে যাক। মোবিন যখন ভাবছে বুলুকে সে হারাবে, তখন—'সে যেন মাতৃজঠরের সেই চিরন্তন অন্ধকারে একটা দিন ভাসছিল, আর তার চেতনার চারপাশে ছলছল করছিল বুলুর অস্তিত্বের প্রাণদায়িনী আবরণী জলাধার। কোথায় একটুখানি ফুটো হয়ে গেছে ... প্রসবের আগে অসময়ে জল ভাঙ্গার মত তার সেই নিশ্চিত আবেষ্টনী ভেঙ্গে একটু একটু করে জল চুঁইয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সে ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছে।' একটি অসাধারণ তুলনা, যা একজন নারী শিল্পীর সংবেদনজাত, আবার একই সঙ্গে একটি যুবকের মনস্তত্ত্ব বোঝাতেও লক্ষ্যভেদী, তার অন্তঃস্থ মাতৃনির্ভর অসহায় বালকত্বের নির্ভুল নির্দেশক।

[*দেশ*, 'অধিকন্তু' কলাম, ৭ অগাস্ট ১৯৯৯। *দেশ* পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী 'অধিকন্তু' কলামের জন্য এমন একটি ছোট্ট লেখা আমাকে পাঠাতে বলেছিলেন, যা ওঁদের ফর্মাটের এক পাতার মধ্যে এঁটে যাবে। ছোট পরিসরের মধ্যে কী ধরানো যেতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করার পরে স্থির করেছিলাম, লেখিকা দিলারা হাশেমের নামটার সঙ্গে *দেশ*-এর পাঠকদের একটা প্রাথমিক পরিচয়সাধন করানো যেতে পারে। তাঁর নাম তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কেউ শোনেন নি। অমিতাভ চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনারই সমপ্রজন্মের একজন সহযাত্রী সাহিত্যিককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, আপনি বেশ দরাজ মানুষ তো!' আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'এতে এত অবাক হচ্ছেন কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'এই ধরণের generosity আজকাল বিরল হয়ে এসেছে ব'লে।' পরবর্তী কালে দিলারাকে নিয়ে নানা প্রবন্ধে আরও আলোচনা করেছি; আশা রাখছি সেই রচনাগুলি যথাসময়ে আমার কোনো ভাবী কালের প্রবন্ধসংগ্রহে সংকলিত হবে। দিলারাও ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের নানা অনুষ্ঠানে আমাকে জায়গা দিয়েছেন। তাঁর সেই সৌজন্যের জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। ১৯৯৮ সালে মার্কিন দেশে অভিবাসী প্রমুদ রাওয়াত-এর উদ্যোগে দিলারা আর আমি ওয়াশিংটন ডি-সি- তে যৌথভাবে একটি অনুষ্ঠান করি।]

লোকনাথ ভট্টাচার্যের *অতি বিশিষ্ট অন্ধজন*

স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, লোকনাথ ভট্টাচার্যের কবিতার বইটি (এবং মুশায়েরা, ১৯৯৭, পরিবেশক : বাণীশিল্প) পড়তে আরম্ভ ক'রে আমার মনের মধ্যে প্রথমে একটা প্রতিরোধের ভাবই তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। 'প্রবেশ' নামে ভূমিকা-কবিতাটিতে দশ দিকের আনুষ্ঠানিক বন্দনা দিয়ে কবি তাঁর ভণিতা আরম্ভ করেছেন। দিকে দিকে বন্দনার বিবিধ লক্ষ্যের তালিকার মধ্যে ঈশান কোণে 'মাতৃরূপী কল্যাণীর দক্ষিণ স্তন', নৈর্ঋত কোণে 'প্রিয়ার বাম উরু', বায়ু কোণে 'মরুভূমির হাওয়া' ইত্যাদি সামগ্রীর সহাবস্থান লক্ষ্য ক'রে আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে থাকে—মনে হয়, কবির বাচন কোনো-একটা কেতাদুরস্ত কাল্টের আত্মসচেতন অভিনয়-রিচুয়াল দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

সত্যি বলতে কি, ভণিতা-কবিতাটিতে রিচুয়ালকে কবি সচেতনভাবেই অবলম্বন করেছেন, তার উপর নির্ভরই করেছেন, যেন তিনি একটি রহস্যময় গোপন কাল্টের অভিনেতা-পুরোহিত। দশ দিক এবং 'এই মহান সভার সকল সভ্যকে' বন্দনা করার পর এই নায়ক ধীবে ধীবে প্রবেশ করেন এক অন্ধকার ঘরে, পাতা আসনে ব'সে প্রথমে নিঃশ্বাসকে সমান হতে দেন, তার পর দেখেন বসার ভঙ্গিটা যথাযথ হয়েছে কিনা, 'হাঁটু ও ঘাড়ের জ্যামিতিতে ভুল আছে কি নেই'—

> তারো পরে, সময় হয়েছে অনুভব করে, নিরুদ্বেগ প্রেম ও প্রত্যয়ে প্রস্তর-মূর্তি পার্বতীর নিবিড় নিভৃত অঙ্গে নিজের প্রত্যঙ্গটি ঠেকাই, প্রস্তর-মূর্তি আর প্রস্তর-মূর্তি নেই জেনেই। তারো পরে, ঘরের আনাচে-কানাচে ধুলো-ঝাড়া তাকে বা কুলুঙ্গিতে আগে থেকে যা-কিছু ছিল, এখনো রয়েছে, এবং নতুন আরো কিছু যা এসে গেছে, এবার তাদের নামকরণ করতে বসি, ওজন করে নিই কোন্ নাম কার প্রাপ্য, পরে আঙুল তুলে দেখিয়ে-দেখিয়ে একে-একে বলতে থাকি, এই তুমি হচ্ছ দুঃখ, ঐ তুমি গম্বুজ ; এই তুমি গোধূলি, ঐ তুমি ময়ূর।

যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে এই খেলা, পূর্বনির্দিষ্ট অতি-অল্প সময়ের পরিধিতে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু ভুল না করে, কোথাও একবারও

হোঁচট না খেয়ে, থমকে না দাঁড়িয়ে।

এই নায়ক, কবির এই 'আমি' এক রহস্যময় নাটকের মুখ্য অভিনেতা। অভিনয়ের এই ভঙ্গিকে আরও তীক্ষ্ণ ক'রে কবি উত্থাপন করেন মহম্মদ, সেন্ট জন অফ দ্য ক্রস আর প্রাচীন ঋষিদের উক্তির সঙ্গে তাঁর এই কথার খেলার সম্ভবপর সাদৃশ্যের প্রসঙ্গকে, তোলেন ম্যাজিক আর মিস্টিক উপাদানের কথা, এসে পড়ে 'পূজার কাঁসর-ঘণ্টা, আত্মসমর্পণের ভৈরবী রাগিণী'।

এর পরেই, পাঠকের মনে প্রতিরোধ দৃঢ় হচ্ছে বা হতে পারে যেন তা অনুভব ক'রেই, উচ্চারিত হয় কবির আত্মসচেতন স্বীকারোক্তি : 'নিজের এত কথা বলা পাপ, আমার মতো অকৃতার্থের পক্ষে ধৃষ্টতা' ; কিন্তু তবু রিচুয়ালটা একবার যখন আরম্ভ করেছেন তখন তাকে শেষ করতেই হয়। কবি বলছেন তাঁর আর তাঁর 'প্রস্তুতির ক্ষণের' কথা, যারা 'দুটি নায়ক-নায়িকা'—

> এটাও তাই বলতেই হয় যে আমার সেই ক্ষণটিকে দেখি আমি এক নারীর মতো করে—একটি নারীই বটে, সুন্দরীদের রাণী ও নগ্না, সুডৌল স্তনের মহিমা যার দুয়ো দিতে পারে যে-কোন রম্ভা-উর্বশীকে ও যাকে ঘরে ঢোকার পর যথার্থ মুহূর্তটি এলে দেখি আরামকেদারায় উপবিষ্টা, আপনাতে আপনি মগ্না, হাঁটু দুটি ফাঁক করে অপেক্ষা তার আমাকে নিয়ে শয্যায় উঠে যেতে। আমি জানি, আমার পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া মানেই তাকে খুন করা, আমার লুক্কায়িত ছুরিতে হঠাৎ বিদীর্ণ করা তার পুষ্পের মতো শুভ্র বক্ষ, যাতে সময় উত্তীর্ণ হলে জানালা বা দরজা বা ঘরের অন্য কোনো ফাঁক দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে না পারে, কোনো ভবিষ্যের দিকে-দিগন্তে অন্য কারুর সঙ্গে সঙ্গমে আবার তার হিরণ্ময় বীজ না ছড়ায়, যাতে তার ও আমার লগ্ন চিরকালের জন্য খোদিত হয় নিরুপম ভাস্কর্যে। আমি তাই অতি সন্তর্পণে এগোই, ঘুণাক্ষরেও তাকে জানতে দিই না আমার ভাবটি, যা কর্তব্য তা করি, পরে খুনের সেই মোক্ষম কার্যটি সমাধা হলেই ফিনকি দিয়ে যে-রক্ত ছোটে, যে-আঙুরপেষা সেই রস, ও তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের কোণায় কোণায় দেয়ালে-দেয়ালে যে-অজস্র হুলুধ্বনি-ঢাকবাদ্যি বেজে ওঠে, তা-ই হয় সেই প্রার্থিত উচ্চারণ, বা কবিতা, অর্থাৎ নাম যদি দিতেই হয় কোনো।

প্রথম রিচুয়ালের মধ্যে দ্বিতীয় রিচুয়াল, যেমন মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহ, সেখানে দেবপ্রতিমা। ভিতরের রিচুয়ালটি রীতিমতো হিংস্র, এবং প্রভুত্ব-সম্পর্কের একটি

পরিচিত স্টিরিওটাইপ—সুন্দরী নারীর সঙ্গে সঙ্গমের পর তাকে খুন ক'রে ফেলা, যাতে সে অন্য কারও সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত না হতে পারে। খুনের এই উৎসবকেই বলা যায় কবিতা, তাই কি বলছেন কবি ?

স্বষ্টি একপ্রকারের হত্যা—এই কূটাভাসবাহী থিওরির মুখোমুখি আমার মধ্যে প্রতিরোধ আবার দৃঢ় হতে থাকে। মনে মনে বলি, বেশ সাহস আছে তো লোকনাথদার, খোদ পারীতে ব'সে কাব্যরচনা সম্বন্ধে এরকম একটা লিঙ্গবাদী রূপক খাড়া ক'রে একেবারে ভণিতাতেই ছেড়ে দিলেন ? একে কি কোনো ক্ষুব্ধ নারীবাদী ক্রিটিক 'ডি-কনস্ট্রাক্ট' করবে না ? না কি আমিই এ ব্যাপারে অজ্ঞ, ফরাসী দেশের কাব্যে এটা এখন চলে, এটাই কেতা ?

সেখানকার কেতা যেমনই হোক, আমার মন কিন্তু এই প্রতিমানির্মাণকে স্বস্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। আমি জানি, আমি নিজে কখনোই কবিতা রচনা সম্পর্কে এমন রূপক ব্যবহার করতাম না। আমি তুলনা দিতাম অন্য এক বর্গের কাজের সঙ্গে—গর্ভে একটা প্রাণের সঞ্চার, তার পর অসীম মমতায় আপনার মধ্যে তাকে লালন করা, পুষ্ট করা, তার পর কিছুটা যন্ত্রণা সহ্য ক'রে তাকে জন্ম দেওয়া। আমার রূপকটা নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে হলো। অবশ্যই। তবে আমার জিজ্ঞাস্য : কবিতা লেখাকে যদি একধরণের স্বষ্টি ব'লে মানতে হয়, তা হলে হত্যাকাণ্ড কিভাবে সেই ক্রিয়ার উপযুক্ত রূপক হয় ? সঙ্গমের পর নায়িকা যদি খুনই হয়, তা হলে শুধু যে তার হিরণ্ময় বীজ আর কোথাও ছড়াবে না তা-ই নয়, ঐ নারীর মাধ্যমে নায়কের পিতা হবার চান্সও তো জলে যায়, প্রাণের কোনো সম্ভাবনা যদি দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে সে তো লুপ্ত হয় ! সেই বিনাশকে কী অর্থে কবিতা বলা যায় ? লোকনাথ কি কবিতাকে আদৌ স্বষ্টি ব'লে মানছেন না ? তা হলে নায়কনায়িকার মিলনের লগ্নটি 'চিরকালের জন্য খোদিত হয় নিরুপম ভাস্কর্যে', এ কথা আবার বলা কেন ? ভাস্কর্য তো কেবল ভাস্করের চেতনায় নিলীন কোনো স্মৃতি নয়, যা ভাস্করের মৃত্যুর পর মিলিয়ে যাবে ; তা একটা বাহ্য নির্মিত জিনিস, একটা স্বষ্টি, ভাস্করের শরীর-মনের বাইরে যার প্রকাশ ও অস্তিত্ব। অর্থাৎ কবিতা বা ভাস্কর্যের যে হত্যার চাইতে স্বষ্টির সঙ্গেই অধিক সম্পর্ক, তা কি অস্বীকার করা যায় ? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই বইয়ে দেওয়া তালিকা থেকেই জানতে পাচ্ছি, লোকনাথের অন্য একটি কবিতার বইয়ের নাম *খুনের শিল্পের ঢাকবাদ্যি*, আরেকটির নাম *ঘর*। এ দুটি আমি দেখি নি ; মনে হচ্ছে দেখতে পেলে আলোচ্য বইয়ে তাঁর কয়েকটি বিশেষ ধরণের প্রতিমানির্মাণ সম্বন্ধে ধারণা আরেকটু স্পষ্ট হতো। ঘরের প্রতিমা *অতি বিশিষ্ট অন্ধজন* বইটিতে কেন্দ্রিক।

আর কবিতাকে খুনের শিল্পের উৎসব বলার মধ্যে যে একটা বাড়াবাড়ি আছে তা কবি বোধ হয় জানেন। কেননা 'প্রবেশ' কবিতাটিতে এর পরেই তিনি নিবেদন

করেন একটি বিকল্প রূপক। এর পুরোটাই তুলে দিতে চাই, কারণ মনে হয় এর মাধ্যমেও তিনি তাঁর পক্ষে জরুরী কোনো কবিতার থিওরি উপস্থিত করতে চাইছেন।

> আমার স্পর্ধার জন্য আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে এবার অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। কিছুকাল ধরে কেবলি আমার মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় আমার সীমিত জীবনের পক্ষে এক ভয়াবহ আবিষ্কারের দিকে ছুটে চলেছি। সে-আবিষ্কার ভাষা নিয়ে মেতে থাকতে-থাকতে একেবারে ভাষারই চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার। যেখানে আমার চেনা ভাষা বা আমার ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডার আর পারছে না, হার মানছে, সেখানেই আমার এই নবজন্ম ঘটছে। মনে হয়, এই সুযোগ বা দুর্যোগটাকে ঘটানোর একটা নিশ্চিত উপায়ও যেন খুঁজে পেতে চলেছি, এবং সেই উপায়টি হল এই। যে-ম্যাজিক মুহূর্ত নিয়ে আমাদের কারবার, যার সঙ্গে আমাদের যোগের স্থিতিকাল অতীব ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য, ধরা যাক আমি সেটার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলাম, যতটা পারলাম সেটাকে টেনে বাড়াতে সুরু করলাম। যেন একটা অতি সাধারণ রবারের বেলুন, ছোটছোট ছেলেমেয়ে যা নিয়ে খেলা করে, ধরা যাক তেমনই একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে সুরু করলাম, ফোলাচ্ছি, ফোলাচ্ছি, সমানে ফুলিয়ে চলেছি, শেষে সেটা যখন প্রায় ফাটে-ফাটে, স্পষ্ট দেখছি তার সর্বাঙ্গে আর্তস্ফীত-জর্জরিত শিরা-উপশিরার নীল বিদ্যুৎ ককিয়ে কাঁদতে চাইছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষান্ত হলাম, তার মুখটি সযত্নে বাঁধলাম সূক্ষ্ম শক্ত সুতো দিয়ে। তারপরে সেই অনন্ত দুঃখের আলেখ্যটিকে, সেই ভাষা ও ভাষাহীন-ভাষার স্পন্দিত আর্তনাদকে সামনে রেখে ধন্য ভক্তের মতো নতজানু হলাম, নমাজ পড়তে সুরু করলাম।
>
> শেষে আরো একবার সকলকে নমস্কার করে আমার সেই বাংলা ভাষায় কসরতের সামান্য কিছু নমুনা এখানে দিচ্ছি।

এই রূপকটি অন্ততঃ আগেরটির চাইতে বোধ্যতর, গ্রাহ্যতর, যদিও 'অনন্ত দুঃখের আলেখ্য', 'স্পন্দিত আর্তনাদ', বা 'নতজানু' হয়ে 'নমাজ' পড়ার মতো রোম্যান্টিক বা পূজাধর্মী প্রতিমার পাশে 'কসরতের' সার্কাসধর্মী প্রতিমাটিকে আবার একটু বেখাপ লাগে।

§

কবি যে তাঁর ভাষার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে একটা মূল্যবান পথনির্দেশক। লোকনাথের কবিতার ভাষা সত্যিই স্বতন্ত্র ; এ বইয়ে সবগুলি কবিতাই গদ্যকবিতা। যদিও *কবিতা* পত্রিকায় আশৈশব তাঁর কবিতা পড়েছি, তাঁর আগেকার বইগুলি আমার কাছে নেই ; এমন কি, এখন ভাবলে আফসোস হয়, তাঁর বিখ্যাত র‍্যাঁবো-অনুবাদ *নরকে এক ঋতু*-র কয়েকটি কপি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে নাভানার তরফে বিলেতে বিক্রি পর্যন্ত করেছি একসময়ে, কিন্তু বোকার মতো সবই বিক্রি ক'রে ফেলেছি, একটিও নিজের জন্য রাখি নি। ছিয়াত্তর বা সাতাত্তর সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে একটি সেমিনার দেওয়ার জন্যে অন্য অনেক আধুনিক কবিতার সঙ্গে লোকনাথের *মই, ময়ূর, মন* আর *হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ* লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েছিলাম। সে-দুটি বইয়ের কবিতাগুলিও ছিলো গদ্যকবিতা ; বেশ মনে আছে যে তাদের ভাষা আমার মনে দাগ কাটে। সৌভাগ্যবশতঃ, সেই পাঠের চিহ্নস্বরূপ কিছু নোট ফুলস্ক্যাপ পাতায় নথিবদ্ধ হয়ে আজও আমার কাছে আছে। নিজেরই দিঙ্‌নির্ণয়ের সুবিধার্থে সেই নোটগুলির দিকে একটু তাকাচ্ছি।

লোকনাথকে আমার মনে হয়েছিলো একজন পরিণত পুরুষ, একজন প্রাসঙ্গিক কবি, যিনি সদর্থক, আস্থাশীল, ঋজু, যিনি জানেন ভালোবাসার মূল্য, জানেন যে আকাশ, হাওয়া, অরণ্য—এরা তাঁর ভাই। 'নিমন্ত্রণ', 'দেরি পনের মিনিট', 'নেংটি ইঁদুর' বিশেষ ভালো লেগেছিলো দেখতে পাচ্ছি। লোকনাথ যে ভালোবাসতে পারেন, ভালোবাসতে পারার গুরুত্ব বোঝেন, সেইটেই অন্য অনেক আধুনিক কবির ভালোবাসতে-না-পারা-স্বরূপ অক্ষমতার পাশাপাশি তাঁর কবিতাকে আমার কাছে বিশেষভাবে মূল্যান্বিত ক'রে তুলেছিলো। আমার নোটে টুকে-রাখা লাইনগুলি থেকে তিনটি টুকরো এখানে দিচ্ছি। *মই, ময়ূর, মন* থেকে প্রথম টুকরোটি এইরকম :

> আছে আকাশ জানি, আছে কমলাবর্ণের রোদ, তবু আর নেই কবিতা জীবনে, নেই মনে—শুধু কবির নামে অকবির অগভীর দৌরাত্ম্য আছে। পাল পাল গাধার বড় বড় কান হাওয়ায় নড়ছে। মিথ্যুক, দাম্ভিক, বাচাল গাধা, নপুংসক। পুরুষাঙ্গ ওদের প্রকাণ্ড কাঁচি দিয়ে কাটো।

> এর চেয়ে ভালো নিথর নীরবতার রাত, আশাহীন ভাষাহীন নিষ্প্রভাত। হে ঈশ্বর, নীরবতা দাও, এই অকবিগুলোকে চুপ করাও, আর ঐ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের লাউডস্পীকারকে।

> হে ঈশ্বর, প্রেম দাও ভাইকে ভালোবাসার, ভাইকে প্রেম দাও আমায়

ভালোবাসার, দাও সহজ শুচিতার গন্ধ মনের নাসিকায়—কবিতা পরে হবে।

ঐ বই থেকে দ্বিতীয় টুকরোটি এইরকম :

এমনই ভাগ্য, শুধু যাওয়ার মুখেই বলতে হ'ল বহু দুঃখে শেখা এই কথা : কাব্য বাক্যের রকমফের নয়—ভালোবাসা ; নয় আকাশ বা বাতাস বা হাহুতাশ বা এদিকের এই গোঙানিটা আর ওদিকের ছ্যাবলা ছেলেটা, কিন্তু মাটির সহজ সরস গন্ধ, কাছের ভাইয়ের চোখে চিনে-নেওয়া জ্যোতি।

আর এই ভালোবাসাটাও বড় বিচিত্র ব্যাপার, শিখতে হ'ল। ভালোবাসব বললেই বাসা যায় না, দুটি হৃদয় এক হ'তে পারে শুধু জড়তাকে প্রাণপণ থাপ্পড় মেরে, মাত্র পারস্পরিক একটি আজীবন দুঃখের সংগ্রামের সাধনায়। কাব্য সেই সাধনার জীবন্ত জ্বলন্ত অক্ষর, সেই থাপ্পড়—ছাপাখানার টাইপ নয়।

আমরা পাষাণ-পাগল—প্রাণ-নদী পাশ দিয়ে ব'য়ে চলে, জলটা ছুঁলামও না।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী—কিন্তু তোমরাও আসছ তো ? আমাদের সকলেরই যাবার সময় হ'ল।

তৃতীয় টুকরোটি *হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ* বইটি থেকে :

ভূত এড়াতে যে-খ্যাপা রামনাম জপে, অনেকটা তারই মতো আমি আওড়াই প্রেমের মন্ত্র, প্রেম-প্রেম-প্রেম-প্রেম, আর পথ কাঁপে, পা কাঁপে। বিশ্বাস কর আর নাই কর, সে-উচ্চারণের এমনই নিহিত শক্তি, কখন এই অন্ধকারে মানুষকে ভালোবেসে ফেলি, মরুতে ফুল ফোটে, যেন নিজেরই অজান্তে।

কী ভালো যে লাগে, মজ্জায় কী মধুবাত, যেন আরোগ্যের শয্যায় রোগী লাল তাজা কমলালেবুর রস পথ্য করে—এক ঢোঁক, দুই ঢোঁক, তিন ঢোঁক, যত চাও তত ঢোঁক প্রাণ ভরে।

মানি, এটা আসে নি সঙ্গে সঙ্গেই, রাতের প্রথম প্রহরেই, কারণ মনে তো

পড়ে—পড়ে না?—সেই গ্রাম যা পেরিয়ে এলাম, যেখানে বুড়োদের দেখেছি শকুনের চোখ, শিশুরা সম্ভাব্য খাদ্য তাদের। আর সে কী কাদা, সে কী কাঁটার ঝোপঝাড় এবড়ো-খেবড়ো পথের।

তবু প্রেম-প্রেম-প্রেম-প্রেম, তাই এই দ্বিতীয় প্রহরেই প্রান্তর যাদুবলে দরবারি কানাড়ার নিসর্গ, স্নিগ্ধ আমেজ গাছের নিশ্বাসে, যেন বীণাও বাজে কোথাও।

§

অর্থাৎ কবি লোকনাথের দুটি বৈশিষ্ট্য আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিলো: প্রথমতঃ, তাঁর গদ্যকবিতার ভাষার টানটোন, দ্বিতীয়তঃ, প্রেমের জরুরত সম্পর্কে তাঁর প্রখর চেতনা। তাঁর ভাষার পেশীময়তা ও গতিশীলতা আজও বজায় আছে। সেটাকে 'কসরত' বলবো না, বরং বলা যায় বাংলাভাষাটাকে নিয়ে তিনি একধরণের মুদ্রাময় ভরতনাটাম্ নেচেছেন। বাক্যের ন্যায্য অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক বিন্যাসকে তিনি কখনো লঙ্ঘন করেন না, লঙ্ঘন না ক'রেই খেলা দেখিয়ে যান। তাঁর নিজস্ব ছন্দের ব্যাপারে তাঁর কানও সদা-সজাগ।

কুড়ি বছরেরও বেশী সময় আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত সেই সেমিনারে আমি বলেছিলাম, আমাদের কবিতার উপরে সিম্বলিস্ট ইমেজিস্ট ইত্যাদিদের প্রভাব বড্ড বেশী পড়েছে, সেই প্রভাব সর্বদা স্বাস্থ্যকর হয় নি। সাধারণভাবে বলা যায়, এ প্রভাবটা গ্রহণ করার দিকে আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, কারণ আমাদের সভ্যতায় প্রতিমা ও প্রতীকের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মে পুরাণে আচার-অনুষ্ঠানে লোকশিল্পে কারুশিল্পে রূপকথায় আমরা ব্যাপকভাবে এটা দেখতে পাই। হাজার হোক, আমরা প্রতিমার পূজা করি, এবং আমাদের মধ্যে যতজন পূজারী, দেবতাও ততজন। যে-যার মাটির প্রতিমা গ'ড়ে তাকে ফুলচন্দনে পূজা দিতে আমরা সিদ্ধহস্ত, এবং ঐতিহাসিক কৃতী ব্যক্তিদের দেবতা বানানো আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস। একটা সংস্কৃতির বিভিন্ন অভ্যাসগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ শক্ত যোগসূত্র থাকে। ব্যক্তিগত প্রতিমা-প্রতীক যে আমাদের কবিতার বাচনভঙ্গিকে গ্রাস করবে তা খুব একটা বিচিত্র নয়। আমাদের কবিতার মঞ্চ তেত্রিশ কোটি ভঙ্গুর নাচিয়ে পুতুলে ছয়লাপ।

অন্য দিকে বুদ্ধির চর্চার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনও দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত। যদিও বিংশ শতাব্দীর এই সায়াহ্নে বেশ বোঝা যায় যে দেশান্তরিত পেশাদার বাঙালী স্ত্রীপুরুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন, অর্থাৎ দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই এমন কিছু উৎস রয়েছে যেখান থেকে অন্ততঃ খানিকটা তৈরি হয়ে

এই-সব পেশাজীবীরা নিজেদেরকে বাইরে রপ্তানি করতে পারেন, তবুও সেই-সব উৎস বাংলাভাষাশ্রয়ী চর্চার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৌদ্ধিকতা ঢোকাতে পারে না, কেননা তাদের মুখ ফেরানো থাকে বৌদ্ধিক চর্চাগুলো ইংরেজীর মাধ্যমে করার দিকে। তবে আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার ধারণা, গত দুই দশকে এ ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। কিছু কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তির তন্নিষ্ঠ চেষ্টার ফলে, শিক্ষিত শ্রেণীর ক্রমপ্রসারের ফলে, একটু জলমেশানো হলেও মিডিয়ার মাধ্যমে নানা ধরণের জ্ঞানচর্চার খবরাখবর পাঠকদের মধ্যে ক্রমপ্রচারিত হচ্ছে ব'লে, বাংলা গদ্যে বৌদ্ধিকতার প্রবাহ আগেকার চাইতে বেড়েছে। লিট্‌ল্ ম্যাগাজ়িন থেকে বাণিজ্যিক কাগজ পর্যন্ত নানা ধরণের মাধ্যমই এই প্রক্রিয়ায় কমবেশী ভূমিকা পালন করছে।

তৎসত্ত্বেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যে বৌদ্ধিকতার প্রকাশ সম্পর্কে একটা অ্যালার্জি এখনও কাটে নি। বৌদ্ধিকতার পেশীময় প্রকাশ সৃষ্টিশীল বাচনের অন্তর্গত হলে অনেকেই আপত্তি করতে থাকেন। 'অ্যাঁ, যুক্তিতর্ক আছে? তা হলে তো ওটা কবিতা হয় নি, বা উপন্যাস হয় নি, বা নাটক হয় নি, প্রবন্ধ হয়েছে।' আর আলোচনার ফোরামেও দেখা যায় যুক্তির প্রতি একটা অনীহা। কে না জানেন পত্রিকায় পত্রলিখিয়ে সেই-সব ব্যক্তিদের, যাঁরা যুক্তির সড়ক ধ'রে চলতে নারাজ, কিছু দূর এগিয়েই 'আমার মতো একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে ...' ইত্যাদি ব'লে নিষ্কৃতি পেতে চান, এবং বোঝাতে চান যে আলোচনার লক্ষ্যটা বিশ্বাসে মিলতে পারে কিন্তু 'তর্কে বহু দূর'।

তাই সাধারণভাবে এ কথা এখনও সত্য যে ভাষার পুরো সম্পদকে কবিতাসুদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট ব্যবহার করা হয় না, বা যাঁরা করেন, করতে চান, তাঁদের কাজের প্রতি সেরকম মনোযোগ দেওয়া হয় না। আমাদের ভাষায় প্রতিমা-প্রতীকের ছড়াছড়ি, কিন্তু ভাষার যেটা নৈয়ায়িক দিক, বাক্যগঠনের দিক, শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের দিক, ধাপে ধাপে অণুচ্ছেদে অণুচ্ছেদে স্তবকে স্তবকে তর্কগঠনের দিক, সেটার প্রতি আমরা অপেক্ষাকৃত উদাসীন। আমার নাটক *রাতের রোদ*-এর দ্বিতীয় দৃশ্যে বিবি চরিত্রের মাধ্যমে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, জীবনানন্দর কিছু বিখ্যাত লাইনের মানে, যা আমরা কয়েক দশক আগেও নির্ভুল বুঝতাম, বাক্যগঠনের নিহিত ন্যায়ের প্রতি পরবর্তী যুগের পাঠকদের উদাসীনতার ফলে সাধারণ মানস থেকে কিরকম আশ্চর্যভাবে মুছে গেছে। আমরা ইমেজগ্রস্ত মানুষ। 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা'র ইমেজটা আমাদের এমনই আবিষ্ট ক'রে রাখে যে 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' আর 'তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয় [থাকবে]' এই দুটো লাইনের কন্‌ট্রাস্টকে যে হিসেবের মধ্যে নিতে হবে, তা আমরা ভুলে যাই। পরিণামে, জীবনানন্দীয় চিত্রকল্পের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' প্রতিমাটির আসল দ্যোতনা যে সামুদ্রিক, তা পর্যন্ত আমাদের চেতনা থেকে হারিয়ে গেছে।

বাক্যের ভিতরকার সিনট্যাক্স এবং বাক্যদের পরস্পরসম্পৃক্ত বিন্যাস অর্থপ্রকাশের একটি জোরালো মাধ্যম, যা বাংলা লেখায় অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। আমাদের একটা বিশেষ মুশকিল এই যে বাংলায় ক্রিয়াপদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। প্রথমতঃ তারা সংখ্যায় কম, দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্রিয়াপদ বিশেষ্য + ক্রিয়াপদ এই ফর্ম্যুলায় দুটো শব্দে তৈরি—যেমন, 'সাঁতার কাটা', 'ব্যাখ্যা করা', 'চুরি করা' ইত্যাদি—যার ফলে ক্রিয়ার সজোর ধাক্কাটা ক'মে যায়। ক্রিয়াপদের সাবলীল ব্যবহারের গুণে ভাষায় আসে পেশীময়তা, গতিশীলতা; ক্রিয়াপদগুলো ধাক্কা মেরে মেরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে। আর প্রতিমা-প্রতীকের প্রতি অত্যধিক আসক্তির ফলে ভাষায় আসে চালচিত্র এফেক্ট : বিশেষ্য-বিশেষণের ডালা উজাড় ক'রে টুকরো টুকরো মালমশলা নিয়ে গ'ড়ে তোলা হয় একটা অলংকৃত দৃষ্টিরঞ্জন চালচিত্র।

লোকনাথের মস্ত গুণ এই যে বৃহত্তর অর্থের সিনট্যাক্স—বাক্যের ভিতরকার এবং বিভিন্ন বাক্যের পরস্পরসম্পর্কের বিন্যাস—তাঁর কাব্যকলার খিলানমধ্যবর্তী প্রস্তর। প্রতিমা-প্রতীককে তিনি মোটেই অগ্রাহ্য করেন না, বরং এদের ব্যবহারে তাঁর ঈশিত্ব ঈর্ষণীয়। কিন্তু সেই-সব মণিমুক্তাকে তিনি গ্রথিত করতে জানেন সিনট্যাক্সের সূক্ষ্ম অথচ শক্ত সুতো দিয়ে, খানিকটা তাঁর সেই চূড়ান্ত ফোলানো বেলুনের মুখে সুতো বাঁধবার মতো ব্যাপার। খাপখোলা তলোয়ারের মতো তিনি ব্যবহার করতে পারেন গদ্যকবিতার বাক্যগঠন ও বাক্যবিন্যাসকে। মিস্টিকাল বা ম্যাজিক্যালের ঘোড়ার পিঠে চেপে নানারকমের খেলা দেখানো সত্ত্বেও তিনি কখনো ছেড়ে দেন না লাগামটাকে বা অশ্বারোহীর জুতোর ধারাল খুরকে, বরং নৈয়ায়িকতার সেই বল্গা আর খুরের খোঁচার সাহায্যেই অশ্বটিকে চালনা ক'রে তাঁর খেলা দেখান। এইখানেই তাঁর জিত।

অতি বিশিষ্ট অন্ধজন—এই নামটিই কি প্রতীকধর্মী নয়, শুনলেই কি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র বা চোখে-রুমাল-বাঁধা গান্ধারী, অন্ধ-হয়ে-যাওয়া হোমার বা মিল্টন, বা ঐরকম কোনো মূর্তি—মাননীয় অথচ অসহায়? এবং কিছুটা যেন সেই প্রতিমার অন্তর্নিহিত ন্যায় মেনেই এই বইয়ের অনেক কবিতাতেই পাওয়া যায় দৃশ্যতা আর অ-দৃশ্যতার একটা দুর্লভ সহাবস্থান। তাঁর ভাষায় দোলায়িত হয় স্বচ্ছতার সঙ্গে অস্বচ্ছতার, মূর্ততার সঙ্গে বিমূর্ততার, ব্যক্তিতার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকতার একটা লীলাখেলা। যদিও একের পর এক দৃশ্য আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, কখনও মনে হয় এক মহাযাত্রার ছবির মিছিল, বা মিউরাল, তবু ঠিক কী ঘটছে তা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেই আর ঠাহর করা যায় না। তখন একটু মনঃসংযোগ ক'রে তাঁর সিনট্যাক্সকে অনুসরণ করতে হয়। তাঁর ন্যারেটিভগুলির অর্থ ধরিয়ে দেওয়া আছে একদিকে প্রতিমা-প্রতীক আর অন্যদিকে নৈয়ায়িকতা এই দুইয়ের টেনশনের মধ্যে, তাদের টানটান খেলার মধ্যে। তাই কি নিজেই তাকে বলেছেন 'কসরত'?

§

আর প্রেম ? 'প্রবেশ' কবিতাটিতে যে-ঘরে তিনি ঢুকেছিলেন, বইয়ের সর্বশেষ কবিতা 'প্রস্থান'-এ সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় বায়ু কোণে বন্দনা করেন 'প্রেমের সান্নিধ্যের দ্রুত অপস্রিয়মান স্মৃতিকে'। এই স্বীকৃতি, এবং বইয়ের উৎসর্গ-উচ্চারণ—'আমার ব্যর্থতার সত্য বেদনাকে'—এই বইয়ের অনুভূতিমালার মূল সূত্রকে ধরিয়ে দেয়। এবং 'প্রবেশ'-এ নারীহত্যার যে-ছবি এঁকেছিলেন তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি যে পূর্ণতঃ অবহিত তা-ও জানিয়ে দিয়ে যান 'প্রস্থান'-এ :

> কারণ কবিতা বললে যাকে কম বলা হয়, বা শুধু প্রার্থিত উচ্চারণ রূপে অভিহিত করলেও যার চূড়ান্ত অপরিহরণীয়তা ও অপ্রমেয় ব্যাপ্তির এক অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত ইংগিতই দেওয়া চলে, তার অনুরণন সমুদ্র হতে উত্থিত দ্বীপের মতো প্রথম জাগে যখন মনে, একমাত্র তখনই ছিল সে সম্পূর্ণ, তখনই ছিল সে প্রাণ, কলকাকলী, সেই আঙুর-ফল। পরে লিখিত বা উচ্চারিত হওয়ার প্রণালীতে তার উপর ঘটিয়েছি যে-অনন্ত ব্যভিচার, বুকে বিঁধেছি যে-তীরের পর তীর, মেতেছি রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি যে-খেলায় দেয়ালে-দেয়ালে, তাতে ঐ দ্যাখো লুণ্ঠিতা ধর্ষিতা সে-নারী, সকল পুণ্যার অগ্রগণ্যা, তার চোখের পল্লবে-পল্লবে এখন দেবোপম একটি শিশুর জন্য কত আকুল অভীপ্সার মৃতদেহ, স্বপ্নের আদিগন্ত শ্মশানভূমি।
>
> জানি না তাই প্রাণের ও মৃত্যুর কী-ঘর এই ফেলে যাচ্ছি, এক-একটি দণ্ডের কত ফাঁপানো বেলুন, তাদের চীৎকার, মুখ-ভেংচানো দৈত্য।

আইভি গাছ যেমন পুরোনো দেয়ালকে প্রচণ্ড কামড়ে আঁকড়ে থাকে, আর্তি ও হাহাকারের শাখাপ্রশাখা তেমনি এই কবিতাগুলিকে আঁকড়ে আছে—ভাষার গাঁথনির ফাঁকে ফাঁকে দৃঢ়সংসক্ত এবং জটাজালে বিস্তৃত। বিশেষ দ্রষ্টব্য 'অসম্ভবের রাজ্য', 'কালশিরা', 'উপভোগ্য অতীব এই শব্দ', 'ছুতোর মিস্ত্রীর সাধনা', 'গুম্ফা ও জনৈক লোকনাথ', 'কাঙালী-ভোজন', 'মাংসপেশীর অট্টহাস্য', 'ভালোমানুষের দল', 'ওঠ্‌বোস্', 'অষ্টোত্তর শত ফুলের মালা', 'যখন পুতুল হল প্রতিমা' ইত্যাদি। আর্তি ও হাহাকারকে রূপ দিতে এবং তার সঙ্গে তীব্র বিদ্রূপকে মেশাতে বীভৎস বা গ্রোটেস্কের, বা হিংস্র চিত্রকল্পের ব্যবহার চোখে পড়ে বেশ কিছু কবিতায়। 'মাংসপেশীর অট্টহাস্য'-এর আরম্ভই এভাবে : 'অস্থিচর্মসারও আর তুমি নও, কঙ্কালমাত্র। তবু, আরও একবার,

এসেছি তোমায় চাবকাতে।' গ্রোটেস্ক রসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 'কাঙালী-ভোজন', যেখানে একটি লোকের—

> মধু বেরিয়েছিল একদিন, ক্ষীরের ফল্গু। আজ পেচ্ছাবও বেরোয় না। অন্তত যে-কোনো তরলের একটি ফোঁটারও সাক্ষাৎ নেই, এখনও এখনও নেই—অবশ্য ঘাম ছাড়া।
>
> ঘাম, কারণ কসরৎ প্রচণ্ড। সেই সকাল থেকে চলছে হেঁইও-হো হেঁইও-হো, নিশ্বাস পড়ছে যেন হাপরের হাওয়া, আগুনের হলকা। দেহ নড়ছে ঢেঁকি চালানোর ঘটাং ঘটাং শব্দে। যে হ'তে চেয়েছিল বর্ষার মেঘ, হল না ছুঁচোও, তার কাতরানি দেয়ালে-দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।
>
> আর কতিপয় উজবুক আমরা, এই এখানে, খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এসেছি এ-দৃশ্য দেখতে। এতক্ষণে ওকে নিয়ে আমাদের যত-না লজ্জা, রাগ-করুণা-অভিশাপ, তার চেয়ে বেশি ধিক্কার নিজেদের নিয়ে।

দর্শকরা এসেছে ভেলকি দেখতে, কেননা লোকটি বলেছিলো 'ওর শুক্র হ'তে রোজই ঝরে নাকি রোশনাই, সূর্যাস্তের দিগন্ত, জন্ম নেয় দেবতাদের নন্দন-কানন' ইত্যাদি।

বেশ কয়েকটি কবিতারই কেন্দ্রে আছে একজন অদ্ভুত লোক, যে কোনো-একটা পাগলামি করছে, আর যার কাণ্ডকারখানা দেখতে লোক জড়ো হয়েছে। উভয় পক্ষই কবির স্যাটায়ারের লক্ষ্য। 'ভালোমানুষের দল'-এ একটি লোকের ঘড়ার সব জল প'ড়ে গেছে, তবু সে তার নিজের বন্ধ ঘরে শূন্য ঘড়াটিকে উল্টে ধ'রে আছে জল ঝরাবে ব'লে, আর উঠোনে দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে আছে ভালোমানুষের দল, অর্থাৎ তার পড়শীরা, যারা পায়ে ফোস্কা পড়া সত্ত্বেও জায়গাটা ছেড়ে নড়তে পারছে না। এই থীমেরই একপ্রকারের 'ভেরিয়েশন' দেখতে পাওয়া যায় বইয়ের নাম-কবিতায়, যেখানে একটি লোক একটি মিনারের শীর্ষে উঠে দুন্দুভি বাজাবে, তখন মিরাক্‌ল্ ঘটবে, সেই অলৌকিক ঘটনা দেখবার জন্য সমস্ত নাগরিক সমবেত হয়েছে। সবাই অপেক্ষায় টানটান ; লোকটি, বলা বাহুল্য, উঠছে না, ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ঐ লোকটিই বোধ হয় 'অতি বিশিষ্ট অন্ধজন' : অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিঁড়ি ভেঙে দুরারোহ মিনারে উঠে দুন্দুভি বাজিয়ে তাকে মিরাক্‌ল্ ঘটাতে হবে, সেটাই তার সমস্যা। কিন্তু না, তা নয়—'সম্মানিতের নির্দিষ্ট স্থান অলঙ্কৃত ক'রে দণ্ডায়মান, সুনিশ্চিত দৃঢ় পদে সমাগত, কতিপয় অতি বিশিষ্ট অন্ধজন। তাঁরা দৈববাণী শুনেছেন,

আজ দৃষ্টি পাবেন।' সিনারিওটা এমন, প্রায় মহাভারতের একটি এপিসোড হতে পারতো।

উদ্ভট লোকগুলির খ্যাপামির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। 'জুয়াড়ী'তে নায়ক 'জুয়া খেলে সূর্য-চন্দ্র নিয়ে, ভাবে মহাকাশ তো তার নিশ্বাসেরই বস্তু—খেলে সর্বস্ব পণ ক'রে, ঘরের খুঁটিনাটি, নিজের সুখ-দুঃখ, প্রিয়ার সঙ্গ।' বলাই বাহুল্য, 'খেলায় সে কেবলই হারে, সূর্য-চন্দ্র দিব্যি ঘোরে কক্ষপথে—আর সামান্য যে-সব ধন নিছকই আপনার, তারা করতলগত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের।' খেলা দেখতে ছোট্ট ঘরের মধ্যে ভিড় করেছে আবালবৃদ্ধবনিতা। যে হারছে সে তাদেরই জ্ঞাতিভাই, তাই তাদের সমস্ত সহানুভূতি ওরই জন্য। লোকটির মধ্যে খানিক আছে যুধিষ্ঠিরের আদল, আর আমার নিজের চকিতে মনে প'ড়ে যায় সুমনের গানের সেই পাগলকে, যে 'সাপ-লুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে'। আমার বেশ লাগে আরেকটি পাগলকে, যার দেখা পাই 'দারুণ গ্রীষ্মের দিনান্ত' কবিতাটিতে। লোকটি 'ধুত্তোর' ব'লে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়, আর তার সংসারের সমস্ত আসবাব ধাওয়া করে তাকে—

> ... ও চলেছে বেপরোয়া, হন হন পায়ে, হাতে হাত মুড়ে পিঠে, দৃষ্টি সটাং সামনে, তবু যেন কিছুই দেখছে না। এবং সেই তালে তাল রেখে, রথারূঢ় মূর্তির পিছনে যেমন গদগদ ভক্তের দল, ওর অনুসরণ করছে গোটা একটি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম, হাতপাখা-বিছানা-চাদর-দেয়ালের ছবি, সব ধুলোঝাড়া, ঝকঝকে তকতকে, ভাঙাচোরা কোথাও নয়, ও তারই সঙ্গে ঘনকৃষ্ণ মেঘ একখানি এখানে, বা সূর্যাস্তের এক কণা বিভাসিত আকাশ ওখানে। ...

এই শোভাযাত্রার ছবি যেন কোনো ইয়োরোপীয় রূপকথার মেজাজে আঁকা। গল্প বলা আর কবিতাকে নিপুণ আঁচড়ে মেলানো হয়েছে গদ্যকবিতার দেহে।

কবিতার পর কবিতায় লোকনাথের এই গদ্যকবিতার আঙ্গিক কখনো শ্লথ হয় না, একেবারে টানটান থাকে। বাক্যগুলির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বাদ্যযন্ত্রের উপর একজন অভিজ্ঞ বাদকের মতো ; কোথাও স্বরলিপি থেকে একতিল স্খলন নেই। আর্তির বিচিত্র প্রতিবেদন সত্ত্বেও এই সংগীতনাট্যের সূত্রধার এক তীব্র বৌদ্ধিকতা। প্রচণ্ড রাগ আছে, চাপা কান্না আছে, জ্বালাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, সূক্ষ্ম কৌতুক আছে, কিন্তু কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয় না সস্তা ভাবালুতাকে। এই আত্মসংযমী আঙ্গিকের পরিশীলনের জন্য তাঁর ফরাসী এক্সপোজ্যুর হয়তো কিছুটা কার্যকর হয়েছে। যা আরম্ভ করেছিলেন *লিপিকা*-র চালে, এখন তাতে যুক্ত হয়েছে অন্য এক বেদম জেদী প্রখরতার মাত্রা।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার মতো, মেজাজের এবং আঙ্গিকের এই ঋজুতা

সত্ত্বেও—যার উপর তাঁর পাশ্চাত্য জীবনের কিছু প্রভাব পড়েছে ব'লেই আমার বিশ্বাস—তাঁর কবিতার দৃশ্যপট এবং ঐহিক আসবাব কিন্তু শতকরা নিরানব্বই ভাগ দিশি। যে-পারী মহানগরীতে তিনি অধুনা বাস করেন, তার আবহের বা জীবনচর্যার, অথবা ফরাসী দেশের ভূচিত্রের বা পল্লীপ্রকৃতির প্রায় কোনো প্রত্যক্ষ স্বাদগন্ধ রূপরস এই কবিতাগুলিতে নেই। একবার চোখে পড়েছে 'রাস্তা-ঘাট, উপকণ্ঠে পাইন-বন' ; একবার উল্লেখ পেয়েছি তুষারপতনের ; একবার পেয়েছি অতিথির হাতে তুলে দেওয়া 'গাঢ় লাল মদের পাত্র' ; 'মদের পাত্র' নামে একটি কবিতাও আছে ; একটি আকস্মিক উল্লেখ আছে টেলিফোন-নামক যন্ত্রে পাওয়া বার্তার ; 'জ্ঞাতিভাই' কবিতাটিতে 'পরামানিক', 'মুনিঋষি' ইত্যাদির উল্লেখ সত্ত্বেও মনে হয় এক অন্ধকার সকালের পারী শহরের আলো-জ্বলা নাপিতের দোকানেই ঘটছে ঘটনা ; কিন্তু 'বিদেশীদের একটি মুহূর্ত' নামের কবিতাতেও—যেখানে 'তুমি-আমি বিদেশী এখানে'—লোকেশন ঠিক বিদেশে নয়, কেননা ওখানে দৃশ্যমান শালবনের মাথা। আর সর্বত্র দাপট সেই দেশটারই টুকরো টুকরো ছবির, সাজসরঞ্জামের, ভাবনার, উল্লেখের, উপমারূপকের, চিত্রকল্পের, যে-দেশটা থেকে তিনি এখন প্রবাসী। ভিড় ক'রে আসে এই সমস্ত : জপের মালা, মাদুর, কুলুঙ্গিতে কৌটো, বাঁশঝাড়ে ঢাকা গ্রামের পুকুর, মেলায় কেনা 'কাঠের লাল-টুকটুকে-ঠোঁট বৌঠাকরুণটি', সন্দেশ, রসোমালাই, মোরব্বা, বর-কনে, গামলায় ভিজানো মটরের দানা, সুদর্শন চক্র, তিব্বতী থালা, বাঁদর-নাচ, বটগাছ, দুর্গাপ্রতিমা, তাল-খেজুর, কেয়া, শরতের সোনালী রোদ্দুর, গুরুর মৃদঙ্গ, গঙ্গাসাগর, পেরেকে লটকানো হাতপাখা, মিনার-গম্বুজ-দুন্দুভি, আলপনা-মঙ্গলকলস, কপালে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে শুভ্রবসন জনতা, শঙ্খবাদিনীদের দল, 'সূর্য-চন্দ্র-তারা হাঁটু মুড়ে বসেছে জল-ভর্তি কুঁজোর পাশে' (আশ্চর্য ছবি), শঙ্খচিল, ভগ্নস্তূপ নালন্দা, শ্মশানে সন্ন্যাসিনী, কিনিকিনি-কঙ্কণ রিণিরিণি-নূপুর, প্রাঙ্গণে কলাগাছ, 'মালী জল দেয় জুঁই-বেল-চাঁপার গোড়ায়—অদূরেই কুটীরে মায়েরও স্নিগ্ধ চাউনি', 'গরুর খুরে ধূলার রেখা .. গোধূলির গ্রামে', কাঁঠালিচাঁপা, কনকচাঁপা, মন্দাকিনী, কপালের টিপ, পটুয়া যদুনন্দন চক্রবর্তী আর তার সহধর্মিণী কাদম্বিনী, কুটীরের আঙিনায় কোণে-ফেলে-দেওয়া ভিজে গামছা, এক্কাগাড়ি, দেবদারু-পলাশ, ঐরাবত, মন্দিরের সান্ধ্য আরতি, বীণা, বলদে-টানা গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, ফল্গু, গামছার উল্টো পিঠে কিংখাব, নিষিদ্ধ সবজি ওল, আগমনী, সেপাইয়ের লাঠি, সানাই, টোল-খাওয়া রঙ-চ'টে-যাওয়া পুরোনো সর্ষের তেলের কৌটায় কুড়ানো গোবর, করালবদনা দেবী ইত্যাদি ইত্যাদি। মেজাজ ও আঙ্গিকের পাশ্চাত্যধর্মী টানটান ঋজুতার পাশাপাশি এই-সব দিশি ডিটেলের মিছিল বাস্তবে আর অতিবাস্তবে মেশানো এক বিশিষ্ট দুনিয়া রচনা করে, যাকে একান্তভাবে লোকনাথের ব'লেই চেনা যায়।

এবং মুশায়েরা পত্রিকার একটি প্রাক্তন সংখ্যায় আমি লিখেছিলাম, বিদেশে

বাস করেন বা বিদেশভ্রমণে অভিজ্ঞ বাঙালী কবিদের কবিতায় নূতন দেশের পরিবেশ কিভাবে ঢুকছে তা অনুসন্ধানের যোগ্য একটি বিষয়। লোকনাথের মধ্যে দেশজ উপাদান ও বৃহত্তর পৃথিবীর মিশালটা প্রাতিস্বিকভাবে তাঁর, তুলনীয় অবস্থায় যাঁরা আছেন এমন অন্যদের থেকে তাঁর কক্‌টেলটা ভিন্ন। নিজের কথা ভাবি, আমার সঙ্গে তাঁর কিছু-কিছু মিল পাই, আবার অমিলও পাই। আমার ধারণা, আমার নিজের কবিতায় অব্যবহিত সম্মুখের পরিবেশ, তার খুঁটিনাটি অনেক বেশী প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেয়।

ঘুরিয়ে বলা যায়, লোকনাথের কবিতায় নিকট পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা অনেক বেশী স্পষ্ট। এই বিচ্ছিন্নতাকে তাঁর কবিতার অন্যান্য প্রধান থীম ও মুডের সঙ্গে—আর্তি ও হাহাকারের সঙ্গে, ব্যর্থতাবোধ ও প্রেমের অপস্রিয়মাণ গতির সঙ্গে—সম্পর্কযুক্ত ব'লেই মনে হয়। লোকনাথের কবিতায় নারীর প্রতি মনোভাবের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব সনাক্ত করা যায়, যা আমাকে খানিকটা বিস্মিতই করেছে। নারী তাঁর জগতে একাধারে প্রিয়া, দেবী ও রাক্ষসী ; তার দৈনন্দিন ঘরোয়া রূপটা তেমন চোখে পড়ে না। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, 'পুতুল হল প্রতিমা, পরে হল রাক্ষসী'। নারীদেহের বিভিন্ন স্ত্রীলিঙ্গবাচক অংশ—স্তন, ঊরু, যোনি ইত্যাদি—উল্লেখ পায়, কিন্তু নারীর মস্তিষ্কধারিণী স্বতন্ত্র মানুষী-সত্তাটি তেমন গুরুত্ব পায় না, ফুটে ওঠে না। প্রিয়া নারীর জন্য আকুতি তাঁর কাব্যের বেলাভূমিতে আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে, সেই সমুদ্রগর্জনের মধ্যে মিশে থাকে রোদন, রাগ, জ্বালা, অসহায়তা। নারীধ্যান-আশ্রয়ী কবিতাগুলির মধ্যে এক দ্বিখণ্ডিত সত্তার যন্ত্রণা, নির্ভরশীলতা ও আক্রোশের যৌথ সিন্‌ড্রোম নির্ভুলভাবে শ্রুতিগোচর হয়। কখনও প্রিয়ার ফেলে-যাওয়া টিপ 'দুর্গাপ্রতিমার চোখের মণি' হয়ে লটকে থাকে আয়নার একটি কোণে ; কখনও ভাষা গুনগুন ক'রে ওঠে গানের মতো : 'হাত রেখেছি যে, কী ক'রে না হবে তুমি প্রিয়া ?' . কখনও বেজে ওঠে অকপট বিষণ্ণ স্বীকৃতি : 'যাকে প্রিযা ভেবেছিলাম, সে অনেকদিন আগেই উধাও হয়েছে—সব প্রিয়জন অন্য জগতের বাসিন্দা' ; কখনও দূর থেকে বসন্তবাতাসের সুরভির মতো ভেসে আসে অতীতের উক্তি :

> "আপনি যদি আসতেন, আসতে পারতেন—দরজা খোলা থাকত।" বলেছিল কেউ। কে বলেছিল, কবে ? চোখে কোন্ চাওয়া নিয়ে, বাজিয়ে কোন্ কঙ্কণ-কিনিকিনি সুর ? বলেছিল, "দরজা খোলা থাকবে বসন্তে-শরতে, আলোয়-আঁধারে। যখন সব পাণ্ডুলিপির সাধ চ'লে গেছে স্মৃতিরও অতীত লোকে, কোনো মন্দিরের সান্ধ্য আরতি আর বাজে না, বাজে না।"

কখনও মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেন : 'তুমিই পৃথিবী, তুমিই নারী, তোমার কর্ণ সেই

গন্তব্যের গুহা—তোমারই যোনি অসামান্য স্রোতস্বিনী অগ্নিদাহের পূর্ব পর্বে' ; আবার কখনও ভাষা থেকে ছিটকে পড়ে ভয়ংকর চিত্রকল্পের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—'অসহ্য-অসভ্য-অশ্লীল উন্মাদনা জাগে তোমার যোনিতে পেচ্ছাব করে দিতে' !

পুরো বইয়ে অস্তিত্বের রহস্যের জানান দিতে বিকীর্ণ অসংখ্য টুকরো টুকরো ছবি, সমাধান নেই এমন সব ধাঁধা বোঝাতে আশ্চর্য সব জয়ী রূপক, মনকে যারা ধাক্কা দেয়, মনে আটকে যায়। সমস্ত দাহ ও অন্তর্বিরোধকে ধারণ ক'রেও মাঝে-মাঝেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে আনন্দ ও আস্তিক্যের রসময় দ্রিমিদ্রিমি, ভিখারী বাউল হয়ে নাচতে নাচতে ব'লে ওঠেন—'আনন্দ আছে'। দার্শনিক তিনি, সুন্যায্য সিদ্ধান্তে আসেন : 'তবু ভাগ্যিস, চিন্তাতেই ঠাকুর জেগে রন, যা নেই, তা অন্তত রয়েছে কোথাও।' মিস্টিক হয়ে মৃদুকণ্ঠে নিজেকে আশ্বাস দেন, 'গুরুকে দেখছি না, যদিও পাশেই তিনি আছেনই—নইলে এ-অন্ধকার কী করে শিল্প হল, কেন মন শুনছে মৃদঙ্গ বাজছে ?' আর জীবনমৃত্যু বিরহমিলন নিয়ে তাঁর কবিমনের সমস্ত গুঞ্জরণকে যা একটি নির্ভুল ভারতীয় সুরে বেঁধে রাখে তা তাঁর বিশাল দার্শনিক প্রেক্ষাপট, তাঁর চিত্রকল্পের বৈশ্বিকতা, যা ব্যাপ্ত সূর্যচন্দ্রতারা থেকে ধূলিকণা পর্যন্ত—'যারা পৌঁছোতে পারবে না, তাদের ভগ্ন যাত্রাকে আশ্রয় দাও তোমার নিশ্বাস-ভরা কৌটোয়, যাতে ধ রে রেখেছে পিপীলিকার সারির মতো কত-না পৃথিবী, আজো অজাত কত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, কত ধ্বংসের ভস্ম, পাপড়ির আড়ালে সঞ্চিত কত সৃষ্টির সম্ভাবনার ঔরস।' বেশ লাগে কতগুলি কবিতা, যেখানে ব্যর্থতার বেদনাকে ছাপিয়ে স্বনিত হয়ে ওঠে একরকমের মজা, বা ফুটে ওঠে সৌন্দর্য, দার্শনিকতা দ্বারা আক্রান্ত দৃশ্যতা : 'জ্যোতির মহল', 'নমস্কার', 'মই', 'চতুরানন', 'কেষ্ট ঠাকুর', 'একদিন শ্রদ্ধায়', 'গৌরচন্দ্রিকা', 'দুগ্‌গা প্রতিমা', 'এ-ফুলদানিতে ফুল', 'গুরুর মৃদঙ্গ বাজছে', 'ফুলের বাগানে হরিণ', 'মধ্যবর্তী বিন্দু', 'শরৎ-বসন্ত', 'জাগরূক', 'গুঁতো', 'সানাই', 'সর্বক্ষণ', 'ঋত্বিক' ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারি, তিনি ভুলে যান নি কবিতার সেই সংজ্ঞার্থ, যা তিনি আগে দিয়েছিলেন—যে কাব্য বাক্যের রকমফের নয়, তা ভালোবাসা। আগেই বলেছি, লোকনাথের এই কবিতাগুলিতে স্পষ্টতা আর অস্পষ্টতার একটা ক্রীড়া আছে—রোদ আর ছায়ার খেলার মতো।

অগত্যা পাঠারম্ভের প্রথম দিকের সেই প্রতিরোধের মনোভাব সত্ত্বেও, নারীর প্রতি তাঁর দ্ব্যর্থক মনোভাব সত্ত্বেও, আমার পাঠক মনকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হয় এই বইয়ের মর্যাদা। যাঁর যা দেবার তা-ই তিনি দিতে পারেন। তা-ই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট হতে হয়। অনেকগুলি ভালো কবিতা তিনি আমাদের এখানে উপহার দিয়েছেন, যাদের মধ্যে অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুঝদার দৃষ্টি বিধৃত—বইয়ের নামকরণ সত্ত্বেও, যেখানে ঠিকরায় এক কূটাভাস। এতগুলি ভালো কবিতা একসঙ্গে পড়তে পারা এক বিশেষ সুযোগ, এবং এ সুযোগ আমাদের পাইয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রকাশকের।

লোকনাথ আমাদের সময়ের একজন বিশিষ্ট কবি। প্রবাসী ব'লে, এবং হয়তো একজন সিরিয়াস কবি ব'লেও—যাঁর কণ্ঠস্বর হুজুগের তারে বাঁধা নয়—আজকের দিনের মিডিয়ার হট্টগোলের কলকাতায় তাঁর যথাযোগ্য সম্মান হয়তো তাঁকে দেওয়া হয় না। তাঁর কবিতাসমগ্র প্রকাশিত হওয়া জরুরী, যাতে তাঁর সমস্ত কবিতা একসঙ্গে প'ড়ে তাঁর বিবর্তনকে আমরা অনুসরণ করতে পারি। এবং এই প্রসঙ্গে আমার নিজের দুটি জিজ্ঞাসা আছে, যা এখানে উপস্থিত ক'রে রাখছি। প্রথম প্রশ্ন ফরাসী দেশে অভিবাসী আরবী ভাষার কবি আদনিস সম্পর্কে *এবং মুশায়েরা*-য় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে: পর ও আপন, নিজত্ব ও অপরত্বের অনুষঙ্গে তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন তাঁর আঙ্গিক নিয়ে: গদ্যকবিতায় তাঁর সিদ্ধি অসাধারণ, কিন্তু কবিতার অন্য ফর্ম নিয়ে তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন না কেন? ভালোবাসার সাধনায় যেমন, তাঁরই ভাষায়, 'জড়তাকে প্রাণপণ থাপ্পড়' মেরে মেরে এগোতে হয়, আমার ধারণা কবিতার সাধনাতেও অনুরূপ একটা প্রয়োজন আছে। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা সেই থাপ্পড় মারা, যা আমাদের এগোতে সাহায্য করে। এবং সেই সিদ্ধির সঙ্গে জীবনের ব্যর্থতাবোধগুলিকে অতিক্রম করতে পারার, ব্যর্থতার পাশাপাশি সার্থকতাগুলিকেও একটা সারিতে সাজিয়ে নিয়ে দেখতে পারার একটা নিহিত যোগ আছে। কিছু কিছু ব্যর্থতাবোধ আমাদের প্রত্যেকেরই আছে, নয়তো আমরা মানুষ হতাম না, দেবতা হতাম। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা করার আনন্দে মশগুল থাকতে পারলে অনেক ব্যর্থতাবোধকে ভুলে থাকা যায়, মাইলফলকের মতো তাদের পেরিয়ে আসা যায়, এবং জীবনের যাত্রাপথে প্রাপ্তিগুলিকেও সূর্যালোকিত তালবন বা পপ্‌লার-সারির মতো চিনে নেওয়া যায়। জীবনের কাছ থেকে এর বেশী যে প্রত্যাশা করা যায় না, তা লোকনাথও জানেন। তিনি কি মনে রাখবেন যে 'ব্যর্থতার সত্য বেদনাকে' শিল্পে অব্যর্থভাবে রূপ দিতে পারাও একপ্রকারের সার্থকতা, এবং তাঁর 'ব্যর্থতার সত্য বেদনাকে' উৎসর্গ-করা বইয়ের পর অন্য কোনো বইয়ে আমরা কি তাঁর কাছ থেকে পাবো না তাঁর সার্থকতাও যে সত্য তারই স্বীকৃতি? আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেকটা ছোট, তবু আশা করি যা বলতে চাইছি সেই কথাটা তিনি ভেবে দেখবেন।

[*এবং মুশায়েরা,* লোকনাথ ভট্টাচার্য বিশেষ সংখ্যা (৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র ১৪০৫, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮ ও জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯)। শুনেছি লোকনাথ নাকি আমার এই সমালোচনা-প্রবন্ধটির তারিফ করেছিলেন। আশা ছিলো কোনোদিন তাঁর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় মুখোমুখি বসতে পারবো, কিন্তু তিনি তার আগেই চ'লে গেলেন! একদা পারীতে ঝর্ণা বসুর গৃহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিলো। পরবর্তী কালে কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে।]

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ :
উদ্যোগের পশ্চাদ্ভূমি স্থাপন

এ কথা বরাবরই মনে মনে জানতাম, যদি রবীন্দ্রনাথের পর অন্য কোনো বাঙালী কবির কবিতাগুচ্ছ গ্রন্থাকারে ইংরেজীতে অনুবাদ করি, যদি কখনও সে-কাজ করার সময় পাই বা সুযোগ আসে, তা হলে আমাকে সর্বাগ্রে অনুবাদ করতে হবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা। মনের ভিতরে ইচ্ছে থাকলেও তেমন কোনো উদ্যোগ নিজের প্রবর্তনায় আরম্ভ করা হতো কিনা সন্দেহ। হয়তো বিশেষতঃ এই কারণেই যে রবীন্দ্রকবিতা অনুবাদের দায়িত্ব যখন গ্রহণ করি তখন তা করেছি মনের এক নির্মল আনন্দ নিয়ে, যাকে বলা যায় 'ইনোসেন্স'-এর আনন্দ, আর ইতোমধ্যে আমার কানে বেজেছে 'এক্সপিরিয়েন্স'-এর দামামা—'স্ট্র্যাটফোর্ড অ্যাফেয়ার'-এর পরবর্তী ঘূর্ণিবাত্যা। অবাঙালী পাঠকদের কাছে বাঙালী কবিকে পৌঁছে দিতে চেয়ে যদি অকারণে গালি খেতে হয় পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের কাছ থেকেই, তা হলে সেই জাতের কাজে সহজ আনন্দ বা উৎসাহ বোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে বৈকি। অনুবাদ করেন নাকি কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা, যাঁদের নিজেদের সৃষ্টিশক্তি নেই কেবল তাঁরাই নাকি কালজয়ী কবিদের নামের পাশে লেজুড় হিসেবে নিজেদের নাম ছাপিয়ে কিছু দিন বেঁচে থাকার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাব্যানুবাদের চেষ্টা ক'রে থাকেন—*দেশ* পত্রিকায় এমন মত পেশ করেছিলেন এক পত্রলেখক। আরও একজন আমাকে কলকাতা থেকেই ইংরেজীতে লেখা চিঠিতে শাসিয়েছিলেন, আমাকে যে-পিটুনি ('bashing') দেওয়া হয়েছে সেটা আমি ডিজার্ভ করি, নিতান্ত দরকার হলে তবেই যেন অনুবাদ করি, নিজেকে যেন 'ওভার-এস্টিমেট' না করি।

নিজেকে ওভার-এস্টিমেট করা কোনো কালেই আমার ধর্মও নয়, কর্মও নয়। তাই তখনই আমার মন ব'লে উঠেছিলো, ছি-ছি, না না, ওসব কাজ তা হলে থাক, বাঙালী কবিদের কবিতার অনুবাদ করাটা আমার জীবনে তেমন কোনো নিতান্ত জরুরী ব্যাপার নয়। চলার পথ অনেকই আছে। ঐ রাস্তাটা বাদ দিয়ে বরং চ'লে যাওয়া যাক অন্য দিকে।

এমনই সময় অনেক বছর বাদে কলকাতায় যোগাযোগ ঘটলো বাল্যকাল ও কৈশোরের পরিচিতা রুমি অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তী বসু সিং-এর সঙ্গে। পঞ্চাশের দশকের পর এই প্রথম আবার আমাদের দেখা হলো, যদিও মাঝখানে একবার আমাদের পত্রবিনিময় ঘটেছিলো। আমি তখন বর্ধমানে অতিথি-অধ্যাপিকা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিভাগে সেমিনার দেবার জন্যে দময়ন্তী আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সব ঠিক, ট্রেনের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে, এমন সময় ওখানকার কর্মচারীদের ধর্মঘটের দরুন সব ব্যবস্থা উলটপালট হয়ে যায়। পরবর্তী কালে দময়ন্তী স্থিত হন কানপুরে। তিনি দীর্ঘকাল কলকাতার বাইরে ছিলেন ব'লেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়ে ওঠে নি। যা-ই হোক, বহুদিনের ব্যবধানে ১৯৯৭-এ আমাদের যখন আবার দেখা হলো তখন তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে অনুরোধ করলেন ইংরেজীতে বুদ্ধদেবের একটি 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স্‌' সংস্করণ প্রস্তুত করতে—সম্পূর্ণ নতুন অনুবাদগুচ্ছের মাধ্যমে। এমন কম্ম আর করবো না যখন মনস্থ করেছি ঠিক তখনই আমার মনের ভিতরমহলের একটা সুপ্ত সংকল্পকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন, উস্কে দিলেন।

এমন নয় যে আমার আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছিলো। আমার রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে একেবারে অসার্থক হয় নি তা টের পাই মধ্যে মধ্যেই—কেবল পেশাদারী সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া থেকে নয়, ছোট ছোট ঘটনা থেকেও—যেমন, যখন আমার পরিচিত এক ইংরেজ বৃদ্ধা এসে বলেন, তাঁর মৃত স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমার অনুবাদে 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে' পাঠ করা হয়েছে। মহিলাটিকে আমি অন্তরঙ্গভাবে চিনি না, আমরা একই সেমিনার-সিরিজে যাতায়াত করেছি সেই সূত্রে আলাপ। জানি যে তিনি উচ্চশিক্ষিত, বিদগ্ধ মানুষ। আমার অনুবাদের বইটি কিনেছিলেন, মন দিয়ে পড়তেন ; তাঁর স্বামীও নাকি পড়তেন ; মধ্যে মধ্যে সে-সব কথা বলতেন আমাকে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সময়ে আমি অক্সফোর্ডে ছিলাম না। খবরটা পরে পেলাম। বিগত স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের গানের অনুবাদ পড়তে হবে, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মহিলাটির নিজের, টেক্সটের নির্বাচনও তাঁর—এর মধ্যে আমার কোনো প্ররোচনা নেই। এরকম সময়েই চকিতে বুঝতে পারি, সার্থক হয়েছে শ্রম।

যে-কোনো সৃজনশীল কাজ ঠিক ক'রে করতে গেলে মনের একটা উজ্জ্বলতা আর নির্মলতা লাগে। অন্যায় আক্রমণের প্রহারে সেই উজ্জ্বলতা আর নির্মলতার উপরে একটা মলিনতার আবরণ প'ড়ে যায়। তখন ক্লান্তি আসে, অন্য দিকে চ'লে যেতে ইচ্ছে করে। তেমনই এক সময়ে মলিনতার সেই আবরণকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দময়ন্তী আমার কাব্যানুবাদ-ক্ষমতায় আস্থা স্থাপন করলেন, তাঁর বাবার কবিতা অনুবাদ করতে অনুরোধ ক'রে আমাকে সম্মান জানালেন। তিনিই কি আমাকে ওভার-এস্টিমেট ক'রে বসলেন ? ! জানি না, কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি নি। রাজি হয়ে গেছি। সে-সময়ে আমাদের মধ্যে নানান আলোচনা হয়। বুদ্ধদেবের মতো নির্মলহৃদয় মানুষকেও যে নানা সময়ে কত অন্যায় আচরণ আর ভিত্তিহীন অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে সে-সমস্ত খবরের টুকিটাকি জানতাম, কিন্তু অনেকটাই জানতাম না। সেই সব আলোচনা আমাকে সাহায্য করে। আবিলতার আবরণটা স'রে যায়, আসল স্বভাবটা

আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেবের নবতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে দময়ন্তী যে-কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার মধ্যে একটি কাজ হলো একটি স্মারক সংকলনগ্রন্থের সম্পাদনা। এই স্মারক সংকলন চলতি বছরে (১৯৯৯) প্রকাশিত হবে। আমার অনুবাদের প্রথম ফসলের কিছু নমুনা সেখানে বেরোবে। কৌতূহলী পাঠকদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি।[১]

যে-কাজ করতে ভালোবাসি, যার গুরুত্বে আমি প্রত্যয়ী, তার দিকে সানন্দে এগিয়ে যাওয়াই আমার স্বধর্ম, কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে কাজের যে-দিকটার অভিমুখে সোৎসাহে এগিয়ে যাই সেটা তো হলো বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দিকটা, যেখানে টেক্সটের সঙ্গে আমার মোকাবিলা, একটা কবিতা থেকে আরেকটা কবিতা সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জ ও আনন্দ। সেই দিকটা ছাড়াও এ ধরণের দায়িত্বের আরও কিছু জটিল সমস্যাকণ্টকিত দিক থাকে, যেমন: কাজ চলাকালীন যে কাজ করছে তার ভরণপোষণ, কাজ হয়ে গেলে বই ছাপানো, ছাপানোর পর যাদের জন্য অনুবাদ করা হয়েছে তাদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া। এই দিকগুলি সামলানোই কঠিনতর। বিশ শতকের একজন অগ্রগণ্য ভারতীয় কবির কবিতা ইংরেজীভাষীদের জন্য অনুবাদে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হলে সেই উদ্যোগের রণক্ষেত্র ও দিগন্ত সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। 'ভূমি' না লিখে ইচ্ছে ক'রেই 'রণক্ষেত্র' কথাটা লিখলাম। কেন, তা স্পষ্ট হবে বর্তমান রচনার পরিসরের মধ্যেই। বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই 'সিনারিও' সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা স্পষ্টতর করতে চাই। আমার মনে হয় এই প্রেক্ষাপটটা বুঝে নেওয়া আমাদের পক্ষে জরুরী। কে অনুবাদ করছে, কাদের জন্য করছে, কী অবস্থায় কোন্ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে করছে, সেই সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের কারা পৃষ্ঠপোষক, কারাই বা বিঘ্নসৃষ্টিকারী—আমি চাই যে আমার পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুরা এই ব্যাপারগুলি বুঝুন। না বুঝে 'আমাদের লেখকদের অনুবাদ হচ্ছে না' ব'লে আফসোস ক'রে কোনো লাভ নেই। একজন অনুবাদক কী করতে পারে, আর পারে না, তা একটা সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই দেখতে হবে, বুঝতে হবে।

সর্বপ্রথমে সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটা কথাই মনে আনা যাক। আদৌ কেন সাহিত্যের অনুবাদ করা? তর্কের খাতিরে ধ'রে নেবো যে এই লাইনগুলি যাঁরা পড়ছেন তাঁরা সাহিত্যপ্রেমিক। তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের সাহিত্যিক দিগন্তকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করায় বিশ্বাস করেন। আশা করি তাঁরা মানবেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যসম্ভারগুলি জাতিধর্মনির্বিশেষে আমাদের সকলের সাধারণ উত্তরাধিকার, যে-সম্পদের সঙ্গে নিজেদের কমবেশী পরিচয়সাধনের চেষ্টা করাটা একটা

কাজের মতো কাজ। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ তাঁরাও এক আয়ুষ্কালের মধ্যে কয়েকটার বেশী ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন না; তা করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সিন্দুকগুলির মধ্যে যে-সব দীপ্তিমান সাহিত্যরত্ন চাবিবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা যদি তাদের কয়েকটির সঙ্গেও নিজেদের অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটাতে চাই, তা হলে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই অনুবাদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের নিজেদের ভাষায়, অথবা খুব চেনা, যত্ন ক'রে শেখা একটা ভাষায়, উৎকৃষ্ট অনুবাদ হলে তবেই সেই অনুবাদ প'ড়ে আমরা সেই অপরিচিত রত্নগুলির দীপ্তির একটা আন্দাজ পাই। একদিক থেকে দেখলে, সাহিত্যের অনুবাদ আমাদেব সময়ের একটা বিরাট দায়িত্ব, যার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো উচিত। আমাদের এই বিরাট পৃথিবী প্রযুক্তির দৌলতে যত ছোট হয়ে আসছে, প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের এবং এক-একটি রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও সংযোগসাধন ও সমঝোতা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই তত জরুরী হয়ে উঠছে। ভিতরে-বাইরে রক্তক্ষয়কারী লড়াইগুলোকে কমাতে হলে বোঝাবুঝি তো বাড়াতেই হবে। তাই আদানপ্রদানের সর্বস্তরেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় চ'লে যাবার প্রয়োজন বাড়বে বৈ কমবে না। সাহিত্যের অনুবাদও সেখানে একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিনিময়ের সেতু বাঁধতে সাহায্য করে—দূর আর দূর থাকে না, আত্মীয় হয়ে ওঠে। ভাবতে ইচ্ছে করে, একুশ শতকে সাহিত্যের অনুবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কাজ হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি পাবে, তার যথাযোগ্য মর্যাদা তাকে দেওয়া হবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, মানবসভ্যতা যেভাবে দ্রুতগতিতে ছুনিয়াজোড়া পল্লীতে পরিণত হচ্ছে তাতে ভাষাবৈচিত্র্য স্থায়ী হবে না, আর সে-বৈচিত্র্য দিয়ে কী-ই বা হবে, তার বদলে একভাষী সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠলেই বা ক্ষতি কী? ক্ষতি এইখানেই যে আমরা যতদূর বুঝি, কি প্রাকৃতিক জগতে কি মানুষের সংসারে বৈচিত্র্যই সুস্থ বিবর্তনের এবং টিঁকে থাকার চাবিকাঠি। বৈচিত্র্যের অভাব প্রাণের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। বৈচিত্র্য অর্জনই প্রাণের ধর্ম; ভিন্নতার চাষই তার কর্মসূচী। যা-কিছু জীবিত, প্রাণসমন্বিত, তারই ছুর্বার গতি বিচিত্রায়ণের দিকে। তাই মাটি জুড়ে যেমন গণনাতীত উদ্ভিদ-প্রজাতির সমারোহ, তেমনি মানুষের মুখে মুখে ভাষা আর উপভাষাদের বিচিত্র লীলা। ইংরেজীই কি একটা ভাষা? তার একাধিক অবতার দ্রষ্টব্য। অনেক মার্কিন ফিল্মের সংলাপ তো টি-ভি-র সাউণ্ড-ভল্যুম বিস্তর বাড়িয়ে দিলেও অর্ধেক বুঝি না! একবার একটা সেমিনারে বাধ্য হয়ে *আর্বান কাউবয়* (*Urban Cowboy*) নামে একটা ছবি দেখতে হয়েছিলো—সেই ছবিটা নাকি মার্কিনদের একটি আধুনিক পুরাণবিশেষ। আমার কেবল মনে হচ্ছিলো—সাবটাইট্‌ল্‌গুলো গেলো কোথায়?

মানবজাতির পক্ষে তাই বিচিত্রায়িত, বহুবাচনিক, বহুভাষাশ্রয়ী, নানাফোকস্-সমন্বিত সংস্কৃতিই সুস্থতর, কাম্যতর। প্রত্যেক ভাষার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে জগৎকে দেখবার, বুঝবার, তার বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ করবার একটা বিশেষ ভঙ্গি। এবং সেটা কোনো স্থাণু ব্যাপারও নয়। সব জীবিত ভাষাই অনবরত বদলাচ্ছে, বিবর্তিত হচ্ছে, নূতন অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ ক'রে নিজেকে নূতন করছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার নিউজ়রীল শুনলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় ইংরেজী ভাষা এবং সেই ভাষার অঙ্গে বিধৃত জীবনদর্শন কতটা বদলে গেছে। সব ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই সঞ্চিত হয়ে থাকে ইতিহাস। পুরোনো টেক্সটগুলো থেকে আমরা জানতে পারি আমাদের পূর্বসূরিরা কিভাবে বাঁচতেন, কী ছিলো তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের সাধস্বপ্ন, তাঁদের ভয় ও দুঃস্বপ্ন, তাঁদের জগৎকে তাঁরা কিভাবে নির্মাণ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যগুলির বাক্সপ্যাটরার মধ্যে মানবজাতির ভুলভ্রান্তি থেকে প্রজ্ঞা অবধি সবই ভিড় ক'রে আছে। তাই তো তাদের ফেলা যায় না। তারা আমাদের জানায় আমরা কী অবস্থায় ছিলাম, এখন কিভাবে আছি, কোন্ দিকে চলেছি। হোক সে-সাহিত্য দূরদেশের বা অতীত কালের, আমাদের অভিজ্ঞতার এবং ভাবনাচিন্তার সঙ্গে কোথাও না কোথাও তার একটা ওভারল্যাপ, একটা পরস্পরপ্রাবরণ থাকবেই। ভাষার চাবি ঘোরাতে পারলে সেই দূরের জিনিসও আমাদের সাধারণ মানবধর্ম সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে পারবে।

অনুবাদ সেই চাবি। অনুবাদের মধ্যস্থতায় আমরা অন্য ভাষায় বিধৃত জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ পাই, আমাদের উপরে সেই কিছু-চেনা কিছু-অচেনার অভিঘাত হয়। অনুবাদের ভাষার উপরে কিছু-অচেনার অভিঘাতের ফলে তার নিজের দিগন্ত প্রসারিত হয়, সেই ভাষা ঋদ্ধ হয়। অনুবাদের অভিঘাতে এক-একটা ভাষায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে নূতন প্রাণ আসে। আবার অনুবাদ আমাদের কানে নতুন খবর এনে দেয় ব'লে কখনও কখনও তার উপরে নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়, অনুবাদ করা বা না-করা রাজনৈতিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। কে না জানেন সাহিত্যের ইতিহাসে, ধর্মের ইতিহাসে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে অনুবাদ কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভাষার দিক দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ আর ইয়োরোপীয় মহাদেশ দুটি অত্যন্ত বিচিত্রায়িত অঞ্চল। পৃথিবীর অনেক প্রধান ভাষা এই দুই ভৌগোলিক এলাকায় লালিত ও বিবর্ধিত হয়েছে। দুই অঞ্চলেই প্রাচীন 'ক্লাসিকাল' ভাষা থেকে আধুনিক ভাষায় অনুবাদ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, এবং দুটি অঞ্চলই এখন ইংরেজীর দাপট অনুভব করছে। ইংরেজীর এই নবতম দাপট আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি থেকে, যার ফলে বৃটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরাও সুবিধা ভোগ করছেন, কারণ তাঁদের মুখের

ভাষাটা এখন তথাকথিত গ্লোবাল ভিলেজের সংযোগসাধনের ভাষা, আন্তর্জাতিক হাটবাজারের ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা, আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের ও ইন্টারনেটের ভাষা। কন্টিনেন্টাল ইয়োরোপে ইংরেজীর প্রসার ক্রমাগত বাড়ছে। ষাটের দশকে আমি যখন প্রথম সেখানে যাই, পথে ঘাটে বেশী লোক ইংরেজীতে মুখ খুলতে পারতেন না। আজকাল অনেকের মুখেই ইংরেজী শুনতে পাওয়া যায়। কেননা স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজীর চর্চা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। রেস্তোরাঁর ছেলেছোকরা ওয়েটাররা ভারতীয় মুখ দেখতে পেলে এগিয়ে এসে ইংরেজী শুনিয়ে দিয়ে যায়, তারা জানে ভারতীয়রা ইংরেজী বলে। টি-ভি সাক্ষাৎকারগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়, উচ্চশিক্ষিতরা তো বটেই, সাধারণ কর্মী মানুষজনও প্রায়ই গড়গড় ক'রে ইংরেজীতে 'বক্তব্য রাখছেন'। অনেকেরই, বিশেষতঃ জার্মান বা স্কাণ্ডিনেভিয়ানদের, উচ্চারণও খুব পরিষ্কার।

এই অবস্থায় কন্টিনেন্টের সুধীসমাজের চেতনায় সাবধানী ঘণ্টাধ্বনিও বাজতে শুরু করেছে। তাঁদের ভাষায় ইংরেজী শব্দের ও শব্দসমষ্টির অত্যধিক অনুপ্রবেশে ফরাসীরা উদ্বিগ্ন, তাঁদের টি-ভি-র পর্দায় মার্কিন ফিল্মের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতিও তাঁদের কাছে অবাঞ্ছিত। কন্টিনেন্টাল ইয়োরোপের সুধীদের দুশ্চিন্তার এবং বিরক্তির আরেকটা কারণ এই, ইংরেজী থেকে তাঁদের ভাষাগুলিতে যে-অনুপাতে অনুবাদ হয়, তাঁদের ভাষাগুলি থেকে ইংরেজীতে কিন্তু মোটেই সে-অনুপাতে অনুবাদ হয় না। ভারতে অনেকেরই ধারণা ইংরেজীতে অন্যান্য ভাষা থেকে প্রচুর অনুবাদ হয়। যেটাকে তাঁদের প্রচুর ব'লে মনে হয় পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিচারে কিন্তু সেখানে ধরা পড়ে অপ্রাচুর্য। এই তথ্য সম্পর্কে আমি নিজেও আগে সম্যক্ অবহিত ছিলাম না। অনুবাদতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের বইপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখালেখি ঘেঁটে জানতে পেরেছি। অনুবাদতত্ত্বের মার্কিন বিশেষজ্ঞ লরেন্স ভেনুটি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইংরেজী হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক অনূদিত ভাষা, অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে ইংরেজী মূল গ্রন্থ থেকে অন্যান্য ভাষাতেই সব চেয়ে বেশী তর্জমা হচ্ছে, সে-তুলনায় অন্যান্য ভাষার মূল গ্রন্থ থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ হচ্ছে অনেক অনেক কম। বৃটিশ ও মার্কিন প্রকাশভবনগুলি থেকে এক-এক বছরে যত টাইট্‌ল্ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে অনূদিত বইয়ের সংখ্যা ২% থেকে ৪%-এর বেশী নয়। তার বিপরীতে জাপানের প্রকাশভবনগুলি থেকে প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যা তাঁদের সামগ্রিক প্রকাশতালিকার ৬%; ফ্রান্সে এই সংখ্যা ১০%, হাঙ্গেরিতে ১৪%, জার্মানিতে ১৫%, ইতালিতে ২৫%।[২]

অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চলছে অত্যন্ত অসম হারে। ইংরেজীভিত্তিক সংস্কৃতিগুলির দাপট এখন সর্বাধিক। কোনো-একটা নাম-করা

প্রকাশভবনের ঝলমলে ক্যাটালগে হয়তো বেশ কয়েকটা অনুবাদগ্রন্থের নাম পাওয়া গেলো : হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এবং আমিও ভেবেছি—ইস, সত্যিই তো, এঁরা কত অনুবাদ করছেন। করছেন, কিন্তু যা করা যায়, করা উচিত, তার তুলনায় ভগ্নাংশও না। পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলো দেখলে তবেই সামগ্রিক অবস্থা মালুম হয়। রূঢ় সত্যটা এই, অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ প্রকাশে ইঙ্গ-মার্কিন প্রকাশকরা তেমন আগ্রহী নন। অনুবাদ প্রকাশ করা তাঁদের কর্মসূচীতে প্রান্তিক স্থানের অধিকারী, কারণ অনুবাদের অধিকার কেনার চাইতে অনুবাদের অধিকার বিক্রি করাই বেশী লাভজনক। ইংরেজী থেকেই এন্তার অনুবাদ হচ্ছে, সেই বাবদ 'তর্জমার অধিকার' বিক্রি ক'রে মূল বইয়ের প্রকাশকরা মোটা অঙ্কের ফী আদায় ক'রে মুনাফা লুটছেন। সেই একই প্রকাশকরা অন্য ভাষা থেকে বই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে বার করার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক। লরেন্স ভেনুটি ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান থেকে আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন, যেগুলি প্রাসঙ্গিক ছবিটাকে পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে। ১৯৮৭ সালে সমগ্র পৃথিবীতে আনুমানিক ৬৫,০০০ অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো ; তাদের মধ্যে ৩২,০০০-এর বেশী টাইট্‌ল্‌ হচ্ছে ইংরেজী থেকে অনুবাদ ; আনুমানিক ৬৭০০টি ফরাসী থেকে, ৬৫০০টি রুশ থেকে, ৫০০০টি জার্মান থেকে, ১৭০০টি ইতালীয় থেকে, ৪৭৯টি আরবী থেকে, ২১৬টি চীনা থেকে, ৮৯টি বাংলা থেকে, ১৪টি কোরীয় থেকে, ৮টি ইন্দোনেশীয় থেকে।[৩] কোনো-এক বছরে বাংলাভাষা থেকে যে ৮৯টি অনুবাদের বই বেরিয়েছে, সেই খবরটাকে আমাদের ভাগ্যি ব'লেই ধরতে হবে বোধ হয়—যা হোক, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথদের মাতৃভাষার 'ধারক-বাহক' আমরা অন্ততঃ কোরিয়া-ইন্দোনেশিয়ার থেকে এগিয়ে আছি !

'বেস্টসেলার' বার করার দিকে বর্তমান বইয়ের বাজারগুলোর যে-ঝোঁক, তা ইংরেজীর প্রেস্টিজ ও প্রিভিলেজকে বিশেষ মদত দেয়। ইংরেজীতে একটা তথাকথিত 'বেস্টসেলার' লিখে উঠতে পারলে সে-বই সর্বত্র অনূদিত হবে, সেই নামের জোরে লেখকের অন্যান্য বইও তর্জমা হয়ে বেরিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, হাইডেলবার্গের একটি বইয়ের দোকানে দেখলাম, সালমান রুশ্‌দির প্রথম বই *গ্রাইমাস*, যা ইংরেজীতেও তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি, দিব্যি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে সুদৃশ্য বাঁধাইয়ে শোভা পাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো ভাষায় উচ্চতম মানের সাহিত্যও সৃষ্টি করেন, আপনার বই অনূদিত হয়ে বইয়ের দোকানে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ, হয়তো আপনার নামটাও আপনার ভাষাগোষ্ঠীর বাইরে কেউ শুনবে না। এশিয়ার ভাষার কথা না-ই বা তুললাম, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, পোর্তুগাল, এমন কি জার্মানির লেখকদের নিয়েই বা কতটুকু আলোচনা হয় ইঙ্গ-মার্কিন মিডিয়ায় ? পূর্ব-ইয়োরোপকে নিয়ে আগে যে-আগ্রহ ও চাঞ্চল্য ছিলো তার বেশীর ভাগটাই রাজনীতিগত।

আমাদের বুঝতে হবে যে আধুনিক ভারতীয় ভাষার লেখকদের বই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে বার করার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন প্রকাশকরা মূলতঃ উদাসীন। অনুবাদ করাতে হলে কোন্ লেখক কোন্ বই অনুবাদযোগ্য তা জানতে হবে, যোগ্য অনুবাদক খুঁজে বার করতে হবে, অনুবাদককে পারিশ্রমিক দিতে হবে, মূল লেখক অথবা তাঁর এস্টেট বা প্রকাশককে ফী দিতে হতে পারে, তার পর আছে প্রচার ও বিক্রয়ের প্রশ্ন। একটা ভিন্ন ঐতিহ্য থেকে আগত বই, যে-বই পাশ্চাত্য পাঠকবর্গকে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয় নি, তেমন একখানা বইয়ের জন্য বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞাপন দিতে হবে, 'বুক লঞ্চ'-এর বা সাহিত্যসভার আয়োজন করতে হবে, সুযোগ্য সমালোচকদের খুঁজে বার করতে হবে, সমালোচনাগুলো যাতে ছেপে বেরোয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে, যা কিনা ঝুঁকির ব্যাপার। টাকাটা না-ও উঠে আসতে পারে। অচেনাকে চেনানোর কাজ তাঁরা কেন ঝুঁকি নিয়ে ঘাড়ে নেবেন, যদি তাঁদের ক্রিয়াকর্মে আন্তরিক সাহিত্যানুরাগ ও বৈশ্বিক জিজ্ঞাসা না থাকে, তাঁদের মূল লক্ষ্য যদি হয় দুনিয়াজোড়া ব্যবসায় ?

বিপরীতপক্ষে ভারতীয়রাই যদি পাশ্চাত্য পাঠকদের টার্গেট ক'রে, সেই অডিয়েন্সের রুচি অনুযায়ী মশলা মিশিয়ে ইংরেজী ভাষাতেই ঝালমুড়ি রচনা ক'রে নিয়ে আসেন, তা হলে প্রকাশকমহাশয়দের কোনো দুশ্চিন্তাই থাকে না, কেবল ঠোঙাটা বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দিলেই হয়। ভারতীয়রা ইংরেজীতে 'বেস্টসেলার' লিখলে সেই বই দুনিয়ার হাটে বিক্রি ক'রে তো বটেই, তার 'তর্জমার অধিকার'টাও একই হাটে বেচে ইঙ্গ-মার্কিন প্রকাশকরা বিনা আয়াসে লাভবান হতে পারেন, একই সঙ্গে দাবি করতে পারেন, এই তো তাঁরা ভারতীয় লেখকদের বই ছাপছেন, তাঁদের কোনো বর্ণাহংকার নেই। তাই এই ধরণের ভারতীয় লেখক এই প্রকাশকদের এত প্রিয়।

মূলতঃ পকেটের কথা ভেবে প্রকাশকরা যা করেন, সেটা মিডিয়ার মাতব্বরদের দ্বারা তাঁদের নিজস্ব ন্যায়ে রূপান্তরিত হয় সংস্কৃতির অভিমানে, ইংরেজী-আশ্রয়ী সংস্কৃতির অভিমানকে এক তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দেয়। নিজেদের ব্রাহ্মণত্বে প্রত্যয়ী এই চক্রে অন্যান্য সাহিত্য-ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকৃত জিজ্ঞাসা লক্ষণীয়ভাবে ক'মে এসেছে। সে-সম্পর্কে তাঁদের কোনো দায়িত্ববোধও নেই। আজকাল এই আবহে ভারতীয় লেখক বলতে ইংরেজী ভাষার লেখককেই বোঝায়। ভারতের অন্যান্য ভাষার লেখকরা সেখানে অদৃশ্য।

এমন একটা 'মিডিয়া কাল্চার' তৈরি হয়েছে যেখানে 'আন্তর্জাতিকতা' অর্জন করা একটা নিতান্ত সহজ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। তার জন্য কোনো বিদেশী ভাষার সঙ্গে কারবার করার দরকার নেই, প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর মানুষরা যদি নিজেরা যেচে ইংরেজীতে লেখেন তবে সেই লেখার প্রচার করলেই প্রচারকরা বিশ্বনাগরিকত্বের

তকমা পেয়ে যেতে পারেন। যা বিস্ময়কর,—কিংবা হয়তো বিস্ময়কর নয়!—বিদ্যাজগতের অধিবাসীরাও এই প্রবণতাকে মদত দিতে প্রস্তুত। যাঁরা তথাকথিত সাঈদ-শিষ্য, অর্থাৎ *ওরিয়েন্টালিজ়্ম্* গ্রন্থের প্রণেতা এডওয়ার্ড সাঈদের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনকারী, তাঁরাও এই সুবিধাবাদী শর্টকাট অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁরা একই সঙ্গে উপনিবেশবাদকেও ঠোকেন এবং ইংরেজীকেও সাহিত্যের চূড়ান্ত পৃথিবীজোড়া মাধ্যম হিসেবে গৌরবান্বিত করেন, এবং তাঁদের দুটো অবস্থানের মধ্যে যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে তা বুঝতে পারেন না, বা বুঝেও বুঝতে চান না। সাঈদ 'ওরিয়েন্টালিজ়্ম্' শব্দটাকে একরকমভাবে হাইজ্যাক করেছিলেন। আগে ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় একটা বিশেষ ক্ষেত্রে শব্দটার চল ছিলো, এবং সেটার একটা মোটামুটি সদর্থক, বর্ণনামূলক মানে ছিলো। ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতরা মোটেই সর্বতোভাবে খারাপ ছিলেন না। তাঁরা সংস্কৃতর এবং আরবী-ফার্সীর চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাঈদ তাঁর অনুসন্ধানের নিজস্ব আগ্রহের এলাকায়—ভারতসংক্রান্ত নয়, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই জগতের বিনিময়ের প্রসঙ্গে—শব্দটার মধ্যে এমন একটা নঞর্থক মোচড় সঞ্চারিত করলেন যে ওরিয়েন্টালিস্টরা সর্বতোভাবে খারাপ লোক হয়ে গেলেন, এবং যে-সব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী নিজেদের প্রগতিশীল ব'লে মনে করেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ভারতের ক্ষেত্রেও নির্বিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করলেন। সাঈদ-প্রবর্তিত ঘরানায় 'ওরিয়েন্টালিস্ট' কথাটা প্রায় গালাগালির সামিল হলো—অনেকটা সাম্যবাদী মহলে 'বুর্জোয়া' শব্দটির মতো। কে না জানেন, প্রায়ই দেখা যায় যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যাঁরা সর্বাধিক চেঁচামেচি করেন তাঁরা নিজেরাই প্রবলতম বুর্জোয়া।

কবিতা প্রকাশের রণক্ষেত্রটা আরোই সমস্যাসংকুল, যেহেতু গদ্যের তুলনায় কবিতার বাজার প্রায় সর্বত্রই সংকীর্ণতর, এবং সর্বত্রই প্রকাশকরা ব'লে থাকেন যে 'কবিতা বিক্রি হয় না'। বেশ মনে আছে, আর্জেন্টিনার কবি রাফায়েল ফেলিপে ওতেরিনিয়ো মার্ দেল প্লাতায় আমাকে বলেছিলেন, হর্হে লুইস বর্হেস-এর মতো নামী কবিও তাঁর কোনো কবিতার বইয়ের পাঁচশো কপি বিক্রি হলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। আর্জেন্টিনায় কবিতার বেশ একটা মর্যাদা আছে, সেখানেই দশা এই। বাণিজ্যস্বার্থচালিত যে-গণসংস্কৃতি আজকের দিনে আমাদের অধিকার ক'রে নিচ্ছে, সেখানে কবিতার জন্য একটু জায়গা ক'রে নিতে কসরত করতে হয়। বেস্টসেলার বইয়ের দুনিয়াজোড়া বিক্রয়ের হাট থেকে অনেক দূরে কবিতাসুন্দরীর অবস্থান। বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে যখন কাগজে কাগজে 'এক বছরের সেরা বই', 'আমার পড়া গত বছরের সেরা বই' ইত্যাদি তালিকা বেরোতে থাকে, তখন সেখানে সহজেই নজরে পড়ে উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনীর প্রাধান্য ; কবিতার বইয়ের নাম কদাচিৎ চোখে পড়ে। সম্প্রতি বিলেতের

জগদ্বিখ্যাত অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস ঘোষণা ক'রে দিলেন যে তাঁরা সমকালীন কবিদের কবিতা আর প্রকাশ করবেন না। (তাঁদের ভারতীয় শাখার কথা বলছি না— সেখানে সমকালীন কবিদের কবিতা এখনও অচল মুদ্রা হয়ে যায় নি—বলছি মূল বৃটিশ প্রকাশভবনটির কথাই, খোদ অক্সফোর্ডে যার হেড আপিস।) বিক্ষুব্ধ কবিকুলের উদ্দেশে প্রকাশভবনের তরফে বাণী দেওয়া হয়েছে: 'কবিরা, আপনারা একসঙ্গে থাকুন। ঐক্যই শক্তি, জোটবদ্ধতাই মুক্তি, দল বেঁধে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণ করুন।' আনুমানিক পঞ্চাশজন কবি তালিকা থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। এঁরা এখন যে-যার পাণ্ডুলিপি নিয়ে অন্যান্য দরজায় ছোটাছুটি করছেন, এবং তার পরিণামে একটা 'knock-on effect' হয়েছে, কবিতা প্রকাশের অলিতে গলিতে প্রচণ্ড যানজট তৈরি হয়েছে। সকলেই চেঁচাচ্ছেন, 'আমারটা আগে, আমারটা আগে'। এ হেন অবস্থায় বিদেশী কবিদের অনুবাদের কথা কে-ই বা শোনে—সে-কাজ প্রকাশভবনগুলির কর্মসূচীতে আরও অনেক পিছনের সারিতে চ'লে গেছে। বলা দরকার, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভাও বসেছে, এবং সেখানে জনৈক মন্ত্রী প্রকাশভবনটিকে খুব ব'কেও দিয়েছেন। প্রতিবাদীদের বক্তব্য, কেবলই পৃথিবীময় ইংরেজী ভাষার অভিধান ও অন্যান্য শিক্ষামূলক বই বিক্রি ক'রে ব্যবসায়িক লাভ করা কখনোই এই প্রকাশভবনের একমাত্র কাজ হতে পারে না! ঠিক, ঐ জাতের বিক্রি থেকেই তাঁদের লাভের বৃহদংশ আসে। তবু কবিতার প্রতিও তাঁদের অবশ্যই কর্তব্য আছে। ইংরেজীর অধ্যাপকগণ নাকি সর্বদাই অভিযোগ করছেন যে সংস্কৃতির সিংহদ্বারে বর্বর আক্রমণকারীদের অত্যাচারে তাঁরা উত্ত্যক্ত। মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন যে সে-কথা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, দ্বাররক্ষীরাই যদি বর্বর আক্রমণকারীদের মতো আচরণ করেন, তা হলে কী হবে? অতএব তিনি ঐ প্রকাশভবনকে তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত সিদ্ধান্ত রদ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না, তবে আপাততঃ এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে কবিমহলে খুব চাঞ্চল্য চলছে।

১৯৯৩ সালে হাইনেম্যান প্রকাশভবন একটি 'এশিয়ান রাইটার্স সিরিজ়'-এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পাঁচটি ভাষা থেকে তর্জমা করিয়ে ছ'টি উপন্যাস বার করেন। বইগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ*-ও ছিলো। সিরিজ়টির প্রধান সম্পাদিকা রঞ্জনা অ্যাশ্ থেকে আরম্ভ ক'রে আরও অনেকের মুখেই শুনেছি যে উক্ত প্রকাশভবন বইগুলি বার করার পর তাদের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ একেবারেই নেন নি, কেবল অভিযোগ ক'রে গেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বইটি বাদে অন্য বইগুলির 'আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না'। পুঁজি বিনিয়োগ ক'রে ঠিকমতো প্রচার না করলে আজকের দিনের এই বেস্টসেলার-শাসিত হট্টগোলের হাটে, যেখানে প্রায়শঃ ভিতরের সারপদার্থের থেকে মোড়কের কদর বেশী, অচেনা লেখকদের বই বিকোবে কী ক'রে?

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসটির তবু যা হোক কিছু বিক্রি হয়েছে, তার কারণ তাঁর নামটা অনেকের চেনা। তাঁর 'সেলিব্রিটি স্টেটাস' আছে। অন্যদের নাম আন্তর্জাতিক বাজারে কেউ শোনে নি। তাঁদের জন্য কিছু বিচক্ষণ মার্কেটিং দরকার। কিন্তু প্রকাশকরা চান এমন বই, যেগুলোর প্রচারের জন্য খুব বেশী অর্থবিনিয়োগ না ক'রেই দ্রুত মুনাফা হবে। 'ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাস' এখন এমন একটা জ্যঁরে দাঁড়িয়ে গেছে, যা পাশ্চাত্য পাঠকদের টার্গেট ক'রেই লেখা হচ্ছে, অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ভাষায় রচিত উপন্যাস বেদম মার খেয়ে যাচ্ছে। ঐ ক'টি বই বার ক'রেই হাইনেম্যান সিরিজ়টি বন্ধ ক'রে দেন। কথাসাহিত্যেরই যখন এই অবস্থা, তখন ভারতীয় ভাষায় রচিত কবিতার প্রচার করতে কে বা কারা এগিয়ে আসবে ?

একটু আগেই রবীন্দ্রনাথের সেলিব্রিটি স্টেটাসের কথা বললাম। তার জন্যও অতিরিক্ত পাদটীকা দরকার। তাঁর খ্যাতি যে এককালে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো তার অগ্রগণ্য কারণ নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর ধর্মগুরুর ইমেজ, যা কবি হিসেবে তাঁর ইমেজের সঙ্গে মিশে তাঁর বইয়ের জন্য একটা বিশেষ ধরণের ধর্মোপদেশবুভুক্ষু মার্কেট তৈরি করেছিলো। তাঁর কবিতায় লোকে খুঁজেছে, এবং পেয়েছে, যুদ্ধোত্তর যুগের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার বাণী। আবার এরই জন্য তাঁকে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়েছে। সেই-সব ঝঞ্ঝা পেরিয়ে-আসা আজকের দিনে যাঁরা তাঁর নামটা শুনেছেন তাঁরা উচ্চশিক্ষিত ; তাঁদের ঠিক 'সাধারণ'-এর কোঠায় ফেলা যায় না। সাধারণ মানুষ বিদেশের কবিদের নাম দূরে থাক, নিজেদের দেশের কবিদের নামই জানবেন না। আমার বাড়ির ঠিকানায় অন্ততঃ দু'বার ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে চিঠি এসেছে, রবীন্দ্রনাথ টাগোর ট্যাক্স দিচ্ছেন না সেই মর্মে নালিশ জানিয়ে। মৎপ্রণীত অনুবাদগ্রন্থটিই এই প্রাহসনিক বিভ্রান্তির উৎস। কিন্তু ট্যাক্স অফিসের কেরানীদের অজ্ঞতা যদি বা মার্জনা করা যায়, বইটির প্রকাশভবনের দপ্তরেই যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যেও যদি একই অজ্ঞতা দৃশ্যমান হয়, তবে তা আমাদের ভাবায় বৈকি। এ দেশে ঐ অনুবাদগ্রন্থ প্রথম প্রকাশের পর বছর-আষ্টেক কেটে গেছে ; এর মধ্যে পুনর্মুদ্রণও বেরিয়েছে ; সম্প্রতি প্রকাশভবনের দপ্তর দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সম্পাদনার আসল কাজ তদারক করে ; অন্য ভাগ প্রচার, কাটতি ও আর্থিক হিসাবনিকাশের ব্যাপারগুলোর দেখাশোনা করে। এই শ্রমবণ্টনের চমৎকারী ফলশ্রুতিতে আগে কোনো বছর যে-প্রহসন ঘটে নি গত বছর সেটিই হলো—আমার রয়াল্‌টি চেকটি এলো আমারই ঠিকানায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টাগোরের নামে। চেকটা আমি ফেরত দিই নি : ওটার বোধ হয় একটা আর্কাইভাল মূল্য আছে। প্রেরক দপ্তরকে জানাতে বাধ্য হয়েছি যে ওটা পৃথিবীর কোনো ব্যাংকে ভাঙানো সম্ভব নয়। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান লজ্জিত হয়ে সত্বরই নতুন চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন,

কিন্তু এই ঘটনা আমাদের কী বলে ? চেকটা যিনি সই করেছেন রবীন্দ্রনাথের নামটা তিনি কালিকলমে হাতেই লিখেছেন, কম্পিউটারকে দোষ দেওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। যান্ত্রিকভাবে একটা তালিকা দেখে কাজ করলে অনূদিত লেখকের নাম আর অনুবাদকের নাম নিয়ে গণ্ডগোল মাঝে-মধ্যে হতেই পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে-কর্মচারী চেকটা কেটেছেন, চেকে সই করার গুরুদায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছে, তাঁর সচেতন বা অবচেতন মনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো মানসপ্রতিমাই নেই। যাঁর নামটা লেখা হলো তিনি যে কয়েক দশক আগে পরলোকগত এক বিদেশী কবি, সে-তথ্য তাঁর মাথার মধ্যেই নেই, তাই নামটা কলম দিয়ে লেখার মুহূর্তেও চেতনার কোনো স্তরে একটা ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠে জানিয়ে দেয় নি যে ভুল হচ্ছে। অথচ এই কবি তাঁদেরই ক্যাটালগের অন্তর্গত একজন কবি ! প্রকাশকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত কবি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা আজ আর প্রত্যাশা করা যায় না। তাই বিরক্তিকর হলেও এটাও মেনে নিতে হয় যে একই প্রকাশকের মার্কিন বিতরণকারীর দপ্তরে ঐ বিষয়ে ধারণা আরও অস্পষ্ট হবে। সম্প্রতি ঐ মার্কিন দপ্তরের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় সরজমিনে পেয়েছি। প্রচারের জন্য তাঁদেরকে দিয়ে কোনো কিছু করানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বইয়ের কাটতিতে যে তাঁদেরও লাভ, সেটাই বোঝানো যায় না। মার্কিন মুলুকে তাঁরা আরেক কাঠি সরেস, কেননা তাঁদের কাছে ১৯৯৬-এর পুনর্মুদ্রণও ১৯৯৮-এ পৌঁছেই 'ব্যাকলিস্ট'-এর বই, পুরোনো বই, 'গরম গরম কেক' নয়, সব সময়ে স্টকে রাখার দরকারও নেই। তাঁদের কী ক'রে বোঝানো যায়, উক্ত কবি সর্বকালের কবি, এবং প্রকাশকের ক্যাটালগেও তাঁকে 'কবিতার ক্লাসিক'দের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

এই খবরগুলো কেন দিচ্ছি? একটা জিনিস বোঝাতে—যেখানে তাঁর কমবেশী সেলিব্রিটি স্টেটাস সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এমন সমস্যা, সেখানে ইংরেজীভাষী দুনিয়ায় রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কবিতা অনুবাদ ক'রে বাজারে ছাড়তে হলে আমাদের কী-পরিমাণে রণকুশল হতে হবে তারই আন্দাজ দিতে। নিজেকে ওভার-এস্টিমেট না ক'রেও বলতে পারি, আসল অনুবাদের কাজটা সে-তুলনায় অনেক বেশী সুসাধ্য। নির্ভরযোগ্য অনুবাদ, যথাসম্ভব প্রমাদবর্জিত মুদ্রণ, সুদৃশ্য বাঁধাই— কোনোটাই হয়তো আমাদের সাধ্যাতীত নয়, সবই না-হয় আমরা প্রাণ দিয়েই করলাম, কিন্তু ঢের কঠিনতর কাজ হবে বাণিজ্যায়ন, পাঠকের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া। সেটা যেন আমরা আণ্ডার-এস্টিমেট না করি।

বৃটেনে অনুবাদ-কবিতার প্রকাশের জন্য আর্ট্স্ কাউন্সিলের স্বল্পসংখ্যক কিছু প্রকাশ-সহায়ক অনুদান আপাততঃ আছে; যারা ধরতে পারে তারা পারে। সবই ধরাধরির

ব্যাপার। 'আপাততঃ' বললাম এইজন্য যে সরকারী অনুদানের কোনো স্থিরতা নেই, নীতিপরিবর্তন হলে অনুদানব্যবস্থা উঠে যেতে পারে। প্রকাশ-সহায়ক অনুদানের জন্য অনুবাদক স্বয়ং আবেদন করতে পারেন না, আবেদন করবেন প্রকাশক। অর্থাৎ অনুবাদক বা তাঁর এজেন্টকে প্রথমে প্রকাশক যোগাড় করতে হবে, তার পর প্রকাশক স্বয়ং আর্ট্‌স্‌ কাউন্সিলকে ধরবেন। তাতে প্রকাশকের সুরাহা হয়, তাঁর 'ঝুঁকি' কাভার্ড হয়। আর অনুবাদকের লাভ এই যে তাঁর শ্রমের ফসল বইটা প্রকাশিত হবে। অনুবাদকের যদি কাজ করার সময়ে কোনোরকমের ভাতার দরকার হয় তা হলে তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক খাতে অন্য একটা অনুদানের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। দু'-ধরণের অনুদানের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। একটা সাহিত্যজগতের ব্যক্তি-কর্মীদের সাহায্য করার জন্য, অন্যটা প্রকাশকদের সাহায্য করার জন্য। কোনো-কোনো ছোট মাপের সাহিত্যপ্রকাশক, যাঁদের কাজকে বৃহদর্থে 'বাণিজ্যিক' ব'লে ধরা হয় না, মূল রচনা আর অনুবাদ দুই জাতের কাজ প্রকাশ করার জন্য ঢালাওভাবে কোনো-একটা অনুদান পেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করার সময়ে আমি আর্ট্‌স্‌ কাউন্সিলের আঞ্চলিক দপ্তর থেকে এক বছরের জন্য অল্প একটু ভাতা পেয়েছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ বইটা বার করার জন্য আমাকে কোনো ঝামেলা পোয়াতে হয় নি। যিনি প্রকাশ করেন তিনি এক ডাকেই সাড়া দিয়েছিলেন ; তাঁদের প্রতিষ্ঠানের একটা ঢালাও সরকারী অনুদানের ব্যবস্থাও আছে। আসল কথা এই, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ; তার একটা মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে। কবিতার প্রকাশকরা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত না হলেও তাঁর নামটা অন্ততঃ জানতেন। আর উইলিয়ম র‍্যাডিচিও তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথের নামটা নতুন ক'রে দৃষ্টিগোচর করেছিলেন। কিন্তু এখানকার প্রকাশকরা আমাদের রবীন্দ্রোত্তর কবিদের নাম পর্যন্ত শোনেন নি।

একেবারেই শোনেন নি, এমন কথা বলা ঠিক নয় হয়তো। বরং বলা উচিত, তাঁরা শুনেও শুনতে চান না, কেননা শোনানোর চেষ্টা যে করা হয় নি তা নয়। নিকট অতীতে আমি নিজেই চেষ্টা করেছি। 'পোয়েট্রি সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা আছে, তার কাজ হচ্ছে বৃটেনে কবিতার চর্চাকে 'ধ'রে রাখা'। সে-উদ্দেশ্যে তাঁরা কবিতা-সপ্তাহ পালন করা থেকে শুরু ক'রে কবিতার প্রচারের জন্য আকাশে বেলুন পর্যন্ত ছাড়েন। ১৯৯৩ সালে 'পোয়েট্রি সোসাইটি'র মুখপত্র *পোয়েট্রি রিভিউ* পত্রিকা ভারতীয় কবিতার উপর একটি বিশেষ সংখ্যা বার করে। সেখানে ভারতীয় ভাষার কয়েকজন কবিও স্থান পেয়েছিলেন। ঐ সংখ্যাতেই খ্যাতনামা অধ্যাপক জন বেইলি আমার রবীন্দ্রানুবাদের একটি মর্মগ্রাহী আলোচনা করেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের পরেও বাংলায় যে অনেক ভালো কবির উদয় হয়েছে সে-বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদকের একটা ধারণা ছিলো, কেননা তিনি ঐ বিশেষ সংখ্যার মালমশলা সংগ্রহের জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের সহায়তায়

ভারত ঘুরে এসেছিলেন। তিনি আমাকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিশেষ রচনা তৈরি করতে বলেন। তা করেওছিলাম। সেখানে কিছু নামধাম অবশ্যই ছিলো। বুদ্ধদেব বসুর নামও ছিলো। চেনাজানা ব্যক্তিরা লেখাটির সময়োপযোগিতার প্রশংসাও করলেন। কিন্তু কই, ১৯৯৩-এ লেখাটা বেরোবার পর কবিতাজগতের কর্ণধাররা কেউ তো আমাকে ফোন ক'রে প্রস্তাব দিলেন না, 'আসুন, কিছু আধুনিক বাংলা কবিতা অনুবাদ ক'রে বের করা যাক।' আমরা যারা বাংলার রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক জোয়ারের স্পর্শ এখনও অনুভব করি, যাদের কাছে শেক্সপীয়র খুবই চেনা মানুষ আর রবীন্দ্রনাথের বিশাল উত্তরাধিকার নিতান্ত ঘরের জিনিস, যারা 'কবিতাভবন'-এর স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি, তারা এই ধরণের নীরবতা, সক্রিয় কৌতূহলের এই অভাব সম্বন্ধে কী বলতে পারি? বিশ্বমনস্ক প্রাণচাঞ্চল্যের এই হ্রাস আমার কাছে তো প্রাদেশিকই ঠেকে। মার্কিন ত্বনিয়ার বন্ধুরাও যে ওখান থেকে এর চেয়ে বেশী ভালো খবর দিতে পারেন তা-ও নয়। সেখানেও কবিতাপ্রেমিকরা নিজেদের কোণঠাসা মনে করেন এবং কবিতাসংক্রান্ত আলোচনার শুরু হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য দিয়ে—'কবিতার বিক্রি নেই।' স্বকর্ণে শুনেছি। যার বিক্রি নেই, মার্কিন ত্বনিয়ায় তার কদর হওয়া বোধ করি সহজ নয়।

আমার পরিচিত ইংরেজ কবি-বন্ধুরা বলবেন, 'কবিতাজগতের কর্ণধার তুমি কাদের বলবে? পোয়েট্রি সোসাইটি, পোয়েট লরিয়েট, *পোয়েট্রি রিভিউ* পত্রিকা, ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, বা আধুনিকত্ব-অভিমানী ব্লাডঅ্যাক্স-কার্কানেট-ফেবারের মতো নামী প্রকাশকদের? এ দেশে প্রকৃত কাব্যচর্চা ও কাব্যানুরাগের স্রোত এখন ওদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নয়, প্রবাহিত ছোট ছোট দলের মধ্য দিয়ে, যারা ওয়ার্কশপ করে, সে-উদ্দেশ্যে নিয়মিত মিলিত হয়; প্রবাহিত লিট্‌ল্ প্রেসগুলির মধ্য দিয়ে, তাদের প্রকাশিত নিতান্ত সীমায়িত সার্কুলেশনের পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে। আজকাল কবিতার ও কবিতার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার জলকল্লোল নির্মলভাবে বইছে এই খাতগুলিতেই। আর যাদের ভাবা হয় মেইনস্ট্রীম, মূল ধারা, তারা এখন প্রাতিষ্ঠানিক: তাদের গতি তুষারীভবনের দিকে। যারা একদিন উৎসাহ নিয়ে ছোট দল হিসেবে নিজেদের গ'ড়ে তুলেছিলো তারাই সাফল্যলাভের পর কাঠিন্য অর্জন করেছে। এখন তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রধান লক্ষ্য নিজেদের অহংগুলোকে, চাকরিগুলোকে, যূথবদ্ধ স্বার্থগুলোকে বজায় রাখা।'

হয়তো এটা কেবল বৃটেনের অবস্থার প্রতিবেদন নয়। হয়তো ছবিটা অন্যদেরও চেনা-চেনা লাগছে।

কবিতার এই ছোট ছোট দলগুলি দেশময় ছড়িয়ে আছে। আসলে এরাই নাকি কবিতাকে 'ধ'রে রেখেছে'। কবিতার এই বিকেন্দ্রীকৃত ছোট ছোট ধারাগুলির

কাছে অন্য দেশের কবিতাকে নিয়ে যাওয়া হবে গেরিলা যুদ্ধের মতো, যে-লড়াইয়ে জিততে হলে কমসে কম একজন কবিতার হো চি মিনের নেতৃত্ব লাগবে। আরেকদল উৎসাহী বলেন, 'নেতৃত্ব দেবে ইন্টারনেট। প্রত্যেক দেশেই কাব্যোৎসাহীরা আছেন, কিন্তু সকলেই নিজভূমে পরবাসী। বাণিজ্যবাহন লক্ষ্মীর সঙ্গে নিষ্ঠুর অসম প্রতিযোগিতায় কাব্যসরস্বতী আজ কোণঠাসা। দেশে দেশে আমরা আজ সংখ্যালঘু, পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইন্টারনেটের সাহায্যে আমরা ভাবনা বিনিময় করতে পারি, আমাদের কাজের খবরাখবর পরস্পরকে পৌঁছে দিতে পারি, গ'ড়ে তুলতে পারি কবিতার লেখক ও পাঠকদের পৃথিবীজোড়া নেটওয়ার্ক।' সেই জালবন্ধনই কি হবে একুশ শতকের নতুন আন্তর্জাতিক কবিতাভবন ?

অনুবাদে উৎসাহীদেরও একটা নতুন জালবন্ধন গ'ড়ে উঠছে, যার উল্লেখ করা দরকার। অনুবাদকলার দুয়োরানী-মর্যাদায় বৃটেনের অনুবাদকরা বেশ কিছুদিন ধ'রেই বিক্ষুব্ধ; তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠছেন। একটু আগেই বললাম, কন্টিনেন্টাল ইয়োরোপীয়রাও বইয়ের বাজারে ইংরেজীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যে উদ্বিগ্ন, এবং নিজেদের সাহিত্যিকদের মর্যাদা সম্বন্ধে অন্যদের অবহিত করতে আগ্রহী। এই-সব তরঙ্গের সমবেত অভিঘাতে ক্রমশঃ অনুবাদের সপক্ষে একটা নতুন লবি তৈরি হয়ে উঠছে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন না থেকে অনুবাদকরা শক্তি খুঁজছেন পরস্পরসহযোগিতার গ্রন্থন থেকে। আগামী শতাব্দীগুলিতে সাহিত্যের অনুবাদ এক নূতন গুরুত্ব লাভ করবে এ কথা উপলব্ধি ক'রে তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে বসানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছেন একদল বুদ্ধিজীবী। তাঁরা নিজেরা সাহিত্যের অনুবাদক ব'লে এই উদ্যোগের সঙ্গে তাঁদের পেশাদারী স্বার্থ জড়িত—আশার ঝিলিক সেইখানেই।

এখন থেকে এক দশক আগে সাহিত্যিক অনুবাদের বিবর্ধন ও বিকাশের জন্য বৃটেনে একটি স্বতন্ত্র সংস্থার গোড়াপত্তন হয়। ঈস্ট অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সংস্থা আর্ট্‌স্ কাউন্সিল থেকে এবং ইয়োরোপীয় ভাণ্ডার থেকে অর্থসাহায্য পায়। ইয়োরোপ মহাদেশের বহুভাষিতা এই সংস্থার চালিকা শক্তি, এবং এর লক্ষ্য হলো অনুবাদকলাকে আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ে নিবেদিত একটি অনন্য শিল্পকলারূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। একটু একটু ক'রে এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর এই সংস্থা তার দাগ রাখতে আরম্ভ করেছে। শিল্পকলাসংক্রান্ত সরকারী নীতি যাঁরা তৈরি করেন তাঁরা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও বিবর্ধনকে কর্মসূচীর মধ্যে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং তাঁদের মেনে নিতে হচ্ছে যে বহুসাংস্কৃতিকতার অর্থ হচ্ছে বহুভাষিতার সত্যতা। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের যে-ভাষাগুলি এখানে সংখ্যালঘুদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত, যেমন পাঞ্জাবী, বাংলা, গুজরাটী, উর্দু, সেগুলি ইয়োরোপের অন্তর্গত ভাষা

হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের মাতৃভাষাগুলি এই পদ্ধতিতে ইয়োরোপীয় স্বীকৃতি পেলে সেই ভাষাগুলি থেকে সাহিত্যিক অনুবাদের পথ আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর হবে, কেননা নিকট ভবিষ্যতে অনুবাদকর্মকে সুকর করার জন্য যে-অর্থসাহায্য আমরা প্রত্যাশা করতে পারি তার একটা বৃহদংশ আসবে ইয়োরোপীয় ভাণ্ডার থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রবণতা একভাষিতাকে দৃঢ়তর করার দিকে ; স্প্যানিশের অনুপ্রবেশকে রোধ করার তাগিদ সেখানে প্রবলতর হচ্ছে। এই ব্যাপারে মার্কিন দেশের অবস্থা আর ইয়োরোপের অন্তর্ভূত বৃটেনের অবস্থায় আমরা একটা লক্ষণীয় প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি। বহুভাষিতাকে ও অনুবাদকলাকে দৃঢ়তর করবার জন্য ইয়োরোপীয়দের জেদ যদি বজায় থাকে, তা হলে একবিংশ শতাব্দীতে অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে একটা তফাৎ গ'ড়ে উঠতে পারে।

এর আগে রণক্ষেত্র আর গেরিলা যুদ্ধের রূপক ব্যবহার করেছি। সে-পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে ইয়োরোপীয় মাতৃভাষাদের তফসিলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হবে একটি রণকৌশল। এর মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই, আছে বাস্তব পরিস্থিতির স্বীকৃতি, তাকে আমাদের সাহিত্যের স্বার্থে কাজে লাগানোর একটা চেষ্টা। ইংরেজী যদি 'ভারতীয় ভাষা' হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, তবে আজকের দিনে বাংলাই বা 'ইয়োরোপীয় ভাষা' হবে না কেন! দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই। এই যেমন আমি নিজে এ দেশে অনেক বছর আছি, কোনো বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ফ্রীলান্সার হিসেবে অনেক বছর ধ'রে ইংরেজী-বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখে যাচ্ছি। এ দেশে আর্ট্‌স্ কাউন্সিল ও তার আঞ্চলিক শাখাগুলির তরফ থেকে লেখকদের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি বা ভাতার ব্যবস্থা আছে। সেগুলি নাকি বাতাসে ওড়ে, ধরতে জানতে হয়। আমি এ দেশেরই নাগরিক ; লেখা থেকে আমার সংক্ষিপ্ত উপার্জন আয়করের চৌকাঠ পর্যন্ত ওঠে না, কিন্তু বিক্রয়-কর-জাতীয় ট্যাক্সগুলি একটা দেশে বাস করলেই দিতে হয়, আর আমার পরিবারের অন্য তিন সদস্য ঠেসে আয়কর দেয় ; আমার কোনো বাংলা বইয়ের প্রয়োজনে সরকারী অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করার অধিকার আমার কেন থাকবে না? কিন্তু বহুকাল এ অধিকার স্বীকৃত ছিলো না। এখন অবস্থা পরিবর্তনের মুখে। বাংলা ইয়োরোপীয় মাতৃভাষা হিসেবে প্রকাশ্য স্বীকৃতি পেলে আমার মতো একজন লেখকের কাজ করতে সুবিধে হবে।[৪] চতুর্দিকে প্রায় সবাই যখন ইংরেজীতে লিখছেন, এমন কি সুদূর ভারতে ব'সে শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়ও যখন বৃটেনের বইয়ের বাজারে 'বৃহৎ কাটতির দেবী' ('goddess of big sales') সাব্যস্ত হয়েছেন, তখন আমার মতো একজন দেশান্তরিত লেখকের মাতৃভাষায় লেখালেখি করার এই-যে জেদ, এর সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্ভূমি কী? কোন্ পটভূমি এই জেদের বীজ বপন করেছে, তাকে পুষ্টি দিয়েছে, পরিণত করেছে? কোনো ইংরেজ বন্ধু যদি আমাকে এ প্রশ্ন করেন, তার

সছুত্তর দিতে হলে অনেক কিছুই তো টেনে আনতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে চেনানো সেই উত্তরের অন্তর্গত হয়। বুদ্ধদেব বসুকে চেনানোও একই পথ ধ'রে চ'লে আসে। আমি এখন যে-দেশের নাগরিক তার পটভূমিকায় আমার মতো একজন ব্যতিক্রমধর্মী লেখকের ঐতিহাসিক কনটেক্সট কী, অধিকাংশ অভিবাসী ভারতীয় লেখক যখন কেবল ইংরেজীতেই লেখেন তখন আমি কেন অক্সফোর্ডশিক্ষিত হয়েও 'তৃতীয় দুনিয়া'র একটি ভাষায় লেখালেখি করা ছাড়তে পারছি না, আমাদের সাহিত্যিক ঘরানা বা পরম্পরা-গুলির স্বরূপ কী,—আমি বিশ্বাস করি এগুলি বোঝানোর একটা দায় একজন অভিবাসী সাহিত্যিক হিসেবে আমার উপরেও অর্সে। এজন্যেই দময়ন্তীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে কোনো শৌখিনতার ব্যাপার নয়, নিজের জীবনসংগ্রামেরই অন্তর্গত।

'সতর্ক আশাবাদ' অবলম্বন ক'রে বলা যায়, বিগত দশকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এখানে আগত অভিবাসীদের মাতৃভাষাগুলির কিঞ্চিৎ পদোন্নতি হয়েছে। এর জন্য দায়ী প্রথমতঃ আমাদেরই সোচ্চার সংগ্রাম,—যদিও সত্যের খাতিরে স্বীকার্য যে সেটা সমস্ত অভিবাসী সমাজের সমবেত সংগ্রাম নয়, ববং বিভিন্ন স্তরে কিছু কিছু নিবেদিত সাংস্কৃতিক কর্মীর সংগ্রাম, এবং দ্বিতীয়তঃ বৃটেনের বর্ধমান ইয়োরোপীয়করণ। অবস্থার কিছুটা উন্নতি না হলে ১৯৯৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টার নাট্যোৎসবে এবং অন্যত্র মূল বাংলায় আমার নাটক *রাতের রোদ*-এর মঞ্চায়ন হতে পারতো না, কলকাতার নাটকের দল সেজন্যে নাট্যোৎসবের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেতেন না। আমরা যারা আমাদেব মাতৃভাষার সম্মানের জন্য অনেক বছর ধ'রে লড়েছি, সেই আমাদের পক্ষে এই ঘটনা ছিলো একটা মাইলফলক, কিন্তু এই বিজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে লণ্ডনের অথবা কলকাতার মিডিয়া দুটো প্যারা লেখাও প্রয়োজন মনে করে নি। কলকাতায় কেবল একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বেরিয়েছিলো। এখানে মনে রাখা দরকার, একজন অভিবাসী লেখকের দিক থেকে দেখলে, তাঁর ভাষাভাষী অভিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা আবশ্যিকভাবে জটিল, প্রায়ই কিছুটা দ্বান্দ্বিক। অধিকাংশ অভিবাসী মানুষ মূলতঃ জীবিকান্বেষণ ও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের কাছে সাংস্কৃতিক জীবন হয় ধর্মসম্পৃক্ত (মন্দিরে-মসজিদে বা কোরানের ক্লাসে যাওয়া), নয় অবসরবিনোদনের একটা সুখকর প্রলেপ (উপমহাদেশের সিনেমা, গানবাজনা, পূজার মেলামেশা, পয়লা অথবা পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ্যে কিছু রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রনৃত্য, কিছু প্রহসনে নিজেরা অভিনয় করা বা পুরোনো দেশটা থেকে তার দল আনানো)। এর বেশী আশা করাও অবাস্তব হবে। একজন সিরিয়াস লেখকের স্বতন্ত্র সংগ্রাম, তাঁর আশানৈরাশ্য, আনন্দ ও যন্ত্রণা, ট্র্যাজেডির বোধ ও আদর্শবাদ, গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে বিযুক্তি, ভাষাশিল্পের প্রতি অতন্দ্র ফোকস্ ইত্যাদি—এগুলি তাঁকে সব সমাজেই অন্যদের থেকে একটু আলাদা ক'রে

রাখে; এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কথাই উল্লেখ করা যায়। এদিকে যিনি নিজদেশে আছেন তিনি তবু চারপাশে সহলেখকদের নেটওয়ার্ক গ'ড়ে তুলে একাকিত্বের মোকাবিলা করতে পারেন, কিন্তু যিনি ভিন্‌দেশে আস্তানা গেড়েছেন তাঁকে তো কিছুটা একলা প'ড়ে যেতে হবেই। আমার প্রায় সমস্ত কাজ এই একাকিত্বের অভ্যন্তরেই। তাই এখানকার বৃহত্তর লেখকসমাজের সঙ্গে কিছু যোগরক্ষাও আমার পক্ষে কোনো শৌখিন ব্যাপার নয়, জরুরী ব্যাপার। ইংরেজীভাষী সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে আমার বাংলাশ্রয়ী লেখকসত্তা হিমবাহের দুই-তৃতীয়াংশের মতো জলের নীচে ডুবে থাকে। এর কিছুটা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হলে তাঁদের চোখে আমার 'স্টেটাস' বাড়ে, ফলতঃ রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বা আমার পরম্পরার অন্য কোনো কনটেক্সটের তাৎপর্য বোঝাতে, সেই অস্পষ্ট মূর্তিগুলিকে টেনে আনতেও সুবিধা হয়। সমস্তটাই অনিবার্যতঃ একটা ছেদহীন প্রক্রিয়া, যার গতি কখনও কখনও চক্রাকার।

আশার কথা, সাহিত্যিক অনুবাদের সপক্ষে একটা আন্দোলন অবশেষে এ দেশে দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। সেই প্রক্রিয়া এখন দৃশ্যমান। এই আন্দোলনের সূত্রধাররা বলছেন যে অনুবাদ তার নিজের জোরে একটি অনন্য শিল্পকলা, যার লক্ষ্য আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়। অনুবাদকলা অন্ততঃ পার্‌ফর্মেন্স আর্ট্‌সের মতো মর্যাদা পাবে না কেন? ১৯৯৭-এ *রাতের রোদ*-এর অনুবাদ করার জন্য আমি প্রাগুক্ত অনুবাদসংস্থা থেকে একমাসের ভাতা পেয়ে গেলাম। হোক তা একমাসের, তবু একজন ফ্রীলান্সারের কাছে তারও মূল্য আছে। একমাস ঈস্ট অ্যাংলিয়ার ক্যাম্পাসে থাকার সুযোগে ওখানকার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে অনুবাদের থিওরি সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করতে পারলাম। ভাতার অর্থ এসেছিলো ইয়োরোপীয় ভাণ্ডার থেকে। এই সহায়তার পিছনে যুক্তিটা ছিলো এইরকম: বাংলায় লেখা হলেও এই নাটক একজন বৃটিশ নাগরিকের লেখা, এর সেটিং বৃটেনের একটি লিভিংরুমে; এটি মূল ভাষায় ম্যাঞ্চেস্টার নাট্যোৎসবে অভিনীত হয়েছে; এই দীর্ঘ নাটকের ভিতরে কী আছে আমরা জানতে চাই; একে মূলধারার মধ্যে আনা হোক। কুড়ি-তিরিশ বছর আগেকার অবস্থার তুলনায় এ ঘটনা যুগান্তকারী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে সভা আহ্বান করতে আরম্ভ করেছে। ১৯৯৮-এ শেফীল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক অনুবাদের কনফারেন্সে আমার নাটকের অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়, এবং তৎসঙ্গে পাঠমাধ্যমিক ওয়ার্কশপ পেশ করতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়: এও অগ্রগতির পদক্ষেপ। অবশ্য অনুবাদকদের সরাসরি মদত দেওয়ার চাইতে সভা ডাকা সহজতর। তবু অধ্যাপকমহল থেকে কিছু অন্ততঃ স্বীকৃতি পাওয়া অনুবাদকদের পক্ষে একটা লাভ নিশ্চয়। রণক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হয়। হয়তো এর ফলে কোনো-একদিন নাটকটা তার ইংরেজী রূপে প্রকাশিত বা মঞ্চায়িত হতে পারবে।[৫]

অনুবাদের সপক্ষে এই যে নতুন 'প্রেশার গ্রুপ' তৈরি হয়ে উঠছে, একে চালাচ্ছে প্রাজ্ঞ স্বার্থবোধ। অনুবাদের পেশাদাররা তাঁদের কারুশিল্পের ব্যাপকতর স্বীকৃতি ও প্রচার চাইছেন। তাঁরা তাঁদের সামনে এমন একটা রঙ্গমঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন, আগামী শতকে যা বিস্তৃততর হতে বাধ্য। ভবিষ্যতের দুনিয়ায় তাঁরা যে মূল্যবান সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারেন, বিশ্বসাহিত্যের সম্ভারকে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, সে-বিষয়ে তাঁরা সচেতনতর হয়ে উঠছেন। বিশ শতকে অনেক মানুষের জীবনই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রসারিত হয়েছে। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে নয়, এই মানুষগুলোর জীবন চলে মহাদেশ থেকে মহাদেশে প্রসারিত বিশাল কক্ষপথ ধ'রে। এঁদের জীবন যে আবশ্যিকভাবেই দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী হবে সেই সত্যটা এখন আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। যে-শিল্পীরা বহুভাষী তাঁদের জন্য বৃটিশ সংস্কৃতির ভিতরে যথেষ্ট জায়গা করা হবে না কেন, এমন দাবি কেবল উচ্চারিত হচ্ছে না, তার ন্যায্যতাও মেনে নেওয়া হচ্ছে। দ্রষ্টা আমার পক্ষে এই বিবর্তন প্রকৃতই ঔৎসুক্যকর, কেননা ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে, এমন কি আশির দশকের মধ্যভাগেও এই আবহ দেখি নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৃটেনের অনুবাদের তরীর পালে এই-যে নূতন হাওয়া লেগেছে তা প্রধানতঃ বইছে ইয়োরোপ মহাদেশের দিক থেকেই। এখানকার অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই এখন ইয়োরোপীয় অর্থভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল, আব বহুভাষিতা পূর্ণ স্বীকৃতি পাক, এটা স্বভাবতঃই ইয়োরোপের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ। তবে পরিবর্তনের হার অসম। বৃটেনের ফরাসী-জার্মান-স্প্যানিশ ইত্যাদির অধ্যাপকরা এই নূতন দৃশ্য সম্পর্কে আগ্রহশীল; তাঁরা এর মধ্যে নিজেদের জন্য সুযোগ দেখতে পাচ্ছেন; ইংরেজীর একভাষী চর্চায় নিমগ্ন অধ্যাপকরা অপেক্ষাকৃত উদাসীন। আর এখনও পর্যন্ত সংস্কৃতির দুই স্তম্ভ মিডিয়া ও প্রকাশকবৃন্দের মধ্যে কোনো বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। তাঁরা বরং পুরোনো ব্যবস্থার দড়িদড়া শক্ত ক'রে 'ধ'রে রাখা'র চেষ্টাই করছেন।

ঐ দুই স্তম্ভের জাড্য ঘুচতে যত দেরিই হোক, আমরা যারা অনেক বছর ধ'রে বহুভাষিতার স্বীকৃতির জন্য লড়াই করেছি, তারা একটা নতুন দিগন্ত দেখতে পাচ্ছি—একটু ঝাপসা হলেও তার অস্তিত্ব এখন আর অস্বীকার করা যায় না। ইয়োরোপ মহাদেশটা বড়; বহুভাষিতার সঙ্গে তার স্বার্থ অন্তরঙ্গভাবে জড়িত; সে বৃটেনের প্রাক্তন উপনিবেশ নয় ব'লে এবং তার ভাষাগুলি যথেষ্ট উন্নত ব'লে ইংরেজীর প্রতি তার মনোভাব দাসত্ববর্জিত। তাই আশা করা যায় স্থানীয় রাজনীতির কোনো সাময়িক পাশাখেলার চাল বৃটেনের এই কষ্টলব্ধ অগ্রগতিকে বানচাল ক'রে দেবে না। এই প্রেক্ষাপটেই বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ করার কাজকে দেখতে ইচ্ছে করে আমার—তাঁকে ফরাসী-জার্মান-স্প্যানিশে অনুবাদ করার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু

বিশ্বমনস্ক যে-কবি আমাদের জন্য কালিদাস, বোদলেয়র, হ্যেল্ডার্লিন, রিল্‌কের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন, তাঁকে অন্ততঃ ইংরেজীভাষীদের কাছেও চেনানো যায় না কি? নির্ভরযোগ্য ইংরেজী টেক্সটে তাঁকে পেলে কিছু ইয়োরোপীয় বিদগ্ধজনও—যাঁরা আজকাল প্রায়ই ইংরেজীতেও নিষ্ণাত—তাঁর কবিতার কিছুটা স্বাদ তো পাবেন।[৬]

ন্যায্যতঃই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, ভারতীয় ভাষা থেকে অনুবাদের সংগ্রামে লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাসের ভূমিকা কী? তাঁরা কি কিছু করতে পারেন না? ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই পারেন। তাঁদের কাছ থেকে সক্রিয়তর সাহায্য আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করি। লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাস দীর্ঘকাল সংস্কৃতির কোনো পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে ছিলেন না। আমার এক ইংরেজ বান্ধবী ডেনিশ থেকে অনুবাদ করেন। বরাবর দেখেছি, লণ্ডনের ডেনিশ দূতাবাস তাঁর কাজের অন্যতম প্রধান সহায়ক, আর ভেবেছি, এরকম মদত পেলে কত কী করা যেতো।

অবশেষে একটা হাওয়াবদলের সূচনা হয় আই-সি-সি-আর-এর সহায়তায় ভারতীয় দূতাবাসের নূতন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নেহরু সেন্টারের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে প্রথম বড় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনের কমনওয়েল্‌থ্‌ ইনস্টিটিউটে ১৯৯৩ সালে। ঈস্ট অ্যাংলিয়ার অনুবাদের বিশেষ সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের থেকে বেশী সক্রিয় সহযোগী ছিলেন কমনওয়েল্‌থ্‌ ইনস্টিটিউট। নেপথ্যে অক্লান্ত কর্মী ছিলেন রঞ্জনা সিদ্ধান্ত অ্যাশ্‌, ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে অনুবাদের সপক্ষে যাঁর দীর্ঘকালীন সংগ্রাম সর্বস্বীকৃত। আই-সি-সি-আরকে তাঁরা জড়িয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনাসভা ডাকা হয় বার্মিংহামে, এবং গত ১৯৯৮ সালে নেহরু সেন্টারের বর্তমান পরিচালক ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে খোদ নেহরু সেন্টারে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বিগত বছরগুলিতে নেহরু কেন্দ্র লণ্ডন শহরের একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক মিলনস্থল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা সকলেই আশা করছি যে নেহরু কেন্দ্র থেকে ভবিষ্যতে নানা ব্যাপারে, বিশেষতঃ প্রচারের ক্ষেত্রে, আরও সাহায্য পাওয়া যাবে।[৭] তবে যেটা মূল সমস্যা—বই তৈরি হলে প্রকাশের অসুবিধা—তার মোকাবিলায় এই কেন্দ্র কিছু করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে আই-সি-সি-আর-এর নীতির উপরে। ভারতীয় লেখকদের কাজকে বাইরে পরিচিত করানোর জন্য প্রকাশসহায়ক অনুদানের কোনো নীতি এঁদের আছে ব'লে জানি না। ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশ নিজেদের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য অনুবাদকদের পুরস্কারও দিয়ে থাকেন। এতে প্রচারে সহায়তা হয়, তাঁদের সাহিত্য অন্ততঃ কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ভারত থেকে ঠিক সে-ধরণের কোনো পুরস্কার দেওয়ার রীতি নেই। আমার ধারণা, সাহিত্য আকাদেমি থেকে অনুবাদসংক্রান্ত কোনো-

একটা পুরস্কার আছে, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে যে-সব পুরস্কার দেওয়া হয় সে-সমস্তই নাগরিকত্বের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক না হলে সেগুলি পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, যাঁরা বহির্জগতের জন্য ভারতীয় সাহিত্যের দক্ষ অনুবাদ করবেন তাঁরা যে ভারতীয় নাগরিক হবেন এমন কোনো কথা নেই। বস্তুতঃ, সাহিত্যচর্চার সঙ্গেই নাগরিকত্বের কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। আমি নিজে বৃটিশ নাগরিকত্ব সত্ত্বেও বাংলায় লিখে যাচ্ছি। একেই দুনিয়াজোড়া কায়েমী বাণিজ্যিক স্বার্থ আমাদের শ্বাসরোধ করছে, তার উপর দিল্লীর সরকারী নীতির এই দৃষ্টিক্ষীণতা আমাদের উৎসাহ দেয় না।

১ সেটি, *বৈদগ্ধ্য* পত্রিকার বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, মে ১৯৯৯-এ বেরোয়। দময়ন্তী সংখ্যাটির অতিথি-সম্পাদনা করেছিলেন।

২ ও ৩ লরেন্স ভেনুটির (Lawrence Venuti) বইটি তার প্রাক্-প্রকাশন টাইপলিপির আকারে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়। ১৯৯৭ সালে নেওয়া নোট থেকে তথ্যগুলি নিলাম। পাণ্ডুলিপিটির নাম ছিলো 'The Scandals of Translation'; ঐ শিরোনামেই ১৯৯৮ সালে Routledge প্রকাশভবন থেকে বই হয়ে বেরিয়েছে।

৪ কিন্তু যতদূর জানি, একটা বই বাংলাতে লেখা হলে তার কাজের জন্য লেখক-ভাতা পাওয়া এখনও সম্ভব নয়। আসলে প্রশ্ন একটা বইয়ের বিষয়বস্তু বা মালমশলা নিয়ে নয়, বইটা শেষ পর্যন্ত কোন্ ভাষায় লেখা হবে তা নিয়ে। ভারতীয় ভাষাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা ক'রে অধ্যাপকরা ইংরেজীতে বই লিখলে কোনো অসুবিধা নেই, তাঁরা বিভিন্ন বিদ্যাজাগতিক ভাণ্ডার থেকে অর্থসাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু বইটা কোনো ভারতীয় ভাষায় লেখা হলে এ দেশে তার জন্য কোনো অনুদান পাওয়া সম্ভব নয়।

৫ *রাতের রোদ*-এর ইংরেজী রূপ *Night's Sunlight* মঞ্চায়িত ও প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে।

৬ আমার বুদ্ধদেব-অনুবাদের বই বেরোয় ২০০৩ সালে, এবং সেটির মধ্যস্থতায় তাঁর কবিতার কিছু কন্টিনেন্টাল ইয়োরোপীয় পাঠকও জুটেছে।

৭ বুদ্ধদেবের জন্মশতবর্ষের বছরে সেখানে একটি স্মরণসভা ডাকা গেছিলো।

[*জিজ্ঞাসা*, ১৯ : ৪, ১৪০৫ (১৯৯৯)। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারিতে লিখিত।]

বাংলা সাহিত্যের 'ডায়াস্পোরিক' ভুবন : একটি ভূমিকা, কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ও ভাবনা

১৯৯৯ সালের জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বাঙালীদের একটি সম্মেলনে এমন একটা বিষয়ে কিছু বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করা হয়েছিলো আমাকে, যে-বিষয়টা একেবারে আমার জীবনের কেন্দ্রেই অবস্থিত। ফলে সাড়া না দিয়ে পারি নি। সেই বক্তৃতাটিরই পরিমার্জনা ও সম্প্রসারণের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ।

এ কথা মানতেই হবে যে গত কুড়ি-তিরিশ বছরে দুই বাংলার বাইরে একটি বৃহৎ বাঙালী সমাজ গ'ড়ে উঠেছে, প্রধানতঃ ইয়োরোপে ও উত্তর আমেরিকায়, মনে হয় কিছু পরিমাণে অস্ট্রেলিয়াতেও। দক্ষিণ আমেরিকার কথা জানি না, তবে অনুমান করি আফ্রিকা মহাদেশের স্থানে স্থানে বাঙালীদের দল নিশ্চয়ই আছেন। শুনতে পাই এশিয়াতে কুয়েত বা দুবাই-এর মতো জায়গায় তাঁরা দলে ভারী হয়ে উঠছেন। ১৯৯৮ সালে বৃটেনেই আমার দেখা হয় সন্দীপ ঠাকুর মশাইয়ের দঙ্গে। তিনি থাকেন জাপানের ওসাকায়, সেখানে একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তার লাইব্রেরির জন্য আমার বই কিনে নিয়ে গেলেন। আগেকার দিনে হলে এঁদের সকলের সম্বন্ধে আমরা হয়তো ঢালাওভাবে কেবল 'প্রবাসী' শব্দটাই ব্যবহার করতাম, কিন্তু আজকাল সঙ্গত কারণেই কিছু নূতন শব্দ বা শব্দসমষ্টিও তৈরি হয়ে উঠছে। যেমন, 'ইমিগ্রান্ট' বোঝাতে মিডিয়াতে 'অভিবাসী' শব্দটা চালু হয়েছে। আমি নিজে এ শব্দটা অনেকদিন ব্যবহার করি নি। আজকাল করি, না ক'রে উপায় নেই। 'প্রবাস'-এর দ্বারা সূচিত হয় কেবল জন্মভূমির বাইরে থাকার ব্যাপারটুকু। 'অভিবাসন'-এর মধ্যে আছে নূতন দেশে শিকড় গাড়ার এবং সেখানকার সংখ্যালঘুদের অন্তর্গত হয়ে ওঠার ব্যঞ্জনা। আগন্তুকদের সন্তানরা যদি নূতন দেশে জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই বড় হয়, তা হলে তাদের আর প্রবাসী বা দেশান্তরিত বলা যায় না, এমন কি তাদের পক্ষে 'অভিবাসী' শব্দটাও অসঙ্গত, কেননা অভিবাসনের বা দেশান্তরগমনের কাজটা তারা করে নি, তাদের বাবা-মায়েরা করেছে। তারা যেখানে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে, শিক্ষা পেয়েছে, সেটাই তাদের প্রথম দেশ। প্রায়ই তাদের বর্ণনা দেওয়া হয় 'দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালী' বা ঐ ধরণের শব্দ-বন্ধে। তাদের প্রাথমিক পরিচয় গ'ড়ে ওঠে নূতন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবেই।

এটা অবধারিত ছিলো যে বাঙালীদের ঢেউ পৃথিবীময় আছড়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের একটা সংস্কৃতিগত জীবনও গ'ড়ে উঠবে। বিভিন্ন স্তরে, জটিলতার বিভিন্ন

মাত্রায় তেমন একটা জীবন নিঃসন্দেহে গ'ড়ে উঠেছে ও উঠছে। বাঙালীরা যেখানেই যায় সেখানেই তাদের নৃত্যগীত আবৃত্তি অভিনয় খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের বাঙালিয়ানা বজায় রাখার একটা ন্যূনতম চেষ্টা ক'রে থাকে। এটা একটা চলমান এবং দৃশ্যমান প্রক্রিয়া।

বৃটেনে দুই বাংলা থেকে আগত বাঙালীদের নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলে—লণ্ডন বার্মিংহ্যাম ম্যাঞ্চেস্টার লিভারপুল সাণ্ডারল্যাণ্ড ইত্যাদি বড় বড় শহরে। এই প্রবন্ধের ঘষামাজার কাজ চলাকালীন (সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) ওয়েল্‌সের সোয়ান্‌সী শহরে বাঙালীদের একটি বৃহদাকার সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ ক'রে এলাম। সাধারণভাবে বলা যায়, আজকাল পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, একুশে ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। দুই বাংলা থেকে গায়ক ও অভিনেতাদের আনানো হয়। অভিনয়ের স্থানীয় দলও কতগুলি আছে। বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরোয়। বাংলায় লেখেন বা বাংলাভাষার মাধ্যমে সাংবাদিকতা করেন গোলাম মুরশিদ, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, শামীম আজাদ, শামীম চৌধুরী, ঊর্মি রহমান, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, ফজলুল আলম প্রভৃতি। শেফীল্ডে মেয়েদের লেখালেখির একটি দল আছে, দেবযানী চট্টোপাধ্যায় এবং সফুরান আরার নেতৃত্বে। তাঁরা বেশ কয়েকটি বইও বার করেছেন। আমার হাতে কবিতার বই গুঁজে দিয়েছেন লণ্ডনের অমলেন্দু বিশ্বাস, কম্পিউটার-জগতের লোক, কভেন্ট্রির শেখর বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। পূর্ণ অর্থে অভিবাসী ছাড়াও যাঁরা আসছেন, কিছু দিন থেকে হয়তো আবার চ'লে যাচ্ছেন তেমন প্রবাসীরাও এই সংস্কৃতিচর্চাকে সব সময়েই পুষ্ট করছেন। সম্প্রতি আমাকে কবিতার বই পাঠিয়েছেন এক তরুণ ডাক্তার, অমিতরঞ্জন বিশ্বাস, যিনি ট্রেনিং নিতে এসেছেন লণ্ডনে। এঁর দ্বিতীয় বইয়ের কবিতাগুলিতে প্রবাসজীবনের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। আমারই নাটকে অভিনয় করতে প্রথম বিলেতে এসেছিলেন আরেক তরুণ ডাক্তার, সম্রাট সেনগুপ্ত, বর্তমানে এখানকার বাংলা নাটকের দলগুলিতে যাঁর রীতিমতো চাহিদা। এই সেদিন লণ্ডনে গান পরিবেশন করলেন সাময়িকভাবে লণ্ডনপ্রবাসী মৌসুমী ভৌমিক, যিনি নিজে গান বাঁধেন, এবং সুগায়িকা তো বটেই। তাঁদেরও ভুললে চলবে না, যাঁরা নিজেরা বাংলায় লেখেন না, কিন্তু বাংলা থেকে অনুবাদ করেন, এবং বাংলা সাহিত্যের প্রচারের প্রতি যাঁদের আনুগত্য নিরলস। এঁদের মধ্যে লণ্ডনের রঞ্জনা সিদ্ধান্ত অ্যাশ্ এবং শেফীল্ডের দেবযানী চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতেই হয়। আর লণ্ডনের বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে মাতৃভূমির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে চেতনা ও গর্ব সঞ্চারিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অনেক কাজ করেছেন শ্রদ্ধেয় তাসাদ্দুক আহমেদ। তাঁর কম্যুনিটি সার্ভিসের জন্য তিনি বৃটিশ সরকারের খেতাবও পেয়েছেন। তিনি বর্তমানে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী, কিন্তু এক সময়ে

খুবই সক্রিয় ছিলেন। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে 'আর্টস্ অফ বেঙ্গল'-এর মতো উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। *গার্ডিয়ান* কাগজের জন্য আমাকে দিয়ে সেই প্রদর্শনীর রিভিউ লিখিয়ে নিয়েছিলেন পর্যন্ত। *গার্ডিয়ান* কাগজে সেই আমার প্রথম ও শেষ লেখা! আর কেউ আমাকে দিয়ে ঐ ধরণের কাগজে কোনোদিন কিছু লিখিয়ে নেবার কথা ভাবেন নি। সেই সময়ে কিছু সাহিত্যসভাও ডেকেছিলেন তিনি ; সেখানে কবিতা পড়েছিলাম মনে আছে।

১৯৮৭ সালে সান ফ্রান্সিস্কোর রবীন্দ্রবিষয়ক সভায় গিয়ে এবং ১৯৯৩ সালে নিউ জার্সির রবীন্দ্রমেলায় গিয়ে এই ধরণের সংস্কৃতিচর্চার মার্কিন দিকটার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই। '৯৩-এ নিউ ইয়র্কে এক গেট-টুগেদারে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো এবং অনেক পত্রিকা আমাকে পড়তে দেওয়া হয়েছিলো। সব সঙ্গে ক'রে ফেরত নিয়ে গেছিলাম, পড়েওছিলাম। '৯৬ সালে বস্টন থেকে বাংলাদেশে যাবার পথে আমাকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়েছিলেন সাজেদ কামাল। '৯৮ সালে টরন্টোর বঙ্গসম্মেলনে গিয়ে খবর পেলাম, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে আরেকটু পড়লাম ক্যানাডা থেকে নতুন প্রকাশিত পত্রিকা *বাংলা জর্নাল*-এ, যেটির প্রথম সংখ্যা ওখান থেকে আমাকে পাঠিয়েছেন ইকবাল করিম হাসনু। উত্তর আমেরিকায় বাস ক'রে বাংলায় লেখেন এমন বেশ কিছু নাম এটির মধ্যে পেলাম। শেখ মিজানের নাম আগেই জেনেছিলাম *জিজ্ঞাসা*-র মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে প্রকাশিত শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিবাসী বাঙালীদের একটা উল্লেখযোগ্য ফোরম্ তৈরি হয়েছে। শিবনারায়ণ নিজে দীর্ঘকাল অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী ছিলেন, তাই এ ধরণের ফোরম্ তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর একটা প্রকৃত উৎসাহ ছিলো। আমেরিকা থেকে অরবিন্দ ঘোষ, সৌম্য দাশগুপ্ত ও অন্যান্যরা তাঁর পত্রিকায় লেখেন। জনপ্রিয়তর স্তরে বেরোয় ডায়াস্পোরার অন্যানা পত্রিকা—অনেক সময়ে মেয়েদের উৎসাহে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে বাংলার চর্চাকে চালু রাখতে। সম্পাদিকারা আমার কাছ থেকে যখন লেখা আদায় ক'রে নেন, তখন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হই। এইরকম একটি কাগজ ছিলো পূরবী নন্দীর *সাংবাদিক*, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরোতো, এখনও আছে কিনা জানি না। ক্যানাডা থেকে এখন অনুরাধা রায়ের তত্ত্বাবধানে বেরোয় *আমরা*—বাংলাভাষার প্রতি কাগজটির কমিটমেন্ট সুদৃঢ়। নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক *ঠিকানা* একটি বহুপ্রচারিত বড় আকারের খবরের কাগজ। মার্কিন দেশে বাংলা থেকে অনুবাদের কাজ করেছেন গায়ত্রী স্পিভাক, কল্পনা বর্ধন, সাজেদ কামাল এবং আরও কেউ কেউ। তাঁদের ভুলে যাচ্ছি না।

আমার পরিচিত পরিধির ভিতর থেকে কয়েকটি নাম উল্লেখ করলাম মাত্র।

আসলে, রীতিমতো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা না করলে এই বিষযটির উপরে সার্বিকভাবে কোনো প্রতিবেদন রাখা সম্ভব নয়। বৃহত্তর চালচিত্রে বিষয়টির অনুধাবন নৃতাত্ত্বিক আঙ্গিকও দাবি করে, এটি সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজির অনুসন্ধানের উপযুক্ত বিষয়। বস্তুতঃ, এখানে ডক্টরেট করার মতো ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে। একটা তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত দরকার। সুইডেনে জার্মানিতে ফ্রান্সে এই ধরণের সংস্কৃতিচর্চা চলছে তা আমরা জানি, সেই-সব গ্রুপের সঙ্গে চেনা গ্রুপগুলির তুলনা প্রযোজন। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রবাসী-অভিবাসীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তুলনা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বা ছিলেন হিন্দী উপন্যাস *হবন*-এর লেখিকা সুষম বেদী। বিলেতে আছেন হিন্দী ভাষার কবি কীর্তি চৌধুরী, পাঞ্জাবী কবি অমরজিৎ চন্দন। গুজরাটী কবিরাও আছেন। সম্প্রতি বিলেতে পাঞ্জাবী থিয়েটার খুব সক্রিয হয়ে উঠেছে। তরুণী গায়িকা সামিয়া মালিক উর্দুতে গান বাঁধেন, সি-ডিও বার করেছেন। উর্দু থেকে তর্জমা করেন আমীর হুসেন ও রুক্সানা আহমেদ। আমি শুধু কয়েকটা নাম তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। এটা কেবল একটা ভূমিকা, একটা স্কেচ। অনেকেই অনেক রকমের কাজে লিপ্ত আছেন। বোঝাতে চাইছি যে এই বড় চালচিত্রটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে।

বাঙালীদের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি, স্বীকার করতেই হবে দেশান্তরিত বাঙালীদের পুঞ্জগুলি এখন এমন একটা আযতনে পৌঁছেছে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায critical mass, এখন আমরা আর যা-ই করি না কেন, একটা স্বতন্ত্র ভুবন হিসেবে গবেষকদের গবেষণার যোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছি বটে। কিন্তু সেই গবেষণা কারা করবে, আমাদের ইতিহাস কারা লিপিবদ্ধ করবে?

টেক্সাসের সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলাম বাংলা 'ডায়াস্পোরা'র একজন লেখিকার পরিচয়ে। 'ডায়াস্পোরা' শব্দটি এসেছে গ্রীক থেকে। এর অর্থ: 'যারা ছড়িয়ে পড়েছে, বিকীর্ণ হয়েছে'। প্রথমে ইহুদীদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হলেও শব্দটির ব্যবহার এখন আর কেবল তাদের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই। যে-কোনো গোষ্ঠীর মানুষ, যারা একটা আদিনিবাস থেকে বেরিয়ে নানা জায়গায ছড়িয়ে পড়েছে এবং একটা critical mass-এ পৌঁছেছে, তাদেরই এই নামে অভিহিত করা যায এবং করা হচ্ছে। একমুহূর্ত ঐতিহাসিক খাতে চিন্তা করলেই মালুম হয়, মানবসমাজে এই 'ডায়াস্পোরা'র ব্যাপারটা আবহমান কাল ধ'রেই ঘটছে। আমেরিকা মহাদেশের তথাকথিত 'ইণ্ডিয়ান'দের পূর্বপুরুষরা তো কোনো-এক সময়ে বেরিং প্রণালী অতিক্রম ক'রে এশিযা থেকে আমেরিকার মাটিতে পৌঁছেছিলেন। তেমনি ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীতে যে-সব ভাষা আছে তাদের আদিরূপ যাঁদের মুখের ভাষা ছিলো তেমন কিছু মানুষ ছড়িয়ে প'ড়ে থাকবেন ইয়োরোপ থেকে ইরান ও ভারতীয় ভূখণ্ড পর্যন্ত। ভাষার ব্যবহার অবশ্যই কোনো রক্তগত বংশপরম্পরার অভ্রান্ত নির্দেশক নয়; একটা বহিরাগত ভাষা নূতন

জায়গায় গৃহীত ও ব্যবহৃত হতে পারে—ভারতে যাঁরা ইংরেজীতে তুখোড় তাঁরা সবাই কি আর উপনিবেশস্থাপনকারীদের বংশধর ?—কিন্তু কোনো-না-কোনো দলকে নতুন ভাষাটাকে প্রথমে এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যেতে হবে, তবেই অন্যরা তাকে গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। ভাষার প্রসার তাই মানবগোষ্ঠীগুলির গতিশীলতার নির্দেশ দেয়, যেমন দেয় খাওয়াদাওয়া, পোশাক-আশাক, চালচলন, আসবাব বা তৈজসপত্রের ব্যবহারও। পৃথিবীতে কেবল ইহুদীদের নয়, ডায়াস্পোরা ঘটেছে অজস্র মানবগোষ্ঠীর : আরবদের, চীনাদের, জিপ্‌সিদের, আফ্রিকার কালো মানুষদের, ইয়োরোপের মানুষদের। ইয়োরোপ থেকে তরঙ্গে তরঙ্গে ডায়াস্পোরার স্রোত এসে আছড়ে পড়েছে মার্কিন দেশে, উত্তরে তথা দক্ষিণে ; আফ্রিকা থেকে দাসবাহী জাহাজে জাহাজে এসে পৌঁছেছে ক্লান্ত ক্ষুব্ধ বুভুক্ষু অর্ধমৃত কালো মানুষের দল। সাদা-কালোর মিলিত ডায়াস্পোরায় গ'ড়ে উঠেছে নয়া দুনিয়ার নয়া সভ্যতা। সুদূর অতীতে বঙ্গের বণিকরাও কি তাম্রলিপ্তি থেকে সাগরপাড়ি দেন নি, তাঁদের রক্তের উত্তরাধিকার তথা তাঁদের তৎকালীন সংস্কৃতির বীজ অন্য মাটিতে ছড়িয়ে দেন নি ? যদি নিজেদের আরেকটু দার্শনিক মাত্রায় চিন্তা করতে প্রশ্রয় দিই, তা হলে এটাও মনে রাখতে পারি যে ছড়িয়ে পড়া ব্যাপারটা আদৌ কোনো বিরল ঘটনা নয় : বিশ্বটাই আদতে একটা বিশাল ডায়াস্পোরা, পদার্থের এক সুমহান বিকিরণ ; বিকীর্ণ নক্ষত্রধূলি দিয়েই আমরা তৈরি হয়েছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই জানি না, কিন্তু ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছি এবং ঘুরছি বটে।

মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতটা মাথার মধ্যে রেখে ফিরে আসা যাক মাটির পৃথিবীতে। আজকাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের 'ডায়াস্পোরা'র লেখকদের নিয়ে গবেষণানিবন্ধ লেখা হচ্ছে। এর সিংহভাগটাই কিন্তু যাঁরা ইংরেজীতে লেখেন তাঁদের নিয়ে। উপনিবেশ-উত্তর সময়ে ইংরেজী বিভাগগুলিতে 'ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্য' একটি স্বতন্ত্র বর্গের মর্যাদা পেয়েছে, এবং তারই অন্তর্গত উপবর্গ হিসেবে দক্ষিণ এশীয় ডায়াস্পোরার যে-সাহিত্য ইংরেজীতে লেখা তা আজকাল বিদ্যাজগতের প্রচুর মনোযোগ পাচ্ছে। এই লেখকবৃন্দের মধ্যে কিছু বঙ্গসন্তানও আছেন। কি পশ্চিমে কি ভারতে মিডিয়ারও এই বিষয়টিতে কৌতূহলের শেষ নেই। বিপরীত কোণে যাঁরা প্রবাসে ব'সে নিজস্ব ভাষায় লেখালেখি করেন তাঁদের সম্বন্ধে এই স্মার্ট গবেষক ও সাংবাদিকদের কৌতূহল প্রায় শূন্যের কোঠায়। ধ'রে নেওয়া যাক যাঁরা পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বা মূলধারার মিডিয়ায় কাজ করছেন তাঁদের অধিকাংশের ভারতীয় ভাষার প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই, সে তাঁরা উপমহাদেশ থেকে আগত হলেও, তাই তাঁরা এ ধরণের কাজে কোনো তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করতে অক্ষম। যেটা

আশ্চর্যের, ভারতীয় উপমহাদেশের ভিতর থেকেও তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত নেবার জন্যে কাউকে তেমন এগিয়ে আসতে দেখি না। বাংলার ক্ষেত্রে এই অনীহা আমাকে বিস্মিত করে। কেননা বাংলা লেখায় 'ডায়াস্পোরা'র একটা ধারা বেশ কিছু দিন ধ'রেই গ'ড়ে উঠেছে। আমেরিকাপ্রবাসী অমিয় চক্রবর্তী তো সাম্প্রতিক অভিবাসনের ঢেউগুলির অনেক আগে থেকেই একজন ডায়াস্পোরিক লেখক ছিলেন।

'অভিবাসন'-এর কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে পুরোনো দিনের 'প্রবাস'-এর কথাই মনে আনি যদি, তা হলে প্রবাসের বাংলা সাহিত্যের উৎসসন্ধানে অনেকটা দূরই পিছিয়ে যেতে পারি—একশো বছরেরও বেশী সময়। বাঙালীদের দেশান্তরগমনের সাহিত্যিক ফসলের ইতিহাস স্পষ্টতঃ এক শতাব্দীর চেয়ে দীর্ঘতর, এবং এই ইতিহাসও ঠিক ক'রে লিখতে হলে কিছু গবেষণা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৮৮১ সালে। কৃষ্ণভাবিনী দাস তাঁর স্বামীর সঙ্গে ১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ডে যান এবং তার তিন বছর পরে ১৮৮৫-তে প্রকাশিত হয তাঁর স্মরণীয় বই *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*। কৃষ্ণভাবিনী সর্বসমেত আটটি বছর বিলেতে কাটিয়েছিলেন এবং দেশে ফেরার পর আরও অনেক প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলিতে তাঁর প্রবাসজনিত চিন্তার ফলাফল আরও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়। *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* বইটির একটি নতুন সংস্করণ কলকাতা থেকে বেরিয়েছে—সীমন্তী সেনেব সম্পাদনায় (স্ত্রী. ১৯৯৬)। মুখবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আশ্চর্যের বিষয়, মুখবন্ধের প্রথম বাক্যেই তিনি লেখেন, 'উনিশ শতকে লেখা বিলেতের ভ্রমণকাহিনী নিয়ে এখনকার বাঙালি পাঠকের মনে খুব বেশি কৌতূহল থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না।' আমাদের যে আদৌ কৌতূহল থাকতে পারে তার সম্ভাবনাটাকেই তিনি একটা টিনের মধ্যে পুরে চাঁটি মেরে ঢাকনাটাকে বন্ধ ক'রে দেন! পরের অণুচ্ছেদে তিনি ইঙ্গিত দেন যে 'শক্তিশালী লেখকের নিজস্ব মনীষার চিহ্ন' এই বইয়ে অনুপস্থিত, 'কৃষ্ণভাবিনীর বইটি সেই দিক থেকে আদৌ অসাধারণ কোনো রচনা নয়।' তার পরেই বলেন, 'কিন্তু সেই কারণেই আজ এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বই হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে', অর্থাৎ যেহেতু অসাধারণ নয়, যেহেতু তা 'একান্তভাবেই স্ট্যাণ্ডার্ড একটি দলিল', সেহেতু তাঁর মতো একজন পেশাদার ইতিহাসবিদের চোখে তার একটা উপাদানগত মূল্য আছে। এই মূল্যায়নকে আমার অসাধারণ রকমের উপর-থেকে-নীচে-তাকানো, পিঠ-চাপড়ে-দেওয়া প্যাট্রনাইজিং ভঙ্গির মূল্যায়ন মনে হয়েছে। উনিশ শতকের এক বাঙালী মেয়ে যাত্রী ও বিদেশপ্রবাসী অবস্থায় নিজের সাহসী ও সরস কলমে তাঁর যাত্রাপথের এবং সমকালীন ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন, এবং সে-বিবরণ আজও আমাদের মন কাড়ে। ভিক্টোরীয় লণ্ডনের এমন কিছু বর্ণনা তিনি রেখে গেছেন, যেমনটা আমি অন্য কোথাও পাই নি। যেমন তৎকালীন

লণ্ডনের বাতাসের দূষণের, তার ধোঁয়াশার বর্ণনা। আমার তো মনে হয় তিনি এক অসাধারণ বঙ্গনারী। কোথায় আমরা এমন একজন লেখিকাকে নিয়ে গর্ব করবো, তা না ক'রে মাননীয় অধ্যাপক তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন—এবং তাঁরই সম্বন্ধে মুখবন্ধ লিখতে ব'সে ! সাধারণতঃ পুরোনো হলে লেখকদের মানমর্যাদা বাড়ে। পুরোনো হয়েও কৃষ্ণভাবিনীর যখন এই অবস্থা, তখন আজকের আমরা যারা প্রবাসী বা অভিবাসী বাঙালী লেখকলেখিকা, তারা পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কতটুকু মনোযোগ'ই বা প্রত্যাশা করতে পারি ?

একটু আগে অমিয় চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করেছি। তার আগে প্রবাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে মাইকেল মধুসূদনের বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে। প্রবাসের ভূমিকা বর্তমান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শিবনারায়ণ রায়—এঁদের জীবনে। বর্তমান সময়ে লোকনাথ ভট্টাচার্য আছেন ফ্রান্সে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত জার্মানিতে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন কৃতী উপন্যাসকার দিলারা হাশেম। অ্যাকাডেমিক গবেষণায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন লণ্ডনপ্রবাসী গোলাম মুরশিদ : তিনি যেভাবে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা দেশের ভিতরে থাকলে করতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের মতো লেখক বা গবেষকদের ডায়াস্পোরিক দিক নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা প্রায় হয়ই না। যাঁরা দেশে ব'সে লিখছেন, আর যাঁরা দেশান্তরিত অবস্থায় লিখছেন, এই দুই দলের লেখার মধ্যে কিছু পার্থক্য ফুটে উঠছে কি ? এবং কী সেই পার্থক্য ? এগুলি আমার কাছে কৌতূহল-উদ্রেককারী প্রশ্ন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা দেখি না। আমি নিজে লোকনাথের সর্বশেষ কবিতার বইটি নিয়ে কলকাতার লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন *এবং মুশায়েরা*-তে আলোচনা লিখেছি।[২] তা ছাড়া ওয়াশিংটনে দিলারা হাশেমের সঙ্গে একত্র অনুষ্ঠানে তাঁর উপরে ইংরেজীতে সংক্ষেপে ভাষণ দিয়েছি, যা ঢাকার কাগজে ছাপা হয়েছে, এবং অনতিকাল আগে তাঁর কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে *দেশ* পত্রিকার 'অধিকন্তু' বিভাগেও লিখেছি।[৩] দিলারার কাহিনীগুলির পটভূমিকা বাংলাদেশ থেকে মার্কিন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি একাধারে খাঁটি বাঙালী এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আন্তঃসাংস্কৃতিক। তাঁর উপন্যাসে ওয়াশিংটনের সেটিং আছে, পশ্চিম ভারতের আওরঙ্গাবাদের সেটিং আছে, অতীতের পশ্চিম পাকিস্তান উঁকি মেরে যায়, আর তাঁর স্বদেশ তো আছেই। যোগ করা উচিত, বর্তমানে তসলিমা নাসরিনও প্রবাসে। তাঁরও দেশে ব'সে লেখা আর দেশের বাইরে লেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য ফুটে উঠছে কি ? অপিচ ভুললে চলবে না সদ্যোমৃত নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে। উত্তরজীবনে তিনি বাংলাতেও একটা নাম ক'রে গেছেন। তাঁর ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন তোলা চলে ; তা ছাড়া তাঁর দুই

ভাষার লেখার মধ্যে মেজাজের এবং শৈলীর পার্থক্য আছে কিনা সেটাও নিশ্চয় একটা অনুধাবনীয় বিষয়।

ঠিকই, বাঙালীদের প্রবাসজীবনের সাহিত্যিক ফসলের ইতিহাস একশো বছরেরও বেশী দীর্ঘ, এবং আশা করা যায় বিষয়টা নিয়ে কোনো-না-কোনো দিন কেউ পূর্ণাঙ্গ আকারে গবেষণা কররেন। কিন্তু আমরা যারা বর্তমান সময়ে অভিবাসী বা ডায়াস্পোরিক অবস্থান থেকে বাংলায় লিখছি, তাদের পক্ষে আরও বেশী জরুরী আমাদের এই এখনকার অস্তিত্বের সমস্যাগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা। প্রত্যেকের অবস্থানই সম্ভবতঃ অন্যদের থেকে একটু আলাদা, তাই বেশ কয়েকজন ডায়াস্পোরিক লেখকলেখিকা যদি তাঁদের নিজস্ব সাক্ষ্য এবং আনুষঙ্গিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে একটা কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র ফুটে উঠতে পারে।

নিজের সম্পর্কে এইটুকু দাবি করতে পারি, বৃটেনে অভিবাসী অবস্থায় যাঁরা এখন বাংলায় লেখালেখি করেন, তাঁদের মধ্যে সময়ের বিচারে আমি প্রথম তরঙ্গেরই অন্তর্গত। ১৯৬০ সালে কুড়ি বছর বয়সে প্রথম বিলেতে আসি—পড়াশোনা করতে। আমি তখনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক—এম. এ. নয়, বি. এ. ; এম. এ. দেবার আগেই বাইরে চ'লে যাই। বাঙালী হিসেবে আমার আত্মপরিচয় তখনই সুদৃঢ়, এমন কি বাংলাভাষার একজন উঠতি কবি হিসেবেও চেনাজানা মহলে একটা পরিচয় তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছে—চেনাজানা মানে কলেজের আঙিনায়, এবং বুদ্ধদেব বসু, বিরাম মুখোপাধ্যায় এঁদের কাছে। আমার প্রথম বই *বল্কল*-এর প্রথমার্ধের কবিতা এই সম্পূর্ণ দেশজ পর্বের। যদি পড়াশোনা শেষ ক'বে কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেখানেই স্থায়ী ভিত্তিতে থেকে যেতাম, তা হলে অক্সফোর্ডে ছাত্রী-জীবনের ঐ প্রথম তিন বছর আমার স্বল্পমেয়াদী প্রবাসের জীবন হিসেবে চিহ্নিত হতো। ঐ তিন বছর কিন্তু আমার সাহিত্যিক জীবনের রূপ গঠনে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ঐ সময়েই *দেশ* পত্রিকার মাধ্যমে একজন উদীয়মান কবি হিসেবে পাবলিকের কাছে আমার আত্মপ্রকাশ ঘটে। *বল্কল*-এর দ্বিতীয়ার্ধের এবং *সবীজ পৃথিবী*-র কিছু কবিতা এই দ্বিতীয় পর্বের। '৬৩ সালে কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখি আমার একটা কবিপরিচিতি তৈরি হয়েছে, কলেজ স্ট্রীটের যে-কফিহাউসে সহপাঠিনীদের সঙ্গে ব'সে নিজে এককালে কবিতা আলোচনা করেছি, সেখানে আমার কবিতা থেকেও কেউ কেউ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন! এর পর একবছর আমি যাদবপুরে অধ্যাপনা করি এবং কলকাতার সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রগুলি আরও শক্ত হয়, সম্পাদকদের তাগাদায় বিভিন্ন পত্রিকায় গদ্য লেখা আরম্ভ করি। এই বছরটিকে আমার সাহিত্যিক জীবনের তৃতীয় পর্ব বলা যায়। তার পর '৬৪ সালে আমি আমার প্রাক্তন সহপাঠী এক ইংরেজকে বিয়ে ক'রে বিলেতে ফিরে আসি, এবং এই

সময় থেকে আমার জীবনে প্রকৃত অভিবাসনের পর্ব শুরু হয়। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকেই আমার দেশান্তরিত সাহিত্যিক জীবন পুরোমাত্রায় আরম্ভ হয়ে যায়, কেবল কবিতায় নয়, গদ্যেও, এবং এই পর্যায়ে বছরদেড়েক ক্যানাডাতেও কেটেছে। *সবীজ পৃথিবী*-র বেশ কিছু কবিতা ও *নারী, নগরী*-র গদ্য এই পর্বের। *শিকড়বাকড়* বইয়ের প্রথম পাঁচটি বাদে আর সব প্রবন্ধ ডায়াস্পোরিক অবস্থায় লেখা। কিন্তু ভারতীয় ডায়াস্পোরাব লেখকদের নিয়ে ইংরেজী ভাষায় যে-সব আলোচনা হয় সে-সব ডিসকোর্সে কোথাও আমার নামের উল্লেখ পাবেন না, কেননা ঐ মানচিত্রাঙ্কনে ভারতীয় ভাষার লেখকদের প্রায় কোনো স্থান দেওয়া হয় না। কার্যতঃ এখন আমার দুটো দেশ, কাগজপত্রে না হলেও বাস্তব বিচারে। তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীকেই আমার স্বদেশ ব'লে মনে হয়, এবং আমার ধারণা আমাব লেখাতেও তার প্রতিফলন ঘটে। আমি ইংরেজীতেও কিছু কিছু লিখি। কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণাগ্রন্থ দুই ভাষাতেই লিখি ; দুই ভাষাতেই অনুবাদের কাজও করেছি ; কিন্তু এ যাবৎ উপন্যাস-নাটক-গল্প লিখেছি কেবল বাংলায়। ইংরেজীতে গল্প-উপন্যাস লেখার তাগিদ আজ পর্যন্ত অনুভব করি নি।

বাংলা ডায়াস্পোরার লেখিকা হিসেবে আমার প্রায় চার-দশক-ব্যাপী অভিজ্ঞতার যে-স্তূপ জ'মে উঠেছে, একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকদের তার সব কিছুর শরিক ক'রে ফেলা সম্ভব নয়। কয়েকটি সূত্র বেছে নিয়ে আলোচনা করছি— যেগুলি অন্যদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারলে তাঁদের জিজ্ঞাসাকেও উস্‌কে দেওয়া হবে, আর যেগুলি নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করলে আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথের কিছু দিশাও হয়তো বা পাওয়া যাবে।

প্রথমে আমার সাহিত্যিক জীবনে নারী হিসেবে আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গটিকে ছুঁয়ে যাওয়া দরকাব। ১৯৯৮ সালে টরন্টোর বঙ্গসম্মেলনে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলেছিলাম।[৪] সব কিছুর পুনরুক্তি করতে চাই না, কয়েকটি মুখ্য পয়েন্ট ধরিয়ে দিতে চাই। মার্কিন দুনিয়ায় আর বৃটেনে অভিবাসনের অভিজ্ঞতা যেমন ঠিক এক নয়, তেমনি অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা লিঙ্গনির্বিশেষেও এক নয়। আমার অভিবাসী সাহিত্যিক জীবনের গঠনে আমার লিঙ্গগত পরিচয় একটা বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বৃটেনের সমাজ হয়তো বা মার্কিন সমাজের থেকে বেশী 'হায়াবার্কিকাল' বা সিঁড়ির ধাপে বিন্যস্ত, বিশেষতঃ ষাট আর সত্তরের দশকে আরোই ওরকম ছিলো। সে-আমলে প্রচণ্ড 'সেক্স ডিসক্রিমিনেশন' ছিলো, বৈষম্য ছিলো প্রতি পদক্ষেপে। আমি একদিকে অ্যাকাডেমিক কর্মজীবনের জন্য তৈরি হয়েছিলাম, অন্যদিকে বৃটেনে অভিবাসী হয়েছিলাম বিয়ের সূত্রে, যাদবপুরের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে। অস্তিত্বের জানলার এই দুই পাল্লার মধ্যে একটা বিরোধ ছিলো। সেটা সেই সময়ে বুঝি নি। ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হয়েছে। এটা একটা তথ্য যে সেকালে বৃটেনের 'অ্যাকাডেমিক এস্টাব্লিশমেন্ট' বিবাহিত

মেয়েদের অ্যাকাডেমিক কেরিয়রকে মোটেই সুনজরে দেখতো না। ভালো-রেজাল্ট-করা মেয়ে হলে স্কুলে পড়াও, সেখানে কর্মজীবন তৈরি ক'রে নাও, কারও কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁটি গাড়তে হলে অবিবাহিতা এবং নিঃসন্তান থাকাটাই বাঞ্ছনীয়—এটাই ছিলো দৃষ্টিভঙ্গি; অক্সফোর্ডে মুখ্যতঃ অবিবাহিতা অধ্যাপিকাদেরই রাজত্ব ছিলো। তাঁরা মনে করতেন হয় বিবাহ নয় কর্মজীবন দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে, দুই নৌকায় পা দেওয়া চলবে না। স্বনামধন্য অধ্যাপিকা চিরকুমারী ডেইম হেলেন গার্ডনার নিজমুখে আমাকে বলেছিলেন, 'তোমরা আজকালকার মেয়েরা দুটোই চাও, ঐখানেই গণ্ডগোল।' সেটা সত্তরের দশক, তখন আমি ডক্টরেট করছি। ডক্টরেট করার পর অ্যাকাডেমিক কর্মজীবনের নৌকা বিলেতের নদীতে ভাসানো গেলো না। বলাই বাহুল্য, আমি কেবলই লিঙ্গগত বৈষম্যের সম্মুখীন হই নি। শর্টলিস্ট থেকে বাদ পড়ছিলাম লিঙ্গ, বর্ণ, বিবাহিতের স্টেটাস এবং বয়স—এই চার কারণেই। ডক্টরেট শেষ করতে করতে আমি মধ্যতিরিশে পৌঁছে গেছি, কারণ আমাকে দুটি সন্তান মানুষ করার সাথে সাথে ডক্টরেট করতে হয়েছে। চার দফায় বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েও চাকরি পাওয়া যেতো—যদি মুরুব্বি জোটানো যেতো। আমি সেই কাজটি করতে পারি নি, মুরুব্বি জোটাতে পারি নি। এই প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে চাকরির দরখাস্ত লেখায় আর সময় নষ্ট না ক'রে পূর্ণকালীন ভিত্তিতেই লেখালেখি করবো। তলে তলে আমি বরাবর লেখিকাই হতে চেয়েছি, আর এই ছিলো আমার সুযোগ। বাধা দেবার কেউ ছিলো না। কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের ভিতরে থাকলে পারিপার্শ্বিক চাপে আমার মতো একজন 'ভালো-রেজাল্ট-করা' মেয়ের পক্ষে চাকরিবর্জিত জীবন বেছে নেওয়া নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য হতো।

অবস্থার ন্যায়টা বোঝাতে চাইছি। ডায়াস্পোরার অভিজ্ঞতা এক ধরণের কর্মজীবন কেড়ে নিলো, আরেক ধরণের কর্মজীবনকে সম্ভব করলো। সৃষ্টিশীল লেখা এবং গবেষণাভিত্তিক লেখায় মিলিয়ে লেখাই আমার কর্মজীবন হলো। বিয়ের পর আমার পাঠকদের কথা দিয়ে এসেছিলাম যে প্রবাসে থাকলেও বাংলায় লেখা ছেড়ে দেবো না। সেই প্রতিশ্রুতিকে আমার জীবনের মূলমন্ত্র করলাম। লেখা আমার কর্মজীবন হলো, জীবিকা নয় কিন্তু। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। প্রথমতঃ, আমি যে-ধরণের বই লিখি তা থেকে বিরাট রোজগার হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, আমার অধিকাংশ বই ভারতীয় প্রকাশন, সেই ভারতীয় মুদ্রার রোজগারে তো বিলেতে সংসার চলে না। কিন্তু ও দেশে গেলে সেই টাকাটা আমার কাজে লাগে, আর নিয়মিত যেতেই তো হয়। আমাকে আপস করতে হয়েছে। রোজগারকে ব্যাক সীট দিতে হয়েছে। পুরো একটা স্যালারি রোজগার করবো সেইরকম কোনো জেদ বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। বিলাসিতাবর্জিত সংগ্রামী ফ্রীলান্সারের জীবন স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে।

অনেক কিছু নাগালের বাইরে চ'লে গেছে। বিব্রত হই যখন পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যত্র পত্রিকা-সম্পাদকরা আমাকে দিয়ে অনবরত বিনা পারিশ্রমিকে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা বোধ হয় ভাবেন যে আমার একটা মাসিক বেতন আছে। সেটা ভুল ধারণা। নেই। বাংলা ডায়াস্পোরার লেখিকা হিসাবে যদি কিছু করতে পেরে থাকি তো তার জন্য আমাকে একটা দাম দিতে হয়েছে। রোজগারকে ব্যাক সীট দেওয়া অধিকাংশ অভিবাসী মানুষের জীবনদর্শনের সঙ্গে একদম মেলে না, কেননা তাঁরা ঐহিক জীবনকে উন্নততর করার অভিপ্রায়েই বিদেশে এসেছেন, কিন্তু বাংলাভাষার লেখিকা হবার জন্য ঠিক সেটাই আমাকে করতে হয়েছে। এই ব্যাপারটার মর্ম অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

সম্প্রতি দেখছি যে ডায়াস্পোরার লেখকদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্যাজগতে একটা নূতন অভিধা চালু হয়েছে—'axial writers'। 'axial', কেননা আমাদের লেখালেখি চলে একটা axis বা কক্ষপথ ধ'রে। একটা পথের রেখা ধ'রে এক দেশ থেকে অন্য দেশে লেখা যায়, সেখান থেকে ফীডব্যাক আসে। লেখাগুলো যে-দেশে যাচ্ছে তার সাম্প্রতিক হালচাল সম্বন্ধে খানিকটা ওয়াকিবহাল না থাকলে সেই পাঠকসমাজের জন্য লেখা যাবে না। আবার সেই লেখার মাধ্যমেই দূরস্থিত পাঠকদের মধ্যে চেতনার পরিবর্তন হবে, পৃথিবী সম্পর্কে নূতন খবর ছড়াবে। তবে জটিলতা আছে। আজকাল আমাদের লেখা কেবল একটা লক্ষ্যেই যাচ্ছে না। প্রথমতঃ, দেশভাগের কারণে বাংলার এখন দুটো দেশীয় লোকেশন। যা এপার থেকে বেরোচ্ছে তার অন্ততঃ কিছুটা ওপারেও পৌঁছচ্ছে, কিছুটা পৌঁছচ্ছে পৃথিবীময় ছড়িয়ে-পড়া বাঙালীদের মধ্যে। 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা যে-সহজ পথ ধ'রে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছেছিলো, বাঙালীদের ডায়াস্পোরা অর্থাৎ ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে সেই পথ এখন একটা নেটওয়ার্ক বা জালবন্ধনে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের অবশ্যই উচিত এই জালবন্ধনকে পুরোপুরি কাজে লাগানো।

বৃটেনে একদল গবেষক axial লেখকদেব উপরে গবেষণা করছেন। বিভিন্ন কনফারেন্সে তাঁদের প্রচারপত্র দেখে নিজের উদ্যোগে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁদেরই চেষ্টায় সোয়ান্‌সীর সাম্প্রতিক বাংলা সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পাই।"

এখানে আজকালকার বহুব্যবহৃত 'কম্যুনিটি'র ধারণাটিকে আমাদের বিবেচনার মধ্যে নিয়ে আসা যাক। একজন ডায়াস্পোরিক লেখকের পক্ষে ধারণাটি রীতিমতো জটিল ও সমস্যাবিজড়িত। গজদন্তমিনারে ব'সে না থেকে, এলিট শ্রেণীর অন্তর্গত না হয়ে কম্যুনিটির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক যুগের ইস্তাহার। মেনে নিলাম। কিন্তু কারা আমার কম্যুনিটি? আমার অন্তরের বিশ্বাস পুরো পৃথিবীকেই আজ আমাদের আপন কম্যুনিটি ক'রে নেওয়া উচিত, কিন্তু সে-কথা না-হয়

আপাততঃ থাক। ন্যূনতম জরিপেও দেখতে পাই যে আমার কম্যুনিটি নানাবিধ। পৃথিবীর যে-কোণটা থেকে একদিন বেরিয়েছিলাম, যেখানে আমার অধিকাংশ বই বেরোয় এবং পঠিত হয়, আমার কাজের প্রধান মূল্যায়নও যেখানে হয়, অথচ যেখানে আমি এখন টেকনিকাল বিচারে বিদেশী, সেখানে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় আমার এক কম্যুনিটি। আবার যেখানেই বাংলাভাষীরা আমার লেখা পড়ছেন, সেটা আমার পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের দেশ বাংলাদেশেই হোক বা পৃথিবীর অন্য কোনো কোণে, সেখানেও আমার কম্যুনিটি। দিল্লী থেকে সর্বভারতীয় মার্কেটের জন্য আমার কয়েকটি ইংরেজী বই বেরিয়েছে : ভারতীয় উপমহাদেশ অবশ্যই আমার কম্যুনিটি। যেটা আমার 'শ্বশুরবাড়ির দেশ', যেখানে নতুন ক'রে শিকড় গেড়েছি, আমার সন্তানদের মানুষ করেছি, যেখানে আমি এখন নাগরিক, সেখানে ইংরেজীভাষী এক কম্যুনিটি। বৃটেন এখন ইয়োরোপীয় দেশসংঘের অন্তর্গত : ইয়োরোপে আরেক বহুভাষী কম্যুনিটি। আবার বৃটেনে ইয়োরোপে দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা অন্য অভিবাসীদের সঙ্গেও আমাকে যুক্ত হতে বলা হয়, বলা হয় ওখানেও আমার এক কম্যুনিটি আছে। এঁদেরই মধ্যে আছেন বাংলা ডায়াস্পোরার অন্যান্য সভ্যরা। এই নানা স্তরেব কম্যুনিটির সকলের মন সমভাবে যোগানো কি সম্ভব ? তাঁদের চাহিদা বিভিন্ন।

একজন অভিবাসী লেখকের পক্ষে তাঁর ভাষাভাষী অভিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কটা আবশ্যিকভাবে জটিল, প্রায়ই কিছুটা দ্বান্দ্বিক। অধিকাংশ অভিবাসী মানুষই বিদেশে এসেছেন উন্নততর ঐহিক জীবনের অন্বেষণে। তাঁরা জীবিকার্জন ও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের কাছে সাংস্কৃতিক জীবন হয় ধর্মসম্পৃক্ত (মন্দিরে-মসজিদে বা কোরানের ক্লাসে যাওয়া), নয় সংস্কৃতিচর্চার নামে মূলতঃ অবসরবিনোদনের একটা সুখকর প্রলেপ (বোম্বাইয়ের সিনেমা, গানবাজনা, পূজা বা ঈদের মেলামেশা, কিছু রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলগীতি বা লোকগীতি, ভাঙ্গড়া বা কাওয়ালী বা উপমহাদেশীয় পপ্, প্রহসনে নিজেরা অভিনয় করা বা পুরোনো দেশটা থেকে তার দল আনানো)। এ সমস্তর মধ্যে কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষের সিরিয়াস শিল্পচর্চাও অবশ্যই থাকে, তবে যে-সব অনুষ্ঠান প্রধানতঃ বিনোদনমূলক, যেখানে হয়তো খাওয়াদাওয়া চলছে, বাচ্চারাও হট্টগোল করছে, সেখানে দুমদাম নাচগানের এক ফাঁকে দশ-পনেরো মিনিট কবিতা প'ড়ে দেওয়া কবির পক্ষে স্বস্তিকর অভিজ্ঞতা না-ও হতে পারে। অথচ নিমন্ত্রণ পেলে সাড়া দিতেই হয়, নয়তো লোকে ভাববে আপনি অহংকারী। যাঁরা নিমন্ত্রণ করছেন তাঁদের মধ্যে সাধারণতঃ আন্তরিকতার কোনো অভাব থাকে না, কিন্তু মানতেই হবে এ ধরণের অনুষ্ঠানে মননের ভাগ কমই থাকে। আর তার বেশী আশা করাও অবাস্তব হবে। একজন সিরিয়াস লেখকের স্বতন্ত্র সংগ্রাম ও চিন্তন, তাঁর আশানৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, আনন্দ ও যন্ত্রণা, ট্র্যাজেডির বোধ ও

আদর্শবাদ, গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে বিযুক্তি, পুরোনো ভাষাটার প্রতি আনুগত্য, ভাষাশিল্পের প্রতি ফোকস্—এগুলি তাঁকে তাঁর কম্যুনিটির অন্য সভ্যদের থেকে একটু আলাদা ক'রে রাখবেই। তাই তিনি চান বা না চান, একটা ছোট কম্যুনিটির ভিতরে অহংকারী ব'লে তাঁর একটা বদনাম রটতেই পারে। ঐ যে একটু আগেই বললাম, রোজগারকে ব্যাক সীট দেওয়া অধিকাংশ অভিবাসীর জীবনের ছাঁদ নয়। তাঁরা হিপি বা খ্যাপা বাউলের মতো বাঁচবার জন্য দেশ ছাড়েন নি। তাঁরা অভিবাসন বরণ করেছেন কর্মজীবন, উপার্জন আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক মানকে উন্নততর করবার আশাতেই। তাঁরা চান জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে, পালিশ দিয়ে ঝকঝকে ক'রে নিতে। এদিকে একজন শিল্পীর মধ্যে কিছুটা নির্জনতাপিয়াসা, কিছুটা পাগলামি, কিছুটা ছন্নছাড়া অগোছালো ভাব থাকবেই, নয়তো তিনি তাঁর স্বধর্ম পালন করতে পারতেন না।

তাই বলতে চাই, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ-গান-প্রহসন হচ্ছে, অভ্যাগতরা খানাপিনা করছেন, পত্রপত্রিকায় বাংলাভিত্তিক সাংবাদিকতা চলছে—এ সমস্ত নিশ্চয়ই সদর্থক, কিন্তু এর মানে এ নয় যে ডায়াস্পোরার একজন সিরিয়াস লেখকের সমস্যাগুলির কোনো প্রকৃত মোকাবিলা হচ্ছে। যিনি নিজদেশে আছেন তিনি চারপাশে সহলেখকদের নেটওয়ার্ক গ'ড়ে তুলে একাকিত্বের মোকাবিলা করতে পারেন, কিন্তু যিনি ভিন্‌দেশে ব'সে মাতৃভাষায় লিখে যাচ্ছেন তাঁকে কিছুটা একলা প'ড়ে যেতেই হয়। তাঁর চারপাশে সমধর্মী ও সহপথিকদের নেটওয়ার্কটা আরও অনেক ছোট। আর আপন গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে ব্যবধান আরও দুস্তর, কেননা তারা অধিকাংশ সময়ই সেই মাতৃভাষাটা জানে না বা তার চর্চা করে না। আমাকে বাংলাভিত্তিক সমস্ত কাজ এই একাকিত্বের অভ্যন্তরেই করতে হয়। আর আমার কাজের উপরে ফীডব্যাকের জন্যও আমাকে প্রধানতঃ দূরের পাঠকদের চিঠিপত্রের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

আবার এর উল্টো দিকে আমার অভিবাসী জীবনের জটিলতা যখন আমার লেখায় প্রতিফলিত হয়, তখন সেই নকশার সব খুঁটিনাটি দূরের পাঠকদের কাছে হয়তো চট ক'রে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু এখানে একজন বিবেকী লেখকের জন্যে একটা চ্যালেঞ্জও আছে। একটা অন্য সমাজ, অন্য ল্যাণ্ডস্কেপ, ঋতুচক্রের অন্য ধরণের পালাবদলকে বাংলাভাষার মাধ্যমে ধরিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ সৃষ্টিশীল আনন্দ আছে। সফল হতে পারলে ভিন্নতার আড়ালে সেই একই মানবহৃদয়, সেই একই মাটির পৃথিবী ফুটে ওঠে। তখন রসগ্রাহী পাঠকরা সাড়া দেন। আমার প্রথম উপন্যাস *নোটন নোটন পায়রাগুলি*-র ঐরকম একটা অভিঘাত হয়েছিলো, এবং প্রথমে ধারাবাহিকভাবে *দেশ*-এ বেরিয়েছিলো ব'লে সেই প্রতিক্রিয়া ঘটেছিলো ব্যাপকভাবে। যাঁরা অল্প বয়সে ধারাবাহিকভাবে পড়েছেন ব'লে তার চালচিত্রটা ঠিক ধরতে পারেন নি অথবা তার গঠনের জট ছাড়াতে পারেন নি, তাঁরা পরবর্তী কালে দুই মলাটের মধ্যে প'ড়ে বইটার

আরও ভিতরে ঢুকতে পেরেছেন। তেমন একজন গত বছর আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, বইটা শেষ করার পর সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি, কয়েকটা দিন আচ্ছন্নের মতো কেটেছে তাঁর। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পাঠানো দু'-চারজন সমঝদারের চিঠি পেলেও মনটা প্লাবিত হয়ে যায়, মনে হয় সব পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার সার্থক হয়েছে। কোনো কোনো নিবেদিত পাঠক কোনো ডিটেল বুঝতে না পারলে প্রশ্নও লিখে পাঠান। তেমন চিঠিও পুরস্কার। একজন লেখক নিশ্চয়ই চান যে তাঁর কণ্ঠস্বরের সমস্ত পর্দা অন্ততঃ কিছু পাঠকের কর্ণে প্রবেশ করুক। মধ্যে মধ্যে টের পাই যে সেরকম মনোযোগী পাঠক দু'-চারজন জুটেছে। ঐ বইটা সম্বন্ধে আমি আজও চিঠি পাচ্ছি, যদিও দুঃখের বিষয় এই যে যতদূর জানি বইটা বর্তমানে নিঃশেষিতমুদ্রণ।[৬] পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে দূর থেকে খুব বেশী তাগাদাও দেওয়া যায় না, কেননা প্রকাশকমহাশয় আমার পরবর্তী বইগুলো ছাপবেন সেটাই কি আমার কাছে অধিক জরুরী নয়?

দূর থেকে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন পাওয়া ডায়াস্পোরার লেখক হওয়ার একটা মজার দিক। হয়তো নিউ ইয়র্ক থেকে কেউ লিখলেন, 'আপনার লেখা প'ড়ে আমি নতুন ক'রে বাংলা শিখছি,' বা আমার লেখায় লীক-নামক সবজির বর্ণনা প'ড়ে 'গোবদা গোবদা পেঁয়াজকলি'র সন্ধানে ছুটলেন সুপারমার্কেটে। হয়তো প্যারিসের মানুষ বিশেষ ক'রে অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন সোনালী-সবুজ জলপাইয়ের তেলের কথা বা জানলার তাকে কিভাবে টোমাটোরা রোদ পোহাচ্ছে আর তাদের পাশে একটা বিড়াল ঘুমোচ্ছে তার বর্ণনা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমার লেখা প'ড়ে খবর পান কে এদিথ পিয়াফ, কাকে বলে বাদামী চিনি, কাকেই বা বলে আইরিশ কফি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমার *ভাবনার ভাস্কর্য* বইয়ে *ভোমা*-র আলোচনা প'ড়ে বাদল সরকার সম্পর্কে প্রথম অবহিত হয়েছেন এমনও রয়েছে!

একজন লেখকের লেখায় বিদেশপর্যটনলব্ধ খুঁটিনাটি আর অভিবাসনলব্ধ খুঁটিনাটি একটু আলাদাভাবে প্রবেশ করে। পর্যটন আমাদের অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা উপহার দেয়, কিন্তু অভিবাসন আমাদের অন্য একটা দেশের জলমাটিতে নূতন ক'রে শিকড় ছড়াতে সাহায্য করে, যদি আমরা সেই সমাজের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবন যাপন করি তা হলে সেই সমাজের গভীরেও প্রবেশ করাতে পারে। আমি আমার বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে ইংরেজদের পারিবারিক জীবনের ভিতরে প্রবেশ করেছি। ইংরেজদের বাইরে থেকে দেখার থেকে এ জানা আলাদা। একজন শিল্পীর পক্ষে জানার গভীরতার কোনো বিকল্প নেই। আমার মধ্যে যেমন পঞ্চাশের দশকের কলকাতার উত্তরাধিকার আছে তেমনি ষাট-সত্তরের পাশ্চাত্য দুনিয়ার উত্তরাধিকারও বিনিশ্চায়ক।

আর ডায়াস্পোরার লেখক হওয়ার ঝামেলার দিক এই যে যদিও কিছু সহমর্মী

পাঠক আপনার মধ্যে দেশজ আর আন্তর্জাতিকের সমন্বয়কে বাহবা দেবে, কিছু দেশস্থিত লোকের কাছে কিন্তু আপনি 'বাইরের লোক' হয়ে যাবেন, তারা সুযোগ পেলেই আপনাকে ছিন্নভিন্ন করবে। আপনি নিজে হয়তো গভীরভাবে অনুভব করেন যে গোটা পৃথিবীটাই আপনার স্বদেশ, কিন্তু যারা নিজেরা কুনো তাদের চোখে আপনি 'আউটসাইডার' হয়ে যাবেন। কেবলই পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছি না, এই কুনো মানুষরা দেশের বাইরেও আছেন। আপনি যা-ই করবেন তাতেই তাঁদের কেউ না কেউ ঠোঁট বেঁকাবেন। তাই নিজেরই কবিতার একটা লাইন উদ্ধার ক'রে বলতে হয়, নাঃ, সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না। একজন আধুনিক শিল্পীর পক্ষে 'কম্যুনিটি'র ধারণাটার মধ্যে এমনিতেই একটা নিহিত 'কন্‌ট্রাডিক্‌শন' আছে। একজন ডায়াস্পোরিক শিল্পীর পক্ষে আরোই। শিল্পী স্বভাবতঃই সহমর্মী রসিকজন খোঁজেন, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, কিন্তু একজন বিবেকী শিল্পী স্বতন্ত্রও থাকতে চান, গোষ্ঠীকে সমালোচনা করার স্বাধীনতাটুকু অটুট বাখতে চান, ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরক্তি এবং ঘেন্নাকে প্রকাশ করার স্বাধীনতাও দাবি করেন। তাঁর কম্যুনিটির কাছে নিজেকে তিনি বিক্রি করতে চান না। এই মূল জায়গাটায় তিনি আপসবিরোধী। সুমন যেমন তাঁর গানে বলেন, যদি ভাবো কিনছো আমায়, ভুল বুঝেছো ; যদি ভাবো খাচ্ছো আমায়, ভুল বুঝেছো।

আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাকে বলে যে দু'-একটা বিশেষ ব্যাপারে বাংলা ডায়াস্পোরার লেখক vulnerable বা সহজে আক্রমণীয় হয়ে পড়তে পাবেন। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁদের পক্ষে সেই ব্যাপারগুলো কী তা সাহস ক'রে বলতে পারি না, যদিও খানিকটা আন্দাজ করতে পারি—হয়তো তা ধর্মসংক্রান্ত, অথবা বাংলা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা তাতে অনাস্থা প্রকাশ করা ? পশ্চিমবঙ্গ থেকে এলে একজন লেখকের পক্ষে সব থেকে বিপজ্জনক কাজ হচ্ছে কোনোক্রমে দেশের অথবা দেশের বাইরের রাবীন্দ্রিক কুনোদের চটিয়ে দেওয়া। তা হলে আর রক্ষে নেই। আমি যেদিন থেকে রবীন্দ্রচর্চায় প্রবেশ করেছি সেই দিন থেকে এই জায়গাটায় vulnerable হয়ে পড়েছি, কেননা এঁদের চটানো খুব সোজা। আক্রমণের আরেকটা সহজ টার্গেট হলো আপনার ভাষা। ভাষা নিয়ে বহুদিন আমাকে কোনো বিরূপ কথা শুনতে হয় নি। বরং উল্টে সকলে আমার ভাষার প্রশংসাই করতেন। এখনও অনেকেই করেন। কিন্তু যাঁদের বিবেচনায় আপনি এখন 'বাইরের লোক' তাঁরা এ প্রশংসা কতদিন বরদাস্ত করবেন ? কোনো-না-কোনো ছুতোয় একদিন না একদিন কাঁটা বেঁধাতে আরম্ভ করবেনই তাঁরা। এঁরা অভিযোগ আনবেন যে আপনি না ঘরকা না ঘাটকা, আপনার ভাষায় বিদেশী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাভাষায় বিশ্লেষণমূলক আধুনিক চিন্তা পরিবেশন করতে গেলে বিশেষভাবেই এই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

আমার সব বাংলা বই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্রের লেখালেখিও প্রধানতঃ ওখানেই। সকলেই জানেন, কাজকর্মের সমস্ত খাতেই পলিটিক্স থাকে, গ্রুপিজ্‌ম্ বা যূথবদ্ধ স্বার্থরক্ষার ব্যাপার থাকে। দূর থেকে সে-সব সামলিয়ে কোনোমতে নিজের জন্য একটা সরু চলার পথ ক'রে নেওয়া যায় মাত্র। সম্পাদক বা প্রকাশকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা যদি বা ক'রে নেওয়া যায়, ক্রিটিকদের সামলানো দেবতাদেরও অসাধ্য। তা ছাড়া গণমাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে আজকাল প্রায়শঃ কাগজের কাটতি ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য ফালতু তর্কাতর্কিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। এতে ক'রে সময় ও শক্তির অনর্থক অপব্যয় হয়। বিতর্কের জন্যেই বিতর্ক চলতে থাকে, যুক্তির ধার ধারে না এমন সব আক্রমণাত্মক চিঠিও বাক্‌স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে এবং তর্ককে জ্বালিয়ে রাখার জন্য ছাপা হয়। কিছু জবাব না দিয়েও পারা যায় না, কেননা নিজের আত্মসম্মানের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আপনার সপক্ষে লেখা অন্যদের চিঠিগুলো যদি না বেরোয়, কেবল বিরোধীদের চিঠিগুলোই বেরোয়, তা হলে দূর থেকে আপনি আর কী-ই বা করতে পারেন? আজকালকার লেখকজীবনের এই দিকটা আমি একদম পছন্দ করি না, তবে মানুষের স্বভাব যেমন, মনে হয় কোনো-না-কোনো আকারে এই-সব সমস্যা বরাবরই ছিলো।

কিছু ছিদ্রান্বেষী থাকবেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব এদের হাত থেকে নিস্তার পান নি। ক্ষতিপূরণও আছে। ডায়াস্পোরিক কবি হিসেবে আমি যে-ব্যাপারে একটা বিশেষ আনন্দের অধিকারিণী সেটা একটু বলি। আমি যেহেতু বাংলা-ইংরেজী দুটো ভাষাতেই কবিতা লিখি সেহেতু দুটো আলাদা জগতের লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে কবিতা বার করতে পারি, আর যেহেতু শ্রোতারা বলেন আমি কবিতাপাঠটা ভালোই করি, তাই চেষ্টা ক'রে ফললাভ করেছি, অর্থাৎ দেখেছি যে পাঠের মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই জগতের কাব্যরসিকদের কাছেই পৌঁছতে পারি। একটা সংস্কৃতির লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের মধ্যেই পাওয়া যায় তার কবিতার খাঁটি হৃৎস্পন্দন, তাই দুটি পৃথক কাল্‌চারের লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে দুটি আলাদা ভাষায় মৌলিক কবিতা প্রকাশ করতে পারা একটা প্রিভিলেজ বা বিশেষাধিকার। তেমনি আজকের এই বাজারশাসিত যুগে যাঁরা স্বেচ্ছায় কবিতার আসরে আসেন, তাঁরা কোনো মতলব নিয়ে আসেন না। নাটকের জগৎটা একটু আলাদা। সেখানে দলবাজি প্রবলতর। যাঁরা নাটক দেখতে আসেন তাঁরা কখনও কখনও মতলব নিয়েও আসেন। 'আওয়াজ' দেবার মতলব, বা পরে 'কুচিকুচি ক'রে কাটা'র মতলব। কিন্তু কবিতার আসর—প্রকৃত কবিতার আসর—একটা অন্তরঙ্গ ব্যাপার। কবিরা সাধারণতঃ মিশ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা 'ভ্যারাইটি শো'র দশ মিনিটের খোপে কবিতা পড়ার চাইতে প্রকৃত 'পোয়েট্রি রীডিং' অনুষ্ঠানে কবিতা পড়াই ঢের বেশী পছন্দ করেন। এখানে আওয়াজ দিলে ঘর থেকে বের ক'রে দেওয়া হবে, শুনতে না

চাইলে উঠে যান, আর ফিরে গিয়ে রিভিউ লিখতে হবে না, কাউকে কুচিকুচি ক'রে কাটাব দরকার নেই, অতএব শ্রবণের অভিজ্ঞতাটার কাছে শান্তমনে আত্মসমর্পণ করা যায়। কবিতার ছুনিয়ায় এই শ্রোতারা তৃণমূল। এমন কবিতাপ্রেমিকদের কাছে নিজের গলায় কবিতা পৌঁছে দিতে পারা একটা আনন্দময় কাজ। এই কাজ আমি করতে পেরেছি কলকাতায় বর্ধমানে শান্তিনিকেতনে উত্তরবঙ্গে আমেদাবাদে লণ্ডনে অক্সফোর্ডে সাণ্ডারল্যাণ্ডে সোয়ান্‌সীতে প্যারিসে হাইডেলবার্গে নিউ ইয়র্কে মেরিল্যাণ্ডে, এমন কি বুয়েনোস আইরেসে। এইরকম সময়ে মনে হয় আমি একটা জীবন্ত সেতু, ছুটো কূল ছুঁয়ে আছি। জীবন্ত সেতু হওয়ার কিছু জ্বালাযন্ত্রণা আছে, সে-কথা তো আগেই বললাম। কিন্তু একটা বিরল আনন্দও আছে. দূরকে নিকট করার, পরকে স্বজন করার অনাবিল আনন্দ। সেটা পাওয়া যায় পোয়েট্রি রীডিং অনুষ্ঠানে।

ডায়াস্পোরিক কবিতার প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি। আমার বরাবর মনে হয়েছে, একজন ডায়াস্পোরিক কবির কবিতায় বিদেশের নিসর্গ কিভাবে প্রবেশ করে, একটা ভিন্ন জলবায়ুর আবহ ও মেজাজকে তিনি কিভাবে তাঁর মাতৃভাষায় বন্দী করেন, কিভাবে খুঁটিনাটির বর্ণনা দেন, যেখানে সমস্যা দেখা দেয় কী ক'রে তার মোকাবিলা করেন—এগুলো অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। কথাটা লেখালেখির সব শাখাতেই কমবেশী প্রযোজ্য, তবে কবিতার বেলায় আর কবিদের লেখা গদ্যের বেলায় বিশেষ ক'রে প্রযোজ্য। এটা এক জাতের অনুবাদের চ্যালেঞ্জ। একটু উদাহরণ দিই।

যদি ইংরেজীতে লিখি 'the June sun', উত্তরের দেশের লোকেরা সহজেই ব্যঞ্জনাটা বুঝে নেবেন। কিন্তু বাংলায় 'জুনের সূর্য' বা 'জুনের রোদ' বলা অনেক বেশী গোলমেলে ব্যাপার। বাংলায় 'জুন' নামটার নিজস্ব, দিশি অনুষঙ্গ নেই। বাংলা হিসেব অনুযায়ী জুনের কিছুটা ভরা জ্যৈষ্ঠের গরম, তার পর আষাঢ়ের বর্ষাসমাগম। চালচিত্রটা একেবারে আলাদা। তাই আমি যদি বিলেতের জুনের রমণীয় লম্বা দিনের কথা বাংলাতে বলতে চাই, আমাকে অন্য এক ধরণের চেষ্টা করতে হবে, একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে। ষাটের দশকে একটি কবিতায় লিখেছিলাম: 'নম্র জুনের অমর্ত্য গোধূলিতে', তার কয়েক লাইন পরে: 'আহা কি রম্য আলোকদীর্ঘ দিন!' এই জুন যে আমাদের পরিচিত রুদ্র জুন নয়, নম্র জুন, তা জানাতে হলো: আবার এই নম্রতা যে জলভরা মেঘের নয়, দীর্ঘায়িত গোধূলির আলোর, তারও আভাস দিতে হলো। অনেক পরে একটি কবিতায় লিখেছি 'জুনের ভরা বিকেলে'—এখানেও সেই আলোয় ভরা দীর্ঘস্থায়ী বিকেলের কথা বলা হচ্ছে, যা গ্রীষ্মমণ্ডলে অপ্রাপণীয়। *নোটন নোটন পায়রাগুলি*-তে এক জায়গায় আছে: 'আলোয় উজ্জ্বল জুন মাসের দিনটা; চাইকভ্‌স্কির সংগীতের মতো আহ্লাদিত রোদ।' আমার এক পাঠক বললে, 'আপনি ছাড়া আর কে ঐরকম লাইন লিখবে! পড়লেই বোঝা যায় কেতকী লিখেছে।' ভক্তের যা

পছন্দ সেটিকেই হয়তো কোনো অমিত্রভাবাপন্নের বিদেশগন্ধী মনে হবে। বিদেশের প্রকৃতির বা ঋতুর মেজাজের যথাযথ বর্ণনা দিতে হলে ভাষায় বিদেশের একটা ছ্যাঁকছোঁক গন্ধ যে রাখতেই হবে সেই মূল ব্যাপারটাই কুনো সংবেদনের গণ্ডীর বাইরে।

খৃষ্টীয় ক্যালেণ্ডারের মাস-নামগুলির মধ্যে অন্য একটা জলবায়ুমণ্ডলের ভাবানুষঙ্গ খোদাই হয়ে আছে। ইয়োরোপীয় কবিতায় এই-সব নাম সংকেতের মতো কাজ করে। নামটা বললেই আর কিছু বলতে হয় না। দক্ষিণ গোলার্ধের কবিদের তৈরি ক'রে নিতে হয়েছে এক বিপরীত ভাবমণ্ডল, যেখানে ডিসেম্বরের অর্থ গ্রীষ্ম আর জুনের অর্থ শীত। বাংলা কবিতা পুষ্ট হয়েছে বৈশাখজ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি নামের সাংকেতিকতা দ্বারা। সেখানে অন্য নামগুলো দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে ঢুকে প'ড়ে এক বিবাদী আধুনিক স্বর যোগ করেছে; যেমন সুনীল গাঙ্গুলীর এই লাইনে—'এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহংকারে ব্যাপ্ত করে দিক'। এপ্রিল নামটা আমরা ইংরেজীব কাছ থেকে পেয়েছি, কিন্তু 'এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া' বাঙালী কবির হাইব্রিড নির্মাণ, ইংরেজী ভাষার আপন মাটিতে কৃষ্ণচূড়া হয় না। ঐ মিশ্রতার গুণেই লাইনটা এত ধাক্কা দেয়। তেমনি বিলেতে ব'সে এপ্রিলকে বাংলা কবিতায় ঢোকালে সেখানে চ'লে আসবে অন্য এক অনুষঙ্গ। আমার 'এপ্রিলের গান' (*বল্কল*) কবিতাটিতে বসন্তবৃষ্টিসিক্ত যে-ঋতুব ছবি আছে তা কৃষ্ণচূড়াশোভিত ট্রপিকাল এপ্রিলের থেকে একেবারে আলাদা। আমার বিলেতে বা ক্যানাডায় লেখা বাংলা কবিতায় ফেব্রুয়ারি, মে, জুন, অক্টোবর, ডিসেম্বর ইত্যাদির সাংকেতিক তাৎপর্য দিশি রীতি থেকে অনিবার্যতঃ ভিন্ন। বাংলার মাটিজলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহ্যিক ভাবানুষঙ্গের উপরে আমি নির্ভর করতে পারি নি। আমাকে নিজস্ব নির্মাণ ক'রে নিতে হয়েছে।

বাংলা কবিতায় অভিবাসী এবং বিদেশভ্রমণে অভিজ্ঞ কবিদের একটা ধারা বেশ কিছু দিনই হলো তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু বিদেশের নিসর্গ আর ঋতুচক্র সেখানে কিভাবে ঢুকছে, ভাষার স্বাভাবিক কাঠামোর ভিতরে নতুন ভাবানুষঙ্গগুলিকে কিভাবে বসানো হচ্ছে, তাতে ব্যঞ্জনা কিভাবে বাড়ছে, কোনো সাংগীতিক 'কাউন্টারপয়েন্ট' সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা, এসব নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে না। বিষয়টা নিয়ে সমালোচকদের মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন গ'ড়ে ওঠে নি মনে হয়। কোথাও একটা জিজ্ঞাসার অভাব কাজ করছে।

সম্ভবতঃ ঐরকমই কোনো জিজ্ঞাসার অভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর বর্ণদৃষ্টির প্রভাব সম্পর্কে এত দিন কেউ তলিয়ে গবেষণা করার কথা ভাবেন নি। আমি যে এ নিয়ে ভাবতে গেলাম তার একটা নিহিত কারণ হয়তো এই যে ব্যাপার-দুটোতে একটা সমান্তরালতা আছে: বাংলায় বিদেশী প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গেলে যে-ধরণের অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগে, তার সঙ্গে বর্ণদৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী সাহিত্যিকের সমস্যার খানিকটা

মিল আছে। ভাষার নিজস্ব ন্যায় একরকম বলছে, আমরা অন্যরকম দেখাতে চাইছি। বাংলায় মে মাসটা দাহের ঋতু, কিন্তু আমার কবিতায় পা ফেলছে অন্য এক মে, যা মধুমাস। তাকে টেনে আনতে গেলে আমাকে বিকল্প নির্মাণ করতে হয়। তুলনীয় এক প্রক্রিয়ায় প্রোটানোপ রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রঙ অধিকাংশ মানুষের মতো দেখেন নি, অন্যরকম দেখেছেন, অথচ আর সকলের মতো একই বর্ণভাষা তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছে। আমরা ধ'রে নিই যে তিনি যেহেতু 'লাল' বলছেন তাই আমরা যা দেখি তিনিও তা-ই দেখেছেন। কিন্তু তিনি যদি গাঢ় লালকে কালোর কাছাকাছি আর গোলাপীকে ধূসরের মতো দেখে থাকেন, তা হলে তাঁর সেই ব্যতিক্রমী ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা কি তাঁর চিত্রকল্পে বিম্বিত হবে না, ভাষার ইঙ্গিতের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংঘাত কি একটা টেনশন তৈরি করবে না? ফলে তাঁকেও কি একটা বিকল্প নির্মাণ খাড়া করতে হবে না? ঠিক তা-ই আবিষ্কার করলাম যখন ডুবুরীর মতো তাঁর বর্ণভাষার গভীরে নামলাম। দেখলাম এক বিশাল বিকল্প নির্মাণ। আরও বুঝলাম, তাঁর মতো মহাকবিও একটা জায়গায় গভীরতর অর্থে 'প্রবাসী'। আমি যেখানে ভ্রমণের মাধ্যমে কয়েক রকমের মে-জুনের চেহারা স্বচক্ষে যাচাই ক'রে নিতে পারি, তিনি সেখানে কয়েকটি রঙের বেলায় জন্মসূত্রে 'চিরপ্রবাসী', কোনোদিন জানলেনই না অন্যদের চোখে সেগুলি কিভাবে ধরা দেয়।

এই প্রসঙ্গটা আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে। প্রথমতঃ, বাংলা ডায়াস্পোরার একজন লেখকের পক্ষে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গভীর স্তরে গবেষণা করার পথে যে-অসুবিধা বর্তমান তার প্রতিবিধান দরকার। এই বিষয়ে টেক্সাসের সম্মেলনে প্রথম যখন বলেছিলাম, তখন কোনো কোনো শ্রোতা আমার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারেন নি। তাঁরা বললেন, কলকাতার লোকেরাও গবেষণার জন্য অনুদান পান না। অধ্যাপকরা অনুদান না পেলেও সাধ্যমতো গবেষণা ক'রে যাবেন, এইরকমই আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে, যেগুলো একটা ন্যূনতম অনুদান না পেলে সত্যিই ঠিক ক'রে করা যায় না। গবেষক যদি বেতনভোগী অধ্যাপক না হয়ে ফ্রীলান্সার হন, তা হলে তিনি কী করবেন? হাওয়া খেয়ে দু'-চারটা কবিতা যদি বা লেখা যায়, গবেষণার অনুসন্ধান চালাতে অবশ্যই আবেকটু রসদ লাগে।

বাংলা-নামক ডিসিপ্লিনের মধ্যে এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে ডায়াস্পোরিক বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বিশেষ অবদান রাখতে পারেন, যেখানে বিদেশের বিশেষ জ্ঞান দরকার, বিদেশী ভাষা জানা দরকার, বিদেশী আর্কাইভ্‌সে গিয়ে কাগজপত্র দেখা বা বিদেশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া দরকার, অর্থাৎ যেখানে তাঁদের একটা বিশেষজ্ঞতা আছে এবং সেই এক্সপার্টিজটা কাজে লাগানো যায়। গোলাম মুরশিদ

যেভাবে মাইকেলের জীবনীতে নতুন তথ্য সংযোজন ক'রে তার উপরে নতুন আলো ফেলেছেন। আমি যেমন রবীন্দ্র-ওকাম্পো গবেষণায় বা রবীন্দ্রনাথের বর্ণদৃষ্টি-সম্পর্কিত গবেষণায় নতুন কিছু দিতে পেরেছি, অর্থাৎ আশা করি যে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথ আর ওকাম্পোকে নিয়ে গভীর স্তরে কাজ করতে গেলে চারটা ভাষার সঙ্গে পরিচয় লাগে—ইংরেজী, বাংলা, স্প্যানিশ, ফরাসী। তা ছাড়া আর্জেন্টিনায় কাজ করার অনেক যন্ত্রণাদায়ক অসুবিধাও ছিলো; সেগুলিকে উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে সরজমিনে অতিক্রম করতে হয়েছে। যেমন, ওখানকার আর্কাইভ্‌সের কর্ত্রী কিছু বাজে খবর দিয়েছিলেন আমাকে, যেগুলো বিশ্বাস করলে রিসার্চ এগোতোই না, রবীন্দ্রনাথ যে-বাড়িটাতে ছিলেন সেই মিরাল্‌রিও না দেখেই ফিরে আসতাম। ঐ মহিলা আমাকে বলেছিলেন বাড়িটা আর নেই, সে অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস না ক'রে আমার ওখানকার অন্য কনট্যাক্টদেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে সেই বাড়িটা নিজের চোখে দেখে এসেছি, যার দোতলার বারান্দা থেকে বাংলার কবি দেখতেন প্লাতা নদীর বুকে আলো আর রঙের খেলা। বুয়েনোস আইবেসের ভারতীয় দূতাবাসও বাড়িটার খবর রাখতেন না। তাঁরা বইপত্র পড়েন নি, আর্কাইভ্‌সের মহিলা যা বুঝিয়েছেন তা-ই বুঝেছেন। তাঁদের বোঝা উচিত ছিলো যে সামরিক শাসনের আর্জেন্টিনা যেমন মানুষদের 'ডিসাপিয়ার' করিয়ে দিতে পারে, আর্কাইভ্‌সের আর্জেন্টিনা তেমনি একটা আস্ত দোতলা বাড়িকে 'ডিসাপিয়ার' করিয়ে দিতে পারে। ১৯৮৪ সালে প্যারিসে অবস্থিত আর্জেন্টিনার ইউনেস্কো ডেলিগেশনের কর্তা আমাকে বলেছিলেন, আর্জেন্টিনায় গিয়ে কাজ কবতে হলে ট্যাংগো নাচতে জানতে হবে। আমি বলেছিলাম, শিখে নেবো। ব্যাপারটা রূপক। ট্যাংগো জানতে হবে, রূপকার্থে হলেও। আবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে গবেষণা করতে হলে জানতে হবে আরেক নৃত্যভঙ্গিমা, শান্তিনিকেতনী নাচ। কোনো কাজের জন্য সিংহাসনে আসীন উপাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি কিভাবে আনাতে হয় তার রীতিনীতি নখাগ্রে রাখতে হবে। দুটো নাচ আয়ত্ত করতে হলে আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতা চাই। আর সমস্ত দক্ষতাই ফেলা যাবে বাংলা না জানলে। এখানে ডায়াস্পোরিক ব্যক্তিত্বের একটা ভূমিকা আছে, তা-ই নয় কি?

ঠিক ওভাবেই, রবীন্দ্রনাথের রঙের ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করতে আন্তর্বিদ্য গবেষণায় নেতৃত্ব দেবার প্রযোজন ছিলো। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ছবি—তিনটি মাত্রাকে মিলিয়ে কাজ, সেভাবে এগোনো, ছবি আর কারুশিল্প দেখতে ইয়োরোপ-আমেরিকা যাওয়া, গ্যালারিতে গিয়ে জার্মান বা ফরাসী ভাষার সঙ্গে সমঝোতা করা, প্রচুর পরিমাণে বিদেশী আর্টের বই হজম করা, একই সঙ্গে বাংলাভাষার গভীরে প্রবেশ করা এবং একজন শান্তিনিকেতনের সহগবেষকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা—এগুলি করতে

যে-ধরণের দক্ষতা লেগেছিলো সেটার সঙ্গে ডায়াস্পোরিক জীবনযাপনের একটা সম্পর্ক আছে। কাজের তুলনীয় ক্ষেত্র বাংলাতে আরও আছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ রায়, বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো লেখকের জীবনে বিদেশগত যে-মাত্রা আছে তাকে তলিয়ে দেখতে চাইলে ডায়াস্পোরার অভিজ্ঞতা কার্যকর হতে পারে। কিন্তু বইটা যদি বাংলায় লেখা হয় তা হলে এই ধরণের গবেষণার জন্য বিলেতে অন্ততঃ কোনো আর্থিক মদত পাওয়া সম্ভব নয়। লণ্ডনের গোলাম মুরশিদও বিনা অনুদানে গবেষণা করেন। আমার রবীন্দ্র-ওকাম্পো-বিষয়ক বা রঙের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণার পিছনে কোনো বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্য ছিলো না। আর্জেন্টিনায় কাজ করা সম্ভব হয় ভারতীয় আনুকূল্যে; জার্মানির গ্যালারি-মিউজ়িয়ম দেখা আর ছবিগুলো সুন্দর ক'বে ছাপানো সম্ভব হতো না জার্মান সাহায্য না পেলে। বই বেরোবার পর কেউ যে সেমিনার দিতে ডাকবে তা-ও ঘটে না। *রঙের রবীন্দ্রনাথ* বেরোবার পর বিলেতের বিদ্যাজগতের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক কয়েকজনকে খুঁটিনাটি পাঠিয়েছিলাম। দুজন গ্রন্থাগারিক জানালেন, তাঁরা বইটা কিনবেন। কিন্তু অধ্যাপকরা কেউ সাড়াই দিলেন না! যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালী, কিংবা বাংলা জানেন। আজকাল বিদ্যাজগতের অধিবাসীরা সর্বাগ্রে যে-যার কেরিয়রের উন্নতিবিধানে ব্যতিব্যস্ত, এবং সে-প্রয়োজনে প্রতিযোগিতা এড়াতে তৎপর, ফলে তাঁদের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে বিষয়নিষ্ঠ জিজ্ঞাসা লক্ষণীয়ভাবে ক'মে এসেছে। কোনো-একটা বিষয় তার নিজের জোরেই ঔৎসুক্যজনক, অতএব যিনি সে-বিষয়ে কাজ করেছেন তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া যাক, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যাক—এই জিনিসটা অধ্যাপকরা আর করছেন না। তা হলে একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাত্তা দেওয়া হয়। ইয়োরোপে দু' বছর অন্তর অন্তর একটা সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ় কনফারেন্স হয়। গত বছর প্রাগে হয়েছিলো। আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে আমি ভাবলাম, *রঙের রবীন্দ্রনাথ* বইটার পিছনে ইয়োরোপ মহাদেশের কিছু মদত ছিলো, অথচ বইটা বাংলায়, ইয়োরোপের স্কলাররা আমার আর আমার সহকর্মীদের গবেষণা সম্বন্ধে কিছুই জানবেন না এটা ঠিক নয়, ওখানে গিয়ে ইংরেজীতে একটা পেপার পড়ি, আমাদের কাজের একটা ছোট প্রতিবেদন অন্ততঃ রাখি। কিন্তু উদ্যোক্তারা বললেন আমাকে লণ্ডন থেকে প্রাগে নিয়ে যাবার মতো অর্থসামর্থ্য তাঁদের নেই! অক্সফোর্ডের একজন অধ্যাপকের পরামর্শমতো ওখানকার ভারতবিদ্যাসংক্রান্ত একটা বিশেষ ফাণ্ড থেকে অর্থসাহায্য পাওয়ার জন্য দরখাস্ত জমা দিলাম। আরেকজন অধ্যাপক সে-দরখাস্ত নামঞ্জুর ক'রে দিলেন! কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা আমাকে আনাতে কোনো চেষ্টাই করলেন না। সত্যি বলতে কি, বিদ্যাজগতের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার যে-চেহারা দেখেছি তা আমাকে তেমন

আশান্বিত করে না। এ এক দুনিয়া, যেখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মৌলিক গবেষণা করলেও বিদ্বানদের মনে কৌতূহল জাগানো দুষ্কর, অথচ বাংলা ঠিকঠাক না জেনে কেবল এক বাঙালী মহিলার সহায়তায় একটা পাঁচশো পাতার রবীন্দ্রজীবনী লিখে ফেলা যায়, তার জন্য বিদ্যাজগতের অনুদানও পাওয়া যায়। জার্মান ঠিকঠাক না জেনেই কেবল এক জার্মান মহিলার সহাযতায় গ্যয়টের জীবনী লেখা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কি অনুমোদন করতেন ?

ঠিক একই সমস্যা দেখা দেয় অনুবাদকলার ক্ষেত্রে। এটি আমার উপরে উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। বাংলা ডায়াস্পোরার কোনো কোনো মানুষের মধ্যে হয়তো সেই দ্বৈভাষিক দক্ষতা আছে যার জোরে তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু এই কাজের জন্য অর্থমদত পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, প্রকাশক পাওয়া কঠিনতর, প্রকাশক জুটলেও যথাযথ প্রচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বই বেরোলেও রীডিং বা সেমিনার দেওয়ার জন্য অধ্যাপকমহল থেকে কোনো আহ্বান পাওয়া যাবে না। প্রচারে সংবাদপত্রগুলির কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। বরং বাগড়া দেবার কিছু লোক পাওয়া যাবে। বইটা একটু পুরোনো হয়ে গেলেই তাকে আর বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে কোনোমতে পার করেছি। হাজার হোক, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর নামটা অন্ততঃ অনেকের জানা। প্রকাশক জোটাতে বেগ পেতে হয নি একেবারেই। এখন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ করার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। কী ক'রে প্রকাশক জোটাবো জানি না।[৭] এ বিষয়ে কিছু লিখেছি *বৈদগ্ধ্য* পত্রিকার বুদ্ধদেব-স্মারক সংখ্যায়, আরও বিশদভাবে লিখেছি *জিজ্ঞাসা*-র ১৯ : ৪ সংখ্যায়।[৮] কিছু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে পাশ্চাত্য জগতের কবিতাপত্রিকায় অবশ্যই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু বই বার করতে হলে কী ধরণের লড়াই লড়তে হয় সে-সম্বন্ধে দেশস্থিত বাঙালীদের ধারণা অস্পষ্ট। তাঁরা মনে করেন আমরা যারা 'বাইরে' আছি তারা চাইলেই দেশের কবিদের বহির্জগতের দৃষ্টিতে তুলে ধরতে পারি। কাজটা অত সহজ নয়। ভারতীয় ভাষা থেকে অনূদিত সাহিত্য বার করার ব্যাপারে ইংরেজীভাষী দুনিয়ার প্রকাশকদের প্রচণ্ড অনীহা। কবিতার কাটতি খুব কম, তাই ও ব্যাপারে তাঁরা নিঃস্পৃহ। গদ্যের বেলাতে তাঁরা চান 'ইণ্ডিয়ান ইংলিশ রাইটিং', যেটা পাশ্চাত্য পাঠকদের টার্গেট ক'রে ঠিকঠাক মশলা দিয়ে তৈরি-করা চানাচুর, ঠোঙা বানিয়ে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিলেই হলো। কতিপয় মার্কিন প্রকাশভবন বিলেতের পুরোনো প্রকাশভবনগুলিকে অজগরের মতো আত্মসাৎ করেছে। আটলান্টিকের দুই কূলে প্রসারিত বাজারতন্ত্র সিরিয়াস সাহিত্যের শ্বাসরোধ করছে, অন্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহলকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। এ এক পরিতাপের বিষয়। আমি নিজে 'দ্য বৃটিশ সেন্টার

ফর লিটারারি ট্রান্সলেশন'-এর কাছ থেকে একটি ছোট অনুদান পেয়ে আমার প্রথম নাটক *রাতের রোদ*-এর একটি ইংরেজী তর্জমা করি। সেটি তাঁদের সমাদর লাভ করেছে। ২০০০ সালে তার অভিনয় হবার কথা, আশা করি হবে। হলে তো আনন্দেরই কথা। নাটকটা কে ছাপবে জানি না।[১] ছাপা হলে ভালো হতো, ইংরেজীভাষীরা আমার বাংলা কাজের একটা নমুনা পেতেন। তাঁরা আমার বাংলা লেখকসত্তার একটা পরিচয় পেলে অন্য কাজের জন্য মদত পেতে সুবিধা হতো আমার—বৃটেনে, যেখানে আমি এখন নাগরিক। রুশ্‌দির অনেক আগে থেকে আমি ভারতীয় ডায়াস্পোরার লেখক, কিন্তু বিদ্যাজগতেব তৎসংক্রান্ত আলোচনায় আমার নাম অদৃশ্য, যেহেতু তাঁদের মানচিত্রে ভারতীয় ভাষার লেখকদের কোনো স্থান নেই। ভাগ্যমন্ত যে-বঙ্গসন্তানরা পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মিডিয়ার জগতে প্রবেশাধিকার পেয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা আমাদের মতো মানুষদের সাহায্য করেন না। আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না তাঁরা। ডায়াস্পোরার অ্যাকাডেমিকরা অন্যদের যত খুশি 'ডি-কনস্ট্রাক্ট' করুন, তাঁরা নিজেরাই কিন্তু 'সাবঅল্টার্ন', চাকরি বজায় রাখতে হলে ওপরওয়ালাদের বিধান মানতেই হয়। যাঁরা এডওয়ার্ড সাঈদের শিষ্য তাঁরা একই সঙ্গে উপনিবেশবাদকেও ঠোকেন, আবার ইংরেজীকেই চূড়ান্ত গ্লোবাল মাধ্যম হিসেবে সিংহাসনে বসান, গৌরবান্বিত করেন. কনট্রাডিক্‌শনটা বোঝেন না। দেশান্তরিত 'উপনিবেশোত্তর' অধ্যাপকরা প্রাণ ভ'রে 'থিওরি' ও দক্ষিণ এশিয়ার 'ইংলিশ রাইটিং'-এর চর্চা ক'রে যাচ্ছেন—তাতে তাঁদের নিজেদের 'কেরিয়র'-এর সোপান-আরোহণ ভালোমতোই হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের সেই সাফল্য থেকে দিলারা হাশেম, গোলাম মুরশিদ বা আমার মতো যাঁরা ডায়াস্পোরিক অবস্থান থেকে বাংলায় লিখতে চান তাঁদের বিলেতে অথবা মার্কিন দেশে কোনো সুরাহা হচ্ছে না। প্রকৃত মদত ও গুণগ্রাহিতার জন্য আমরা সেই কলকাতা বা ঢাকার উপরেই নির্ভরশীল। এই আবহে আমরা যে অন্ততঃ আমাদের নিজস্ব চিন্তাব স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখতে পারছি, নিজেদেব তবফে নিজেরাই সেনাপতি থাকতে পারছি, কারও আজ্ঞাধীন হতে হচ্ছে না, এইটুকু বোধ হয় আমাদের লাভ। কলকাতা বা ঢাকা থেকে আমাদের যেটুকু ভৌগোলিক দূরত্ব, তা আজ্ঞাধীনতা থেকে আমাদের অনেকটা রক্ষা করে। দিলারা আর মুরশিদকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি; আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য যে লেখকবৃত্তি চালিয়ে যাবার জন্য, প্রকাশিত হবার জন্য, স্বীকৃতি পাবার জন্য আমাদের কোনো ধামাধরা কাজ করতে হয় না।

এটাও বলা দরকার, দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াস্পোরিক লেখককুলের মধ্যে যাঁরা কেবল ইংরেজীতে লেখেন তাঁদের যথেষ্ট বর্ণাহংকার আছে। তাঁরা নিজেদের উচ্চবর্ণ এবং আমাদের নিম্নবর্ণ মনে করেন, নিজেদের আলাদা রাখেন। আমাদের অনুষ্ঠানে তাঁরা পারতপক্ষে আসেন না। ইংরেজীভিত্তিক মিডিয়াতেও তাঁদেরই সমধিক খাতির।

তসলিমা নাসরিন যে সেখানে উল্লেখ পান, বা তাঁর সাক্ষাৎকার যে সেখানে নেওয়া হয়, তার মূল কারণ রাজনৈতিক : তাঁর মাথার উপরে ধর্মীয় চরমপন্থীদের ফতোয়া এখনও বলবৎ আছে ব'লে, বা কলকাতার কাগজ তাঁর লেখা বার করলে বাংলাদেশে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় ব'লে। এই সেদিন আমেরিকার *Ms* পত্রিকার অগাস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তাঁর উপরে একটি নতুন লেখা বেরিয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার ভিত্তি যদি শ্রেফ সাহিত্যিক হতো, তা হলে আমেরিকার ইংরেজী কাগজে দিলাবার উপরেও অনায়াসেই লেখা বেরোতে পারতো না কি ? দিলারা একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কলাকুশল কথাসাহিত্যিক ; তিনি অনেক দিন ধ'রে লিখছেন, অনেক দিন ধ'রে আমেরিকায় অভিবাসী, এবং হ্যাঁ, তাঁর লেখায় শিল্পিত নারীচেতনারও কোনো অভাব নেই।

ডায়াস্পোরার বাঙালীদের এটা বুঝতে হবে যে নিছক বিনোদনভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে সিরিয়াস সাহিত্যসেবীদের বা গবেষকদের সাহায্য করা যায় না। বিনোদন চলুক, আমি তার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু নূতন দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চস্তরে আমাদের কাজের স্বীকৃতি, আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের প্রচার যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে তার জন্য আমাদের ঢের বেশী প্রাজ্ঞভাবে সংঘবদ্ধ হতে হবে, লড়তে হবে। আমরা যারা কিছুটা স্বীকৃতি অর্জন কবেছি তারা বাংলা বই শেষ ক'রে উঠতে পারলে সেটা কলকাতা বা ঢাকা থেকে যেমন ক'রে হোক বেরিয়ে যায়, কিন্তু আমরা যদি অনুবাদে বুদ্ধদেব বা নজরুলের জন্য প্রকাশক চাই তা হলেই আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়। সাজেদ কামাল নজরুলের যে-অনুবাদ করেছেন সেই বইটি দেখলাম ঢাকা থেকেই বেরিয়েছে। পশ্চিমে তার বিতরণ হবে কি ? বুদ্ধদেবের অনুবাদ কলকাতা থেকে বার করতে আমার হয়তো তেমন কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে বই পশ্চিমে—এমন কি ভারতের অন্যত্র—পৌঁছবে কি ? কলকাতার প্রকাশকরা দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজে তেমন ক'রে বিতরণ করতে পারেন কি ? আর বাংলাভাষী দুনিয়ার বাইরে পৌঁছে দিতে না পারলে অনুবাদ ক'রে কী লাভ ? তাতে মূল লেখকেরও লাভ নেই, দেশান্তরিত অনুবাদকেরও বিশেষ কোনো প্রাপ্তি নেই। আজকাল পাশ্চাত্য প্রকাশকরা অনূদিত সাহিত্যের জন্য প্রকাশসহায়ক অনুদানও প্রত্যাশা ক'রে থাকেন। লণ্ডনের ইয়োরোপীয় দূতাবাসগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি তাঁদের দেশের সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন। আমাদের সামনে সে-সুযোগ নেই। সাহিত্যচর্চার বা গবেষণার সিরিয়াস খাতে আমাদের 'কম্যুনিটি' থেকে কোনো পুঁজির বিনিয়োগ নেই, নেই এমন কোনো নিজস্ব ফাউণ্ডেশন যা থেকে আমরা মদত পেতে পারি। আর বাঙালীদের বেলায় সেরকম কোনো প্রতিষ্ঠান যদিও বা গ'ড়ে ওঠে, তৎক্ষণাৎই কি দুই বাংলার মধ্যে বিশ্রী রেষারেষি আরম্ভ হয়ে যাবে না ? আমি মার্কিন দেশের বা ক্যানাডার কথা সরজমিনে জানি না, কিন্তু বৃটেনের হালচাল জানি। এখানে

দুই দিক থেকে আগত 'কম্যুনিটি'র মধ্যে রেষারেষি যথেষ্টই আছে, এবং এপার-ওপারভিত্তিক গ্রুপিজ়্ম্ বেশ প্রবল।

টেক্সাসের সম্মেলনে আমার বক্তৃতার পর যে-আলোচনা হয় সেখানে একজন বলেন, আমার কথার মধ্যে 'অভিমান' ফুটে উঠছে ; আরেকজন বলেন, আমি নাকি মার্কিন লেখিকাদের মতোই অধিকারসচেতন ! আমি বলবো, যাকে আমাদের পুরোনো দেশে 'অভিমান' বলে এ তা নয়। একে বরং বলা যায় আত্মসম্মানবোধ। আর হ্যাঁ, অধিকারচেতনার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। অধিকারচেতনা না থাকলে নূতন দেশের ডায়াস্পোরিক জীবনের সংগ্রামে আমরা তো এগোতেই পারবো না, প'ড়ে প'ড়ে মার খাবো। সংগ্রামটা যখন বাংলার জন্য তখন রণকুশলতা তো কাম্যই, ধানাইপানাই ক'রে কী লাভ।

ডায়াস্পোরায় বাংলা লেখার পেশীকে শক্ত করতে হলে কতগুলি জিনিস আমাদের করতেই হবে। প্রথমতঃ, দুই বাংলার শক্তিক্ষয়কারী হাস্যকর রেষারেষি পাশে সরিয়ে রেখে আমাদের শক্তিকে মিলিত করতে হবে। দু' দিকের এক্সপার্টিজ়ই আমাদের দরকার। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় প্রজন্মকে বাংলাভাষায় কিছুটা প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত, কেননা তারা নিজেরা বাংলায় না লিখলেও আমাদের জীবনে তাদের শ্রদ্ধা-সমর্থন-সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। আমরা কেন বাংলায় লিখতে চাই সেটা তাদের বোঝা দরকার। তৃতীয়তঃ, সাবঅল্টার্ন-মুখরিত বিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গণে, বাজারশাসিত প্রকাশনায়, আর হৈচৈতান্ত্রিক মতলববাজ মিডিয়ায় আমাদেব অনুপ্রবেশকে দৃঢ় ক'রে নিজেদের স্বাক্ষর রাখতে হবে। কিছু উপস্থিতবুদ্ধি ও ব্যবসায়িক টনক লাগবে, কিছু বিচক্ষণ ইম্প্রেসারিও চাই, নয়তো আমরা যেখানে আছি সেখানকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য যথোপযুক্ত জায়গা আমরা ক'রে নিতে পারবো না, প্রান্তিক অন্তেবাসী হয়েই থাকতে হবে আমাদের। এই-সব প্রসঙ্গে আমাদের আরও সৃষ্টিশীলভাবে চিন্তাবিনিময় করা দরকার। টেক্সাসের সম্মেলনে সেই সম্ভাবনার একটা উন্মেষ দেখেছিলাম। আশা করি তা বিকশিত হবে, অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে না।

উপসংহারে বলি, বাংলার সেবা অবশ্যই আমার জীবনের কেন্দ্রে একটি ব্রতের মতো প্রতিষ্ঠিত—ওখানে আমার আত্মপরিচয় আর আত্মমর্যাদাবোধ মিশে আছে—কিন্তু কোনো সংকীর্ণ মতবাদের আহ্বানে আমার মন সাড়া দেয় না। ভাষাকে ভিত্তি ক'রে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল কুনো জাতীয়তাবাদ, কোনো নব্য পৌত্তলিকতা বা জাতিভেদ যদি প্রশ্রয় পায়, তা হলে আমাদের নিজেদের মানসিক বিকাশই বাধাগ্রস্ত হবে। যে-ধরণের গোষ্ঠীপ্রীতি নিজেদের মধ্যে অন্যদের ডেকে আনতে চায় না, তাদের বাদ দিতে চায়, অন্যদের ক্ষতি ক'রেও নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রস্তুত, তা গ্রুপিজ়্মের নামান্তর ! ন্যাশনালিজ়্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-বিপদ দেখেছিলেন, তার সত্যতা এই

বিংশ শতাব্দীতে বারে বারেই প্রমাণিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের যেন মানুষের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কৌতূহলী, সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু ক'রে তোলে। নিজেদের যদি সেভাবে গড়তে না পারি তবে আমরা বৃথাই জন্মভূমির বাইরে এসেছি। ডায়াস্পোরার লেখক একটিমাত্র জাতির সম্পত্তি নন , তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে একটা আন্তর্জাতিকতা থাকবে, এটাই প্রার্থনীয়। জীবন্ত সেতুবন্ধন হতে পারা একরকমের বিশেষাধিকার, এবং ডায়াস্পোরার লেখককে তার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

১ বাংলা ডায়াস্পোরার লেখকদের নিয়ে সিরিয়াস গবেষণা আরম্ভ করেছেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপিকা ডঃ সুমনা দাস সুর।

২ ও ৩ এই বইয়ের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, লোকনাথ, শিবনারায়ণ ইত্যাদি প্রবন্ধে উল্লিখিত কেউ কেউ আর ইহলোকে নেই।

৪ তার ভিত্তিতে রচিত একটি প্রবন্ধ ২০০৩-এ *অমৃতলোক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫ ২০০০-এ এঁদেরই উৎসাহে 'Writing Diasporas' কনফারেন্স উপলক্ষ্যে *রাতের রোদ*-এর ইংরেজী রূপের প্রথম রজনীর অভিনয় হয় সোয়ান্‌সীর ক্যাম্পাস থিয়েটারে।

৬ *নোটন নোটন পায়রাগুলি* আমার অন্য দুটি রচনার সঙ্গে *এই পৃথিবীর তিন কাহিনী*-র অন্তর্গত হয়ে নূতন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে (ছাতিম বুক্‌স্‌, ২০০৬)।

৭ দিল্লীর অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস ২০০৩-এ আমার বুদ্ধদেব-অনুবাদ বার করেন।

৮ প্রবন্ধটি এই বইয়ের অন্তর্গত করা হয়েছে।

৯ আর্ট্‌স্‌ কাউন্সিলের পরামর্শ মেনে ইংরেজী অনুবাদটি (*Night's Sunlight*) মঞ্চায়ন-প্রোজেক্টের অন্তর্গত হয়ে 'programme-playscript'-এর ফর্মাটে ছাপা হয়।

[*জিজ্ঞাসা*, ২০ : ৩, ১৪০৬ (১৯৯৯-২০০০)। প্রবন্ধটির সূত্রে একই সংখ্যায় শিবনারায়ণ রায় কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন। আমার জবাবটি নীচে দেওয়া হলো। এটি অগাস্ট ২০০০-এ লিখিত ও ২০০১-এ *জিজ্ঞাসা*-র ২১ : ১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।]

জিজ্ঞাসা-র দপ্তরে একটি চিঠি

পত্রিকার ২০ : ৩ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের ডায়াস্পোরিক ভুবন সম্বন্ধে আমার যে-প্রবন্ধটি বেরিয়েছে সেই সূত্রে শিবনারায়ণ কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন। সে-প্রসঙ্গে দু'-একটি কথা বলতে চাই। মনে হয় এ বিষয়ে আরেকটু আলোচনার অবকাশ আছে।

শিবনারায়ণ লিখেছেন, '... কেতকীর অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার মূল তফাৎ হোল আমি কোনো দিনই লিখে জীবিকা অর্জনের কথা ভাবি নি, তার জন্য বেছে নিয়েছিলাম অধ্যাপনার বিকল্প। লেখাই কেতকীর জীবন এবং অনুমান করি জীবিকার প্রধান অবলম্বন।' তিনি এরকম কেন ভাবলেন জানি না। আমি তো আমার প্রবন্ধে পরিষ্কার বলেছি, 'লেখা আমার কর্মজীবন হলো, জীবিকা নয় কিন্তু। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে।' আমার প্রবন্ধে আমি তো এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি যে লেখালেখি আমার জীবনের মুখ্য কাজ হলেও তা থেকে আমার জীবিকা অর্জিত হয় না। আমি কোনোদিনই ভাবি নি যে বাংলায় লিখে বিলেতে জীবিকা অর্জন করা যাবে। বাস্তবতা থেকে ততটা বিযুক্ত নই আমি। আমার নিজের জীবনের ন্যায়টা আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম—কী ক'রে কোন্ অবস্থার চাপে আমি একজন ডায়াস্পোরিক বাঙালী লেখিকা হয়ে উঠলাম, এবং তার জন্য আমাকে কী দাম দিতে হয়েছে। অধ্যাপনা করবো না এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ আমার ছিলো না। তেমন কাজের জন্যই তো প্রশিক্ষিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রজন্মের একজন অভিবাসী বাঙালী মেয়ে হিসেবে কার্যতঃ আমি একাধিক দফায় বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ডক্টরেট করার পরেও যখন সেই মুশকিলের কোনো আসান হলো না, তখনই আমি সত্বর সিদ্ধান্ত নিই যে আর কালক্ষেপ না ক'রে লেখার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করবো, রোজগার যত কমই হোক, কেননা সেই দিকেই আমার মনের আসল আকর্ষণ ছিলো বরাবর। আমাকে যদি একক চেষ্টায় রুটি রোজগার করতে হতো, তা হলে একটা না একটা অন্য কাজ করতেই হতো, কিন্তু যেহেতু আমার একজন জীবনসঙ্গী আছে, যে আমার এবং সন্তানদের সাধ্যমতো প্রতিপালন করা থেকে কখনো পরাঙ্মুখ হয় নি, তাই আমার সামনে আরেকটি বিকল্প ছিলো। দুজনে মিলে রোজগার না করলে মধ্যবিত্ত জীবনের অনেক চাকচিক্যকেই বাদ দিতে হয়, কিন্তু প্রাণধারণ অসম্ভব এমন তো বলা যায় না। আমার সামনে এই পথটি ছিলো—জীবনযাত্রার নিম্নতর মান স্বীকার ক'রে নিয়ে, পাশ্চাত্য জীবনের নানা বিলাসিতাকে বাদ দিয়ে, অভিবাসী অবস্থাতেই বাংলায় সিরিয়াস সাহিত্য রচনা করার একটা চেষ্টা করা। সেই চেষ্টাতেই আমি ব্রতী হলাম। একজন মেয়ের পক্ষে বাড়িতে ব'সে লেখার কাজের একটা বাড়তি সুবিধা এই যে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া ফেরত-আসার সময়ের সঙ্গে মানিয়ে বেশ খানিকটা কাজ ক'রে ওঠা যায়। মা অফিসে চাকরি করলে সন্তানরা মাকে অনেক কম পায়। আমার ছেলেরা আমাকে তার চেয়ে বেশী পেয়েছে, মনে হয় তার ফলে লাভবানই হয়েছে। এমন একটা সমাজের ভিতরে আমাকে

লেখালেখির কর্মজীবন গ'ড়ে তুলতে হয়েছে যেখানে 'কাজের মাসী' ব'লে কোনো সহায়িকা নেই, ধোয়ামোছা ঝাঁটপাট সমস্ত কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

শিবনারায়ণের নিজের ডায়াস্পোরিক অবস্থান আর আমার অবস্থানের মধ্যে সব থেকে বিনিশ্চায়ক পার্থক্য এই যে তিনি পুরুষ আর আমি মেয়ে। মেয়ে হিসেবে ষাট-সত্তর-আশির দশকের বিলেতে আমাকে যে-বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে। তিনি অধ্যাপকের পদে বৃত হয়ে পরিণত বয়সে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাঁর মনের মতো জীবন গ'ড়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর সংসারযাত্রার সহায়িকা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আমি কলকাতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একজন বিদেশীকে বিয়ে ক'রে তার দেশে প্রবাসী হই। তখন আমার মাত্র চব্বিশ বছর বয়স। আমাদের প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী মেয়েদের কাছে নিজেদের নির্বাচনমতো বিয়ে করতে পারাটা একটা বিরাট ইশ্যু ছিলো। আমি সেই স্বাধীনতাটা একটু বেশী মাত্রাতেই খাটিয়েছিলাম— একেবারে বিদেশীকে বিয়ে ক'রে পরবাসে চ'লে যাওয়া। বাবা-মায়ের অমত হলো না, তাঁদের আশীর্বাদও পাওয়া গেলো। কিন্তু তাব পরে কী কী বৈষম্যের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে সে-বিষয়ে কোনো সম্যক্ ধারণা ছিলো না তখন। ক্রমে ক্রমে বোঝা গেলো। দুটি শিশুকে নিয়ে অনেকটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেশ খানিকটা আর্থিক সংগ্রাম ক'রে যেভাবে আমি ডক্টরেট করেছিলাম তা একজন তরুণী মায়ের সংগ্রাম, একটি মেয়ের সংগ্রাম, কিন্তু সেই ডিগ্রী অর্জনের দ্বারা চাকরিক্ষেত্রের বৈষম্য এড়ানো সম্ভব হয় নি।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলেছিলেন যে একটি মেয়েকে লেখিকা হয়ে উঠতে হলে তার নিজের একটি ঘর আর বার্ষিক ৫০০ পাউণ্ড আয় চাই। তিনি বলেন নি যে টাকাটা বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকরি ক'রে নিয়ে আসতে হবে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে টাকাটা এসেছিলো একজন আত্মীয়ার কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারস্বরূপ। তিনি বলেছেন যে এই উত্তরাধিকার তাঁকে অপ্রিয় খুচরো কাজ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলো। মুক্তি দিয়েছিলো লেখার টেবিলে—বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছেন 'মায়াবী টেবিল'। তেমনি আমার ক্ষেত্রে আমার জীবনের এক সংকটলগ্নে, যখন বুঝলাম যে অধ্যাপনা করতে চাইলে আমাকে সত্যিই আবার দেশবদল করতে হবে, বৃটেনের সংসার অটুট রাখা যাবে না, তখন ভেবে দেখলাম, গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা একজন যখন ক'রে দিচ্ছে, তখন তার সুযোগ নিয়ে বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তখন নিয়ম ক'রে লিখতে বসি না কেন? কোনো রোজগারের পরোয়া না ক'রেই কাজ আরম্ভ করলাম, এবং দু' বছরের চেষ্টায় একটা উপন্যাস খাড়া করলাম। তার জন্য অল্প কিছু পারিশ্রমিক ভারতীয় মুদ্রায় পরে পেয়েছিলাম, উপন্যাসটা *দেশ*-এ বেরোবার পর। এরকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আরও অনেক বিবাহিতা নারী দেশে দেশে নিয়েছেন। আমি যদি অধ্যাপিকা হবার জন্য জেদ করতাম, তা হলে আমার সেই সাধের বিবাহ, যার জন্য আমি দেশ ছেড়েছিলাম, তা হয়তো ভেঙে যেতো। কিছু পুরুষ শিল্পীও আছেন, যাঁরা কম রোজগারে সন্তুষ্ট থেকে শিল্পরচনা করেন, বাচ্চাদের স্কুলে

নিয়ে যান, ফেরত আনেন, ঘরকন্নায় হাত লাগান, যাঁদের স্ত্রীরাই পরিবারের মুখ্য রোজগেরে। আমি বরাবরই জানি বাংলায় লিখে বিলেতে সংসার চালানো যাবে না। কিন্তু আমার একটা চেষ্টা থাকে বাংলা লেখালেখি থেকে অল্প কিছু রোজগার তহবিলে জমা পড়ুক, যা থেকে কলকাতায় গেলে আমার খরচ মেটানো যায়। সেটুকু আমি করতে পেরেছি। দমদমে একবার নামার পর আমাকে কোনো স্টার্লিং খরচ করতে হয় না। আমার একটা জেদ থাকে যে কলকাতার প্রকাশক-সম্পাদকরা এটুকু বুঝুন যে লেখাও একটা শ্রম, এবং তার জন্য অল্প হলেও কিছু পারিশ্রমিক, কিছু সম্মানদক্ষিণা থাকা বিধেয়। এটা আমাদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। সকলেই কিছু জনপ্রিয় লেখক হয়ে রয়াল্‌টি কুড়োতে উদ্‌গ্রীব নন। কেউ কেউ হ্রস্বীকৃত আয় মেনে নিয়ে সিরিয়াস সাহিত্য রচনা করতে প্রস্তুত। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য একটা ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিম্নকাঠামো তো লাগেই। সমাজ তাঁদের সেই ন্যূনতম নিম্নকাঠামোটা যুগিয়ে দিতে পারলে তাঁদের কাছ থেকে কিছু উন্নত মানের কাজ পাওয়া যেতেও পারে, যা নিছক জনপ্রিয়তা আর স্ফীত রয়াল্‌টির মুখাপেক্ষী নয়। আমার ধারণা প্রকাশক-সম্পাদকদের এ সম্পর্কে সচেতন করার ব্যাপারে লেখকদের একটা দায়ও আছে। ডায়াস্পোরার লেখকদের পক্ষে এটা একটা 'ডেলিকেট নেগোসিয়েশন', কিন্তু জরুরী। নয়তো কলকাতার প্রকাশক-সম্পাদকরা চিরকালই ভাববেন যে আমাদের পকেটে স্টার্লিং আর ডলারের গঙ্গাযমুনা, আমাদের আর কোনো-কিছুর দরকার নেই। তথ্য এই, অন্য কাজ থেকে পকেটে যদি সত্যিই টাকার বন্যা আসে, তা হলে সেই কাজটা নিঃসন্দেহে বিধ্বংসী, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যার খাই-খাই মেটানোর পর কাউকে আর কোনো মায়াবী টেবিলে বসতে হবে না। ঐ অবস্থায় শিল্পরচনা দূরে থাক, সন্তানপালন সংসারযাত্রাও সুকঠিন হয়ে পড়ে। এর চাপে কত বিবাহ যে ভেঙে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি যদি সত্যিই এ দেশে অধ্যাপিকার চাকরি পেতাম, তা হলে সে-গুরুদায়িত্ব সামলে, খাতা দেখা সামলে, কমিটি-কনফারেন্স ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলে, ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন-তত্ত্ব পোসট-কোলোনিয়াল-তত্ত্ব আর পোস্টমডার্নিজ্‌ম্‌-তত্ত্বের সঙ্গে রোঝাপড়া ক'রে, অপিচ সংসার-সন্তান সামলে, নিজের আত্মাকে সামলে, মাথা ঠিক রেখে *নোটন নোটন পায়রাগুলি, রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*, বা *রঙের রবীন্দ্রনাথ* লিখে উঠতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমার তো মনে হয় আমার স্নায়বিক বৈকল্য ঘটতো। বড় বই লেখার জন্য অধ্যাপকরা স্যাবাটিকাল নিয়ে থাকেন। সেগুলোকে তাঁদের নিজেদের লাইনের সমালোচনাধর্মী বা গবেষণামূলক বা তাত্ত্বিক বই হতে হয়, বলা বাহুল্য ইংরেজী ভাষায়। তাই বলতে চাই যে জীবনের এই সিদ্ধান্তগুলো কোনো সহজ সরল 'বেছে নেওয়া'র প্রশ্ন নয়। আমার পক্ষে যা করা সম্ভব সেটাই আমি করেছি।

শিবনারায়ণ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রসঙ্গ এনেছেন। লিখে রোজগার করাই যদি আমার মতলব হতো তা হলে তো নিঃসন্দেহে ইংরেজীতে এমন কিছু লেখার চেষ্টা করতাম যাতে বাজার মাত হতে পারে। কিন্তু সেটা আদপেই আমার জীবনের চালিকা শক্তি নয়।

বরং যেভাবে হোক বাংলায় লেখা চালিয়ে যাওয়াই আমার জীবনের একটি সিরিয়াস লক্ষ্য। ইংরেজীতে আমি কবিতা লিখি, কবিতা অনুবাদ করি, গবেষণাগ্রন্থও লিখি—যে-সব ক্রিয়াকলাপ থেকে কোনো বাজার মাত হয় না, কারও পকেটে টাকা আসে না। আসর সরগরম করতে হলে হয় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো গদ্য লিখতে হয়, নয় 'ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাস' বাজারে ছাড়তে হয়। যা-ই হোক, টেক্সাসের সম্মেলনে বাংলাভাষার একজন ডায়াস্পোরিক সাহিত্যিক হিসেবেই আমাকে বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছিলো, এবং আমার প্রবন্ধটা সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা। এই ডায়াস্পোরিক ভুবনে ইংরেজীর বিশ্বায়িত দাপট আমার মতো মানুষের জীবনে একটি অতিরিক্ত জটিলতা সৃষ্টি করে, যেহেতু ইংরেজীভাষী পাশ্চাত্য মানুষের মগজে তথা ডায়াস্পোরার এশীয়দের মধ্যেও অনেকের মগজেই এই ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না যে কোনো ইংরেজীজানা অক্সফোর্ডশিক্ষিত মানুষ আদৌ কেন দক্ষিণ এশিয়ার একটি ভাষায় বই লিখতে চাইবে।

এর পর আরেকটি ব্যাপারে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। শিবনারায়ণ তাঁর নিউ ইয়র্ক শহরের বঙ্গসম্মেলনের অভিজ্ঞতা ও তৎপরবর্তী স্থানীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ এই দুই এলাকা থেকে আগত অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের ব্যাপারে একটা তফাৎ দেখেছেন, এবং মন্তব্য করেছেন যে আমি তাকে গুরুত্ব দিই নি। প্রথমেই মনে করিয়ে দিই যে আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ বৃটেনভিত্তিক, আমেরিকাভিত্তিক নয়। আমার প্রবন্ধটি আমি পড়েছি মার্কিন দেশে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের সেমিনারে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ দুই দিকের প্রতিনিধিরাই ছিলেন, এবং আমাদের সকলের মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গ'ড়ে তোলাই যে-জমায়েতের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো। তেমন একটি সভায় আমি এমন কোনো সাধারণীকৃত তুলনামূলক মন্তব্য করতে পারি না, যা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত নয়, এবং যা দুই দিকের বাঙালীদের মধ্যে একটা টেনশন সৃষ্টি করতে পারে, সভাগৃহে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশ-নামক নতুন রাষ্ট্রটির গোড়াপত্তন হবার আগে থেকে আমি বৃটেনে অভিবাসী। সে-আমলে পূর্বপাকিস্তান থেকে যাঁরা এ দেশে আসতেন তাঁদের সিংহভাগ শ্রীহট্টের মানুষ। তাঁরা সাধারণতঃ রেস্তোরাঁ খুলে জীবিকানির্বাহ করতেন। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের মধ্যে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। নিজেদের বাঙালী সত্তা সম্বন্ধে এঁরা নিঃসংশয় ছিলেন না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে শুরু হয় এক আত্মনির্মাণপ্রক্রিয়া। এঁদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী, এই প্রশ্নটা নিয়ে সত্তরের দশক জুড়ে তিক্ত তর্কবিতর্ক চলেছে। ঢাকা-রাজশাহীর কলেজশিক্ষিত বাঙালীদের সঙ্গে সিলেটীর প্রতি অনুগত গোষ্ঠীর যথেষ্টই তর্কাতর্কি হয়েছে। বাঙালী হিসেবে একটা বৃহত্তর পরিচয় গ'ড়ে তোলার ব্যাপারে সিলেটী গোষ্ঠীর মধ্যে একটা প্রতিরোধের মনোভাব ছিলো। নিজেদের বাঙালী ব'লে ভাবলে মধ্যে মধ্যে ভারতীয় বাঙালীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও কিছু

কাজ করতে হয়। ধর্মের ব্যাপারটা এসে পড়ে। ১৯৪৭-এ দেশ তা হলে ভাগ হয়েছিলো কেন? যাঁরা গোঁড়া তাঁরা প্রথমে মুসলমান, তার পরে বাঙালী। কথাটা আমি দু'-একটি ধর্মপ্রাণা অবগুণ্ঠিতাকে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এই সেদিনও বলতে শুনেছি।

আশির দশকে একবার আমি কয়েক মাস অক্সফোর্ডের 'অ্যাডভাইসরি সেন্টার ফর মাল্টিকাল্‌চারাল এজুকেশন'-এর তরফে এই জেলার বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে কাজ করি। প্রধানতঃ ইংরেজী শেখানোর কাজ হলেও খানিকটা সোশ্যাল ওয়ার্কারের ভূমিকাও পালন করতে হতো। প্রসঙ্গতঃ বলি, বাড়ির বাইরে কাজ করার সঙ্গে ঘরের কাজ আর লেখার কাজকে মেলানো যে কতটা শ্রমসাধ্য তা আমি ঐ ন' মাসে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। প্রতি বিকেলেই এত ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম যে মায়াবী টেবিলে আসীন হওয়া দূরে থাক, রান্নাবাড়া করতেও ইচ্ছে করতো না। যা-ই হোক, দুটি সিলেটী রেস্তোরাঁ-পরিবারের কন্যাকে মনে আছে, যারা আমাকে শিক্ষিকারূপে পেয়ে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিলো। একদিন আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ খাইয়েছিলো তারা। আমি যে বাঙালী হয়েও মুসলমান নই এ কথা জেনে তাদের মা যেন একটু বিস্মিতই। হিন্দু বাঙালী হয় কিনা সে-সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কেমন যেন ভাসা-ভাসা, ওদিকে তাঁদের মানসিক জগৎটা ছিলো বোম্বাইয়ের ছবির ভিডিও দ্বারা শাসিত। মেয়ে-দুটি কলেজে যেতে চায়, মায়ের আপত্তি নেই, কিন্তু জানলাম তাদের বড় ভাই যেতে দেবে না। আমি ভ্রাতাটির সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম। কিন্তু ভ্রাতাটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখে নি। দুই বোনের বিশ্বাস অর্জন করলেও তাদের দাদাটির বিশ্বাস অর্জন করতে পারি নি। আমি যখন 'কলকাতার হিন্দু টীচার' এবং ইংরেজের স্ত্রী তখন নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষার নাম ক'রে তার বোনেদের দুরন্ত স্বাধীনতার পথে উস্‌কে দেওয়াই আমার মতলব। মেয়ে-দুটি কতদিন আমার বাড়িতে কাতর টেলিফোন করেছে। তার পর একদিন জানলাম তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কলেজে তারা আর যায় নি।

বৃটেনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পুব পশ্চিম দুই দিকের বাঙালীদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকেই গুরুত্ব দিয়েছি। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে দুই দিকের মানুষই আছেন। বৃটেনের বাংলাদেশীরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের থেকে বাংলাকে বেশী ভালোবাসেন, তার জন্য বেশী খাটেন—এমন কোনো সাধারণীকৃত দাবি আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করতে পারি না। পুব-পশ্চিমের দুই দিকেরই উচ্চশিক্ষিত পরিবারগুলিতে দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ বাংলায় কথাবার্তা বলতে চায় না, সে তাদের বাবা-মা ঢাকার হোন, কি কলকাতার। বাংলাদেশীদের মধ্যে যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করেন বা বইয়ের দোকান চালাবার চেষ্টা করেন তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেন যে তাঁদের কম্যুনিটির লোকেরা বাংলা বই পড়েন না, কেনেন না। লাইব্রেরিতে বাংলা বই কেনা হলেও তা ইশ্যু হয় না। দোকানে বই সাজিয়ে রাখলেও তা বিক্রি হয় না। শুনেছি আমার যে-বই কলকাতায় আউট অফ প্রিন্ট লণ্ডনের দোকানে তার পুরোনো স্টক প'ড়ে

আছে। তবে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে ও তার বিবর্ধনে, সুযোগসুবিধা আদায়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের চাইতে বেশী সচেষ্ট, রাজনৈতিকভাবে আরও তৎপর ও সোচ্চার। পশ্চিম দিকের বাঙালীদের একটা ভারতীয় আত্মপরিচয়ও আছে, সেটা রক্ষা করার দায়ও আছে। সেটা তাঁরা খারিজ করতে চান না, কেন চাইবেন। ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখোমুখি তাঁরা একটু অস্বস্তি বোধ করেন, একটু নীরব থাকেন। ফলে এ দেশে অনেকের ধারণা জন্মেছে যে রাংলা যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা সকলেই বাংলাদেশী, সকলেই মুসলিম। ভারতীয়দের মধ্যেও যে 'বাঙালী' আছেন, সেই বাঙালীরা যে ধর্মে হিন্দু হতে পারেন, সে-বিষয়ে তাঁদের ধারণা ঝাপসা হয়ে গেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা সময়ে সময়ে কোণঠাসা বোধ করেন।

উত্তর আমেরিকায় বাঙালীদের মাইগ্রেশনের ছবিটা কিছু আলাদা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দিন ধ'রেই ওদিকে 'ব্রেন ড্রেন' হয়েছে। তার পব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর উত্তর-মার্কিন ইমিগ্রেশনের বিধিবদ্ধ চ্যানেলে যে-সব বাংলাদেশী খেপে খেপে ওদিকে পৌঁছেছেন তাঁদের মধ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত ও পেশাদার মানুষ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে একাত্তর-পরবর্তী চেতনাও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তাঁরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের চাইতে বাংলাকে বেশী ভালোবাসেন এমন কোনো মন্তব্য করা আমার এক্তিয়ারের বাইরে হতো, অশোভনও হতো। টেক্সাসের সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বোধ করি প্রধানতঃ বাংলাদেশী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয়রাও কাজ করেছিলেন। বস্তুতঃ, আমাকে যিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তিনি কলকাতার ছেলে এবং *জিজ্ঞাসা*-র আজীবন সদস্য— সৌম্য দাশগুপ্ত। সৌম্যর উৎসাহ ও প্রবর্তনা ছাড়া আমি ওখানে নেমন্তন্ন পেতাম কিনা বলতে পারি না।

১৯৯৮-এব জুলাইয়ে টরন্টোর টাউস বঙ্গসম্মেলনে অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। সেটার উদ্যোক্তারা প্রধানতঃ পশ্চিম বাংলার, কিন্তু বাংলাদেশের অভিবাসীরাও সহযোগী ছিলেন। কিছুটা সহযোগিতাই তো এই জাতীয় সম্মেলনের রীতি, দেখতে পাই। আর হ্যাঁ, এই মেলাগুলোর একটা বড় দিক অবশ্যই সামাজিক মেলামেশা, কেনাবেচা, নৃত্যগীতভিত্তিক মিশ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন। কিন্তু সমবেতদের মধ্যে পেশাদার বিদ্বজ্জনেরাও থাকেন। টরন্টোতে আমার সেমিনার-বক্তৃতায় তো ঘরভর্তি শ্রোতা ছিলেন, অনেকে চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন। আগ্রহ নিয়েই শুনেছেন। ঠিকই, মেলায় শাড়ি বিক্রি হয়, গানের ক্যাসেটও বিক্রি হয়, কিছু বইও বিক্রি হয়। আমেরিকার বাঙালীদের ক্রয়ক্ষমতা বেশী। বই কেনার ব্যাপারে তাঁরা লণ্ডনের বাঙালীদের চাইতে অধিক মুক্তহস্ত। আমি তো যখনই কিছু বই নিয়ে গেছি সব বিক্রি ক'রে ফিরেছি। ১৯৯৮ সালের বঙ্গসম্মেলনের প্রেসিডেন্সি কলেজ পুনর্মিলনটি মনে পড়ছে। হাতের বইগুলো টেবিলে রাখার কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিক্রি হয়ে যায়। সঙ্গে আরও কেন আনি নি তা

নিয়ে কেউ কেউ আক্ষেপ প্রকাশ করলেন।

ঐ ১৯৯৮ সালের হেমন্তকালে আমি আবার আটলান্টিক পার হই, এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি 'লেক্চার ট্যুর' উপলক্ষ্যে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক ছিলেন আমার এক অনুরাগী পাঠক, যিনি কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মাড়োয়ারী। তাঁর চেষ্টায় দিলারা হাশেমের সঙ্গে আমার একটি যুগ্ম ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় ওয়াশিংটন ডি-সি-তে। তার পর পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের চেষ্টায় আরও তিনটি শহরের ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দিই। পশ্চিম বাংলার মানুষদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং উৎসাহী গুণগ্রাহিতা পেয়েছি। স্যুটকেসে যে ক'খানা বই নিয়ে গেছি সবই বিক্রি ক'রে ফিরেছি। নতুন অর্ডারও নিয়ে এসেছি এবং বিলেতে ফিরে এসে ডেস্প্যাচ করেছি। সত্যি বলতে কি, আমি যে-ক'বার আমেরিকায় গেছি প্রতিবারই কোনো-না-কোনো নতুন অনুরাগী পাঠকের সন্ধান পেয়েছি, যিনি পশ্চিম বাংলা থেকে আগত অভিবাসী। এ ক্ষেত্রে আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা আমি মোটেই বলতে পারি না যে মার্কিন দুনিয়ায় অভিবাসী পশ্চিমবঙ্গীয়দের বাংলার প্রতি আকর্ষণ অভিবাসী পূর্ববঙ্গীয়দের চেয়ে কম। আত্মীয়তা বোধ করবার জন্যই সম্মেলনগুলি ডাকা হয়। যোগদান ক'রে কিছুটা আনন্দ পাই। তার পর ফিরে এসে সৃষ্টির কাজ আবার সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই করতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা যায়, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশীদের মধ্যে ডায়াস্পোরিক সাহিত্যচর্চা এতটা প্রবল হওয়া সত্ত্বেও (যেমন শিবনারায়ণ বলছেন) মার্কিন দুনিয়ায় অভিবাসী কৃতী লেখিকা দিলারা হাশেমের নামটা তিনি তাঁদের মুখে শুনলেন না কেন? দিলারার নাম তো শিবনারায়ণ (এবং *দেশ*-এর বর্তমান সম্পাদক) আমার কাছ থেকেই জানলেন! এখানেও কি লিঙ্গগত পরিচয়ের একটা ব্যাপার আছে? আনন্দের খবর এই, ২০০০ সালের বৃহৎ মার্কিন বঙ্গসম্মেলনে পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা দিলারাকে অকুণ্ঠভাবে সম্মান জানিয়েছেন।